# বঙ্কিমচন্দ্র

# বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, কবিরত্ন

শ্রীভবতোষ দত্ত, ডি. লিট. সম্পাদিত

জিজ্ঞাসা
কলিকাতা-৯ : কলিকাতা-২৯

# BANKIMCHANDRA

By

**AKSHAYKUMAR DATTA GUPTA, KAVIRATNA**

**Edited by BHABATOSH DATTA, D. Litt.**


প্রথম সংস্করণ : ১৩২৭

প্রকাশক : শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড

**জি জ্ঞা সা**

১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯

১এ ও ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর : শ্রীদেবেন্দ্রনাথ নাথ

বাসন্তী আর্ট প্রেস

৫৭/২, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

## ॥ সূচীপত্র ॥

## প্রথম সংস্করণে গ্রন্থকারের নিবেদন

নানা চাকরী করিয়া এবং নানা ঘাটের জল খাইয়া সরকারী কর্মচক্রের আবর্তনে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে যখন সংস্কৃত ও বঙ্গভাষার অতিরিক্ত অধ্যাপকরূপে ঢাকা কলেজে আসিয়া পড়িলাম তখন এই কলেজের সকল শ্রেণীতে বাঙ্গালা পড়াইবার ভার আমারই উপর প্রদত্ত হইল। তদবধি এপর্যন্ত আমাকে তৃতীয় বা চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে বঙ্কিমচন্দ্রের একখানি উপন্যাস অধ্যাপনা করিতে হইয়াছে। ঐ গ্রন্থখানি উপলক্ষ করিয়া (ছাত্রগণের পরীক্ষার্থে প্রয়োজনীয় না হইলেও) বঙ্কিমের জীবন ও তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থসম্বন্ধেই আমি স্বল্প-বিস্তর আলোচনা করিতাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রগণ ঐ ভাবে আপনাদের জাতীয় সাহিত্যভাণ্ডারের মহামণিগুলির একটু মর্যাদাবোধ ও আদর করিতে শিখুক। আমি আমার বিজ্ঞতায় বা অধ্যয়ননৈপুণ্যে কখনই অনুচিত আস্থাশালী নহি, কিন্তু আমার ভাগ্যগুণে এবং অধ্যাপিত বিষয়ের মনোজ্ঞতায় অল্পদিন মধ্যেই বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশেষতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর আলোচনায় ছাত্রগণের অনুরাগ ও উৎসাহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল বলিয়া আমার ধারণা জন্মিয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ক্লাসের বাহিরে বাঙ্গালা সাহিত্যসম্বন্ধে আমাকে নানা প্রশ্ন করিতে আসিতেন এবং অনেকেই আমাকে আমার বক্তৃতাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া মুদ্রিত করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেন। শেষে কেহ কেহ বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনামূলক গ্রন্থ প্রকাশ জন্য জিদই করিতে লাগিলেন। একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—ইনি আমার পরমস্নেহাস্পদ ছাত্র, স্বয়ং বাঙ্গালা রচনায় রুচিশীল ও শক্তিসম্পন্ন শ্রীমান্ চারুভূষণ দেব (বি, এ,)। এইরূপে ছাত্রগণের অত্যাগ্রহেই নিজ অক্ষমতাবোধ সত্ত্বেও আমি এই গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হই। আমার সঙ্কল্পের বিষয় অবগত হইয়া ঢাকা সিটি লাইব্রেরীর অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার রায় মদ্রচিত গ্রন্থ প্রকাশ করিতে আগ্রহ দেখাইলেন। এইরূপ নানা জনের উৎসাহে গ্রন্থরচনা সমাপ্ত হইবার পূর্বেই উহার মুদ্রাঙ্কণ আরব্ধ হইল। ইতিমধ্যে আমি পারিবারিক নানা বিপদে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। গ্রন্থ আংশিক রূপে মুদ্রিত হইয়া অবশিষ্টাংশের রচনার জন্য পড়িয়া রহিল। পরে যখন যতটুকু লিখিয়াছি, অমনি তাহা ছাপা হইয়াছে। এইরূপে দুই বৎসরে উহা সমাপ্ত হইল। মুদ্রাঙ্কণের পূর্বে সমস্ত গ্রন্থ এক সময়ে পড়িয়া দেখিতে ও সংশোধন করিতে না পারায় উহাতে দুই একস্থলে এবং অসঙ্গতি দোষ ও অসতর্কতাজনিত ভ্রমও রহিয়া গিয়াছে। যাঁহাদের উৎসাহে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাঁহারা ইহার শত ত্রুটি উপেক্ষা করিয়াও আদর করিবেন জানি, কিন্তু সর্বসাধারণে ইহা কতদূর প্রীতির চক্ষে দেখিবেন তাহা বলিতে পারি না। ঢাকা কলেজে আমার অধ্যাপকলীলা প্রায় ফুরাইয়া আসিল। কর্মচক্রের পুনরাবর্তনে একপক্ষ মধ্যেই আমি ঢাকা ছাড়িয়া, এমন কি, অধ্যাপকতা ছাড়িয়াও

অন্য বিধ কর্মক্ষেত্রে গিয়া পড়িব। ঢাকা কলেজ হইতে বিদায় লইবার পূর্বে যে আমি আমার ছাত্রগণের একটা আবদার রক্ষা করিতে পারিয়াছি, এই জ্ঞানই বর্তমানে আমার পক্ষে যথেষ্ট পুরস্কার বিবেচনা করি। এই গ্রন্থে অসতর্কতাজনিত যে দুই একটি ভ্রম আছে, এবং গ্রন্থখানিকে সমগ্রভাবে পুনঃপাঠ ও সংশোধন করিবার অনবসরহেতু যে ত্রুটি নিতান্ত অনিবার্য হইয়াছে তজ্জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত ও লজ্জিত। ইহা ছাড়া এই পুস্তকে যে সকল মুদ্রাকর প্রমাদ ঘটিয়াছে তজ্জন্যও আমি পাঠকগণের ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। যদি ইহার দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কণ আবশ্যক হয়, তবে ঐ সকল ত্রুটি যথাসাধ্য সংশোধন করিবার বাসনা রহিল।

এই গ্রন্থখানি প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের "জীবনী" নহে, তাঁহার জীবন, যুগ ও গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে আলোচনামাত্র। যদিও তাঁহার জীবনসম্বন্ধে আমি নিজে যে যৎসামান্য অনুসন্ধান করিবার সুযোগ পাইয়াছি তাহার ফল আংশিকরূপে এই গ্রন্থের অঙ্গীভূত হইয়ছে, তথাপি আমার আবিষ্কৃত অনেক বিষয়ই যথাযোগ্য সমর্থনের অভাবে এবং অন্যান্য কারণে আপাততঃ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। কাজেই বঙ্কিমের জীবনসম্বন্ধে আলোচনা যাহা কিছু করা হইয়াছে, তাহার মূল সবই মুদ্রিত গ্রন্থ বা প্রবন্ধ। সেখানে যে গ্রন্থ বা প্রবন্ধ হইতে যেরূপ সাহায্য লাভ করিয়াছি তাহা প্রায় সেই স্থানেই (গ্রন্থমধ্যে বা পাদটীকায়) অঙ্গীকৃত হইয়াছে। ঐ সকল গ্রন্থ বা প্রবন্ধের লেখকগণ সকলেই আমার কৃতজ্ঞতার পাত্র। বঙ্কিম-জীবনের ঘটনার তারিখগুলি আমাকে প্রায় শ্রীযুক্ত শচীশবাবুর গ্রন্থ হইতে এবং ১৩২১ সনের চৈত্র মাসের 'মানসী' পত্রিকায় প্রকাশিত ও শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় সঙ্কলিত 'বঙ্কিম জীবনপঞ্জী' হইতে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। প্রভাতবাবুর পঞ্জী আবার প্রধানতঃ শচীশ বাবুর গ্রন্থ হইতেই সঙ্কলিত। সুতরাং শচীশবাবুর নিকটই এ বিষয়ে আমি অধিক ঋণী। শচীশবাবুর অনেক মতই কেবল ভ্রম প্রদর্শন জন্য এই গ্রন্থে উল্লিখিত হইলেও কেহ যেন মনে না করেন উঁহার গুণাবলীর প্রতি আমি অন্ধ বা অনুরাগহীন। শচীশবাবুর গ্রন্থ ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনসম্বন্ধে গত ২৬/২৭ বৎসর মধ্যে যাহা কিছু প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি তৎসমুদয়ই আমি একবার পড়িয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছি। ইহাতে যে কতদূর ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছে তাহা মফস্বলের সাহিত্যসেবিমাত্রেই সহজে উপলব্ধি করিবেন। আমার কয়েকটী বন্ধু এ বিষয়ে আমাকে প্রচুর সাহায্য করিয়াছেন। একজনের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা ঋণ অত্যন্ত অধিক। ইতি ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কবি-পৌত্র আমার পরমপ্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ। ইনি স্বীয় পিতামহের গ্রন্থাগার হইতে প্রাচীন বান্ধব, আর্যদর্শন, বঙ্গদর্শন প্রভৃতি দ্বারা আমার বিপুল সাহায্য করিয়াছেন। প্রাচীন সাহিত্য, প্রদীপ, নব্যভারত প্রভৃতি আমি অন্য নানা ব্যক্তি হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক গ্রন্থের

প্রথম সংস্করণ এবং প্রয়োজনীয় অন্য কতিপয় গ্রন্থ আমি ঢাকা ট্রেনিং স্কুলের প্রাচীন গ্রন্থাগার হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। ঐ বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষকও আমার কৃতজ্ঞতার পাত্র। বহু চেষ্টায়ও ৺গিরিজাপ্রসন্ন রায়ের "বঙ্কিমচন্দ্র" গ্রন্থের এক কপালকুণ্ডলাংশ ছাড়া অন্য অংশ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। পাঠকগণ ইহাতেই বুঝিবেন মফস্বল সহরবাসীর পক্ষে সাহিত্যচর্চা কতদূর বিড়ম্বনা। গিরিজাপ্রসন্নের সমগ্র বইখানি যে কিনিতে পাওয়া যায় না বঙ্কিমানুরাগিগণের ইহা দুর্ভাগ্য।

এই গ্রন্থখানি প্রায় দুই বৎসর পূর্বে মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়। ঐ সময়ে মুদ্রিত অংশে বঙ্কিমের পত্নী 'অদ্যাপি জীবিতা' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। একথা এখন আর সত্য নহে, উহা সকলেই জানেন। ৬১ পৃষ্ঠায় [ বস্তুতঃ ৬৬ পৃষ্ঠায়—স ] স্টুয়াটের ইতিহাসে ওসমানের উল্লেখ নাই বলিয়া যে কথা লিখিয়াছি তাহা অসতর্কতামূলক। ঐতিহাসিক পাঠক আমার ঐ ত্রুটি মার্জনা করিবেন। 'রাধারাণী' চতুর্থ সংস্করণে কিঞ্চিৎ পরিবর্ধিত হইয়াছিল। ইহাও অসতর্কতা হেতু আমার চক্ষে পড়ে নাই। পরিবর্ধিত হইলেও উহা শিল্প কৌশলে হীনই রহিয়া গিয়াছে—সুতরাং ঐ গ্রন্থ ও বঙ্কিমের ছোটগল্পসমূহ সম্বন্ধে আমি যে মত প্রকাশ করিয়াছি তাহা মোটের উপর অবিসংবাদিতই রহিয়াছে বলিয়া আমি মনে করি।

ইতি—

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত কবিরত্ন

ঢাকা কলেজ
২০শে শ্রাবণ, ১৩২৭

# বঙ্কিমচন্দ্র

—:০:—

## সূচনা

যে যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম, উহা বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসে একটা উৎকট প্রলয়ের যুগ। এই সময়ে বাঙ্গালার হিন্দুসমাজে এরূপ একটা প্রবল সংক্ষোভ দৃষ্ট হইয়াছিল যে, অনেকেরই মনে হইয়াছিল, এই বিপ্লবাবর্তে দেশের প্রাচীন আচার, প্রাচীন সংস্কার, প্রাচীন বিদ্যা, প্রাচীন নীতি, এমন কি হিন্দুসভ্যতার সনাতন বিশেষ যে অধ্যাত্মদৃষ্টি, তাহা পর্যন্ত চিরকালের জন্য অতল কালসাগরগর্ভে ডুবিয়া যাইবে।

বাহ্যদৃষ্টিতে এই বিপ্লব খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে আরব্ধ হয় বলিয়া অনেকে এই ঘটনাকে একটা নিতান্ত আকস্মিক ব্যাপার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ উহা সেরূপ নহে। সমাজের কোনও পরিবর্তনই অকস্মাৎ ঘটে না। সৃষ্টি ও স্থিতির ন্যায় প্রলয়ও বিশ্ববিধানের একটা নিত্য দিক্। ধর্মশাস্ত্রকারগণ বিশ্ববিধানে চারিপ্রকার প্রলয় স্বীকার করিয়াছেন—নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃত ও আত্যন্তিক। বিশ্বে যেমন নিত্যপ্রলয় চলিতেছে, মনুষ্যসমাজেও তেমনি নিত্যপ্রলয় আছে। বিশ্বে যেটা প্রলয়ের ক্ষণ, অন্য দিক্ দিয়া দেখিলে তাহাই সৃষ্টির ও স্থিতির ক্ষণও বটে। বিশ্বে নিত্যপ্রলয়ের সঙ্গে নিত্যসৃষ্টি ও নিত্যস্থিতি ওতপ্রোত-ভাবে গ্রথিত। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের মধ্যে ব্রহ্মা কয়েক দিনে বিশ্বজগতের সৃষ্টি সম্পূর্ণ করিয়া বিষ্ণুর স্কন্ধে সমস্ত ভার অর্পণপূর্বক নিশ্চিন্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে বসিয়া আছেন,[১] এবং মহেশ্বর বেচারি চাকরির উমেদারের ন্যায় সুদূরসম্ভাব্য প্রলয়ের প্রতীক্ষায় ক্ষুণ্ণ মনে কালযাপন করিতেছেন এরূপ মনে করিবার যুক্তিসঙ্গত হেতু নাই। বস্তুতঃ তিন দেবতাই সত্য, নিত্য এবং অভিন্ন;—কোনও মুহূর্তে ইহাদের কাহারও লীলার অবসান হয় না, কিংবা কাহারও লীলা অনারব্ধ থাকে না। নিত্যপ্রলয় ও নিত্যসৃষ্টির মধ্য দিয়া যেমন জগতের বিবর্তন, ক্রমোন্নতি বা অভিব্যক্তি হইতেছে, সেইরূপ সমাজও নিত্যপ্রলয় ও নিত্যসৃষ্টির মধ্য দিয়া ক্রমবিকাশ লাভ করিতেছে। সমাজেও নিত্যই প্রলয়ের সঙ্গে সৃষ্টি, সৃষ্টির সঙ্গে প্রলয় চলিতেছে। এই পরিবর্তন সর্বদা লক্ষ্য হয় না। কিন্তু ইহার সত্যতা ও

---

১। পরমেশ্বর সম্বন্ধে সাধারণ খৃস্টানের এইরূপ ধারণার প্রতি কটাক্ষ করিয়া কার্লাইল এক স্থানে লিখিয়াছেন—"An absentee God sitting idle ever since the first Sabbath, at the outside of His Universe and seeing it go."

নিত্যতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। একটা অতিক্ষুদ্র বীজ হইতে অতিক্ষুদ্র অঙ্কুর এবং তাহা হইতে ঈষৎ একটু বড় প্ররোহ কিরূপ ধীরে ধীরে নিঃশব্দে অনাড়ম্বরে উদ্ভূত হয়, তাহা কে লক্ষ্য করে? কিন্তু সেই প্ররোহই যখন কালক্রমে মহামহীরুহের আকার ধারণ করে, তখন লোকে বিস্ময়বিহ্বলচিত্তে তাহার দিকে তাকাইয়া থাকে।

আবার বিশ্বে যেমন নিত্যপ্রলয় ছাড়াও নৈমিত্তিক নামে একপ্রকার প্রলয় স্বীকৃত হইয়াছে, মনুষ্য-সমাজমধ্যেও সেইরূপ নৈমিত্তিক প্রলয় স্বীকার করা যাইতে পারে। নিত্যপ্রলয়ের দ্বারাই অবস্থাবিশেষে দ্রুততর হইয়া নৈমিত্তিক প্রলয়ের সংঘটন করে। নিত্যপ্রলয়ই সমাজকে নৈমিত্তিক প্রলয়ের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখে; একদিনে করে না, ধীরে ধীরে বহু বৎসর ধরিয়া প্রস্তুত করে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বঙ্গীয় সমাজে যে মহাবিপ্লব ঘটিয়াছিল, উহাও সামাজিক একটা নৈমিত্তিক প্রলয়; কিন্তু উহার জন্য বঙ্গীয় সমাজ বহু পূর্ব হইতেই প্রস্তুত হইতেছিল। যাঁহারা বলেন, বঙ্গীয় সমাজ মহামতি রাজা রামমোহন রায়ের পূর্বে বহুশত বৎসর ধরিয়া জড়, স্পন্দহীন, সুপ্ত বা নিতান্ত স্থিতিশীল অবস্থায় ছিল, এবং রামমোহন তাহাকে পুনঃ পুনঃ কশাঘাতে জাগ্রত ও আংশিক রূপে সচল অবস্থায় আনিয়াছিলেন, তাঁহারা যথার্থ কথা বলেন না। রাজা রামমোহনের জন্মকালে বাঙ্গালার হিন্দুসমাজ আপাততঃ খুব স্থিতিশীল বলিয়া বোধ হইলেও, বস্তুতঃ উহা স্থিতিশীল ছিল না। কোনও সমাজেরই কোনও প্রতিভাবান ব্যক্তি উল্কাপিণ্ডের ন্যায় নক্ষত্রলোক হইতে ছুটিয়া আসেন না। রামমোহন বাঙ্গালার সমাজেই জন্মিয়াছিলেন, বাঙ্গালার সমাজেই বড় হইয়াছিলেন, বাঙ্গালারই অন্যান্য বহু ব্রাহ্মণ সন্তানের ন্যায় বাল্যে আরবী ও পার্শী ভাষা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, নিজ সমাজেই পৌত্তলিকতার ও প্রাণহীন আচারের বিরুদ্ধে নানা কথা শুনিয়াছিলেন, নানা তথ্য শিখিয়াছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক অন্য বহু ব্যক্তি হইতে তাঁহার প্রভেদ এই ছিল যে, তাঁহার সমসাময়িক সমাজের মধ্যে বিক্ষিপ্ত ভাবপুঞ্জ তাঁহার মধ্যে সংহত হইয়াছিল। প্রতিভাবানের বিশেষত্ব এইখানে। মার্কিন মনীষী এমার্সন কবিদিগের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, The poet stands in strict relation to his people. He has the overdose of their nationality. কবি সম্বন্ধে যাহা সত্য, সকল 'লোকোত্তরপ্রতিভাশালী' ব্যক্তির সম্বন্ধেও তাহাই সত্য। সমাজের বিক্ষিপ্ত ভাবপুঞ্জ তাঁহাদিগের মধ্যে ঘনীভূত হয়, সমাজের নীরব আশা ও আকাঙ্ক্ষারাশি তাঁহাদিগের রসনায় ভাষাপ্রাপ্ত হয়, সমাজহৃদয়ের গুপ্ত বেদনা তাঁহাদের হৃদয়ে ব্যথার উদ্রেক করে, সমাজদেহের মর্মস্থলের অলক্ষ্য ব্রণ তাঁহাদের নিপুণ বিবেচনা-শক্তির কাছে ধরা পড়ে। অধ্যাপক বুণ্ড্ (Wundt) বলিয়াছেন—

The leading minds are those who are more clearly

conscious than others of the impelling forces of public opinion, who concentrate these forces in their own personality and thus gain the power to determine or vary their direction so far as such power can operate within the limits of the tendencies of the universal will.

রাজা রামমোহন রায় ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, ইহা যত অসম্ভব অলৌকিক ব্যাপার বলিয়া কেহ কেহ বর্ণনা করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে তত নহে। ঐ সকল লেখক রামমোহনকে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে প্রথম অস্ত্রধারণকারী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন; উহাও সত্য নহে। এখনও যেমন বহু লোকে জানে পৌত্তলিকতা হিন্দুধর্মের উচ্চতম সোপান নয়, তখনও জানিত। এখনও হিন্দু-অহিন্দু অনেকে মূর্তিপূজা-পদ্ধতিকে আক্রমণ করে, তখনও করিত। আবহমান কাল হইতে কত ধর্মসংস্কারক ইহার বিরুদ্ধে কত যুক্তি দিয়াছেন; কত নাস্তিক কত কথা বলিয়াছেন! রামমোহনের বাল্যে যেমন বহুদেবতাপূজক বা প্রতিমাপূজক ব্যক্তিগণের ইয়ত্তা ছিল না, তেমনই একেশ্বরবাদী, বা ব্রহ্মবাদী, বা বৈদান্তিক, বা নাস্তিক প্রভৃতির সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না। বস্তুতঃ ইহারাই রামমোহনের জন্য কার্যক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। নিত্যপ্রলয় ও নিত্যসৃষ্টির ধারাক্রমে রামমোহনের সমসাময়িক বাঙ্গালা সমাজ পূর্ব হইতে যে এক বিপর্যয়োন্মুখতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, আংশিক রূপে রামমোহন ও তাঁহার সমকালীন অপর কতিপয় ব্যক্তির চেষ্টায় এবং প্রধানতঃ দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে, সেই অবস্থাই ক্ষুদ্র-বৃহৎ কতকগুলি নিমিত্তসূত্রে মহাবিপ্লবের আকারে দেখা দিয়াছিল। এই বিপ্লবটাকেই ধর্মশাস্ত্রের পরিভাষার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য উপরে 'নৈমিত্তিক প্রলয়' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

সকলেই জানে ১৮১৭ খৃস্টাব্দে কলিকাতায় হিন্দুকলেজ স্থাপিত হয়। কিন্তু ইহার বহু পূর্ব হইতে ইংরাজী শিক্ষার প্রতি লোকের দৃষ্টি পতিত হইয়াছিল, এবং পাশ্চাত্য ভাষা ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-দর্শনাদিতে শিক্ষালাভের আবশ্যকতা অনুভূত হইয়াছিল। ইংরেজ শাসনকর্তৃগণ তখনও স্থির করিতে পারেন নাই, ইংরাজী ভাষায় এদেশবাসিগণকে উচ্চশিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা সমীচীন ও ইংলণ্ডের সহিত এদেশের সম্বন্ধ রক্ষার পক্ষে অনুকূল হইবে কি না। কিন্তু দেশীয় সমাজের কতিপয় ব্যক্তি শাসনকর্তৃগণের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা উচিত বিবেচনা না করিয়া, ডেভিড্ হেয়ার প্রভৃতি কয়েকজন সদাশয় বিদেশীয়ের প্ররোচনায় ও সাহায্যে এবিষয়ে সমুচিত ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের চেষ্টায় কলিকাতায় একাধিক ইংরাজী বিদ্যালয় ও অবশেষে সুবিখ্যাত হিন্দুকলেজ স্থাপিত হইল; এবং জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে দেশীয় যুবকবৃন্দ তথায় ইংরাজী বিদ্যা ও সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী

আচারও শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

যে সকল বক্তা বা লেখক হিন্দুসমাজকে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে নিতান্ত গোঁড়া, সঙ্কীর্ণচেতা, রক্ষণশীল এবং দেশীয় শাস্ত্র ও দেশীয় আচার ভিন্ন অন্য শাস্ত্র ও অন্যবিধ আচারের প্রতি চিরকাল ঘোরতর বিদ্বেষযুক্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারা এইটুকু লক্ষ্য করিলেই আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন যে, হেয়ার-স্কুল, ওরিয়েন্টাল সেমিনারি বা হিন্দুকলেজে প্রথম প্রবিষ্ট ছাত্রগণের মধ্যে গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সন্তানের সংখ্যাও বড় অল্প ছিল না। আবার, কেবল যে এই নব মহাবিপ্লবের যুগেই এই অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হইয়াছে তাহা নহে, মুসলমান আমলেও খুব উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ সন্তানগণও আরবী-পার্শী শিক্ষা, রাজদরবারে দরবারী হওয়া, এমন কি যবন রাজার সরকারে চাকরি গ্রহণেও পরাঙ্মুখ হন নাই। রূপ-সনাতনের ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতও যবন সরকারের চাকরি করিতেন, এবং আধুনিক কালের বহু 'শিক্ষিত' 'উন্নতিশীল' হিন্দুর ন্যায় নামে স্বধর্ম ত্যাগ না করিয়াও নানা যবনাচার অবলম্বন করিয়াছিলেন। বরেন্দ্রভূমির ভাদুড়ী ও সান্যালগণের বিষয়বুদ্ধির কথা ও রাজদরবারে প্রতিপত্তি এবং অবশেষে কিয়ৎকালের জন্য রাজত্বলাভের বিবরণ বাঙ্গালার ইতিহাসজ্ঞগণের সুবিদিত। বস্তুতঃ প্রাচীন আদর্শও যেমন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের একাংশের চিরদিনই প্রিয় ছিল, তেমনই তাহাদের আর এক, এবং সম্ভবতঃ বৃহত্তর, অংশ কখনও যুগসম্মত ভাব ও আচারাদি একেবারে উপেক্ষণীয় মনে করে নাই, বা করিতে পারে নাই। এই উভয় শ্রেণীর লোকেরই সমাজে প্রতিপত্তি ছিল এবং একের প্রভাবে অন্যের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হইত। ব্রাহ্মণেতর জাতি ব্রাহ্মণগণের দৃষ্টান্ত অনুসরণপূর্বক, যথাসম্ভব প্রাচীন আদর্শের সহিত যোগরক্ষা করিয়া, নূতন নূতন যুগের নূতন নূতন ভাব ও নূতন নূতন আচার অবলম্বন করিয়া চলিত। সকলেই যে যোগরক্ষা করিতে পারিত, তাহা নহে, অনেকে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেও বাধ্য হইত। যাহারা অধিক বাড়াবাড়ি করিত, তাহারাই বিচ্ছিন্ন হইত। কিন্তু যতই বহুলোক বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, ততই অধিক নূতন আচার ও নূতন সংস্কার নিঃশব্দে সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে ইহাও মনে করা যাইতে পারে।

জীবনসংগ্রাম বড় কঠিন ব্যাপার, পুঁথিপত্রে সমাজের আদর্শ যাহাই থাকুক, সমাজের অন্তর্নিহিত কতকগুলি শক্তি ও নিয়ম তাহাকে যুগে যুগে নূতন নূতন পথ ধরিয়া চলিতে বাধ্য করিবেই। হিন্দুসমাজেও ইহার বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় নাই। জীবনসংগ্রামের তাড়নায়—রাজনৈতিক কারণে, আর্থিক কারণে, মানুষের হৃদয়-নিহিত নানা স্বাভাবিক আশা ও আকাঙ্ক্ষার উন্মাদনায় এবং আরও কত অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় প্রেরণায় তথাকথিত 'গোঁড়া, স্থিতিশীল, জড়স্বভাব' ব্রাহ্মণকেও প্রাচীন আচারের শিথিলতা সাধন করিতে হইয়াছে। ব্রাহ্মণের পক্ষে বিদ্যার্জন ও দারিদ্র্য উচ্চ আদর্শ বটে, এবং সে আদর্শ হইতে যে কোনও কালেই সকল ব্রাহ্মণ বিচ্যুত

হয় নাই তাহা সত্য; কিন্তু ইহাও সত্য যে, মনুর যুগ হইতে রামমোহনের আমল পর্যন্ত ব্রাহ্মণমাত্রেই কেবলই ব্রহ্মবিদ্যা ও দারিদ্র্য অবলম্বন করিয়া জীবনযাপন করেন নাই। কেননা ব্রাহ্মণেরাই শিখাইয়াছিলেন, বিদ্যা তখনই সুখকরী হয়, যখন তাহা অজস্র অর্থ-প্রসব করিতে থাকে। তাঁহারা বলিতেন—

> অর্থাগমো নিত্যমরোগিতা চ
> প্রিয়া চ ভার্যা প্রিয়বাদিনী চ।
> বশ্যশ্চ পুত্রোঽর্থকরী চ বিদ্যা
> ষড় জীবলোকেষু সুখানি রাজন্॥

'জীবলোকে ছয়টিই সুখ—নিত্য অর্থাগম, অরোগিতা, প্রিয়া ও প্রিয়বাদিনী ভার্যা, বশ্য পুত্র, এবং সকলের শেষ ও সম্ভবতঃ সকলের প্রধান—অর্থকরী বিদ্যা।' অর্থনীতির প্রভাব সমাজের উপর যে কত অধিক, তাহা এস্থলে স্পষ্টরূপে নির্দেশ করা অসম্ভব। উহারই প্রভাবে মুসলমান যুগে ব্রাহ্মণ ও গোঁড়া হিন্দুও আরবী-পার্শী শিখিত, আর উহারই প্রভাবে হিন্দুকলেজে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের হিন্দুসন্তানগণ দলে দলে প্রবিষ্ট হইয়া ইংরাজীশিক্ষা লাভ করিতে লাগিল। প্রাচীন বিদ্যার চর্চায় নূতন যুগের সর্ব অভাব পূর্ণ হইত না, হইলেও প্রয়োজনাতীত অর্থের প্রতিও লোকের যে স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা নাই, তাহা নহে। নূতন যুগে ধীরে ধীরে সকলেই দেখিল, সকলেই বুঝিল দেশীয় বিদ্যায় প্রায় দারিদ্র্য ঘোচে না; কিন্তু বিলাতী বিদ্যায় আশাতীত অর্থলাভ সম্ভব। দেশীয় সরস্বতী 'চতুর্মুখের মুখাম্ভোজবনে' বিহার করিতে পারেন, কিন্তু বিলাতী ভারতীর আসন যথার্থ স্বর্ণপদ্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। দেশীয় সরস্বতীর সেবায় অপ্রত্যক্ষ পুরুষার্থ ধর্ম ও মোক্ষ লাভ হইতে পারে, কিন্তু বিলাতী ভারতীর সেবায় প্রত্যক্ষ পুরুষার্থ অর্থ-কাম লাভ হয়; তাঁহার বাহন রাজহংসগণ এমনই সদাশয় যে, যৎসামান্য সেবাতেই পরিতুষ্ট হইয়া সরস্বতীর স্বর্ণপদ্মের পাপড়ি ছিঁড়িয়া ভক্ত সেবকগণকে অকাতরে বিতরণ করে। কাজেই পূর্বে যাঁহারা 'ঘটত্ব, পটত্ব, ষত্ব, ণত্ব' লইয়া মস্তিষ্কালোড়ন করিতেন, তাঁহারা এখন Barbara Celarent মুখস্থ করিতে লাগিলেন, কালিদাস ফেলিয়া বায়রণ ধরিলেন, অমরকোষ দূরে নিক্ষেপ করিয়া 'গাড্ মানে ঈশ্বর, লাড্ মানে ঈশ্বর, আই আমি, ইউ তুমি, কম আইস, গো যাও'[১] ইত্যাদি নূতন অভিধান কণ্ঠস্থ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে সংস্কৃত ফেলিয়া ম্লেচ্ছভাষার চর্চা হিন্দুগণ, এমন কি অনেক ব্রাহ্মণও মুসলমান আমলেও করিয়াছেন। তবে জীবনসংগ্রাম সেকালে তত উগ্র ছিল না বলিয়া বহু লোককে দেবভাষা ছাড়িয়া ম্লেচ্ছবাণীর সেবা করিতে হয় নাই। নূতন আমলে নূতন যুগধর্ম প্রভাবে লোকের অভাববোধ বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল বলিয়া নূতনবিদ্যার চর্চার প্রতিও আগ্রহ বাড়িয়াছিল।

---

১। রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত', পৃ ১১।

কিন্তু বিমাতা যতই ভাল হউন, তিনি বিমাতা, মাতা নহেন। ভারতীয়া সরস্বতী ছিলেন দেশীয় পণ্ডিতগণের মাতা, আর শ্বেতদ্বীপের ভারতী হইলেন বিমাতা। দেশীয় সরস্বতী সন্তানগণের অর্থাভাব মোচন করিতে পারুন আর নাই পারুন, গর্ভধারিণীর ন্যায় আপনার স্নেহাঞ্চলে সকলকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার স্নেহ-প্রসাদে বাঙ্গালী ভট্টাচার্যের পরিবারে তুষ্টি, তৃপ্তি ও শান্তি বিরাজ করিতেছিল। শ্বেতদ্বীপের ভারতী সেবকগণকে আশাতীত পরিমাণে কাঞ্চন দিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তার সঙ্গে আর যাহা দিলেন, তাহার প্রভাবে তাহারা উন্মত্ত হইয়া উঠিল, রাস্তায় ঢলাঢলি করিতে লাগিল, বাপ-জ্যাঠাকে old fool বলিয়া গালি দিতে শিখিল, গুরু-পুরোহিতকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিল, সংসারকে শ্মশানে পরিণত করিল, আর নিজেরাও অকালে শ্মশানে দেহরক্ষা করিতে লাগিল।

এই গুরুতর স্বভাব-বিপর্যয়ের এক প্রধান নিমিত্ত এই যে, এই সময়ে হিন্দু-কলেজের জন্য বাছিয়া বাছিয়া যে সকল শিক্ষক আনয়ন করা হইতেছিল, তাঁহাদের অধিকাংশই নাস্তিক বা সংশয়বাদী। ডিরোজিও, কাপ্তান রিচার্ডসন্, রীস্—ইঁহারা সকলেই এই শ্রেণীর। ছাত্রগণের মন ও হৃদয়ের উপর ইঁহাদের প্রভাব অসীম ছিল। এখনকার স্কুল-কলেজের সাহেব অধ্যাপকগণের সহিত ছাত্রবর্গের সম্পর্ক দেখিয়া সেকালের চিত্র মনশ্চক্ষুর সম্মুখে অবিকল স্থাপন করা কঠিন। ৺রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত' ও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত' প্রভৃতি গ্রন্থে ইঁহাদের বিবরণ ও তদানীন্তন ইঙ্গবঙ্গের চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। এ স্থলে আর একজন মনীষি-প্রদত্ত বিবরণের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে, ইহা হয়ত সকলের সুবিদিত নহে। নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রদ্ধাস্পদ ( ভাই ) প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কেশবচন্দ্র সেনের জীবনীর ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

> The very touch of European knowledge affected their (*i.e.* of the so-called Young Bengal) ancestral orthodoxy, and succeeding batches of graduates came out of the Hindu College with their idolatrous faith completely bleached out of them. The educationists of the time ...... did not perceive, at the time that the loss of Hindu orthodoxy meant the obliteration of every sense of religion ...... The young men were unfastened from the safe anchorage of the social customs with the authority of centuries of time-honoured tradition at their bottom. They drifted away yearly in great numbers to

every species of radical doubt and moral irregularity, they were emasculated, giddied, and more or less denationalised ...... What was known as education comprised a slight acquaintance with the idioms of the English language made through an uncritical study of the writings of a number of British authors, mostly belonging to the previous centuries. Shakespeare and Milton, held in a sort of conventional repute, were indeed extensively taught in the schools. One great test of superior education lay in the young man's readiness to quote with great show of self-importance from Hamlet and Paradise Lost; Johnson's Rasselas and Rambler were read with intense admiration; Addison's Spectator was always the *sine qua non* of good education: Goldsmith was the favourite poet, and Pope's verses were read with intense admiration ...... Perhaps an aspirant after political celebrity delivered a set speech at a literary club a great number of which began to crop up in the native quarters of Calcutta. Perhaps an eccentric character joined the Brahmo Somaj, more for the free eating than the practice of religion there. Perhaps some enterprising youth would go and become a convert to Christianity. But as a rule, education, except in rare instances, neither stimulated the intellect to originality, nor influenced the heart to profound impulses. On the other hand with increasing knowledge, there was an increasing progress of secret self-indulgence; scepticism had extensively infected the rising generation and strict morality was ceasing to have any hold on Young Bengal ...... Dr. Duff some-what thoughtlessly characterised the ocean of Oriental literature by quoting Ferdusi's satire on the court of Ghuzni. "The magnificent court of Ghuzni is a sea, and a sea without bottom and without shore. I have fished in it long, but have found no pearl". Our young men

took advantage of his sage counsel by fishing for pearls in Scott's and Fielding's novels, and the wide unclean waters of other inferior works of English fiction. ...... The Christian missionaries, the state officials, the youthful journalists, the unfledged reformers all united to raise a war-cry against caste, and the entire population of our colleges and schools joined in the crusade. It meant the introduction of the European luxuries of food and drink, the free-and-easy ways of the West, the abolition of social discipline, of the exactions of Brahman priests and impecunious relatives. Excessive indulgence in the use of alcoholic liquors characterised the educated community; concomittant vices showed themselves, and premature mortality began to rage amongst the rising generation. The emancipation of women began to be talked about, and here and there the doors of the zenana were flung open. Men, before they had learnt to honour the gentler sex felt a trenchant desire to be introduced into the company of the female relations of their neighbours. Third-rate English novels illustrated the questionable benefits of such promiscuous communion. All notions of moral danger promulgated by Hindu teachers of former times were set aside as old-fashioned and pernicious. Impurity of character among the educated became proverbial.

শ্রদ্ধাস্পদ মজুমদার মহাশয়ের ইংরাজী রচনার অপূর্ব ওজস্বিতা ও ঔজ্জ্বল্য অনুবাদে রক্ষা করা কঠিন। উহার মর্ম এইরূপ—

য়ুরোপীয় বিদ্যার সংস্পর্শেই তাহাদের (অর্থাৎ ইঙ্গবঙ্গের) পিতৃপুরুষ হইতে প্রাপ্ত স্বধর্মাসক্তি অভিভূত হইয়া পড়িল, এবং দলে দলে হিন্দুকলেজ হইতে যে সকল ছাত্র বাহির হইতে লাগিল, তাহাদের মধ্যে প্রতিমাপূজায় বিশ্বাসের গন্ধমাত্রও রহিল না। ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থাপকগণ তখনও বুঝিতে পারেন নাই যে, হিন্দুর পক্ষে স্বধর্মানুরাগ লোপের অর্থ তাহার ধর্মবোধেরই আত্যন্তিক লয়। ঐ সকল ইংরাজীশিক্ষিত যুবকগণ চিরকালাগত প্রবাদ বা ঐতিহ্যরূপ প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত সামাজিক আচারের বন্ধন হইতে মুক্ত

হইয়া প্রতিবৎসর দলে দলে মৌলিক সংশয় ও নৈতিক অনাচারের স্রোতে কোথায় ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তাহাদের মনুষ্যত্ব লুপ্ত হইল; মাথা ঘুরিয়া গেল, এবং জাতীয়তা অন্তর্হিত হইল। ...... শিক্ষা অর্থে প্রায়শঃ অতীত কয়েক শতাব্দীর কয়েকজন ইংরেজ লেখকের মতসমূহ নির্বিচারে গ্রহণ ও সেই সূত্রে ইংরাজী ভাষার কায়দার সহিত কিঞ্চিৎ পরিচয়মাত্র বুঝাইত। সেক্ষপীয়র ও মিল্টনের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন একটা চলিত রীতির মধ্যে ছিল এবং ঐ দুই কবির কাব্যাবলী বিদ্যালয়সমূহে প্রচুররূপে পঠিত হইত। হ্যামলেট ও প্যারাডাইস্ লস্ট হইতে যখন-তখন বচন উদ্ধৃত করিতে পারিলে তৎকালে যুবকগণ উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হইতেন। তাঁহারা জন্‌সনের রাসেলাস্ ও র‍্যাম্বলার পড়িয়া বিস্মিত হইতেন। এডিসনের স্পেক্টেটার না পড়িলে সুশিক্ষাই হইল না বলিয়া মনে করা হইত। গোল্ডস্মিথ ছাত্রবর্গের প্রিয় কবি ছিলেন। পোপের কবিতা কণ্ঠস্থ করা হইত। ...... রাজনীতিক্ষেত্রে যশোলিপ্সু দুই-একটি যুবক হয়ত কোনও একটা সাহিত্যিক ক্লবে মুখস্থ করা বক্তৃতা দিত। এই সময়ে কলিকাতার বাঙ্গালী মহলাগুলিতে এই শ্রেণীর অনেকগুলি সাহিত্যিক ক্লব গজাইয়া উঠিয়াছিল। দুই একটা ক্ষেপা ছেলে হয়ত ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিত, তাহাও ধর্মাচরণের জন্য নহে, পানাহারে স্বেচ্ছাচারিতার জন্য। হয়ত দুই-একটা বাহাদুর ছোকরা পাদ্রিদলে মিশিয়া খ্রীস্টান হইয়া যাইত। কিন্তু দুই-একটি যুবক (যাহাদিগকে সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত বলিয়া মনে করা যায়) ব্যতীত অন্য সকলের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষসাধন দ্বারা মৌলিক চিন্তার বিকাশ করিতে পারে নাই; এবং তাহাদের হৃদয়েও কোনও গভীর ভাবের সঞ্চার করে নাই। প্রত্যুত বিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গোপনে ইন্দ্রিয়লালসা-পরিতৃপ্তির প্রবৃত্তি বাড়িয়া গিয়াছিল; যুবকগণ সংশয়বাদে আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাহাদের চিত্ত হইতে নৈতিক বন্ধন খসিয়া পড়িতেছিল। ...... পাদরি ডাঃ ডাফ এক খেয়ালের বশে কবি ফার্দুসির ব্যঙ্গোক্তি উদ্ধৃত করিয়া গজনীর রাজসভার সহিত প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণবের তুলনা করিয়াছিলেন। ফার্দুসির উক্তিটি এইরূপ—"গজনীর রাজসভা অতল ও অপার সমুদ্রসদৃশ। কিন্তু আমি এই সমুদ্রগর্ভে বহুকাল ধরিয়া অনুসন্ধান করিয়া একটি রত্নও পাইলাম না।" আমাদের যুবকসম্প্রদায় ডাক্তার ডাফের এই ওস্তাদী উক্তি প্রমাণ মনে করিয়া স্কট ও ফিল্ডিং এর উপন্যাসসমূহে এমন কি তদপেক্ষা নিকৃষ্টতর ইংরাজী উপন্যাসরূপ পঙ্কিল জলে মুক্তা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ...... খৃস্টান পাদরীগণ, রাজপুরুষবর্গ, খবরের কাগজের নবীন সম্পাদকসম্প্রদায় ও অনুদ্গতপক্ষ সংস্কারক-পক্ষিরাজগণ সকলে একস্বরে জাতিভেদপ্রথার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন এবং কলেজ ও স্কুলের ছোকরার

দলও সেই যুদ্ধে যোগ দিল। জাতিভেদপ্রথার উচ্ছেদ অর্থে তাহারা বুঝিয়াছিল সাহেবী খানাপিনায় বিলাসিতা, পাশ্চাত্য সমাজের অসংযত আচার, সামাজিক নিয়মবন্ধনের উচ্ছেদ, এবং পুরোহিত-ঠাকুর ও দরিদ্র আত্মীয়গণের দাবীর লোপসাধন। অতিরিক্ত মদ্যপান শিক্ষার একটি বিশেষ লক্ষণরূপে গণ্য হইয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যবিধ পাপাচরণও দেখা গিয়াছিল, ইহার ফলে যুবকসম্প্রদায়ের মধ্যে অকালমৃত্যুর ঘোরতর প্রাদুর্ভাব হয়। স্ত্রীজাতির মুক্তির কথা সকলের মুখেই শুনা যাইত, এবং দুই-এক পরিবারে অন্তঃপুরের পরদা উঠাইয়া দেওয়াও হইয়াছিল। স্ত্রীজাতির প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে শিক্ষা করিবার পূর্বেই লোকে প্রতিবেশী পরিবারের স্ত্রী-কন্যাগণের সহিত আলাপ করিবার জন্য দারুণ লোভের বশীভূত হইয়াছিল। তাহারা তৃতীয় শ্রেণীর ইংরাজী নভেল হইতে এইরূপ বাধাহীন মেলামেশার উপকারিতা উপলব্ধি করিয়াছিল; এইরূপ আচার যথার্থই সমাজের উপকারী কি না তাহা স্বভাবতঃই সন্দেহ করা যাইতে পারে। প্রাচীন কালের হিন্দু-সমাজশিক্ষকগণ নৈতিক বিপদ সম্বন্ধে যে সকল মত প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা শিক্ষিত সম্প্রদায় সেকেলে ও মঙ্গলের বিরোধী বলিয়া বর্জন করিয়াছিলেন। চরিত্রদোষ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছিল।

ধর্মসম্বন্ধে সংশয়বাদ, মদ্যপান ও অখাদ্যভোজন এই সময়ে শিক্ষিত সমাজে কতদূর প্রচলিত ছিল, তৎসম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের উক্তিও উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। তিনি লিখিয়াছেন—

ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করাতে আমার কলেজের সমাধ্যায়ীরা আশ্চর্য হইয়াছিলেন। তাঁহারা আমাকে এক অদ্ভুত জীব মনে করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই সংশয়বাদী অথবা ধর্মের প্রতি উদাসীন ছিলেন। কলেজের উত্তম ছোকরা যে ব্রাহ্ম হইতে পারে, তাহা তাঁহাদের স্বপ্নের অগোচর ছিল।[১]

পুনশ্চ—

হিন্দুকলেজের ছাত্রেরা মনে করিতেন যে, মদ্যপান করা সভ্যতার চিহ্ন, তাহাতে দোষ নাই। তখনকার কলেজের ছেলেরা মদ্যপায়ী ছিলেন বটে। কিন্তু বেশ্যাসক্ত ছিলেন না। তাঁহাদিগের একপুরুষ পূর্বের যুবকেরা মদ্যপান করিত না—কিন্তু অত্যন্ত বেশ্যাসক্ত ছিল; গাঁজা, চরস খাইত ও বাজি রাখিয়া ঘুড় উড়াইত ও বাবরি রাখিয়া মস্ত পাড়ওয়ালা ঢাকাই ধুতি পরিত। কলেজের ছোকরারা এই সকল রীতি একবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কখনই পানাসক্ত হইতেন না যদ্যপি তাহা সভ্যতার চিহ্ন এমত মনে না করিতেন। ...... আমি ও আমার সহচরেরা এইরূপ মাংস (অর্থাৎ শিক-কবাব) ও জলস্পর্শশূন্য ব্রাণ্ডি খাওয়া সভ্যতা ও সমাজসংস্কারের পরাকাষ্ঠা-

১। আত্মচরিত, প ৪৬-৪৭।

প্রদর্শক কার্য মনে করিতাম। ...... মদ্যপানবিষয়ে রামমোহন রায়ের শিষ্য ও হিন্দুকলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে প্রভেদ ছিল। রামমোহন রায়ের শিষ্যেরা অত্যন্ত পরিমিত-পায়ী ছিলেন। কিন্তু কলেজের অধিকাংশ ছাত্র এরূপ ছিলেন না।[১]

পুনশ্চ—

যে দিন আমরা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করি সে দিন বিস্কুট ও সেরী আনাইয়া ঐ ধর্ম গ্রহণ করা হয়। জাতিবিভেদ আমরা মানি না উহা দেখাইবার জন্য ঐরূপ করা হয়। খানা খাওয়া ও মদ্যপান করা রীতির জের রামমোহন রায়ের সময় হইতে আমাদের সময় পর্যন্ত টানিয়াছিল, কিন্তু সকলেই যে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের দিন ঐরূপ করিতেন এমন নহে।[২]

এই বিপ্লবের প্রভাবে রাজা রামমোহনের মৃত্যুর কিয়ৎকাল পরেই ব্রাহ্ম-সমাজেও ধর্ম ও জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে কিরূপ বিপর্যয় ঘটিয়াছিল, তাহার উদাহরণ-রূপে সুলেখক ৺অজিতকুমার চক্রবর্তী মহাশয়ের মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনী হইতে দুইটি উক্তি উদ্ধৃত হইল। অজিতকুমার লিখিয়াছেন—

ঐ বছরেই (অর্থাৎ ১৭৭৬ শকে) অগ্রহায়ণ মাসে রাখালদাস হালদার 'ব্রাহ্মদিগের বর্তমান আন্তরিক অবস্থা বিষয়ক পর্যালোচনা' নাম দিয়া এক আবেদন লিখিয়া দেবেন্দ্রনাথকে পাঠাইয়া দেন। ...... আবেদনের শেষে তিনি ব্রাহ্মসমাজে কতকগুলি পরিবর্তন আনিবার প্রস্তাব করেন। সে প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীন কালের সঙ্গে আর একেবারেই যোগ থাকে না। তাহা অত্যন্ত বেশি মাত্রায় উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যপরায়ণ হইয়া উঠে। ...... তখনকার ব্রাহ্মদের সম্বন্ধেও রাখালদাস হালদারের ঐ আবেদনপত্রে যেটুকু তথ্য পাওয়া যায়, তাহাও বিশেষ আশাজনক নয়। তিনি লিখিতেছেন, "সকলে সমবেত হইয়া আমোদের সহিত ভোজন করিব, উত্তম অট্টালিকাতে নিবসতি করিব, উত্তম বস্ত্র পরিধান করিব, উত্তম যানে আরোহণ করিব, এবং ঈশ্বর বর্তমান আছেন, এইরূপ বিশ্বাস করিব; তাঁহারদের (ব্রাহ্মদের) প্রিয় অভিপ্রায় এই যে, এই সকল বিষয় সম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মধর্মের চরম উদ্দেশ্য সফল হইল। তাঁহারদের বিবেচনায় অন্তর্মনুষ্যকে সচ্চরিত্র, শ্রদ্ধাবান্ এবং ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন করা তত আবশ্যক নহে, বহির্মনুষ্যকে যত সুসজ্জিত, সুশোভিত এবং সুসভ্য করা বিহিত।"...... দেশের লোকের বিশ্বাস ছিল যে, ধর্মের ছলে ব্রাহ্মরা আমোদের জন্যই একত্রিত হয়। মদ্যপানটা ব্রাহ্মদের মধ্যে রীতিমত চলিত ছিল।[৩]

পুনশ্চ—অজিত বাবু লিখিয়াছেন—

একবার রাজনারায়ণ বাবু মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজে একটা বক্তৃতা পড়েন,

১। আত্মচরিত, পৃ ৪১-৪২। ২। আত্মচরিত, পৃ ৪৬।
৩। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, (জিজ্ঞাসা সং) পৃ ১২৫-১২৬।

সেই বক্তৃতা দেবেন্দ্রনাথের অত্যন্ত ভালো লাগিয়াছিল—কিন্তু তত্ত্ববোধিনী সভার গ্রন্থাধ্যক্ষেরা তাহা পত্রিকায় প্রকাশযোগ্য মনে করেন নাই। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে পত্রে লিখিতেছেন, (২৬ ফাল্গুন, ১৭৭৫)—"এ বক্তৃতা আমার বন্ধুদিগের মধ্যে যাঁহারা শুনিলেন, তাঁহারাই পরিতৃপ্ত হইলেন; কিন্তু আশ্চর্য এই যে তত্ত্ববোধিনী সভার গ্রন্থাধ্যক্ষেরা ইহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশযোগ্য বোধ করিলেন না। কতকগুলান নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে, ইহাদিগকে এ পদ হইতে বহিষ্কৃত না করিয়া দিলে আর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সুবিধা নাই।"[১]

এই স্থানে প্যারীচাঁদ মিত্র-প্রণীত ডেভিড্ হেয়ারের জীবনচরিত হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইতে পারে। তাহা হইতে ইংরাজী শিক্ষার বহুল প্রচলনের অব্যবহিত-পূর্বকালে ভদ্র হিন্দুসমাজের আমোদ-প্রমোদের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে।—

(ডেবিড হেয়ার) প্রথমতঃ ভদ্র ভদ্র হিন্দুদিগের—বাটিতে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। যাহাতে তাঁহাদিগের সহিত সংমিলন হয় তাহাতেই উদ্যত হইলেন। কি নাচ, কি যাত্রা, কি কবি, কি আকড়াই, কি খেমটা নাচ, কি পাঁচালী, কি বুলবুলের লড়াই সকলেতেই হেয়ার সাহেব আহূত হইলে বসিয়া আমোদ করিতেন। উপরোক্ত আমোদ ভিন্ন ঐ সময়ে অন্যান্য কৌতুক ছিল। কোন কোন স্থানে সন্দেশের মজলিস অর্থাৎ গোল্লা বিছাইয়া তাহার উপর বসিয়া বৈঠকী সঙ্গীত হইত। কোন কোন স্থানে মানুষপক্ষীর সভা অর্থাৎ বৃহৎ বৃহৎ খাঁচার ভিতর মনুষ্য পক্ষীস্বরূপ থাকিতেন। সভায় আনীত হইলে কেহ কাক, কেহ কাদাখোঁচা, কেহ সারস, কেহ বক এইরূপ নানাপক্ষীর প্রকৃতি দেখাইতেন ও মধ্যে মধ্যে গান করিতেন যথা "কুরুড কিং ল্যাক্ জ্যাক্সন গুলবর জ্যাক্সন, আলিপুরি জ্যাক্সন, কু—ড়—"

এই সকল আমোদে মদ্যপানের কথা নাই। রাজনারায়ণ বাবুও লিখিয়াছেন তখনকার যুবকগণ মদ্যপান করিত না। অনেকের মনে হয়ত সন্দেহ হইবে, তবে কি মদ্যপান এদেশে কখনও প্রচলিত ছিল না? ছিল, সংস্কৃতকাব্যে স্ত্রী-পুরুষে মদ্যপানের কথা আছে; মদ্যপানে যদুবংশ ধ্বংস হইয়াছিল বলিয়া মহাভারতে উল্লিখিত হইয়াছে। এসকল অতি প্রাচীন কালের কথা। অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে মদ্যপান ভদ্রসমাজে অতি গর্হিত আচার বিবেচিত হইত বলিয়া ভদ্র যুবকগণের মধ্যে উহার বাড়াবাড়ি ছিল না। প্রৌঢ়দিগের মধ্যে কেহ কেহ, বিশেষতঃ বীরাচারী তান্ত্রিকগণ, মদ্যপান করিতেন। সাধারণ গৃহস্থকে মদ্য স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হইত। মদ্যব্যবসায়ী অর্থাৎ শৌণ্ডিক সমাজে অস্পৃশ্য অনাচরণীয় বলিয়া বিবেচিত হইত। মদ্যপান যে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলনের সময় বা তাহার অত্যল্পকাল পূর্বে বিদেশীয়গণের অনুকরণে ভদ্র হিন্দুসমাজে অধিক প্রচলিত

১। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, (জিজ্ঞাসা সং) পৃ ১৯৩।

হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। শিক্ষিত দুই চারি জন লোক মদ খাইতে আরম্ভ করিলেই, যাহারা ইংরাজীশিক্ষা লাভ করেন নাই বা সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইংরেজের সংস্পর্শে আসেন নাই তাহারাও মদ্যপানে বাড়াবাড়ি করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপে এই সময়ে বাঙ্গালার সর্বত্র মদ্যপানের অভ্যাস ভয়ানকভাবে বাড়িয়া গিয়াছিল। পূর্ববঙ্গের ধামরাই প্রভৃতি দুই-চারিটি প্রাচীন গ্রামের প্রাচীন বংশ-সমূহের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়—অপরিমিত মদ্যপানই উহাদের অধঃপাতের একমাত্র কারণ। অথচ এই অঞ্চলে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন, কলিকাতা অঞ্চলে প্রচলনের কিছু পরে হইয়াছিল। সর্বত্রই গুণের অনুকরণ করিবার পূর্বে লোকে দোষের অনুকরণ করিতে শিখে। কলিকাতার লোকের পানদোষ সম্বন্ধে প্যারীচাঁদ মিত্র লিখিয়াছেন—

> কলিকাতায় যেখানে যাওয়া যায় সেই খানেই মদ খাইবার ঘটা। কি দুঃখী, কি বড় মানুষ, কি যুবা, কি বৃদ্ধ সকলেই মদ্য পাইলেই অন্ন ত্যাগ করে। কথিত আছে, কোন ভদ্রলোক একগ্রামে কিছু দিবস অবস্থিতি করিয়াছিলেন; তথায় দেখিলেন, প্রায় সকল লোক অহোরাত্র অবিশ্রান্ত গাঁজা খাইতেছে। এই ব্যাপার দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এ গ্রামে কত লোক গাঁজা খায়। গাঁজাখোরের মধ্যে একজন উত্তর করিল, আমরা সকলেই গাঁজা খাইয়া থাকি, গ্রামে শালগ্রাম ঠাকুর ও আমাদের টেপিপিসি—যাহার বয়স ৯৯ বৎসর, কেবল তাঁহারাই খারিজ আছেন। কলিকাতা এক্ষণে তদ্রূপ।[১]

শিক্ষিত সমাজের এইরূপ অত্যাচার অনাচার সত্ত্বেও ইংরাজী শিক্ষা হিন্দুসমাজে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থাদি উচ্চবর্ণের মধ্যে যে ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতে লাগিল, ইহা হইতেই বুঝা যাইবে রাজনৈতিক ও আর্থিক নিমিত্তের (Political and economical causes) প্রভাব সমাজের উপর কত অধিক। বিশ্বনাথ তর্কভূষণের ন্যায় গোঁড়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ন্যায় প্রতিভাশালী ও স্থিরবুদ্ধি তনয়কে সংস্কৃত ছাড়িয়া ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা করিতে সকল অনাচারের শিক্ষাস্থল হিন্দুকলেজে পাঠাইয়াছিলেন। বস্তুতঃ এই যুগের সামাজিক বিপ্লব, বা প্রলয়ের ইতিবৃত্ত স্মরণ করিলে হিন্দুসমাজ যে এখনও বর্তমান আছে ইহা আশ্চর্যজনক বলিয়াই মনে হইতে পারে। সৌভাগ্যক্রমে সে সমাজের প্রাণশক্তি অসীম ছিল, এবং এখনও আছে; তাহার বর্জন করিবার ক্ষমতাও যেমন তীব্র, গ্রহণ করিবার ক্ষমতাও তেমনই অধিক। বিশেষতঃ এই যুগের পরিবর্তনধারা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে মনে হয়, হিন্দুজাতি ও হিন্দুসভ্যতার বিশেষত্ব জগতে স্বতন্ত্রভাবে বিরাজিত থাকুক, ইহা বিধাতারই ইচ্ছা। তাই তিনি যেমন এক হাতে ইংরাজী-শিক্ষিত নব্য কালাপাহাড়গণকে নিমিত্তমাত্র করিয়া হিন্দুসমাজের

১। মদ খাওয়া বড় দায়, জাত রাখার কি উপায়। পৃ ১

কতক অংশ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ধূলিসাৎ করিতেছিলেন, অপর হাতে তাহা পুনরায় গড়িয়া তুলিবার ব্যবস্থাও করিতেছিলেন। সে গঠনক্রিয়া অদ্যাপি সম্পূর্ণ হয় নাই; পরিবর্তনশীল কালের পরিবর্তনশীল রুচি-প্রবৃত্তি, ঘটনা ও অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য ও সমন্বয় বিধান করিয়া বিধাতার শুভেচ্ছা ধীরে ধীরে হিন্দুসমাজের বহুশাখায় প্রসারিত জীবনধারাকে পরিপুষ্ট করিতেছে।

কোনও একজন মানুষকে সর্বাংশে এই গঠনক্রিয়ার একমাত্র বিশ্বকর্মা বলিয়া নির্দেশ করা সমাজবিজ্ঞানের নিয়মবিরুদ্ধ। কেননা সমাজতত্ত্ববিদ্ বলেন—"সমাজ আপনার নিজের নিয়মেই ভাঙ্গে, গড়ে, উঠে, পড়ে। সমাজের এই নিয়মকে বিধাতার মঙ্গলেচ্ছা বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয় কর, না কর তাহাতে কিছু যায় আসে না।"[১] কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, সামাজিক পরিবর্তন কেবল ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছা দ্বারা নিয়মিত হয় না। ব্যক্তির মধ্যে সমাজের ভাঙ্গা-গড়ার, উঠা-পড়ার ক্রম লক্ষ্য করা যায় মাত্র। ব্যক্তি দ্বারা সমাজ আপনার কাজ করাইয়া লয় কাহাকেও দিয়া বেশি কাজ করায়, কাহাকেও দিয়া কম কাজ করায়। যে সমাজ ভাঙ্গিবে বলিয়া উদ্যোগ প্রকাশ করে, সমাজ তাহাকে দিয়াও গৌণভাবে নিজ গঠনের সহায়তা করাইয়া লয়। যাঁহারা আপনাদিগকে উন্নত মনে করিয়া সমাজের সকলকে স্বমতে আকর্ষণ করিতে অসমর্থ হইয়া সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যান, তাঁহারাও সমাজেরই নিজ হাতের প্রযুক্ত অস্ত্রমাত্র। সমাজ আপাততঃ দুইজন উৎকট উন্নতিবাদীকে বর্জন করিয়া হয়ত দুই হাজার উদাসীন লোককে নূতন মতের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন ও অলক্ষিতভাবে যথার্থ উন্নতির দিকে অগ্রসর করে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, তবে কি সমাজে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বলিয়া কিছু নাই? আছে বই কি? ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব প্রস্ফুরণের পূর্বে তাহার ভাবরাশি সমাজ বা আবেষ্টন হইতেই লব্ধ হয়। ক্রমে ক্রমে ব্যক্তি তাহার নিজের ভাবে ঐ ভাবগুলিকে আয়ত্ত করে। উহা হইতেই তাহার মনে নানা প্রেরণার উদ্ভব হয়। ঐ প্রেরণাগুলি সর্বাংশে নূতন নহে, সমাজেই তৎসমুদয় পূর্ব হইতেই ছিল, কিন্তু বিক্ষিপ্তভাবে থাকা হেতু কার্যকরী হয় নাই। সমাজশক্তিতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কার্যকরণশক্তির অভাবে সমাজকে কার্যসাধনের জন্য এমন ব্যক্তিবর্গের মুখাপেক্ষা করিতে হয়, যাহাদের মধ্যে সমাজের ভাবরাশি সংহত হইয়া পরিণতি লাভ করিয়াছে। সামাজিক চৈতন্য কোনও না কোনও ভাবে প্রত্যেক ব্যক্তিতেই প্রতিফলিত হয় বটে, কিন্তু অধিকাংশ লোকের মধ্যেই উহা নানা পুরাতন ও গতানুগতিক সংস্কার দ্বারা অভিভূত হইয়া থাকে। মানুষের একটা স্বভাব এই যে, তাহার চিন্তা বা স্মৃতিশক্তি প্রায়শঃ তাহাকে অতীত দ্বারা বর্তমানকে এবং

১। To the religious consciousness God is the creative worldwill, which means that He is at once individual and social will. —Wundt.

বর্তমান দ্বারা অনাগতকে উপলব্ধি করিতে প্রবৃত্ত করে। কিন্তু সমাজের যাঁহারা যথার্থ নেতা তাঁহারা সমাজের বর্তমান, অতীত, ও ভবিষ্যৎ সকল অবস্থারই বিশেষত্ব স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারেন, এবং সেইজন্য তাঁহাদের মধ্যে সামাজিক চৈতন্য ও সামাজিক ইচ্ছাশক্তি কেন্দ্রীভূত হয়, এবং সেই কেন্দ্র হইতে পুনর্বার সমগ্র সমাজের উপর ক্রিয়া করিতে থাকে। এইরূপে সামাজিক প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে ভাবের ও ইচ্ছার আদান-প্রদানের ফল বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

এই তথ্যগুলি আশা করি এত সূক্ষ্ম বা সাধারণের নিকট এরূপ অশ্রুতপূর্ব নহে যে এস্থলে ইহার অধিক বিশ্লেষণ আবশ্যক। তথাপি দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে যে, অনেক বক্তা ও লেখকই এই মোটা কথাটা ভুলিয়া যান। তাঁহারা ব্যক্তিবিশেষের গুণে মুগ্ধ হইয়া সম্ভাব্য ও অসম্ভাব্য সর্ববিধ কৃতিত্ব তাহাতে আরোপ করেন। এইরূপে কত মহাত্মাই যে বাঙ্গালার সমাজে নবযুগের একমাত্র প্রবর্তক বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন, তাহার অবধি নাই। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, হরিশ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন, ঈশ্বরচন্দ্র, অক্ষয়কুমার, বঙ্কিমচন্দ্র ইঁহারা প্রত্যেকেই এ সম্মান পাইয়াছেন। কিন্তু কথা এই, সমাজ পদার্থটা বালকের ক্রীড়নক নহে যে তাহা একটি কাঠির আঘাতে যে দিকে ইচ্ছা গড়াইয়া দেওয়া যায়। সমাজে যখন যথার্থ নবযুগ আসে, তখন তাহা প্রায়শঃ কেবল একজনকে আশ্রয় করিয়া সমাজের বাহির হইতে হঠাৎ আসে না, তাহা প্রাকৃতিক অভিব্যক্তির নিয়মক্রমে সামাজিকগণের ধর্ম, নীতি, সাহিত্য, শিল্প, রাষ্ট্র, দৈনন্দিন-জীবনযাত্রার সংস্কার ইত্যাদি সকল দিক হইতে ফুটিয়া উঠিতে থাকে। আবার ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া উভয়ই প্রকৃতিরই নিয়ম। নদীর স্রোত যখন স্বীয় উৎকট খরতায় একদিকের তট কাটিয়া নেয়, তখনই অপর দিকে 'আগুড়া' সৃষ্টি করিয়া নূতন পলি সঞ্চয় করিতে থাকে। সমাজেও যেখানেই উৎকট উন্নতিবাদী, সেখানেই উৎকট রক্ষণশীলও দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক বাঙ্গালা সমাজে এইরূপ দ্বিবিধ চরম-নীতির শিক্ষকই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু মোটের উপর হিন্দুসমাজ কোনও পক্ষই ঐকান্তিকভাবে অবলম্বন করে নাই। বঙ্কিমের জীবন সমালোচনা-কালে এই তথ্য বিশেষভাবে স্মরণ রাখা আবশ্যক। তাঁহার দ্বারা সমাজ আপনার শাশ্বতিকী উন্নতির প্রবাহ অব্যাহত রাখিবে বলিয়া তাহাতে উৎকট রজোগুণ বা উৎকট তমোগুণ—উদ্দাম গতি বা অন্ধ নিশ্চেষ্টতার সঞ্চার করে নাই। জাতীয় জীবনের নানাবিভাগেই বঙ্কিমের প্রতিভা কার্য করিয়াছে। তিনি একাধারে সাহিত্যিক, রাজনৈতিক, ধর্মপ্রচারক ও নীতিশিক্ষক। তাঁহার জীবনে দেখিব, তাঁহার সমসাময়িক অপর দুই-একজন প্রতিভাশালী মহাপুরুষের ন্যায় তিনি সামাজিক জীবনের কোনও ক্ষেত্রেই স্বীয় প্রতিভার উত্তেজনা বা কর্মতৎপরতার

উন্মাদনায় কেবলই কালাপাহাড়লীলা অভিনয় করেন নাই, কিংবা নবযুগের উন্মাদনী বার্তা কানে আসিবার ভয়ে উলিসিসের ন্যায় মোম দিয়া নিজের ও নিজ সমাজের সকলের কর্ণ রুদ্ধ করিবার ব্যবস্থাও করেন নাই। বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসে তাঁহার স্থান অতি উচ্চ। কত উচ্চ তাহা আমরা তাঁহার কর্ম-সমালোচনার সময়ে দেখিব। বাল্যে ও যৌবনে যেরূপ আবেষ্টনের মধ্যে তাঁহার শিক্ষাদীক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছিল তাহার পরিচয় আমরা আংশিকভাবে দিয়াছি। তিনি ও তাঁহার সহকর্মী ব্যক্তিগণ এই বিপ্লব-ঘূর্ণিবায়ুর স্থিরতর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হইয়া হিন্দুসমাজের প্রাণের স্পন্দন যথার্থভাবে অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি ধর্মে সাহিত্যে, জীবন-নীতিতে অনেক নবাভ্যুদিত তর্কের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং যেহেতু তাঁহার মতের অনেক স্থলেই তদানীন্তন হিন্দুসমাজ সর্বান্তঃকরণে সায় দিয়াছিল, তাহা হইতেই বুঝা যায় যে, তিনি কুত্রাপি উৎকট উদ্ভাবন শক্তির প্রয়োগ করেন নাই। আধুনিক কোনও কোনও জীবনচরিত লেখকের ভাষার কায়দা-কসরতের অনুকরণে যদি কেহ তাঁহাকে 'যুগ-সমস্যা-মীমাংসক', 'যুগসমন্বয়ের প্রতিষ্ঠাতা' 'যুগসন্ধির আবিষ্কর্তা' ইত্যাদি অল্পাধিক পরিমাণে ( অন্ততঃ বর্তমান লেখকের পক্ষে ) দুর্বোধ্য পরিভাষায় পরিভাষিত করিতে চাহেন, তাহাতে আপত্তি নাই। তবে যদি একটা সোজা কথায় নবযুগের বাঙ্গালায় বঙ্কিমের যথার্থ স্থাননির্দেশ করা নিতান্তই আবশ্যক বিবেচিত হয়, তবে বলিব, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সমসাময়িক বঙ্গের চিন্তাশীল হিন্দুসমাজের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ছিলেন। এই বর্ণনায় তাঁহার হৃদয় ও মনের যেরূপ উদারতা বা সঙ্কীর্ণতা দ্যোতিত হয়, তাহা সর্বাংশেই তাঁহার প্রাপ্য। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার দেহের বিস্তার ও মনের প্রসারের প্রত্যেক ইঙ্গিতে হিন্দু ও বাঙ্গালী ছিলেন। রামমোহন রায় সম্বন্ধে তাঁহার একজন অনুরাগী বলিয়াছেন, "তাঁহার কাছে সমস্যাগুলি সমস্ত মানুষের সমস্যারূপে উপস্থিত হইয়াছে, এবং বিশ্বমানবের তরফ হইতে সেই সমস্যা মিটাইবার আয়োজনও তাঁহাকে করিতে হইয়াছে।" বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আমরা ততখানি বলিতে পারি না। বঙ্কিমচন্দ্র নিজকে বাঙ্গালার ও বাঙ্গালাকে আপনার বলিয়া জানিয়াছিলেন। বাঙ্গালা যে অংশে ভারতবর্ষের, ভারতবর্ষও সেই অংশে বঙ্কিমচন্দ্রের আপনার ; বাঙ্গালী যে অনুপাতে বিশ্বমানবের অংশ, বিশ্বমানবও ঠিক সেই অনুপাতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিয়। তিনি তাঁহার সমসাময়িক কোনও কোনও 'সংস্কারকে'র ন্যায় ঘরকে বাহির ও বাহিরকে ঘর, পরকে আপন ও আপনকে পর করিয়া উচ্চ অঙ্গের 'পীরিতি' সাধন করিতে চেষ্টা করেন নাই। তিনি কৃষ্ণকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া খৃস্টকে আঁকড়াইয়া ধরেন নাই, কিংবা স্বদেশীয় সভ্যতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া 'অপর সমুদায় দেশ ও জাতিমধ্যে যে সকল সৎ পুরুষ আছেন' তাঁহাদের সহিত 'সত্যেতে সামঞ্জস্যে ও পবিত্রতাতে মিলনে'র স্বপ্নও কোনও দিন দেখেন নাই। যাঁহারা তাদৃশ বিশ্বজনীন প্রেমের সাধক বা অনুরাগী,

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে তাহাদের রুচির অনুকূল বিশেষ কিছুই নাই! কিন্তু যে ব্যক্তি পুরাদস্তুর বাঙ্গালী ও হিন্দু থাকিয়া বৈজ্ঞানিক সত্য ও যুক্তির আলোকে স্বদেশের ও স্বজাতির চিরন্তনী সাধনাকে পরীক্ষা করিয়া লইতে চায়, যে স্বদেশকে ভালবাসে, স্বজাতির গৌরবকাহিনী অনুশীলন করিতে প্রীতি অনুভব করে, যে আপন সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি, দুর্বলতা, অন্ধতাটুকু ভালরূপে ও সহানুভূতির চক্ষে দেখিয়া তাহার সংশোধন করিতে ইচ্ছা করে, যে আপনাকে নিজ সমাজের অখণ্ড অংশ ভাবিয়া নিজের সর্ববিধ বৃত্তির অনুশীলন দ্বারা নিজের ও পরোক্ষভাবে সমাজের কল্যাণসাধন আকাঙ্ক্ষা করে, যে জাতীয় ভাষার অনুশীলন করিতে গৌরব বোধ করে, যে জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা মুখ্যতঃ স্বজাতিকে স্বদেশের ভাষায় শিখাইতে চায়, এবং দেশীয় সমাজের মুক্তির পথ দেশীয় আদর্শের মধ্যে অনুসন্ধান করিতে ভালবাসে, যে এই সুমহান্ ও আয়ুষ্মান্ হিন্দুসমাজকে অচল, মৃত বা মৃতপ্রায় ভাবিয়া সুইডেন, ডেন্মার্ক বা বেলজিয়মের সাহিত্যগন্ধমাদনে মৃতসঞ্জীবনী সুধার অন্বেষণ না করিয়া, এই সমাজের প্রকৃত জীবনীশক্তি কোথায় তাহা ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া সেই শক্তির পরিপুষ্টিদ্বারা তাহার সকল আময় দূরীকৃত করিবার বাসনা করে, তাহার পক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর শিক্ষা ধীরভাবে আলোচনীয়, নিপুণভাবে অনুধাবনীয় এবং অনেক স্থলেই শ্রদ্ধার সহিত অনুসরণীয়ও বটে। অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন হইলেও বঙ্কিমচন্দ্র অমানুষী প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন, একথা কে বলিবে? বঙ্কিমচন্দ্র কোথাও ভ্রমে পতিত হন নাই, কোনও চিন্তার ধারায় অর্ধপথে বিরত হন নাই, কোনও ক্ষেত্রে স্বল্পায়োজন লইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হন নাই, একথা বলিতে পারি না। তথাপি তাঁহার চিন্তার গভীরতা, সরলতা, আন্তরিকতা, তাঁহার কর্মফলের গুরুত্ব, মহত্ত্ব ও সুদূর-ব্যাপকত্বের কথা চিন্তা করিলে মুগ্ধ হইতে হয় এবং পুনঃ পুনঃ বলিতে হয়, তাঁহার সময়ে তাঁহার তুল্য লোক বাঙ্গালায় অতি অল্পই ছিল, এবং তাঁহার পরেও আজ পর্যন্ত অতি অল্পই জন্মিয়াছে।

## প্রথম পরিচ্ছেদ

### জন্ম ও শিক্ষা

১৮৩৮ খৃস্টাব্দের ২৭ শে জুন, বাঙ্গালা ১২৪৫ সনের ( ১৭৬১ শকাব্দের ) ১৩ই আষাঢ়, রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় ২৪ পরগণা জিলার অন্তর্গত কাঁটালপাড়া গ্রামে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়।

১৮৩৮ খৃস্টাব্দ বাঙ্গালার ইতিহাসে একটি চিরস্মরণীয় বৎসর। অবশ্য, ইতিহাস বলিতে যাঁহারা কেবল রাজনৈতিক ঘটনাবলির বিবরণমাত্র বুঝেন, তাঁহারা হয়ত স্মৃতিশক্তির উপর প্রচণ্ডতম চাপ দিয়াও ১৮৩৮ খৃস্টাব্দে বাঙ্গালাদেশে বিশেষ কোনও স্মরণীয় ঘটনা মনে আনিতে পারিবেন না। ভারতেতিহাসে বিশেষজ্ঞ-গণের দৃষ্টি একলক্ষে বাঙ্গালা হইতে ভারতের পশ্চিম সীমান্তে পতিত হইবারই সম্ভাবনা অধিক, কেননা ঐ বৎসরেই লর্ড অকল্যাণ্ড একদিকে শিমলাশৈলের তুহিন-পবনের স্পর্শ অপরদিকে রুশিয়া-ভল্লুকের আক্রমণভয়ে আড়ষ্ট হইয়া কাবুলের আমীর দোস্ত মহম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন। তদুপলক্ষে বাঙ্গালাদেশ হইতে কাবুলের দিকে যে অভিযান হয়, তদ্‌ভিন্ন বাঙ্গালার কোনও ঘটনা বাঙ্গালার রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রসিদ্ধ নহে। তথাপি বলিতে হইবে বাঙ্গালীর পক্ষে ১৮৩৮ খৃস্টাব্দ একটি চিরস্মরণীয় বৎসর। ঐ শুভবর্ষে বঙ্গমাতা যে সকল মহারত্ন প্রসব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের গৌরবে তিনি চিরদিন গৌরবান্বিতা থাকিবেন। বাঙ্গালা কাব্যে হেমচন্দ্র, বাঙ্গালার ধর্ম ও সমাজের ইতিহাসে কেশবচন্দ্র, রাজনীতিচর্চায় কৃষ্ণদাস, আর গদ্যসাহিত্য, ধর্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি—সংক্ষেপে বলিতে গেলে আধুনিক বাঙ্গালার সর্ববিধ চিন্তাক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র—ইঁহাদের কাহার নাম কোন কালে বঙ্গবাসী ভুলিতে পারিবে? এই মহাপুরুষগণের প্রত্যেকের জন্ম ১৮৩৮ খৃস্টাব্দে। সে বৎসরে যাঁহাদের জন্ম এরূপ অল্পসংখ্যক লোকই এখন বাঙ্গালাদেশে জীবিত আছেন। যাঁহারা কোনও ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতিসাধন করিয়া বহুলোকের নিকট পরিচিত হইয়াছেন, এরূপ ব্যক্তি একজনও জীবিত নাই। সর্বশেষ ব্যক্তি অল্পদিন হয় মানব-লীলা সংবরণ করিয়াছেন, ইঁহার নাম আইনজ্ঞ সমাজে বহুদিন পরিচিত থাকিবে। ইনি সার্ চন্দ্রমাধব ঘোষ; ইঁহার জন্মও ইংরাজি ১৮৩৮ খৃস্টাব্দে। বিদেশীয় মনীষিগণের মধ্যে ভারতবাসিগণ যাঁহাদের নাম বহুদিন পর্যন্ত স্মরণ রাখিবে, এরূপ দুই মহাত্মার জন্ম ঐ বৎসরে হয়। প্রথম, সার্ উইলিয়ম ওয়েডারবরণ; দ্বিতীয় লর্ড ( জন ) মর্লি। ওয়েডারবরণ কিছুকাল হয় পরলোকগত হইয়াছেন, লর্ড মর্লি অদ্যাপি জীবিত, এমন কি কর্মক্ষম আছেন। বাঙ্গালার দুর্ভাগ্যক্রমে লর্ড মর্লির

সমবয়স্ক বাঙ্গালী মহাপুরুষগণের মধ্যে (সার চন্দ্রমাধব ব্যতীত) আর সকলেই বহু বৎসর পূর্বে ধরাধাম ত্যাগ করিয়াছেন। কেশবচন্দ্র ৪৫ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করেন। কৃষ্ণদাসের মৃত্যুও ঐ বৎসরেই হয়। ১৮৮৪ খৃস্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী কেশবচন্দ্র, ২৪ শে জুলাই কৃষ্ণদাসের মৃত্যু হয়। বঙ্কিমচন্দ্র আর দশবৎসর জীবিত থাকিয়া ১৮৯৪ খৃস্টাব্দে দেহত্যাগ করেন; হেমচন্দ্র আরও নয় বৎসর (১৯০৩ খৃস্টাব্দের মে মাস পর্যন্ত) জীবিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার জীবনের শেষ কয়েক বৎসর তাঁহাকে জীবিত না বলিয়া মৃত বলিলেই চলে।

বাঙ্গালার অন্যান্য কৃতিসন্তানগণের মধ্যেও অতি অল্প কয়েকজন আশির কোঠায় পা দিতে পারিয়াছেন। সুবিখ্যাত হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৩৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন, স্বামী বিবেকানন্দ ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৪০ বৎসর বয়সে, দ্বারকানাথ মিত্র, রামদাস সেন ৪১ বৎসরে, উমেশচন্দ্র বটব্যাল ৪৬ বৎসরে, ঈশ্বর গুপ্ত ৪৭ বৎসরে, ভারতচন্দ্র রায় ৪৮ বৎসরে, মাইকেল মধুসূদন ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ৪৯ বৎসরে, পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ ও রজনীকান্ত গুপ্ত ৫১ বৎসরে, প্যারীচরণ সরকার, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, দাশরথি রায় ৫২ বৎসরে, রামগোপাল ঘোষ ৫৩ বৎসরে, যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ৫৫ বৎসরে, মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ৫৮ বৎসরে, মহামতি রাজা রামমোহন রায়, আনন্দমোহন বসু, রমেশচন্দ্র মিত্র, লালমোহন ঘোষ, বিহারীলাল চক্রবর্তী ৫৯ বৎসরে, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ ৬০ বৎসরে, রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় ৬১ বৎসরে, উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেন ৬২ বৎসরে, রামগতি ন্যায়রত্ন ৬৩ বৎসরে, অক্ষয়কুমার দত্ত ও (ভাই) প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ৬৬ বৎসরে, কালীপ্রসন্ন ঘোষ ৬৭ বৎসরে, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর) ৬৯ বৎসরে, মহেন্দ্রলাল সরকার ৭০ বৎসরে, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও অক্ষয়চন্দ্র সরকার ৭২ বৎসরে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও তারানাথ তর্কবাচস্পতি ৭৩ বৎসরে, রাজনারায়ণ বসু ৭৪ বৎসরে, কৃষ্ণকমল গোস্বামী ৭৭ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। যাঁহারা অশীতিবর্ষ অতিক্রম করিয়াছিলেন, এরূপ মাত্র তিনটি নাম মনে হয়। সুবিখ্যাত গঙ্গাধর কবিরাজ, রামনিধি গুপ্ত[1] ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর; ইঁহারা প্রত্যেকে ৮৭ বৎসর বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

মহাপুরুষমাত্রেরই জন্মের সঙ্গে দুই-একটা অলৌকিক বা অন্ততঃ পক্ষে অসাধারণ ঘটনা সংসৃষ্ট থাকে শুনা যায়। এগুলি কতদূর সত্য বা কাল্পনিক তাহাও কেহ বলিতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনচরিত-লেখক তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র ঐরূপ একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু উহার সত্যতা সম্বন্ধে তিনি নিঃসংশয় নহেন। কথিত আছে, বঙ্কিমের জন্মের ক্ষণকালপূর্বে তদীয় পিতা যাদবচন্দ্র সূতিকাগারে শঙ্খধ্বনি শুনিয়াছিলেন। অনুসন্ধানে যখন জানা গেল

১। রামনিধি ৯৭ বৎসর জীবিত ছিলেন। —স.

যে কেহই শঙ্খ বাজায় নাই, তখন তিনি সানন্দে উদ্দেশে ভগবানের চরণে প্রণাম করিলেন।[১]

কথাটা সত্যও হইতে পারে মিথ্যাও হইতে পারে, অনেকেই ইহা মিথ্যাই মনে করিবেন সন্দেহ নাই; কিন্তু যদি বাঙ্গালীর সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, উন্নতি-অবনতির সহিত কোনও অতিপ্রাকৃত জীবের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি থাকে, তবে তাহার পক্ষে ১২৪৫ সনের ১৩ই আষাঢ় রাত্রি ৯ ঘটিকা অপেক্ষা শঙ্খবাদনের অধিকতর উপযুক্ত সময় যে গতশতাব্দী মধ্যে হয় নাই, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর এত অধিককাল পরে তদীয় জীবনচরিত লিখিবার প্রয়াস হইয়াছে যে, তখন তাঁহার বাল্য, কৈশোর এমন কি যৌবনেরও অনেক কথাই লোকে বিস্মৃত হইয়াছে। শুনিয়াছি বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই তাঁহার বন্ধুগণকে তদীয় জীবনচরিত তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে লিখিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন। তাহার কারণও ছিল। জ্যেষ্ঠভ্রাতৃগণের সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ও আরও দুই একটি পারিবারিক বা ব্যক্তিগত ঘটনার বিবরণ সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হউক, হয়ত ইহা তিনি ইচ্ছা করিতেন না। ঐ সকল বিবরণ সাধারণের জানিয়া যে বিশেষ কোনও লাভ আছে, তাহাও নহে; কাজেই ঐ ঘটনাগুলির সম্মুখ হইতে যবনিকা অপসারণ করিবার জন্য কাহারও অতিরিক্ত আগ্রহ নিতান্তই অশোভন বলিয়া মনে হইতে পারে। বিশেষতঃ এখনও তদীয়া পত্নী ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র জীবিত আছেন। কিন্তু মনে হয়, বঙ্কিম-জীবনের দুই-চারিটি কথা বাদ দিয়াও তাঁহার একখানি উৎকৃষ্ট জীবনচরিত প্রণীত হইতে পারিত। এবিষয়ে তদীয় আত্মীয় ও অন্তরঙ্গ বন্ধুগণের ঔদাসীন্যের ফল এই হইয়াছে যে, এখন অনেক অলীক কথা ও কল্পিত বিবরণ সত্যরূপে প্রচারিত হইতে চলিয়াছে। পূর্ণচন্দ্র একস্থানে লিখিয়াছেন, "বঙ্কিমবাবু সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়া থাকেন, তাহার অধিকাংশই অমূলক"।[২] বঙ্কিমের বন্ধু ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকারও ঐরূপ কথা লিখিয়াছেন, শচীশচন্দ্র স্বীয় পিতৃব্য বঙ্কিমচন্দ্রের যে জীবনচরিত লিখিয়াছেন, তাহা পড়িলে মনে হয়, তিনি চেষ্টা করিলে এতদপেক্ষা সম্পূর্ণতর জীবনী লিখিতে পারিতেন।[৩] বঙ্কিমচন্দ্রের দৌহিত্রগণও সকলেই কৃতবিদ্য, তাঁহারাও এবিষয়ে উদাসীন। ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার বাঙ্গালা সাহিত্যের এই গুরুতর অভাবটি মোচন করিবেন বলিয়া অনেকে আশা করিয়াছিল, কিন্তু

---

১। শচীশচন্দ্র-প্রণীত জীবনচরিত, পৃ ৪১—৪২।

২। নারায়ণ পত্রিকা, ভাদ্র, ১৩২২।

৩। শচীশ চট্টোপাধ্যায়ের বঙ্কিমজীবনীর তৃতীয় সংস্করণ (১৩৩৮) পূর্ববর্তী সংস্করণ অপেক্ষা অধিকতর সম্পূর্ণ। এই সংস্করণ অবলম্বনে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শনিবারের চিঠির (১৩৩৮) বিভিন্ন সংখ্যায় বঙ্কিমজীবনী আলোচনা করেন।—স.

তিনিও বিশেষ কিছু করিলেন না। হায় বঙ্কিম! ইহা যদি তোমারই ঐকান্তিক ইচ্ছায় হইয়া থাকে, তবে হয়ত তোমার আত্মা ইহাতে নির্বৃত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালী যে তোমার ন্যায় একজন মহাপুরুষের একখানি বিস্তৃত জীবনচরিত লিখিতে পারিল না, তাহার এ কলঙ্ক কে মোচন করিবে? তোমার গুণমুগ্ধ কোনও বিদেশীয় ব্যক্তি যদি তোমার জীবন ও তোমাকে উপলক্ষ্য করিয়া তোমার সময়ের সমাজ ও তোমার পার্ষদগণের সম্বন্ধে সবিস্তর বিবরণ জানিতে চায়, তবে বাঙ্গালী কিরূপে তাহার ঔৎসুক্য নিবারণ করিবে?

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা রায় যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটুপিরি চাকরি করিতেন। তিনি একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া তাঁহার আত্মীয়গণ সকলেই বিশ্বাস করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসসমূহ যাঁহারা মনোযোগ সহকারে পড়িয়াছেন তাঁহারা জানেন বঙ্কিমচন্দ্র যোগবলে বিশ্বাস করিতেন; ঐ বিশ্বাসের ছায়া একাধিক উপন্যাসে পতিত হইয়াছে। কথিত আছে তদীয় পিতা যাদবচন্দ্র একজন যোগীর কৃপাভাজন ছিলেন। এই যোগীর বিবরণ নানা ব্যক্তি নানাস্থানে দিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র এতৎসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম এইরূপ[১]—

পনর-ষোল বৎসর বয়ঃক্রমকালে যাদবচন্দ্র একদা স্বীয় জনক কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া একাকী গৃহত্যাগ করেন, পরে উড়িষ্যায় বৈতরণী তীরবর্তী যাজপুর-নামক স্থানে নিজ অগ্রজের নিকট উপস্থিত হইয়া তথায় পার্শী ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। কিয়ৎকাল পরে তাঁহার জ্বর হয়। জ্বর ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া বিকারে পরিণত হইল; ক্রমে নাড়ীর গতি বন্ধ হইল, এমন কি তাঁহাকে বৈতরণীতীরস্থ করিতে হইল। তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে নিশ্চয় করিয়া তাঁহার আত্মীয়-বন্ধুগণ সৎকারের আয়োজন করিলেন। ইতিমধ্যে লোকের ভিড় ঠেলিয়া ভ্রমরকৃষ্ণশ্মশ্রু-বিশিষ্ট জটাজূটধারী ও গৈরিকবসন এক সুদীর্ঘকায় পুরুষ তথায় উপস্থিত হইলেন। সমবেত লোকগণ কেহই ইহাকে জানিত না, কিন্তু সে সময়ে তাঁহার আকস্মিক আগমনে সকলেই মনে করিল ইনি কোনও দেব-প্রেরিত মহাপুরুষ। মহাপুরুষ মৃতের আবরণ উন্মুক্ত করিয়া বলিলেন, "কি সুন্দর! ছেলেটি কি সুন্দর!—মরে নাই, জীবিত আছে।" পরে তিনি সেই মৃত বা মৃতপ্রায় দেহের মস্তক হইতে নাভি পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ দুই হস্ত চালনা করাতেই যাদবচন্দ্র পাশমোড়া দিলেন এবং ক্রমে জ্ঞানপ্রাপ্ত হইলেন। তখন যাদবচন্দ্রকে গৃহে আনা হইল, মহাপুরুষও স্বেচ্ছায় তাঁহার সঙ্গে গৃহে আসিলেন। পরে তাঁহাকে সুস্থ দেখিয়া মহাপুরুষ যাইবার উদ্যোগ করিলে যাদবচন্দ্র তাঁহার পদযুগল জড়াইয়া ধরিয়া দীক্ষা প্রার্থনা করিলেন। মহাপুরুষ বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে অনেকক্ষণ যাদবচন্দ্রের দিকে

---

১। নারায়ণ, ভাদ্র, ১৩২২। [বঙ্কিম-প্রসঙ্গে সংকলিত, 'বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মশিক্ষা', পৃ ৯৭—১০১। —স.]

চাহিয়া রহিলেন, পরে দীক্ষাদানে সম্মত হইয়া একটি দিন স্থির করিয়া বলিয়া গেলেন, "ঐদিন প্রত্যূষে স্নান করিয়া দীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবে, আমি আসিয়া দীক্ষা দিব।" যথাকালে যাদবচন্দ্রের দীক্ষা হইল। দীক্ষাকালে গৃহের দ্বার রুদ্ধ ছিল। দীক্ষান্তে মহাপুরুষ চলিয়া গেলে যাদবচন্দ্রের অগ্রজ গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন তাঁহার ক্রোড়ে একটি পুঁটলি রহিয়াছে। যাদবচন্দ্র ঐ পুঁটলির অভ্যন্তরস্থ পদার্থ দেখাইতে সম্মত হইলেন না। অষ্টাদশ বর্ষ হইতে অষ্টাশীতি বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত উহা যাদবচন্দ্রের চিরসঙ্গী হইয়াছিল। মৃত্যুশয্যায় তিনি উহা পুত্রগণের হস্তে দিয়া বলিয়াছিলেন, "এই পুঁটলিতে আমার গুরুদেবের খড়ম ও উপবীত আছে। দীক্ষার পর তিনি গলা হইতে উপবীত ও আমার প্রার্থনা অনুসারে তাঁহার পায়ের খড়ম দিয়াছিলেন। আমার মৃত্যুর পর ইহাতে পাথর বাঁধিয়া অতল জলে নিক্ষেপ করিবে।" অতল জলে নিক্ষেপের পূর্বে[১] তদীয় পুত্রগণ সেই উপবীত পরীক্ষা করিয়া অনুমান করিয়াছিলেন উহা তিব্বত-দেশীয় কোনও বৃক্ষের ছাল। ঐ উপবীতের প্রত্যেক দণ্ডীর উভয় পৃষ্ঠে কি লিখিত ছিল তাহা তাঁহারা পাঠ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন উহা তিব্বতীয় ভাষা, এবং তাঁহাদের পিতৃগুরু তিব্বতীয় তাপস।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ইহাও পূর্ণবাবুই লিখিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর প্রায় দুইমাস পূর্বে একদিন রবিবার বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র গড়ের মাঠে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বাড়ীর বাহির হইয়াই এক সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎকার লাভ করেন। ইহার পরিধানে মালকোঁচামারা গৈরিক বসন, গাত্রে গেরুয়া জামা। মাথায়ও গেরুয়া পাগড়ী ছিল। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিয়া হিন্দী ভাষায় বলিলেন, "আপনি কি বঙ্কিম বাবু? আপনার সঙ্গে কথা আছে।" বঙ্কিম জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে? কোথা হইতে আসিয়াছেন?" তিনি কহিলেন, "আমি তিব্বত হইতে আসিয়াছি; সেইস্থানের কোনও ব্যক্তি আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন।" বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, "সে দেশের কোনও ব্যক্তির সহিত আমার আলাপ নাই।" তিনি বলিলেন "আপনার নাই বটে, আপনার বাবার ছিল। তখন বঙ্কিমচন্দ্র সসম্মানে তাঁহাকে গৃহে নিয়া এক নির্জন গৃহে প্রবেশপূর্বক দ্বার রুদ্ধ করিলেন। বহুক্ষণ পরে গৃহের দ্বার উন্মুক্ত হইল; উভয়ে কি কথাবার্তা হইয়াছিল তাহা কেহ জানিল না।[২]

বঙ্কিমের পিতৃগৃহ বর্তমান সময়ে নিতান্ত ভগ্নাবস্থাগ্রস্ত। তাহার নিজ-নির্মিত

---

১। শচীশচন্দ্র লিখিয়াছেন খড়ম ও পৈতা যাদবচন্দ্রের দেহের সহিত এক চিতায় ভস্মীভূত হইয়াছিল।

২। নারায়ণ, ভাদ্র, ১৩২২। এই বিবরণ হইতে শচীশচন্দ্র-প্রদত্ত বিবরণ কিঞ্চিৎ ভিন্ন। তৎপ্রণীত বঙ্কিমচরিতের পৃ ২৭০—২৭৬ দ্রষ্টব্য। পূর্ণচন্দ্র প্রত্যক্ষদ্রষ্টা বলিয়া তৎপ্রদত্ত বিবরণই গ্রাহ্য। [দ্রষ্টব্য 'বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মশিক্ষা' বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, পৃ ১০১—১০২। —স.]

বৈঠকখানাও ঘোরতর দুর্দশাগ্রস্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরাধিকারী দৌহিত্রগণ যে ইহার জীর্ণসংস্কার করিয়া বঙ্কিমের স্মৃতিচিহ্নরূপে রক্ষা করিতেছেন না, ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়। ঐ গৃহে বসিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' রচিত হইয়াছিল। ঐ বৈঠকখানা এককালে বঙ্কিমের অতি আদরের স্থান ছিল। উহা যে বাঙ্গালী জাতির তীর্থস্থানরূপে গণ্য হইবার যোগ্য তাহাও কি বলিয়া দিতে হইবে?

বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ী নৈহাটি স্টেশনের একরূপ উপরেই বলা যায়। স্টেশনের প্ল্যাট্‌ফরম্ হইতে ঐ স্থানে পৌছিতে তিন মিনিটের অধিক সময় লাগে না। বঙ্কিমের বৈঠকখানার পার্শ্বেই উত্তর দিকে তাঁহার পিতার স্থাপিত শিবমন্দির ও তাহা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে রাধাবল্লভ জিউ ও বলরামচন্দ্র বিগ্রহের মন্দির।

বঙ্কিমচন্দ্র পিতার তৃতীয় পুত্র ছিলেন। যাদবচন্দ্রের চারিপুত্র; প্রথম পুত্রের নাম শ্যামাচরণ,[১] দ্বিতীয় সঞ্জীবচন্দ্র, ইঁহার নাম বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত। বঙ্কিমের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের মাতামহ একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। মাতামহ হইতে বঙ্কিমচন্দ্র কেবল শাস্ত্রানুরাগ লাভ করেন নাই, তাঁহার মৃত্যুর পরে তৎসংগৃহীত বহু সংস্কৃত পুঁথিরও অধিকারী হইয়াছিলেন। এই গ্রন্থগুলি তিনি গৃহে বহু যত্নে পড়িয়া স্বীয় বিশাল শাস্ত্রজ্ঞতার ভিত্তি স্থাপন করেন। মাতামহকুল হইতে প্রাপ্ত গ্রন্থাবলীর মধ্যে ফলিতজ্যোতিষ-বিষয়ক গ্রন্থও ছিল। উহাও তিনি কথঞ্চিৎ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীরাম শিরোমণি[২] নামক একজন বিখ্যাত পণ্ডিতের নিকট তিনি অনেকগুলি সংস্কৃতকাব্য পড়িয়াছিলেন। পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় শিরোমণি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, নৈষধ পড়াইবার সময়ও তিনি কাব্যাংশের প্রতিই অধিক মনোযোগ দিতেন, ব্যাকরণ বা দর্শনের দিকে ফিরিয়াও চাহিতেন না।

অতি শৈশবেই বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিভার নানা প্রমাণ দিয়েছিলেন। কথিতআছে, বঙ্কিমচন্দ্র একদিনে বর্ণমালা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। আটবৎসর বয়ঃক্রমকালে বঙ্কিমচন্দ্র মেদিনীপুর স্কুলে ভর্তি হন। তাঁহার জীবনের এই ভাগ সম্বন্ধে তাঁহার ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র লিখিয়াছেন, "বঙ্কিমচন্দ্র ভাগ্যক্রমে বাল্যকাল হইতে বিদ্যোৎসাহী ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের সহবাসেই থাকিতেন। পিতৃদেব তাঁহার অসামান্য প্রতিভা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান্ ও সতর্ক ছিলেন। শৈশবে

১। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনচরিত-লেখক শচীশচন্দ্র শ্যামাচরণ বাবুর দ্বিতীয় পুত্র।

২। পূর্ণচন্দ্র ইঁহার নাম শ্রীরাম ন্যায়বাগীশ লিখিয়াছেন। [হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ইঁহার নাম লিখিয়াছেন শ্রীরাম শিরোমণি। শাস্ত্রী মহাশয় ইঁহার নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের শেষ অংশ ও জয়কৃষ্ণের সারমঞ্জরী পড়িয়াছিলেন; পরে পড়েন নৈষধ। দ্র. 'বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়' বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, পৃ ১৫৬—১৫৭। —স.]

বঙ্কিমচন্দ্র মেদিনীপুরে শিক্ষা পান। পিতৃদেব তখন ঐ স্থানে ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। ......... মেদিনীপুরে একটি হাইস্কুল ছিল। টিড্ নামে একজন বিলাতী সাহেব উহার হেড্‌মাস্টার ছিলেন। অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের সহিত বঙ্কিমচন্দ্র মধ্যে মধ্যে ঐ স্কুলে যাইতেন। একদিন ঐ সাহেব ক্লাব পরিদর্শনে আসিয়া তাঁহার পরিচয় লইলেন। ......... তাঁহার অনুরোধে অতি শৈশবে ইংরাজী শিক্ষার জন্য পিতৃদেব বঙ্কিমচন্দ্রকে ঐ স্কুলে ভর্তি করিয়া দেন। বৎসরান্তে পরীক্ষার ফলে সাহেব তাঁহাকে ডবল প্রমোসন দিতে চাহিলেন, কিন্তু পিতৃদেবের আপত্তিতে তাহা ঘটিল না।[১] বঙ্কিমচন্দ্রকে বৈকালে টিড্ সাহেবের বিবি লোক পাঠাইয়া লইয়া যাইতেন। ......... এই সময়ে মলেট সাহেব নামে একজন হ্যালুবেরি সিভিলিয়ান মেদিনীপুরে ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। টিড্ সাহেবের বিবি তাঁহার ছেলেদের ও বঙ্কিমচন্দ্রকে লইয়া প্রতিদিন বৈকালে ম্যাজিস্ট্রেটের কুঠিতে যাইতেন।"

ইংরেজি ১৮৫১ সনে যাদবচন্দ্র চব্বিশ পরগণায় বদলি হইয়া আসেন।[২] মেদিনীপুর ত্যাগের পর বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায় আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি গৃহে প্রাইভেট্ টিউটরের নিকট পড়িতে লাগিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের জ্ঞানার্জনে অত্যধিক আগ্রহ ছিল। তিনি নানা লোকের মুখে শুনিয়া বহুতর সংস্কৃত শ্লোক কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা তাঁহার খুব প্রিয় ছিল। তিনি সর্বদা তাহা আবৃত্তি করিতেন। ঈশ্বর গুপ্ত-সম্পাদিত 'সংবাদ-প্রভাকর' ও 'সাধুরঞ্জন' পত্রিকা তাঁহাদের কাঁটালপাড়ার বাড়াতে আসিত, উহার মধ্যে যে কবিতাগুলি ভাল লাগিত, বঙ্কিমচন্দ্র সেগুলি কণ্ঠস্থ করিতেন। ভারতচন্দ্রেরও দুই-একটি

১। বঙ্গবাসী আফিস হইতে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক' নামক পুস্তকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে, "প্রতিবৎসর দুইবার শ্রেণী পরিবর্তন করিয়া তিনি পরীক্ষার সময় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতেন।" হারাণচন্দ্র রক্ষিত-প্রণীত 'বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম' নামক পুস্তকেও ঐ কথা লিখিত হইয়াছে।

[ বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী-রচনা প্রসঙ্গে শৈশব শিক্ষার যে বিবরণ দিয়াছেন, এই প্রসঙ্গে তাহাও উদ্ধৃতিযোগ্য—

এই সময়ে আমাদিগের পিতা, মেদিনীপুরে ডেপুটি কালেক্টরী করিতেন। আমরা সকলে কাঁটালপাড়া হইতে তাঁহার সন্নিধানে নীত হইলাম।......কিছুকালের পর আবার আমাদিগকে কাঁটালপাড়ায় আসিতে হইল। এবার সঞ্জীবচন্দ্র হুগলী কলেজে প্রেরিত হইলেন। তিনি কিছুদিন সেখানে অধ্যয়ন করিলে আবার একজন 'গুরু মহাশয়' নিযুক্ত হইলেন। আমার ভাগ্যোদয়ক্রমেই এই মহাশয়ের শুভাগমন; কেন না আমাকে ক, খ, শিখিতে হইবে, কিন্তু বিপদ্ অনেক সময়েই সংক্রামক। সঞ্জীবচন্দ্রও রামপ্রাণ সরকারের হস্তে সমর্পিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে আমরা আট-দশ মাসে এই মহাত্মার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মেদিনীপুর গেলাম।

পূর্ণচন্দ্রের বিবরণ বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয়বার মেদিনীপুর যাত্রার পরবর্তী ঘটনা। পূর্ণচন্দ্রের প্রবন্ধের নাম 'বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যশিক্ষা' বঙ্কিম-প্রসঙ্গে সংকলিত। —স. ]

২। শচীশ চট্টোপাধ্যায়ের বঙ্কিমজীবনীতে সংকলিত যাদবচন্দ্রের আত্মচরিতে আছে— "১৮৪৯ সালের নভেম্বর মাহায় চব্বিশ পরগণায় বদলি হইলাম।" —স.

কবিতা তাঁহার প্রিয় ছিল। বিদ্যার রূপবর্ণন-বিষয়ক কবিতাটি নাকি তিনি অনেক সময় আবৃত্তি করিতেন।

কবিতা আবৃত্তি বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের খুব স্বাভাবিক দক্ষতা ছিল। তিনি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা উভয়বিধ কবিতাই খুব সুন্দরভাবে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। কবিতা আবৃত্তিতে তাঁহার এইরূপ স্বাভাবিক অনুরাগ ও দক্ষতা হেতু তিনি তদানীন্তন বিখ্যাত পণ্ডিত ৺হলধর তর্কচূড়ামণির সস্নেহ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এই প্রবীণ পণ্ডিত মধ্যে মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের পাঠগৃহে বসিয়া তাঁহাকে মহাভারতের নানা উপাখ্যান শুনাইতেন। তর্কচূড়ামণি কর্তৃক উপ্ত এই জ্ঞানবীজ পরিণামে 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রভৃতি পাণ্ডিত্যময় অমৃতফল প্রসব করিয়াছিল। একদিন দোলযাত্রা উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণের ষোলশত গোপিনী ও বস্ত্রহরণ সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র চূড়ামণি মহাশয়কে একটু বিস্মিত এবং সম্ভবতঃ একটু ব্যথিতও করিয়াছিলেন। চূড়ামণি মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "এ প্রশ্নের উত্তর আমি তোমাকে পরে দিব, এক্ষণে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেও তুমি তাহা বুঝিতে পারিবে না, তবে এই মাত্র জানিয়া রাখ যে, শ্রীকৃষ্ণ আদর্শপুরুষ ও আদর্শচরিত্র।"[১] চূড়ামণি মহাশয়ের মুখে আর এবিষয়ে অধিক কিছু শুনিবার সুযোগ বঙ্কিমচন্দ্র প্রাপ্ত হয়েন নাই। কিন্তু ঐ উক্তি তাঁহার মনে নিশ্চয়ই চিরদিন জাগরূক ছিল এবং ঐ মত তিনি কেবল 'কৃষ্ণচরিত্রে' নানা যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদিত করিতে চেষ্টা করেন নাই, 'ধর্ম্মতত্ত্ব' প্রভৃতিতেও পুনঃ পুনঃ প্রচার করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মের দুই বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৮৩৬ খৃস্টাব্দে চুঁচুড়াতে College of Mahammad Moshin (মহম্মদ মসিনের কলেজ) স্থাপিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পঞ্জিকায় (Calendar) হুগলি কলেজের বিবরণীতে উক্ত বিদ্যালয়ের ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। পূর্বে এই বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের মাহিনা ত লাগিতই না, এমন কি কাগজ, কলম, কালী, খাতা, পড়িবার পুস্তক পর্যন্ত অধ্যক্ষেরা ছাত্রদিগকে দিতেন। হায় রে সে দিন! মহম্মদ মসিনের কলেজই এখন হুগলি কলেজ নামে পরিচিত। ১৮৩৫ খৃস্টাব্দে এদেশীয় লোকগণের ইংরাজীশিক্ষা বিধানার্থ প্রথম শিক্ষাপরিষদ (Council of Education) স্থাপিত হয়। হুগলি কলেজ স্থাপনাবধি ঐ পরিষদের তত্ত্বাবধানাধীন ছিল। ১৮৪২ খৃস্টাব্দে জুনিয়ার-সিনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষা স্থাপিত হয়। ১৮৫৮ খৃস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে ঐ পরীক্ষা উঠিয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষা উভয়ই দিয়াছিলেন।[২] সিনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষায় সাহিত্যে Bacon, Shakespeare, Milton,

১। ভারতী, আষাঢ়, ১৩২৩। [দ্র. বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, 'বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যশিক্ষা' পৃ ৪০-৪১।—স.]

২। হুগলী ও প্রেসিডেন্সি কলেজে বঙ্কিমচন্দ্রের ছাত্রজীবন সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নথিপত্র ঘাঁটিয়া অনেক খুঁটিনাটি বিবরণ উদ্ধার করিয়াছেন। এ সম্পর্কে

Pope, ও Gray-র নানা গ্রন্থ, দর্শনে Smith-এর Moral Sentiments, Steward-এর Philosophy of the Mind, Whateley-র ও Mill-এর Logic পাঠ্য ছিল। ইতিহাসে Hume-এর History of England, Robertson-এর Charles V, Mill-এর ও Elphinstone-এর History of India প্রভৃতি পড়িতে হইত। অঙ্কশাস্ত্রে Integral Calculus, Differential Calculus, Euclid (I—VI, XI), Algebra, Astronomy এবং Principia প্রভৃতি পাঠ্য ছিল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র সিনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষায় যথেষ্ট খ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইলেও বি. এ. পরীক্ষায় তাদৃশ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। শচীশচন্দ্র ও রায় সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত লিখিয়াছেন, বঙ্কিম পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে মাত্র দুইমাস সময় পাইয়াছিলেন। সে যাহা হউক প্রথম বারের বি. এ. পরীক্ষায় দশজন পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথমে সকলেই ফেল হয়, পরে বঙ্কিমচন্দ্র ও 'কলিকাতা গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন-নিবাসী' যদুনাথ বসু অনুগ্রহ-নম্বর (grace marks) পাইয়া পাশ হন। রায় সাহেব হারাণচন্দ্র যে লিখিয়াছেন, "প্রতিভাবান্ বঙ্কিম যথাকালে প্রশংসার সহিত বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন"[১] তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। কিন্তু ইহা সত্য যে উত্তীর্ণ যুবকদ্বয় মধ্যে বঙ্কিমই প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। প্রথম বারের বি. এ. পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র প্রণয়নে এবং উত্তর-পরীক্ষা-বিষয়ে কিরূপ আদর্শ অবলম্বিত হইবে সম্ভবতঃ অনেকে তাহা বুঝিতে পারেন নাই, বিশেষতঃ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার সময়ও অল্প ছিল। সম্ভবতঃ এই দুই কারণেই প্রথম বারের পরীক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্রের মত প্রতিভাশালী ছাত্রও আশানুরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই।

ইংরাজী রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। অঙ্কশাস্ত্রেও তিনি

---

সাহিত্যসাধক-চরিতমালার অন্তর্ভুক্ত 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' দ্রষ্টব্য। এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের ছাত্রজীবনের কয়েকটি প্রধান ঘটনা উল্লিখিত হইল—

হুগলী কলেজে জুনিয়র ডিবিসনে ভর্তি—১৮৪৯, ২৩ অক্টোবর।

জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা (১৮৫৩)—১৮৫৪, এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত হয়। এই পরীক্ষায় তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করেন। আট টাকা বৃত্তি পান।

চতুর্থ শ্রেণীর সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা—১৮৫৫, এপ্রিল মাসে। শীর্ষস্থান এবং আট টাকা বৃত্তি।

তৃতীয় শ্রেণীর সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা—১৮৫৬, এপ্রিল মাসে। কুড়ি টাকা বৃত্তি। শীর্ষস্থান।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িবার সময় হুগলী কলেজ ত্যাগ—১৮৫৬, জুলাই।

এনট্রান্স পরীক্ষা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে—১৮৫৭, এপ্রিল। প্রথম বিভাগ।

বি-এ পরীক্ষা—১৮৫৮, এপ্রিল।

বি-এল পরীক্ষা প্রেসিডেন্সি হইতে—১৮৬৯ জানুয়ারি। —স.

১। "বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম" পৃ ৮।

সবিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। 'বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম' ও বঙ্গবাসী আফিস হইতে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক'-নামক পুস্তকে লিখিত হইয়াছে যে, পূর্ণচন্দ্রের কলেজে অধ্যয়নকালে গণিতের অধ্যাপক একদিন জ্যামিতির একটি প্রতিজ্ঞা ছাত্রদিগকে পূরণ করিতে দেন। কোন ছাত্রই তাহাতে কৃতকার্য হইল না দেখিয়া অধ্যাপক নাকি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "বঙ্কিমচন্দ্র হইলে এ প্রতিজ্ঞাপূরণ আর আমাকে দেখাইতে হইত না।" বঙ্কিমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র ক্লাসের একজন ছাত্র ছিলেন বলিয়া অধ্যাপকের পক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রকে স্মরণ করা অসম্ভব নহে। নচেৎ বঙ্কিমচন্দ্র যে হুগলী কলেজ হইতে উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে গণিতে অসাধারণ রূপে ব্যুৎপন্ন ছিলেন এতখানি মনে করিবার বোধ হয় বিশেষ হেতু নাই। তবে জ্যোতির্বিজ্ঞান ( Astronomy ) যে তাঁহার প্রিয় পাঠ্য ছিল তাহা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত তাঁহার নানা প্রবন্ধ হইতে অনুমান করা যায়। তিনি যে ফলিতজ্যোতিষও পড়িয়াছিলেন তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে।

বঙ্কিমের প্রিয় ও অনুরাগী সাহিত্যশিষ্য পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 'বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়'-শীর্ষক প্রবন্ধে[১] লিখিয়াছেন, "কাব্যের উপর বঙ্কিম বাবুর খুব ঝোঁক ছিল। কিন্তু কাব্যের চেয়েও ইতিহাসেই তাঁহার বেশি সখ ছিল। ইউরোপের ইতিহাস তিনি খুব পড়িয়াছিলেন। তিনি সর্বদাই ফ্লরেন্সের মেডিচিদের কথা কহিতেন। রিনাইসেন্স ( Renaissance ) ইতিহাস তিনি খুব আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং সেই পথ ধরিয়া বাঙ্গালারও যাহাতে আবার নবজীবন সঞ্চার হয় তাহার জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, তিনি বাঙ্গালার একখানি ইতিহাস লিখিয়া যান! সেই উদ্দেশ্যেই তিনি 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' সম্বন্ধে বঙ্গদর্শনে সাতটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।"[২]

কিন্তু, বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষার বিবরণে যে তথ্য আধুনিক বাঙ্গালী পাঠকের কৌতূহল অধিক উদ্দীপন করিবে বলিয়া আশা করা যায়, তাহা এই—কলেজে অধ্যয়নকালে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা রচনা অভ্যাস করিয়াছিলেন কি না?

বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে কলেজে বাঙ্গালা শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। মধ্যযুগে কিয়দ্দিন বাঙ্গালাভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকা হইতে বহিষ্কৃত হইয়া পড়িয়াছিল। আবার আধুনিক কালে বঙ্গের গৌরব সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী শাস্ত্র-বাচস্পতি মহাশয়ের সুবিবেচনায় ও সুব্যবস্থায় ১৯০৯-১০ খৃস্টাব্দ হইতে বাঙ্গালা ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা, মধ্য ও বি. এ. পরীক্ষায় অবশ্যপাঠ্য বলিয়া

১। নারায়ণ, বৈশাখ ১৩২২। [ বঙ্কিম-প্রসঙ্গে সংকলিত—স. ]

২। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক গবেষণা সম্বন্ধে ১৩২২ সনের বৈশাখ মাসের নারায়ণ পত্রিকায় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি অতি সুলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। কৌতুকী পাঠক তাহা পাঠ করিতে পারেন। [ এই সূত্রে রমাপ্রসাদ চন্দের প্রবন্ধটিও দেখা যাইতে পারে। দ্রষ্টব্য মানসী ও মর্মবাণী, আষাঢ় ১৩৩১ 'বঙ্কিমচন্দ্র ও বাঙ্গালার ইতিহাস'।—স. ]

নির্ধারিত হইয়াছে। তৎপর অল্পদিন হইল ঐ মহাত্মারই চেষ্টায় বাঙ্গালা ভাষায় এম. এ. উপাধিদানেরও ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু এখনও সব কলেজে উপযুক্তরূপে বাঙ্গালা শিক্ষা দানের ব্যবস্থা হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা পরীক্ষা-রীতিতেও সংস্কার আবশ্যক। বাঙ্গালা ভাষার বর্তমান উন্নতির যুগেও যখন বাঙ্গালা শিক্ষার এই অবস্থা, তখন বঙ্কিমের ছাত্রাবস্থায় কিরূপ ছিল তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। বিশেষ তখন বাঙ্গালা ভাষার চর্চা করা ইংরাজী-শিক্ষিত সমাজ আপনাদের অগৌরবের বিষয় বলিয়াই মনে করিতেন। এখনও দুই চারিটি ছাত্র 'বাঙ্গালা ভাল জানি না' বলিতে গৌরব বোধ করে, কেননা বাঙ্গালা কম জানার অর্থ ইংরাজী সাহিত্যে তদনুপাতে গভীরতর জ্ঞান। একালের অধিকাংশ ছাত্রের তুলনায় সে কালের ছাত্রেরা ইংরাজী রচনায় অধিকতর দক্ষ ছিলেন, এবং সম্ভবতঃ ইংরাজী সাহিত্যের সহিত পরিচয়ও তাঁহাদের গাঢ়তর ছিল। তখন বাঙ্গালা ভাষায় পাঠযোগ্য গ্রন্থও অধিক ছিল না, এমন অবস্থায় বাঙ্গালা ভাষা যে সেকালের শিক্ষিতগণের নিকট অনাদরের সামগ্রী হইবে তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। আবার কেবল যে বাঙ্গালায় ভাল বই ছিল না, তাহা নহে; ঐ ভাষা শিক্ষা দিবার উপযুক্ত শিক্ষকও সবত্র মিলিত না। শ্রদ্ধাস্পদ রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন, "আমাদিগের কলেজে যিনি বাঙ্গালা পণ্ডিত ছিলেন, তিনি একসময়ে রামকমল সেনের পাচকব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আমরা রান্নার গল্প করিয়া সময় কাটাইতাম।"[১] রামকমল সেনের এই সূপকারটি রন্ধনকার্যে কিরূপ ছিলেন তাহা রাজনারায়ণ বাবু বলেন নাই, কিন্তু তিনি যে দেওয়ানজির রন্ধনশালা হইতে বাঙ্গালা অধ্যাপনায় সরসতা সম্পাদনের যোগ্যতা অর্জন করিয়া আসেন নাই, তাহা রাজনারায়ণ বাবুর উক্তি হইতে স্পষ্টই বোধ হয়। কিন্তু বাঙ্গালীর সৌভাগ্যক্রমে হুগলি কলেজে বাঙ্গালা শিক্ষা ভাল হইত। শ্রদ্ধাস্পদ অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিয়াছেন—

> হুগলী কলেজে মাতৃভাষা শিক্ষা ভালরূপই হইত। পিতৃদেবের (গঙ্গাচরণ সরকারের) সময়েও হইত, আমাদের সময়েও হইত, আমাদের সময়েও যে ভালরূপ হইত, তাহার সাক্ষী ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন। মধ্য সময়ে যে হইত, তাহার সাক্ষী বঙ্কিমবাবু ছিলেন। প্রথম সময়ে যে হইত, তাহার সাক্ষী হুগলীর হরচন্দ্র ঘোষ ছিলেন। ইতিপূর্বে ইংরাজী অভিজ্ঞের বাঙ্গালা ভাষায় অনভিজ্ঞতার একটা বিদ্রূপাত্মক গল্প ছিল। লোকে বলে 'কোকিলের' স্ত্রীলিঙ্গ লিখিতে হইলে তাঁহারা নাকি লিখিতেন 'মেদী কোকিল'। এ দুর্নাম প্রধানতঃ এ কলেজে হরচন্দ্র ঘোষ ও পিতৃদেব কর্তৃক দূরীকৃত হয়। যে ফিরিঙ্গি বাঙ্গালার লাঞ্ছনা এখন অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, সেই লাঞ্ছনা প্রথমে তিনিই প্রচার করিয়াছিলেন। 'রাণী ও

১। আত্মচরিত, পৃ ৫২—৫৩।

মহারাণী ! বাহকগণ, বিশেষতঃ তোমার বাহকগণ হয় খ্যাত্যাপন্ন ভাঙ্গতে কুশল কলেজের।' হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ সাদারল্যাণ্ড সাহেবের বাঁশবেড়ের রাণীকে লেখা একখানি ইংরাজী পত্রের মোসাবিদা হইতে ঐ কলেজের কেরাণী জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঐ অতি উজ্জ্বল বাঙ্গালা অনুবাদ করেন।[১]

পূর্বেই বলা হইয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অনেক কবিতা সর্বদা আবৃত্তি করিতেন। একদিকে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগ, অন্যদিকে হুগলী কলেজে মাতৃভাষা শিক্ষায় সুব্যবস্থা এই উভয়ের সংযোগ সোনায় সোহাগা মিশ্রণের ন্যায় হইয়াছিল। ছাত্রাবস্থায়ই বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্ত-সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'সাধুরঞ্জন' নামক পত্রিকায় দুই-একটি কবিতা লিখেন। সুকবি দীনবন্ধু মিত্র ও সুবিখ্যাত দ্বারকানাথ অধিকারীরও ঐ সময়েই ঐ পত্রিকাদ্বয়ে কাব্য রচনায় হাতে খড়ি হয়। ঈশ্বর গুপ্ত এই তিনজনেরই সাহিত্যগুরু। রায় সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত লিখিয়াছেন, এই সময় হইতেই বঙ্কিমের লেখায় একটু মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। দীনবন্ধু বা দ্বারকানাথ তখন ঈশ্বর গুপ্তের অনুকরণমাত্র করিতেন। প্রভাকরে বঙ্কিমচন্দ্রের যে সকল রচনা প্রকাশিত হয় উত্তরকালে তিনি আর তাহা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন নাই। শচীশচন্দ্র তাহা স্বপ্রণীত বঙ্কিমজীবনীতে প্রকাশ করিয়া বঙ্কিমানুরাগিমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। হারান বাবু যাহাই বলুন বঙ্কিমের এই সময়ের রচনায় তাঁহার ভাবী গৌরবের বিশেষ কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। শচীশচন্দ্রের গ্রন্থে দেখিতে পাই, কবিবর ঈশ্বর গুপ্ত বঙ্কিমের 'সুবঙ্কিম ভাবকৌশলের' প্রশংসা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনিও বঙ্কিমকে ভাষার বঙ্কিমতা পরিহার করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন।

ছাত্রাবস্থায়ই বঙ্কিমের 'ললিতা' ও 'মানস' নামক কাব্যদ্বয় প্রকাশিত হয়। বঙ্কিম নিজে লিখিয়াছেন, এই দুই গ্রন্থ তাঁহার পঞ্চদশ বৎসর বয়সে লিখিত ও তিন বৎসর পরে মুদ্রিত হয়। এই দুই কাব্যে বঙ্কিমের কবিতার ভাষা অনেকটা উজ্জ্বল ও সবল হইয়া ফুটিয়াছে। উহা কতদুর বঙ্কিমের পুনঃসংশোধনের ফল তাহা বলিতে পারি না, কেননা প্রথম সংস্করণের 'ললিতা' ও 'মানস' দেখি নাই। উত্তরকালে তিনি উভয়গ্রন্থ পরিবর্তিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন তথাপি ইহাতে কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনীর রচয়িতাকে চেনা যায় না। 'ললিতা' কাব্যটি একটা ভৌতিক গল্প। 'মানসে' শচীশচন্দ্র সুপ্ত প্রতিভার অস্ফুট গর্জন কর্ণগোচর করিয়াছেন।[২]

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কৈশোরাবধি এইরূপ বঙ্গভাষায় অনুরাগী হইয়াও

১। 'বঙ্গভাষার লেখক' 'পিতা-পুত্র'। —স.

২। বঙ্কিমচন্দ্রের 'সংবাদপ্রভাকর' ও 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' পত্রিকায় প্রকাশিত বাল্যরচনা এবং দ্বারকানাথ অধিকারী ও দীনবন্ধু মিত্রের সহিত তাঁহার কবিতাযুদ্ধের বিবরণ শচীশচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্র তদীয় প্রথম উপন্যাস ইংরাজী ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করেন। ইহাকেই বলে কালধর্ম। মাইকেল মধুসূদন প্রভৃতি আরও অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালী বঙ্কিমের পূর্বে এই পথের পথিক হইয়াছিলেন। অথচ এই সময়ে ভারতহিতৈষী ইংরেজগণের মধ্যে কেহ কেহ বাঙ্গালী শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে তাহাদের মাতৃভাষার চর্চা করিতে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিতেছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন (Bethune) ইঁহাদের অন্যতম। মধুসূদনের ইংরাজী কাব্য Captive Lady পাঠ করিয়া ইনি তদীয় বন্ধু গৌরদাস বাবুকে লিখিয়াছেন, বাঙ্গালী কবি বা লেখক কেবল বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ লিখিলেই সমাজের কল্যাণ ও স্থায়ী যশঃ অর্জন করিতে আশা করিতে পারেন। কৃষ্ণনগর কলেজের পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষেও তিনি ঐরূপ ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন।[১] তাঁহারই উপদেশে মধুসূদন বাঙ্গালা ভাষায় কাব্য লিখিতে প্রবৃত্ত হন। বঙ্কিমচন্দ্রের সুমতি কিরূপ ঘটনাসূত্রে ফিরিয়া আসিয়াছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। সে যাহা হউক, তাঁহার প্রথম উপন্যাস Rajmohan's Wife সম্পূর্ণ হয় নাই। যে পত্রিকায় উহা প্রকাশিত হইতেছিল তাহা অল্পকাল মধ্যেই উঠিয়া যায়।[২]

বি. এ. পরীক্ষা দিবার পূর্ব হইতেই বঙ্কিমচন্দ্র আইন অধ্যয়ন করিতেছিলেন। বি. এ. পাশ করিবার পরও চাকরির অবস্থায় আলিপুরে নিযুক্ত থাকার সময় ও তৎপরে কিছুদিনের ছুটি লইয়া তিনি আইন অধ্যয়ন করেন। ১৮৬৯ খৃস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র বি. এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। চাকরির অবস্থায় ওকালতি পরীক্ষা দিবার হেতু সম্ভবতঃ এই ছিল যে, যদি কর্তৃপক্ষের সহিত মন কষাকষির দরুণ চাকরি ছাড়িতে হয়, তবে জীবিকা-নির্বাহের একটা পথ উন্মুক্ত থাকিবে।

---

চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্কিমজীবনী'তে পাওয়া যাইবে। 'বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম গদ্যরচনা' প্রবন্ধে অক্ষয়চন্দ্র সরকারও আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধটি বঙ্কিম-প্রসঙ্গে সঙ্কলিত হইয়াছে। ১৩৩৮ কার্তিক সংখ্যার শনিবারের চিঠিতে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যরচনা বিষয়ে নূতন তথ্য দিয়াছেন। অতঃপর পূর্বপ্রাপ্ত তথ্য ও আরও কিছু নূতন তথ্য সহযোগে বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যরচনার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে শ্রীভবতোষ দত্ত-সম্পাদিত 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব' (১৯৬৮) গ্রন্থে, পৃ ১৭২-২০০। —স.

১। যোগীন্দ্রনাথ বসু-প্রণীত 'মাইকেল জীবনী' ১৬০—১৬১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২। Rajmohan's Wife ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে কিশোরীচাঁদ মিত্র-সম্পাদিত Indian Field পত্রিকায় সম্পূর্ণ আকারেই প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম তিনটি অধ্যায় ছাড়া অবশিষ্ট উপন্যাসটি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আবিষ্কার করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তীকালে এই উপন্যাসের একটি অনুবাদ প্রস্তুত করিতেছিলেন। সেটি প্রথম সাত অধ্যায় পর্যন্ত করা হইয়াছিল। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বারিবাহিনী' নামে এই উপন্যাসটি সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন, যদিও তিনি জানিতেন না যে বঙ্কিমচন্দ্র ইহা Rajmohan's Wife-এর অনুবাদ রূপেই রচনা করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ-সংস্করণ বঙ্কিম-রচনাবলীতে ধৃত ইংরেজি উপন্যাসটির প্রথম তিনটি অধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা অনুবাদের ভিত্তিতে প্রস্তুত করিয়াছেন। —স.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## পিতৃভক্তি ও বন্ধুবৎসলতা

১৮৫৮ খৃস্টাব্দে বি. এ. পাশ করিবার পরই ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব স্বয়ং বঙ্কিমকে আহ্বান করিয়া ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কার্য দিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে চাকরির জন্য বিশেষ উমেদারি করিতে হয় নাই, করিতে হইলে হয়ত তিনি গ্রহণ করিতেন না। তাহার আত্মসম্মানবোধ এত প্রখর ছিল যে, একালে তাহা অনুমান করাই কঠিন।

ডেপুটিগিরি চাকরির প্রতি চিরকালই শিক্ষিত বাঙ্গালীর একটা লোলুপ দৃষ্টি আছে। স্বাধীনচেতা রাজনারায়ণ বসুও ঐ চাকুরির জন্য উমেদারি করিয়াছিলেন। তখন পরীক্ষা ছিল না, পরে যখন ঐ চাকরির জন্য পরীক্ষাদ্বারা প্রতিযোগিতা করিতে হইত, তখন ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিতম ছাত্রেরা ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করিতেনই, এখন কেবল সুপারিশি ও উমেদারি দ্বারাই ঐ কর্ম লভ্য হইলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্রগণও তাহাতে বীতরাগ হয়েন নাই। অবশ্য, যে একেবারে মুরুব্বিহীন, তাহার পক্ষে দায়ে পড়িয়া স্বাধীনচিত্ততা প্রদর্শন করা কঠিন নহে। ডেপুটিগিরিতে বাঙ্গালীর অনুরাগ তাহার সাহিত্যেও ছায়াপাত করিয়াছে; অনেক ছোট গল্পেরই নায়ক ডেপুটিবাবু। কোনও নবীন ডেপুটিবাবুর বা অন্ততঃ পক্ষে সব্‌ডেপুটির হস্তে কন্যাদান বাঙ্গালী শ্বশুরের সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা। ছেলে ডেপুটি হইলে পিতা কাশীতে মঠ স্থাপিত হইল মনে করেন। এ হেন ডেপুটিগিরি চাকরি গ্রহণ জন্য আহূত হইয়াও বঙ্কিমচন্দ্র লাট সাহেবের সহিত প্রথম-দর্শনদিনে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় গলিয়া যান নাই; লাট সাহেব তাঁহাকে কর্ম লইতে অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন, "পিতার সহিত পরামর্শ করিয়া গ্রহণ করিব কি না পরে জানাইব।" পরে তিনি পিতার আদেশে নিজের ঘোরতর অনিচ্ছা-সত্ত্বে ঐ কর্ম গ্রহণ করেন।[১]

এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের পিতৃভক্তির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। আধুনিক কালের বাঙ্গালী পুত্রগণ বিবাহকালে পণগ্রহণ, যথাসময়ে উপযুক্ত পরিমাণে তত্ত্ব না আসিলে শ্বশুর-শাশুড়ীর সহিত সম্বন্ধচ্ছেদ, কিংবা দ্বিতীয় বা তৃতীয় পক্ষে বিবাহ ইত্যাদি ব্যাপারে কখনও পিতৃভক্তির অভাব দেখান না; বঙ্কিমচন্দ্র যে পিতার আদেশে ডেপুটিগিরির মত চাকরি লইলেন, ইহাতে তাঁহারা অনেকেই হয়ত বিস্মিত হইবেন না। এমন ত্যাগস্বীকারে কয়জন নারাজ? কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের পিতৃভক্তি অতি অসাধারণ ছিল। তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র বঙ্কিমচরিতে এতৎসম্বন্ধে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন; বঙ্কিমচন্দ্রের

---

১। বঙ্কিচন্দ্রের জীবনচরিত, পৃ ৬৬০—৬৬৪।

স্নেহভাজন বান্ধব তারকনাথ বিশ্বাস মহাশয়ও 'ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন' পত্রিকায় এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন।[১] বঙ্কিমচন্দ্র পিতাকে ভয় ও ভক্তি উভয়ই করিতেন। প্রথম বার কর্ম্মস্থলে যাইবার সময় বঙ্কিমচন্দ্র শিশিতে করিয়া পিতা ও মাতার পাদোদক সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি কখনও পিতার সহিত ডাকিয়া কথা বলিতেন না। বঙ্কিমচন্দ্র দেবীচৌধুরাণীতে লিখিয়াছেন "ব্রজ নীরব; বাপের সাক্ষাতে বাইশ বছরের ছেলে হীরার ধার হইলেও সেকালে কথা কইত না—এখন যত বড় মূর্খ, তত বড় লম্বা স্পীচ্ ঝাড়ে"। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও 'সেকালের' সেই হীরার ধার যুবক-পুত্র হইয়াও পিতৃসন্নিধানে নীরব থাকিতেন; পিতার সকল আদেশ অবশ্যপালনীয় বলিয়া জানিতেন, পিতার শয্যাবসনাদি পর্য্যন্ত পবিত্র জ্ঞান করিতেন। তারকবাবু বঙ্কিমের আচরণে একটু বাড়াবাড়ি ছিল বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন। প্রকৃত কথা এই যে, বঙ্কিমের পিতা অত্যন্ত তেজস্বী রাশভারি পুরুষ ছিলেন। তিনি ভগবানের একজন বিশেষ অনুগৃহীত ব্যক্তি বলিয়া তাঁহার আত্মীয়গণ সকলেই বিশ্বাস করিতেন। হয়ত কতকটা সেইজন্য তাঁহার পুত্রগণ তাঁহার সহিত কখনও 'প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে' নীতির অনুসরণ করিয়া চলিতে সাহস করিতেন না; হয়ত যাদবচন্দ্র নিজেও ঐরূপ আচরণ বিসদৃশ বলিয়া মনে করিতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রগণও ঐরূপ ভয়-ভক্তি ও শ্রদ্ধামিশ্রিত ভাবেই পিতার সহিত ব্যবহার করিতেন। ৺অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন, মহর্ষির জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত পিতার সন্নিধানে উপস্থিত হইবার সময় নগ্ন-গাত্রে যাইতে সাহসী হইতেন না, জোব্বা পরিয়া যাইতেন। বঙ্কিম-চন্দ্রের পিতা ডেপুটি কালেক্টরী চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ২২৫ টাকা মাত্র পেনসন পাইতেন। তিনি অত্যন্ত অধিক ব্যয় করিতেন। শুনিয়াছি বঙ্কিমবাবুর ভ্রাতৃগণের মধ্যে কেহ কেহ আয় অপেক্ষা অধিক ব্যয় করিতেন, তজ্জন্য যাদবচন্দ্রকে অনেক সময় তাঁহাদিগের সাহায্য করিতে হইত। এইরূপ নানা কারণেই পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে ঋণজালে আবদ্ধ হইতে এবং বঙ্কিমচন্দ্রকে বহুবার সেই ঋণ পরিশোধ করিতে হইয়াছে। তারকনাথ বিশ্বাস লিখিয়াছেন—

> পণ্ডিত রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়[২] মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে যাদব-বাবুকে গঙ্গাযাত্রা করা হইলে বঙ্কিমবাবু ও পূর্ণবাবু অন্যান্য আত্মীয়গণ সহ সর্বদা তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলেন। একদিন বঙ্কিমবাবু পার্শ্বের ঘরে উপবিষ্ট, এমন সময়ে পিতার দীর্ঘনিঃশ্বাস তাঁহার কর্ণমূলে প্রবেশ করিল, তিনি ছুটিয়া গিয়া বলিলেন, "অমন করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিলেন কেন?" তিনি বলিলেন, "আর কিছু নয় বঙ্কিম, মনের একটা কষ্ট আছে কিন্তু তোমায় বলিতে আর সাহস হয় না।"

১। Dacca Review (১) ১৯১৬ নভেম্বর-ডিসেম্বর। (২) ১৯১৭ জুন।

২ ইনি বঙ্গদর্শনের কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন।

বঙ্কিম। কেন বাবা?

যাদব। তুমি কয়েকবার আমার ঋণশোধ করিয়াছ, কিন্তু কতবার আর বলিব?

বঙ্কিমবাবু অমনি বলিলেন, "সে সব ভাবিবেন না। দেনা আছে আমিও আছি, আপনি এ সময়ের যে চিন্তা তাহাই করুন।"

সেই মৃতপ্রায় মহাপুরুষের মন প্রফুল্ল হইল। তখন তাঁহার দেনা নাকি প্রায় ৪০০০ চার হাজার টাকা। বঙ্কিমবাবু সে সমস্তই পরিশোধ করিয়াছিলেন। এতটা পিতৃভক্তি অধুনা বিরল।"[১]

এইস্থলে বলা আবশ্যক যে যাদবচন্দ্র যে কারণেই হউক নিজে জীবিত থাকিতে পুত্রদিগকে পৃথক্ করিয়া দেন। তখনও নাকি ভ্রাতৃগণের মধ্যে সৌহৃদ্যবন্ধন ছিন্ন হয় নাই, কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম সহোদরের সহিত বঙ্কিমবাবুর মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল।[২] ঐরূপ মনোমালিন্য সত্ত্বেও যে পিতার ঋণভার বঙ্কিমচন্দ্র একা গ্রহণ করেন তাহাতে তাঁহার যথেষ্ট পিতৃভক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। শুনিয়াছি যাদবচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রকে বসতবাটীর অংশ দেন নাই; সঞ্জীববাবু উহা বঙ্কিমচন্দ্রকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তারকবাবু বলেন, সঞ্জীববাবু আপোষে ছাড়িয়া দেওয়ার পর বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে প্রথমে মাসিক ১০০ টাকা দিতেন, শেষে ৫০ টাকা দিতেন।

ডেপুটিগিরি চাকরির প্রতি বঙ্কিমের বিদ্বেষ সম্বন্ধে এইস্থলে দুই-একটি কথা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। চন্দ্রনাথ বসু বঙ্কিমের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, বঙ্কিমের মৃত্যুর পর তিনি প্রদীপ পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধুবৎসলতা সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখেন।[৩] ঐ প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন যে, যখন তিনি (চন্দ্রনাথ) ডেপুটিগিরি চাকরি লইয়া ঢাকায় যান, তখন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "যাইতে চাও যাও, কিন্তু এ চাকরি তুমি করিতে পারিবে না।" তিনি নিজের চাকরি সম্বন্ধে অনেক সময়ে বলিতেন, ঐটাই তাহার জীবনের একটা বড় বিড়ম্বনা।[৪] স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত একদিন আলাপ করিবার সময় প্রসঙ্গক্রমে বঙ্কিমচন্দ্র নিজের স্বাস্থ্যনাশের কতকগুলি কারণের উল্লেখ করেন। তন্মধ্যে একটি কারণ 'চাকরির চাপ'। বঙ্কিম বলেন, "চাকরিতে মানুষ আধমরা হয়।" চাকরিমাত্রের প্রতি ত বঙ্কিমের বিদ্বেষ ছিলই; ডেপুটিগিরির প্রতি তাঁহার

১। Dacca Review ১৯১৬ নবেম্বর-ডিসেম্বর।

২। আনুমানিক ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে।—স.

৩। দ্র. বঙ্কিম-প্রসঙ্গ। বন্ধুবৎসল বঙ্কিমচন্দ্র।—স.

৪। বঙ্কিমের মৃত্যুর পর জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় ১৩০১ সনের জ্যৈষ্ঠের নব্যভারতে লিখিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে একবার বলেন, "আমি বিবেচনা করি চাকুরি আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুতর দুর্ভাগ্য।"

বিশেষ বিদ্বেষ ছিল। রায় সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত লিখিয়াছেন, "একজন বাদ্ধিষ্ণু বংশের ছেলেকে ডেপুটিগিরি করিতে দেখিয়া বঙ্কিম স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, 'কি দুঃখে তোমাদের মত ধনিসন্তান এরূপ চাকরি গ্রহণ করে'?"

কিন্তু বঙ্কিম ডেপুটিগিরির প্রতি বিরক্ত হইলেও বাঙ্গালা সাহিত্য ডেপুটিগণের কাছে চিরঋণী থাকিবে। এক ডেপুটি বাঙ্গালীকে 'কপালকুণ্ডলা', 'আনন্দমঠ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'বিষবৃক্ষ', 'কমলাকান্ত' দিয়াছেন, আর এক ডেপুটি 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র', 'প্রভাস' দিয়াছেন। আর একজন হইতে আমরা 'পদ্মিনী উপাখ্যান' লাভ করিয়াছি। এই সাহিত্যরত্নগুলির কোনটিই কালের অত্যাচারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার নহে। আর এক ডেপুটির 'ধ্রুবতারা' বাঙ্গালা উপন্যাস-গগনে ধ্রুবতারার মতই স্থিরসুষমাময়ী। ডেপুটি দ্বিজেন্দ্রলালকে বাঙ্গালী কতকালে ভুলিবে? প্রাচীন কালের ডেপুটিগণের মধ্যে হরচন্দ্র ঘোষ, এককালে বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত ছিলেন; সুপ্রসিদ্ধ মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও তদীয় জামাতা ও জীবনীলেখক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণও ডেপুটিগিরি করিতেন। ডেপুটি চন্দ্রশেখর কর, পরমেশপ্রসন্ন রায় সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত। উদীয়মান ডেপুটিকুলে কুমার সুরেশচন্দ্র সিংহের নাম উল্লেখযোগ্য। আরও দুই-চারিটি সুপরিচিত ডেপুটি সাহিত্যসেবীর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে, কিন্তু আর বিশেষ আবশ্যকতা আছে মনে হয় না।[১]

---

১। গ্রন্থকার এখানে কয়েকজন ডেপুটি লেখকের নাম করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস'-লেখক নবীনচন্দ্র সেন। 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-লেখক রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। 'ধ্রুবতারা'-লেখক যতীন্দ্রমোহন সিংহের নাম বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত। যতীন্দ্রমোহন সিংহ 'উড়িষ্যার চিত্র' 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা' ছাড়াও তোড়া, সন্ধি, সাকার ও নিরাকার-তত্ত্ব বিচার, অনুপমা, গল্পমালা, তপস্যা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি শশধর তর্কচূড়ামণির শিষ্য ছিলেন। ইঁহার পূর্বনিবাস ছিল নদীয়ায়। অবসর গ্রহণের পর ফরিদপুরে বসবাস করেন। ১৩৪৪-এ ইঁহার মৃত্যু হয়।

প্রাচীনকালের ডেপুটিগণের মধ্যে হরচন্দ্র ঘোষ, মদনমোহন তর্কালঙ্কার এবং যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের জীবনী সাহিত্য-সাধক-চরিতমালায় পাওয়া যাইবে।

চন্দ্রশেখর কর (১৮৬১—?) যশোহর জেলার মির্জাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১২৯০ বঙ্গাব্দে বি. এ. পাশ করিয়া ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। সাহিত্য, নব্যভারত প্রভৃতি পত্রিকায় লিখিতেন। তাঁহার কয়েকটি উপন্যাসের নাম হৈমবতী, সুরবালা, সংকল্প, পাপের পরিণাম, অনাথ বালক। তাঁহার একটি গ্রন্থের সমালোচনা করেন ৺কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর (১৩১৭)।

পরমেশপ্রসন্ন রায়ের বই পঞ্চামৃত। তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। অবসর লইয়া ঢাকা শহরে পুরানো পল্টনে বাড়ি করেন 'পরম-ভবন'। তাঁহার পুত্র অর্থনীতির অধ্যাপক পরিমল রায়ের 'ইদানীং' বইখানি সুপরিচিত। পরমেশপ্রসন্নের মৃত্যু হয় ১৯২৬/১৯২৭-এ।

সুরেশচন্দ্র সিংহ (জন্ম বাংলা সন ১০ই বৈশাখ ১২৮৮, মৃত্যু ইংরেজী অব্দ ২৬ ডিসেম্বর ১৯৫৩) ময়মনসিংহের সুসঙ্গ রাজপরিবারের। এই বংশে তিনিই প্রথম সরকারী চাকরী গ্রহণ করেন এবং ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে ম্যাজিস্ট্রেট হন। ঢাকা কলেজে সুরেশচন্দ্র হরিনাথ দের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ছিলেন তাঁহার সহপাঠী। সুরেশচন্দ্র সৌরভ, প্রতিভা, ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনী, শৈলজাদেবী ছদ্মনামে ভারত-

বঙ্কিমচন্দ্রের ডেপুটিলীলার প্রথমক্ষেত্র যশোহর। এইখানে তিনি প্রায় দুই বৎসর ছিলেন। এইখানেই কবিবর দীনবন্ধুর সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ ও আলাপ-পরিচয় হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বয়সের বন্ধুগণের মধ্যে দীনবন্ধু ও জগদীশনাথ রায় অন্তরতম ছিলেন। দীনবন্ধু পোস্টাল বিভাগে চাকরি করিতেন। তিনি পরিহাসরসিক ও সদানন্দ পুরুষ ছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে দীনবন্ধু ও বঙ্কিম উভয়ে ঈশ্বর গুপ্ত-সম্পাদিত পত্রিকান্তরে কাব্যের প্রতিযোগিতা করিতেন। তখন মৌখিক আলাপ ছিল না। এখন মৌখিক আলাপ হইবামাত্র উভয়ে গাঢ় বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। দীনবন্ধুর দ্বিতীয় নাটক 'নবীন তপস্বিনী' বঙ্কিমচন্দ্রের নামে উৎসৃষ্ট হইয়াছিল, বঙ্কিমও স্বরচিত মৃণালিনী তাঁহাকে উৎসর্গ করেন।[1] এই দুই বন্ধুর মধ্যে বন্ধুতা অতি অপূর্ব ধরনের ছিল। কখনও কেবল উভয়ে দুইটি গুড়গুড়ি লইয়া ধূমপান করিতেন এবং পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। এইরূপ ভাবে বহুক্ষণও কাটিয়া যাইত।[2] বলা বাহুল্য, কখনও কখনও উভয়ের হাস্যালাপ কিঞ্চিৎ উদ্দাম ভাবও ধারণ করিত।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ উপন্যাস 'কাব্যপ্রিয় পণ্ডিতাগ্রগণ্য জগদীশনাথ রায় সহৃদয়বরকে' 'স্নেহের চিহ্নস্বরূপ অর্পিত' হইয়াছে। ললিতচন্দ্র লিখিয়াছেন, "অনেকেই হয়ত জানে না যে, এই জগদীশবাবুই বিষবৃক্ষের হরদেব ঘোষালে কল্পিত হইয়াছেন। নগেন্দ্র ও হরদেব ঘোষালের ন্যায় বঙ্কিমবাবু ও জগদীশবাবুর চিঠিপত্র চলিত।" শ্রীযুক্ত তারকনাথ বিশ্বাসও লিখিয়াছেন, "অনেকে বলেন বিষবৃক্ষের নগেন্দ্রনাথ স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র, হরদেব ঘোষাল তাঁহার প্রিয়বন্ধু স্বর্গীয় জগদীশচন্দ্র (নাথ) রায়; অধিক কি, হরদেব ঘোষালের যে পত্র দুইখানি বিষবৃক্ষে ছাপা হইয়াছে, তাহা জগদীশবাবু কর্তৃক বঙ্কিমচন্দ্রকে লিখিত হয়। তবে কি বুঝিতে হইবে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের একটা পদস্খলন হইয়াছিল, স্বভাবকবি-ভাবময় বঙ্কিম ভাবের ঘোরে আত্মহারা হইয়াছিলেন।"[3] সে যাহা হউক, শচীশচন্দ্র-প্রদত্ত বিবরণমতে জগদীশনাথের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম পরিচয় ১৮৬০ খৃস্টাব্দে তমোলুকে তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বৈঠকখানায় হয়। জগদীশনাথ তথায় সল্ট বা পুলিশের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টরূপে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম পুলিশের

---

মহিলা প্রভৃতি পত্রিকায় গল্প ও কবিতা লিখিতেন। তাঁহার ছোট-গল্পগুলি মৃগনাভি (১৯১৫ খ্রী) [illegible] (১৩১৬ বঙ্গাব্দ) পরাগ (১৩২৭ বঙ্গাব্দ), [illegible] (১৩৩০ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থগুলিতে সঙ্কলিত হইয়াছে। তাঁহার কবিতা-সঙ্কলন নাই। ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে সুরেশচন্দ্র শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার সর্বশেষ গ্রন্থ বিশুদ্ধানন্দ-পরিচয় গ্রন্থকারের মৃত্যুর পর পুত্র শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

১। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠখানিও দীনবন্ধুর স্মৃতিতে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।—স.

২। ললিতচন্দ্র মিত্র-লিখিত 'বঙ্কিমবাবু' শীর্ষক প্রবন্ধ। নারায়ণ, বৈশাখ, ১৩২২।

৩। Dacca Review জুন, ১৯১৭।

ডিস্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হন। বঙ্কিমের জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্যামাচরণ এই সময়ে তমোলুকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। জগদীশ ও দীনবন্ধু উভয়েই বঙ্কিমচন্দ্র হইতে বয়সে কিছু বড় হইলেও তিন জনে সহোদরাধিক প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। দীনবন্ধুর মৃত্যুর পর যেদিন বঙ্কিম প্রথম তাঁহাদের বাটীতে যান, সেদিন তিনি দীনবন্ধুর এক বালিকা কন্যাকে "ক্রোড়ে করিয়া শিশুর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছিলেন।" তৎপূর্বে বঙ্কিম বঙ্গদর্শনের বিদায় প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন, "তাহার (দীনবন্ধুর) জন্য তখন বঙ্গসমাজ রোদন করিতেছিল, কিন্তু এই বঙ্গদর্শনে আমি তাঁহার নামোল্লেখ করি নাই; কেন তাহা কেহ বুঝে না। আমার যে দুঃখ কে তাহার ভাগী হইবে? কাহার কাছে দীনবন্ধুর জন্য কাঁদিলে প্রাণ জুড়াইবে? অন্যের কাছে দীনবন্ধু সুলেখক, আমার কাছে প্রাণতুল্য বন্ধু।"

বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য বন্ধুগণের মধ্যে অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও চন্দ্রনাথ বসুর নাম উল্লেখযোগ্য। স্বর্গীয় সুবিজ্ঞ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কেও তিনি খুব আদর ও শ্রদ্ধা করিতেন: এবং সীতারাম উপন্যাস 'সকলশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, সকল গুণের আধার, সকলের প্রিয়, আমার বিশেষ স্নেহের পাত্র' রাজকৃষ্ণ বাবুর নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। রাজকৃষ্ণের অকাল মৃত্যুতে বঙ্কিম অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বয়সে বঙ্কিম অপেক্ষা অনেক ছোট; তিনিও তাঁহার অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় ও চন্দ্রনাথ বসুর সহিত আলাপ বঙ্গদর্শন প্রকাশের পরে হয়। অক্ষয়বাবুর সহিত আলাপ তৎপূর্বে। পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন, কবিবর হেমচন্দ্র, বঙ্কিমের সহাধ্যায়ী বলাইচাঁদ দত্ত, খিদিরপুরের জমিদার যোগেশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি আরও কয়েকজন অনেকদিনই বঙ্কিমের কলিকাতার বৈঠকখানার শোভাবর্দ্ধন করিতেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত আলাপের সূচনার এক অতি মনোজ্ঞ বিবরণ অক্ষয়বাবু বঙ্গবাসী আফিস হইতে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক' নামক পুস্তকের 'পিতাপুত্র' প্রবন্ধে দিয়াছেন। তাহা হইতে কিয়দংশ এইস্থলে উদ্ধৃত হইল। ইহা হইতে বঙ্কিমের চরিত্রের আর একটি বিশেষত্ব উপলব্ধি করা যাইবে।

বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে কিছুদিন একশ্রেণীতে আইন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালে তাঁহাদের পরস্পর আলাপ-পরিচয় হয় নাই। বঙ্কিম তখন কয়েক বৎসর ডেপুটিগিরি কার্য করিয়াছেন, তাঁহার দুর্গেশ-নন্দিনী, কপালকুণ্ডলা প্রকাশিত হইয়াছে; অক্ষয়চন্দ্র সবেমাত্র বি. এ. পাশ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র, পূর্বে যেখানে সিটি কলেজ ছিল তাহার পশ্চিমদিকে অবস্থিত, নিজ তেতালা বাসাবাটী হইতে আরদালিকে দিয়া ছাতা ধরাইয়া গোল-দীঘির ধার দিয়া কলেজে আসিতেন।

সুন্দর সুশ্রী গঠন, পাতলা পাতলা দেহ, উন্নত নাসিকা, উজ্জ্বল চক্ষু, ঠোঁটের আশে পাশে একটু একটু হাসি আছে। কিন্তু সেই হাসির সঙ্গে আছে প্রবল

গরিমা-জ্ঞান। আসেন, একপার্শ্বে বসেন, চুপ করিয়া থাকেন, কাহারও সহিত কথা কহেন না। তাৎকালিক সংস্কৃতাধ্যাপক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মহাশয়। তিনিও ঐ তৃতীয় শ্রেণীতে আইন শিক্ষা করেন। অধ্যাপক বলিয়া সাহেব শিক্ষক উঠিয়া গেলে তাঁহার অনুরোধে আমাদের রেজেস্টরী লইতেন। কৃষ্ণকমল বাবু প্রথম নামটি ধরিয়াছেন কি বঙ্কিমবাবু অমনি উঠিলেন,—তাঁহার কাণের কাছে গিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "আমাকে উপস্থিত লিখে লইবেন মহাশয়!" কৃষ্ণকমল বলিলেন, "আচ্ছা"। অমনি বঙ্কিমচন্দ্র গোলদীঘীর ধার দিয়া, ছাতা ধরাইয়া সটানে সমানে চলিয়া গেলেন। আমাদের কাহারও সহিত তখন বঙ্কিমের পরিচয় হয় নাই।[১]

৬০।৬১ সালে পিতা[২] যখন জাহানাবাদে মুন্সেফ বঙ্কিমবাবুর মেজদাদা সঞ্জীবচন্দ্র তখন জাহানাবাদে সবরেজিস্ট্রার হইয়া গেলেন। সেই অবধি তাঁহাদের দুই জনে বন্ধুত্ব হয়। বঙ্কিমবাবু বহরমপুর যাইতেছেন বলিয়া সঞ্জীববাবু পিতাকে পত্র লিখেন আমাদের বাসায় উঠিবেন বলিয়া জানাইয়া রাখেন এবং কাছারীর নিকট বঙ্কিমবাবুর জন্য একটি বাড়ী ভাড়া করিবার জন্য অনুরোধ করেন। আমি অবশ্য পাচটা বাড়ী দেখিয়া শুনিয়া একটি বাড়ী ঠিক করিয়া ঝাড়াইয়া-ঝুড়াইয়া রাখিলাম; জল তুলাইয়া রাখিলাম, একটা ঠিকা চাকরও রাখিয়া দিলাম। পূর্বেই বলিয়াছি বঙ্কিমবাবুর কপালকুণ্ডলা পড়িয়া আমি কাব্যের গুণপণায় মুগ্ধ হইয়াছিলাম, সুতরাং কেবল আতিথ্যের খাতিরে নহে, প্রকৃত ভক্তিভরে, আনন্দসহকারে এই সকল কার্য করিয়াছিলাম। যথাকালে বঙ্কিমবাবু আসিলেন, আহারাদি করিলেন, শুনিলেন যে, আমি গৃহ-বাসী গঙ্গাচরণবাবুর পুত্র, বি-এল্ পাশ করিয়া বহরমপুরে ওকালতি করিতে আসিয়াছি। আহারের পর বিশ্রাম করিলেন; বিশ্রামের পর বৈকালে আমরা পিতাপুত্রে গাড়ী করিয়া তাঁহাকে তাঁহার বাড়ী দেখাইতে লইয়া গেলাম। বাড়ী দেখিলেন, পছন্দ করিলেন, ঠিকা চাকর তিনখানা কেদারা বাহির করিয়া দিল, আমরা তিন জনে ক্ষণেক বসিয়া রহিলাম, বাসায় সকলে ফিরিয়া আসিলাম, বঙ্কিমবাবু সে রাত্রি আমাদের বাসাতেই যাপন করিলেন। পিতার সহিত কথাবার্তা চলিল। পরদিন প্রাতে তাহার জিনিসপত্র, চাকর-ব্রাহ্মণ লইয়া, গাড়ী করিয়া তিনি নিজ বাসায় গেলেন, আমি গাড়ী করিয়া দিলাম, গাড়ীতে তুলিয়া দিলাম; হায়রে হায়! তখনকার কথা মনে পড়িলে,

১। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'পিতাপুত্র' পড়িয়া বিপিনবিহারী গুপ্ত ভ্রমবশতঃ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসা করেন যে বঙ্কিম কৃষ্ণকমলের নিকট আইন পড়িয়াছিলেন কিনা। কৃষ্ণকমল বলেন ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি আইন-শ্রেণীতে বঙ্কিমের সহপাঠী ছিলেন। পুরাতন-প্রসঙ্গ; ১৩৭৩ সং, পৃঃ ৪১। —স.

২। রায় গঙ্গাচরণ সরকার বাহাদুর। তিনি একজন সুকবি ছিলেন।

এখনও বুক ফাটে। এ পর্যন্ত বঙ্কিমবাবু আমার সহিত একটি কথাও কহিলেন না, অধীনের প্রতি কপালকুণ্ডলাকারের করুণাকটাক্ষ হইল না। ... ..

কাছারীর ফেরতা পিতাপুত্র দুই জনে বঙ্কিমবাবুর সুবিধা, অসুবিধা কতদূর হইতেছে দেখিবার জন্য, বঙ্কিমবাবুর বাসায় তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। বঙ্কিমবাবু 'আসুন' বলিয়া পিতাকে সম্বর্ধনা করিলেন। এবার মনে হইল, পিতাকে আসুনের সম্বোধনে, ব্রাকেটের মধ্যে আমিও যেন আছি। আমার নিযুক্ত সেই চাকর সেইরূপ তিনখানি চেয়ার বাহির করিয়া দিল; বঙ্কিমবাবুর আদেশ মত পিতাকে তামাক দিল, আমরা তিন জনে বসিয়া রহিলাম। পিতার সহিত বঙ্কিমবাবুর কথোপকথন হইতে লাগিল। আমি জলে তিনে দুই-এক কথার টোপ ফেলিতে লাগিলাম। বঙ্কিমবাবু কিন্তু টোপ খাইলেন না। .....

এইরূপে দিন যায়। বঙ্কিমবাবু নিজেই বলিয়াছেন, দিন কাহারও জন্য বসিয়া থাকে না।[1] আমার দিন আটকাইয়া রহিল না। যতদিন পিতা বহরমপুরে ছিলেন, ততদিন বঙ্কিমবাবু মাঝে মাঝে এক একবার আসিতেন, পিতার সহিত গল্প গুজোব করিয়া চলিয়া যাইতেন। তাহার পর পিতাদেব চলিয়া গেলেন। আমি একা বাসায় রহিলাম। বঙ্কিমবাবু আর আসেন না। আমিও অবশ্য যাই না।

কিসের একটা ৪।৫ দিনের ছুটি হইল। বঙ্কিমবাবুও বাড়ী আসিবেন, আমিও বাড়ী আসিব।[2] নলহাটিতে আমরা দুইজনে দেখা সাক্ষাৎ। সাত সাত ঘণ্টাকাল, নলহাটীতে বিশ্রাম বা কষ্টভোগ করিতে হইবে, তাহার পর হয়ত ইস্ট ইণ্ডিয়ান গাড়ী আসিবে, নয়ত দুই ঘণ্টা বিলম্বে আসিতে পারে। সেকেণ্ড ক্লাসের বিশ্রাম ঘরে বসিয়া বঙ্কিমবাবু ও আমি। দিন যায় ত ক্ষণ যায় না। বহুদিন গিয়াছে, কিন্তু এবার বঙ্কিমবাবু ক্ষণ কাটাইতে পারিলেন না। শুভক্ষণে, অতি শুভক্ষণে বঙ্কিমবাবু কথা কহিতে লাগিলেন।

অক্ষয়বাবু এইরূপ বিবরণ দিতে গিয়া বলিয়াছেন, তাৎকালিক বঙ্কিমচরিত্র চিত্রিত করিতে গিয়া তাঁহার অহঙ্কারের কথা না বলা ঘোরতর বিড়ম্বনা। এই অহঙ্কার সম্বন্ধে অন্যান্য লেখকও নানা কথা বলিয়াছেন। স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়স যখন ১৬।১৭ বৎসর হইবে তখন (১৮৭৪ খৃঃ) বঙ্কিমচন্দ্র বারাসাতে ছিলেন। সেই সময়ে একদিন একটা মোকদ্দমার বিচার দেখিতে চণ্ডীবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের এজলাসে গিয়াছিলেন। তৎপ্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন[3]—

১। সম্ভবতঃ অক্ষয়চন্দ্র এখানে দুর্গেশনন্দিনী, দ্বিতীয় খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদের প্রথমাংশ লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলিতেছেন।

২। বঙ্কিমবাবুর বাড়ী নৈহাটি-কাঁটালপাড়ায়, অক্ষয়বাবুর বাড়ী চুঁচুড়ায়। গঙ্গার এপার ওপার।

৩ বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, 'বঙ্কিমস্মৃতি' পৃ ৯৯। —স.

সেই যে বিচারক বঙ্কিমচন্দ্রকে নয়ন ভরিয়া দেখিয়া আসিয়াছিলাম, সৌন্দর্যের তেমন বিজলী লীলা আর কখন কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। কলিকাতার সিংহ-সৌন্দর্য ও চুঁচুড়ার ভূদেবরূপ দেখিয়াছি; তাহা মানবীয় সাধারণ সৌন্দর্য বলিয়াই মনে হয়। জন-সমাজের নেতৃস্থানীয় কেশবের সৌন্দর্য দেখিয়াছি, তাহা প্রতিভার পরাক্রম-পুষ্ট, হৃদয়-মন-মাতান সৌন্দর্য সন্দেহ নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সে স্থির গম্ভীর সৌন্দর্যরাশিও বিরল বটে, তদীয় কনিষ্ঠপুত্র রবীন্দ্রনাথও সুপুরুষ, কিন্তু যেন মনে হয় মেয়েলী ঢং-এর রূপরাশি তাঁর চারিদিক আলো করে। কিন্তু বঙ্কিমের সে সিংহ-বিক্রম-মণ্ডিত পৌরুষ-ভাবময় সৌন্দর্য আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সে রূপের দেমাক্ বড়ই স্বাভাবিক। বঙ্কিমচন্দ্র যে ভয়ানক দেমাকে ছিলেন বলিয়া শুনিতে পাই, সে অহঙ্কারের কিয়দংশ তাঁহার পুরুষোচিত সর্বাঙ্গ-সুন্দর দেহের অহঙ্কার।

বঙ্কিমবাবু প্রথম বয়সে কিঞ্চিৎ গর্বিত ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। প্রথম বয়সে কেবল বঙ্কিমবাবুর নহে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণেরও অহঙ্কারের অপবাদ ছিল। গর্বিত হইলেও বঙ্কিম দাম্ভিক ছিলেন না। তিনি যে তাঁহার চারিদিকের জনসাধারণ হইতে বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভাবলে কতদূর উন্নত তাহা তিনি জানিতেন। এই আত্মগরিমা-জ্ঞানের সঙ্গে তাঁহার মেজাজের স্বাভাবিক রুক্ষতাও কিঞ্চিৎ মিশ্রিত হইয়া থাকিবে। তিনি সহজেই চটিয়া যাইতেন। শচীশচন্দ্র তদ্বিষয়ে দুই-একটি উদাহরণ দিয়াছেন। যে কারণেই হউক প্রথম বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র সর্বসাধারণের অভিগম্য ছিলেন না, কিন্তু ইহাও সত্য যে, তিনি গুণের আদর করিতে কখনই পরাঙ্মুখ হইতেন না। তিনি সকলের সহিত বন্ধুত্ব করিতেন না; যার-তার সঙ্গে প্রথম দর্শনেই বন্ধুত্ব তাঁহার ছিল না। তিনি ধীরে ধীরে বন্ধু অর্জন করিতেন বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু একবার অর্জন করিলে বন্ধুতা কিরূপে আজীবন রক্ষা করিতে হয় তাহা জানিতেন। শেষবয়সে তাঁহার চরিত্রের পরুষতা কমিয়া গিয়াছিল। সাহিত্যিকগণ অনেকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তদীয় আচরণে পরিতৃপ্ত হইয়া আসিয়াছে। বঙ্কিমের দেমাকের অপবাদ সম্বন্ধে যে চণ্ডীবাবুর কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তিনিই লিখিয়াছেন, "উত্তরকালে তাঁহার নিকট (অন্যদায় সাহায্য ব্যতিরেকে) পরিচিত হওয়ার সময়ে বা তৎপরে কখনও অহঙ্কারের পরিচয় পাই নাই।" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতি বহু ব্যক্তি সাহিত্যিকগণের সহিত বঙ্কিমের অমায়িকতা সম্বন্ধে নানাকথা লিখিয়াছেন। ৺ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় বার্ধক্যে বঙ্কিমের বিনয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বঙ্কিমের মৃত্যুর পরে জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় লিখিয়াছিলেন যে, তিনি বঙ্গবাসী ও নব্যভারতে বঙ্কিমের কতকগুলি মত সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা করিয়াও তাঁহার 'স্নেহ ও অনুগ্রহ' হইতে বঞ্চিত হন নাই।[১]

১। নব্য ভারত, জ্যৈষ্ঠ—১৩০১।

বঙ্কিমচন্দ্রের অহঙ্কার সম্বন্ধে অনেক কথা অনেক সময়ে অতিরঞ্জিত হইয়াও প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার সৌজন্যও যে কত অধিক ছিল, তাহা অনেকেই জানে না। সেইজন্য কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের সহিত বঙ্কিমের পরিচয়ের বিবরণ কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইলেও এস্থলে উদ্ধৃত করা উচিত বোধ করিতেছি। নবীনচন্দ্র লিখিতেছেন[১]—

নৌকা নৈহাটীর ঘাটে পৌছিল, এবং আমরা (নবীনচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্র সরকার) বঙ্কিমবাবুর বাড়ীর দিকে চলিলাম। রেলের লাইন পার হইবামাত্র সঞ্জীববাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ······ তিনি আমাকে দক্ষিণ হস্তে আদরে জড়াইয়া একটি ঘরে লইলেন, এবং ফরাস বিছানায় বসাইয়া বঙ্কিমবাবুকে খবর দিলেন। শুনিলাম সেটি বঙ্কিমবাবুর বৈঠকখানা। একটি শিবালয়ের সঙ্গে লাগান একটি হল এবং তাহার অপর পার্শ্বে দুটি কক্ষ। হলের চারিদিকে প্রাচীরের কাছে কাছে দুই চারিখানি কৌচ ও কুসনওয়ালা চেয়ার ফরাস বিছানার উপর ছিল। প্রাচীরের গায়ে কয়েকখানি ছবি এবং হলের এক কোণায় একটি হারমোনিয়াম। আমি কক্ষের সজ্জা দেখিতে দেখিতে সঞ্জীববাবুর সঙ্গে কথা কহিতেছিলাম। অক্ষয়বাবু পার্শ্বে বসিয়া ছিলেন। অকস্মাৎ পশ্চাৎ হইতে কে আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিল। আমি চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া—দেখিলাম এক একহারা গৌরবর্ণ পুরুষ। মাথায় কুঞ্চিত ও সজ্জিত কেশ, চক্ষু দুটি নাতিক্ষুদ্র নাতিবৃহৎ, কিন্তু সমুজ্জ্বল; নাসিকা উন্নত, অধরোষ্ঠ ক্ষুদ্র ও রহস্যব্যঞ্জক ঈষৎ হাসিযুক্ত; তাহার উপর দুই প্রকাণ্ড গোঁফের তাড়া,—অগ্রভাগ কুঞ্চিত। দীর্ঘ বঙ্কিম গ্রীবা, মুখও ঈষৎ দীর্ঘ ও সুগঠিত। অঙ্গে বাহু পর্যন্ত একটি সামান্য পিরান এবং পরিধান নয়নসুকের ধুতি। দেখিবামাত্রই মূর্তিখানি সুন্দর, সতেজ, ও প্রতিভান্বিত বোধ হয়। সঞ্জীববাবু হাসিয়া বলিলেন, "বলুন দেখি লোকটি কে?" আমি ঈষৎ হাসিয়া উঠিয়া প্রণাম করিতে যাইতেছিলাম তিনি আমাকে নমস্কার করিতে অবসর না দিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিলেন, এবং হাসিয়া বলিলেন, "সত্য সত্যই বলুন দেখি আমি কে? আমি হাসিয়া বলিলাম, "বঙ্কিমবাবু।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আমাকে কিরূপে চিনিলেন? আমি উত্তর করিলাম, "শিকারি বিড়ালের গোঁফ দেখিলেই চেনা যায়।" সকলে হাসিয়া উঠিলেন, এবং বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "বটে! আমার গোঁফের উপরই আপনার প্রথম নজর পড়িয়াছে?" আমি বলিলাম, "পড়িবার কথা নয় কি?" আবার—সকলে হাসিলেন, এবং সঞ্জীববাবু বলিলেন, "দেখা যাক্ কার জিত হয়।" তখন বঙ্কিমবাবু বলিলেন', "ছোকরাদেরই চিরকাল জিত হইয়া থাকে। সত্য সত্যই আপনি যে এত ছেলেমানুষ, আপনার লেখা দেখিয়া ও পত্র পড়িয়া

১। 'আমার জীবন' ২য় ভাগ।

মনে করি নাই।" সঞ্জীববাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি ইঁহার কবিতা পড়িয়াছেন ; ইংরাজী পত্র দেখেন নাই। আমি এমন সুন্দর ইংরাজী অতি অল্প বাঙ্গালীরই দেখিয়াছি। আমি অক্ষয়বাবুর দিকে চাহিয়া বলিলাম, "দাদা শুনিলেন কি ? এঁর মুখে আমার ইংরাজীর প্রশংসা ! তাঁর সাক্ষাতে আমি কলমটি ধরিবারও যোগ্য নহি।" অক্ষয়বাবুকে দাদা ডাকিতে শুনিয়া বঙ্কিমবাবু হাসিয়া বলিলেন, "বটে ! অক্ষয় আপনার দাদা ? অক্ষয় আমার নাতি, এবং অসাধারণী আমার নাত বৌ। অতএব তুমিও আমার নাতি। এত ছেলেমানুষকে আর আপনি বলা যায় না।" অক্ষয়বাবুর কাগজের নাম সাধারণী তাই বঙ্কিমবাবু তাঁহার স্ত্রীর নাম রাখিয়াছিলেন 'অসাধারণী।' ইহার পর অনেক গল্প চলিল।······বঙ্কিমবাবু আমার পড়া শুনিতে চাহিলেন, আমি তাঁহার পড়া শুনিতে চাহিলাম। উভয়ের গ্রন্থাবলী আসিয়া উপস্থিত হইল। জিদ করিয়া প্রথম আমার একটি কবিতা পড়াইলেন, এবং পড়ার সকলেই প্রশংসা করিলেন। তাহার পর তিনি কি পড়িবেন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। অক্ষয়বাবু আমাকে আগেই শিখাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমি বলিলাম, "বিষবৃক্ষ"। তিনি—"কোন স্থান পড়িব ?" আমি—"যে স্থান আপনার অভিরুচি।" তিনি 'বিষবৃক্ষ' খুলিয়া যে স্থানে কমলমণির কাছে সূর্য্যমুখী তাঁহার পতিপ্রাণতা দেখাইয়া পত্র লিখিয়াছেন, সেইস্থান পড়িতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, এবং বলিলেন, "বিষবৃক্ষ আমি পড়িতে পারি না। তুমি অন্য কিছু শুনিতে চাও ত পড়ি।"

তাহার পর আমরা বাড়ীর ভিতর উপরের বারাণ্ডায় গিয়া খাইতে বসিলাম। বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "বামন বাড়ীর রান্না মাছ মাংস তুমি খাইতে পারিবে না, নিরামিষ তরকারী যাহা আছে তাহাতে দুই এক গ্রাস খাইতে পার কি না দেখ।" আমি তাহার প্রতিবাদ করিলাম। কিন্তু মাংস একটু মুখে দিয়াই বুঝিলাম যে বাঙ্গালা পুস্তকের সমালোচনার মত তাঁহার এ সমালোচনাও 'বঙ্গদর্শনের' উপযুক্ত। মাংসে পেঁয়াজ মসলা কিছুই নাই। যেন খালি খানিকটা জলে সিদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। আমি তথাপি শিষ্টাচারের অনুরোধ বলিলাম, "কেন মাংস ত বেশ হইয়াছে ?" তিনি বলিলেন, "তোমার ঠানদিদির খোসামুদি করিবার প্রয়োজন নাই। আমি পূর্ববঙ্গের স্ত্রীলোকদের রান্না খাইয়াছি। আমাদের এ অঞ্চলের স্ত্রীলোকেরা মাছমাংস তেমন রাঁধিতে পারে না।" খাওয়ার পর বৈঠকখানায় আসিয়া তিনি অনেকরাত্রি পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে গল্প করিলেন, এবং আমাদিগকে শোয়াইয়া নিজে শুইতে গেলেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের উপর বঙ্কিমচন্দ্র কিছু রুষ্ট হইয়াছিলেন। তৎপ্রসঙ্গে নবীনচন্দ্র বলিয়াছেন—

শিবনাথ শাস্ত্রী আপনার 'সুন্দরী সুন্দর' কবিতাটির অনুকরণে একটি বিদ্রূপাত্মক কবিতা লিখিয়াছিল বলিয়া কি তাঁহার প্রতি এই ক্রোধ উচিত? তিনি বলিলেন, "বিদ্রূপের জন্য নহে! সে উহা maliciously (অসরল ভাবে) করিয়াছিল।" অক্ষয়বাবু বলিলেন, "চাটুয্যেদের অহঙ্কার দেশে একটা প্রবাদের মত দাঁড়াইয়াছে।" আমিও হাসিতে হাসিতে বর্দ্ধমানে সঞ্জীববাবুর সম্বন্ধে সে ধারণার কথা বলিলাম। বঙ্কিমবাবু বলিলেন—"নবীন! কথাটা ঠিক। এই অহঙ্কারটুক না থাকিলে মরিয়া যাইতাম। দুইটা গল্প শুন। বহরমপুরে বদলি হইয়া গেলাম। একে ত রোডসেস্ ইত্যাদি একরাশি কাযের ভার কালেক্টার বেটা জিদ করিয়া বঙ্গদর্শন ও আমার লেখা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে maliciously আমার ঘাড়ে চাপাইল। তাহাতে দর্শকের জালায় অস্থির হইলাম। যে আসে সে যে হুকা লইয়া বসে, আর উঠে না। আমি দেখিলাম আমার লেখাপড়া বন্ধ হইল। তখন আমার গৃহদ্বারে এক নোটিশ দিলাম যে, কেহ আমার সাক্ষাৎ পাইবেন না। তার পর দিন হইতে সমস্ত বহরমপুর রাষ্ট্র হইল—'বটে! বেটার এমন দেমাক! থাক্, তার বাড়ীর আশে পাশে কেহ যাইব না।' আমিও নিশ্চিন্ত হইলাম। দ্বিতীয় গল্পটি এইরূপ। এক গুলির আড্ডায় আমার উপন্যাসের সমালোচনা হইতেছিল। এক গুলিখোর বলিল, "বঙ্কিমটা নিশ্চয় গুলিখোর। তাহা না হইলে বাবা এমন রসিকতা কি তার কলম হইতে বাহির হয়?" সকলেই হাসিলাম। বুঝিলাম এই শেষ গল্পটা অক্ষয়বাবুর উপকারার্থ। অক্ষয়বাবু বলিলেন—"আমি গুলিখোর হই, আর যা হই, কিন্তু আপনাদের দেমাকে দেশটা যে টলটলায়মান, তাহা আমি একশবার বলিব।"

এবার কি ইহার পরের বার সাক্ষাতে, ঠিক স্মরণ নাই, অহঙ্কারের একটা ঘটনা আমার সাক্ষাতে ঘটিয়াছিল। আমরা প্রাতে বসিয়া আছি; একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গঙ্গাস্নান করিয়া নামাবলি গায়ে তাঁহার বৈঠকখানায় আসিলেন। তিনি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বসিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণ বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে একটা চরের বন্দোবস্তের ভার তাঁহার হাতে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। অমনি যেন শিমুলস্তূপে অগ্নি পড়িল। তিনি ফরশির নলটি মুখ হইতে নামাইয়া বলিলেন, "বটে! তুমি এজন্য আসিয়াছ? বের হও।" ব্রাহ্মণ অপ্রতিভ ও অপমানিত হইয়া আমার দিকে কাতরভাবে চাহিয়া চলিয়া গেলেন। বঙ্কিমবাবু তখন তামাক খাইতে খাইতে আমাকে বলিলেন, "দেখিলে তামাসা?" আমি বলিলাম, "কাহার? আপনার না ব্রাহ্মণটির?" তিনি বলিলেন, "আমার কেন? ভদ্রলোক আসিল, আত্মীয় বলিয়া আমি অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলাম। তার পর ব্যবহারটা

দেখিলে? সে কেন অফিসের কথা ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল?" আমি বলিলাম, "তাহার জন্য তাহাকে এই অকথ্য অপমান না করিয়া মিষ্টভাবে বলিলেই হইত—'আপনি অফিসে গিয়া তাহার খবর লইবেন'।" তিনি বলিলেন,, "তুমি ছেলেমানুষ, জান না; এরূপ লোকের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার না করিলে, বাড়ীর কাছে হুগলীতে আমার কাজ করা চলিবে না।"

বঙ্কিমচন্দ্রের কৈফিয়ৎ যে যথেষ্ট নয় তাহা বোধ হয় অনেকেরই মনে হইবে। বস্তুতঃ বঙ্কিমের চরিত্রে স্বভাবতঃ কিছু যে রুক্ষতা ও অমর্ষণতা ছিল তাহা অস্বীকার করিবার জো নাই। কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্র উক্ত ব্রাহ্মণটিকে প্রণাম করিয়া আসন দিতে ত্রুটি করেন নাই। সেই জন্যই বলা হইয়াছে যে, বঙ্কিমের চরিত্রে গর্ব থাকিলেও দাম্ভিকতা ছিল না। আর গুণবানের সহিত ব্যবহার করিবার সময় তিনি যে কিরূপ জল হইয়া যাইতেন, তাহা ত নবীনচন্দ্রের সহিত ব্যবহারের বিবরণ হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে কবি কালিদাস দিলীপ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

ভীমকান্তৈর্নৃপগুণৈঃ স বভূবোপজীবিনাম্।
অধৃষ্যশ্চাভিগম্যশ্চ যাদোরত্নৈরিবার্ণবঃ॥

বঙ্কিম সম্বন্ধেও ঐরূপ বলা চলে। তিনি স্থলবিশেষে যেমন কঠোর হইতেন, আবার তেমনই যথাস্থলে কোমল হইতে জানিতেন। যাহা হউক কবিবর নবীনচন্দ্রের প্রদত্ত বিবরণ হইতে আরও কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করা যাইতেছে।

আরও একটি দিন এইরূপ আনন্দে কাটিল। পরদিন আমি সকালের ট্রেণে কলিকাতা যাইব এবং অক্ষয়বাবু হুগলি যাইবেন। কিন্তু বঙ্কিমবাবু আর বাড়ীর মধ্য হইতে আসেন না। তিনি পূর্ব রাত্রিতে আরও একটি দিন তাঁহার বাড়ীতে থাকার জন্য বড়ই জিদ করিয়াছিলেন। আমার সন্দেহ হইতেছিল যে, তিনি ইচ্ছা করিয়া আমার ট্রেণ মিস করাইবার জন্য দেরী করিতেছিলেন। অক্ষয়বাবুরও সে সন্দেহ হইল। অবশেষে আমি চলিয়া যাইতেছি শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া আসিলেন, এবং আবার থাকিবার জন্য জিদ করিতে লাগিলেন। আমি আবার অসম্মত হইলে, এবং কলিকাতা যাইবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখাইলে, তিনি অগত্যা সম্মত হইলেন এবং চা আনিতে বলিলেন। আমি বুঝিলাম যে আর এক ষড়যন্ত্র। বলিলাম আমি চা খাই না। তিনি বলিলেন যে তখনও ট্রেণের ঢের সময় আছে, দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়িলেও তাঁহার বাড়ী হইতে গিয়া ট্রেণ পাওয়া যায়। নিতান্ত আমি চলিয়া আসিতেছি দেখিয়া হলের দ্বার পর্যন্ত আসিয়া আমার সঙ্গে করমর্দন করিয়া বিদায় দিয়া অমনি বলিয়া উঠিলেন—"ভাল কথা মনে হইয়াছে। তোমাকে ত আমার বহি এক সেট দিই নাই।" চাকরকে

বহি একসেট্ শীঘ্র আনিতে বলিলেন, এবং কিছুতেই আমাকে আসিতে দিলেন না। আমার হাত ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। বহি আসিলে বলিলেন যে প্রত্যেক বহিতে তাঁহার হাতের উপহার লিখিয়া তবে ত দিবেন? আমি বলিলাম, "দোহাই আপনার, আমার ট্রেনটা মিস করাইবেন না।" তখন বলিলেন, "অন্ততঃ বিষবৃক্ষটায় লিখিয়া দি।" এবং বড় কায়দা করিয়া ধীরে ধীরে লিখিতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে ঠন করিয়া নৈহাটি স্টেশনে দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়িল। আমি বহিগুলি কুড়াইয়া লইয়া সটান দৌড় দিলাম। গাড়ী চলিয়াছে এমন সময় গিয়া ট্রেনের এক কক্ষে লাফাইয়া উঠিলাম। তিনি গবাক্ষে দাঁড়াইয়া ট্রেনের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। মনে করিয়াছেন আমি ট্রেন মিস করিয়াছি। কিন্তু আমাকে ট্রেনে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে রুমাল ঘুরাইতে লাগিলেন। আমিও তাই করিলাম। ট্রেন তাঁহার গবাক্ষপথ ছাড়িয়া আসিলে পর, আমার জীবনের একটি সুখস্বপ্ন ভোর হইল। এ আনন্দ-উচ্ছ্বাসের প্রতিক্রিয়ায় আমি অবসন্ন হইয়া গাড়ীতে বসিয়া পড়িলাম এবং ভাবিতে লাগিলাম, এই স্নেহবান্ সুরসিক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি কি লোকের কাছে ঘোরতর অহঙ্কারী বলিয়া পরিচিত? তখন বঙ্কিমবাবুর প্রতিভার ও প্রতিষ্ঠার মধ্যাহ্ন। তাঁহার উপন্যাস ও প্রবন্ধাবলী পড়িবার জন্য সমস্ত বঙ্গদেশ বঙ্গদর্শনের প্রকাশ জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া চাহিয়া থাকিত।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## চাকরি ও প্রথম উপন্যাস

যশোহরে প্রায় দুই বৎসর চাকরির পর বঙ্কিমচন্দ্র নেগুয়া মহকুমায় বদলি হন। ঐ মহকুমা পরে কাঁথিতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। অল্পকাল পরেই তিনি খুলনাতে আসেন। এই স্থানে এই সময়ে নীলকর সাহেব ও প্রজাগণের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় সমগ্র বঙ্গদেশে একটা প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। বঙ্কিম-চন্দ্রকে সেই হাঙ্গামার তদন্ত করতে হয়।[১] এই কার্যে একসময়ে তাঁহার নিজের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হইলেও, তিনি কর্তব্যকার্যে উদ্যম ও তেজস্বিতাপ্রদর্শনে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার দৃঢ়তা ও সাহস কর্তৃপক্ষের সানুগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। বাল্যাবধি বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল না। তাঁহার শরীর স্বভাবতঃ অপটু ছিল। বাল্যে তিনি ছুটাছুটি পছন্দ করিতেন না। তাসক্রীড়া তাঁহার পরমপ্রিয় ছিল। কিন্তু বাল্যেও তিনি কাঁটালপাড়ায় একজন সাহসী

১। এই হাঙ্গামার সবিস্তর বিবরণ শচীশচন্দ্রের বঙ্কিমচরিতে প্রদত্ত হইয়াছে।

বালক বলিয়াই পরিচিত হইয়াছিলেন। একবার নৈহাটিতে কতকগুলি গোরা গ্রামবাসিগণের উপর অত্যাচার করে। কয়েকদিন পরে আবার কতকগুলি গোরা আসিয়াছে শুনিয়া কাঁটালপাড়ার লোকেরা অনেকে গৃহ হইতে পলায়ন করিল; কেহ কেহ, গৃহদ্বার বন্ধ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। শিশু বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু গৃহে বসিয়া রহিলেন না, একখণ্ড ছড়ি হাতে লইয়া বাহিরে রাস্তায় আসিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কয়েকদল গোরা সত্যসত্যই সেই রাস্তায় আসিয়াছিল। তাহাদের কয়েকজন বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে কি দুই একটা কথা বলিয়া, এবং কেহ কেহ তাঁহার হাতের ছড়িখানি পরীক্ষা করিয়া চলিয়া গেল। তাহাদিগকে দেখিয়া বা তাহাদের পরবর্তী দলগুলিকে দেখিয়াও বঙ্কিম রাস্তা হইতে দৌড়িয়া পলায়ন করেন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যে গোরার ন্যায় ডাকাতের ভয়েও ভীত হয়েন নাই। তিনি সাঁতার জানিতেন না, কিন্তু ঝড়-বাদল-কুয়াসায় নৌকায় চড়িতে ভয় পাইতেন না। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, চিরদিন বঙ্কিমচন্দ্র নাকি ষাঁড়গরু দেখিলে সরিয়া যাইতেন, মই দিয়া ছাদে উঠিবার সাহস করিতেন না।

খুলনায় বঙ্কিমচন্দ্র তিন বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিককাল ছিলেন। এই সময়েই তাঁহার দুর্গেশনন্দিনী রচিত হয়। 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে, "১৮৬১ সালে দুর্গেশনন্দিনী লিখিত ও পরবৎসর প্রকাশিত হয়।" ঐ কথা সত্য নহে। খৃষ্টীয় ১৮৬৪।৬৫ (বাঙ্গালা ১২৭১) অব্দে দুর্গেশনন্দিনী প্রথম প্রকাশিত হয়।

শচীশচন্দ্র লিখিয়াছেন, তিনি সঞ্জীববাবুর মুখে শুনিয়াছিলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশের পূর্বে ঐ পুস্তকের পাণ্ডুলিপি শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্রকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতৃদ্বয় দুর্গেশনন্দিনীতে বিশেষ সৌন্দর্য দেখিতে পান নাই। পরে নাকি সঞ্জীবচন্দ্র আর একবার পাঠ করিয়া তাহা প্রকাশযোগ্য বিবেচনা করেন, এবং স্বয়ং মুদ্রণ ও প্রকাশের ভার গ্রহণ করেন। শচীশবাবু বলেন, ইহার পর বঙ্কিমচন্দ্র কোনও উপন্যাসই প্রকাশের পূর্বে স্বীয় সহধর্মিণী ব্যতীত আর কাহারও নিকট পাঠ করিতেন না, বা কাহাকেও পাঠ করিতে দিতেন না। এই কথাটি বোধ হয় আংশিকরূপে সত্য, কেননা তিনি দুই-একখানি উপন্যাস পাণ্ডুলিপি অবস্থায় ভট্টপল্লীর কোনও কোনও পণ্ডিত মহাশয়কে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়াছে।

সে যাহা হউক, রসগ্রাহী (অন্ততঃ প্রথমবার পাঠ বা শ্রবণকালে) না হইলেও জ্যেষ্ঠাগ্রজ শ্যামাচরণ বাবুর 'শ্রীচরণে'ই বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী 'উপহার স্বরূপ অর্পণ' করেন। ইহা লেখকের ভ্রাতৃ-প্রীতির চিহ্ন। এই প্রীতিবন্ধন পরে নানা কারণে ছিন্ন হইয়াছিল। বঙ্কিমের দ্বিতীয় উপন্যাস 'মদগ্রজ শ্রীযুক্ত বাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে' উপহার দেওয়া হইয়াছে। এস্থলে 'শ্রীচরণে'র

উল্লেখ নাই। সঞ্জীবচন্দ্র বড় ভাই হইলেও বন্ধুতুল্য ছিলেন। এ বন্ধুতাও যে চিরস্থায়ী হয় নাই তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।[১] বঙ্কিমের অনুজ 'শ্রীমান্ বাবু' পূর্ণচন্দ্র 'স্নেহচিহ্নস্বরূপ' চন্দ্রশেখর উপহার পান। পূর্ণবাবুর প্রতি বঙ্কিম চিরকালই সৌভ্রাত্র প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়।

দুর্গেশনন্দিনী একটা ঐতিহাসিক ঘটনার লোক-মুখ-শ্রুত-প্রবাদ অবলম্বনে লিখিত। বঙ্কিমচন্দ্রের খুল্লপিতামহ (পিতামহের মধ্যম ভ্রাতা) গল্পবর্ণনে অতিশয় পটু ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ বাল্যে ইঁহার নিকট গল্প শুনিতেন। তিনি মধ্যে মধ্যে বিষ্ণুপুর অঞ্চলে যাতায়াত করিতেন। মান্দারণ গ্রামটি জাহানাবাদ ও বিষ্ণুপুরের মধ্যে অবস্থিত। পূর্ণবাবু লিখিয়াছেন, "ঐ অঞ্চলে মান্দারণের ঘটনাটি উপন্যাসের ন্যায় লোকমুখে কিংবদন্তীরূপে চলিয়া আসিতেছিল। মেজ ঠাকুরদাদা উহা ঐ স্থানে শুনিয়াছিলেন এবং মন্দারণের জমিদারের গড় ও বৃহৎ পুরী ভগ্নাবস্থায় দেখিয়াছিলেন। তাঁহারই মুখে প্রথম শুনি যে, উড়িষ্যা হইতে পাঠানেরা মান্দারণ গ্রামের জমিদারের পুরী লুটপাট করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়, রাজপুতকুল-তিলক কুমার জগৎসিংহ তাঁহাদের সাহায্যার্থে প্রেরিত হইয়া বন্দী হইয়াছিলেন।"[২]

স্টুয়ার্ট (Charles Stewart)-প্রণীত বঙ্গদেশের ইতিহাস ১৮৪৭ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[৩] ঐ পুস্তকখানি সরকারি স্কুল-কলেজে পঠিত হইবার জন্য শিক্ষা-পরিষদের তত্ত্বাবধানে প্রচারিত হয়। দুর্গেশনন্দিনী, প্রথম খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালায় মোগল পাঠানের বৈরিতার বিষয়ে যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা ঐ পুস্তক হইতে গৃহীত বলিয়া বোধ হয়।[৪] কিন্তু তথায় মান্দারণ-দুর্গের কোন উল্লেখ নাই। জগৎসিংহের বন্দী হওয়া সম্পর্কে ঐ পুস্তকে লিখিত আছে যে, জাহানাবাদ হইতে ৫০ মাইল দূরবর্তী ধারপুরের সান্নিধ্যে কতলু খাঁর

১। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশের কিছু পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র কাঁটালপাড়ার ভদ্রাসন মধ্যম পুত্র সঞ্জীবচন্দ্র ও কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্রকে ভাগ করিয়া দেন। শ্যামাচরণ ও বঙ্কিমচন্দ্র ন্যায্য অংশ হইতে বঞ্চিত হন। 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' (সাহিত্য-সাধকচরিত) পৃ ৮৯। —স.

২। নারায়ণ, বৈশাখ, ১৩২২ ['বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা', বঙ্কিমপ্রসঙ্গ, পৃ ৫০-৫১। —স.]

৩। ষ্টুয়ার্টের বই প্রথম বাহির হইয়াছিল ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে। কাউনসিল অব এডুকেশনের তত্ত্বাবধানে ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। —স.

৪। Stwert's History of Bengal, Section VI. দ্রষ্টব্য। [দুর্গেশনন্দিনী কাহিনীর ঐতিহাসিক উৎস সম্বন্ধে পরবর্তী কালে যদুনাথ সরকার মহাশয় আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্র স্টুয়ার্টের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ওই তথ্য নির্ভরযোগ্য নহে। ষ্টুয়ার্ট ডাও সাহেবের ইতিহাসের উপর মূলত নির্ভর করিয়াছিলেন। কিন্তু কাপ্তান এলেকজাণ্ডার ডাও ফিরিস্তার রচিত হিন্দুস্থানের ইতিহাস ইংরাজীতে প্রায়শঃ অনুবাদ করিয়া দিয়েছেন বলিয়া এবং নিজ গ্রন্থের নামপত্রে ফিরিস্তার নাম সংযোগ করিয়া দিয়া অপর্যাপ্ত মেকী কথা চালাইয়াছেন, যাহা ফিরিস্তা ত লেখেন নাই; এমন কি কোন পারসিক লেখকের পক্ষে

সৈন্যগণকর্তৃক লুণ্ঠন ও অত্যাচারের প্রতিবিধান করিবার জন্য মানসিংহ জগৎসিংহকে প্রেরণ করেন। জগৎসিংহের আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া পাঠানগণ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণপূর্বক সন্ধির প্রস্তাবের ভাণ করিতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে তাহারা কতলু খাঁ হইতে আরও সৈন্যের সাহায্য আশা করিতেছিল। যুবক জগৎসিংহ তাহাদের চতুরতা বুঝিতে পারেন নাই। কতলু খাঁ সৈন্যপ্রেরণ করিবামাত্র আফগানেরা অতর্কিতভাবে রজনীযোগে জগৎসিংহের শিবির আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে বন্দী ও তাঁহার অনুচরগণের মধ্যে বহু লোককে নিহত করে। জগৎসিংহ বন্দীভাবে বিষ্ণুপুরে (Bissuntpore) নীত হন। মধ্যে গুজব উঠিয়াছিল যে, পাঠানেরা জগৎসিংহকে নিহত করিয়াছে। এই সময়ের কিছুদিন পূর্ব হইতেই কতলু খাঁ পীড়িত ছিলেন। জগৎসিংহের বন্দী হওয়ার কয়েক দিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার সন্তানগণের মধ্যে প্রধান ব্যক্তিগণ জগৎসিংহকে মুক্তিদান করিয়াই তাঁহারই মধ্যস্থতায় সন্ধির প্রার্থনা করিলেন। মানসিংহ অন্য কোনও রূপ উপায় অবলম্বন অসম্ভব দেখিয়া তাহাদের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। তৎপর কতলু খাঁর পুত্রগণ তদীয় মন্ত্রী খাজা ঈশার[১] সঙ্গে মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং দেড়শত হস্তী ও অন্যান্য মূল্যবান উপঢৌকন প্রদান করেন। ইত্যাদি।

ষ্টুয়ার্টের ইতিহাসে ওসমানের উল্লেখ নাই। বঙ্কিমবাবু তাহাকে কতলু খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়া পাদটীকায় লিখিয়াছেন যে, ইতিহাসে ওসমান্ কতলু খাঁর পুত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে।[২] এই বিবরণ তিনি অন্য কোনও স্থল হইতে গ্রহণ করিয়া থাকিবেন।

তিলোত্তমা বিমলা, অভিরাম স্বামী ও তাহার পত্নী বা উপপত্নীদ্বয়, এবং আয়েষা ইহারা সকলেই বঙ্কিমের কল্পনার সন্তান। বিমলার পশ্চাৎ পশ্চাৎ রজনীযোগে জগৎসিংহের মন্দারণদুর্গে প্রবেশও নির্জল, নিছক কল্পনা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ঐরূপে কতলু খাঁর অন্তঃপুরেরই একাংশে জগৎসিংহের অবস্থিতি, আয়েষা-কর্তৃক তাঁহার শুশ্রূষা প্রভৃতিও কবি-কল্পনা। 'ওসমান্ কতলু খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র এজন্য অন্তঃপুরে কোথাও তাহার গমনে বারণ ছিল না।' কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ভ্রাতুষ্পুত্রগণও যে কোনও কালে মুসলমান নৃপতিগণের অন্তঃপুরে অবাধে যাতায়াত করিতেন, তাহা বোধ হয় না। এমত অবস্থায় ওসমানের পক্ষে যাহাই

---

সেরূপ লেখাও সম্ভব ছিল না। .. তারিখের গোলমাল এবং ঘটনার উলটপালট সাজান স্টুয়ার্টের পুস্তকে এত বেশী যে, তাহার সংশোধন করিতে হইলে বইখানি আমূল নূতন করিয়া লিখিতে হয়।"—ভূমিকা, দুর্গেশনন্দিনী (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ সং)। ]—স.

১। বঙ্কিমচন্দ্র কতলু খাঁর অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রগণ এমন কি ঈশার নামও উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। দুর্গেশনন্দিনী, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৭শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২। ওসমান ঐতিহাসিক ব্যক্তি, কিন্তু তিনি কতলু খাঁর দেওয়ান খাজা ঈশার পুত্র। স্টুয়ার্ট ওসমানের উল্লেখ করেন নাই—ইহা ঠিক নহে, গ্রন্থকার ভূমিকায় ভ্রম স্বীকার করিয়াছেন। —স.

হউক, জগৎসিংহের পক্ষে কতলু খাঁর অন্তঃপুরে অবস্থান ও আয়েষার হাতে শুশ্রূষা-লাভ যে একটা নিতান্তই অসম্ভব ব্যাপার তাহাতে কে সন্দেহ করিতে পারে? দুর্গেশনন্দিনী, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ওসমান ও আয়েষার কথোপকথনে বঙ্কিমচন্দ্র জগৎসিংহের প্রতি পাঠানগণের সদ্ব্যবহারের একটা কারণ দিয়াছেন। ওসমান্ বলিতেছেন যদি "যদি জগৎসিংহকে আমাদের সদ্ব্যবহার দ্বারা বাধ্য করিতে পারি, তবে সেও আমাদিগের মনোমত সন্ধি-বন্ধন পক্ষে অনুরোধ কি যত্ন করিতে পারে।" কিন্তু সদ্ব্যবহার করিবার জন্য যে একজন বন্দী রাজপুত যুবককে একজন মুসলমান নৃপতি স্বীয় অন্তঃপুরে স্থান দান করিলেন এবং স্বীয় দ্বাবিংশতিবর্ষবয়স্কা কন্যাকে অবাধে তাঁহার শুশ্রূষায় ব্যাপৃত হইতে দিলেন, ইহা সম্ভবের বাহিরে। বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্র এখানে সম্ভব-অসম্ভবের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না করিয়া কেবল কাব্যের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যথেচ্ছভাবে ঘটনাবিন্যাস করিয়াছেন। এ বিষয়ে যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের রীতির নিন্দা করিয়াছেন তাহাদের কথার উত্তরে ইহা বলা আবশ্যক যে, Romance বা কাব্যধর্ম-প্রধান উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের ঘটনাবিন্যাসে যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে। দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী ও আংশিকরূপে চন্দ্রশেখরও বিশেষভাবে কাব্যধর্মান্বিত বলিয়া তাহাতে ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের পূর্বোক্তরূপ যৎকিঞ্চিৎ অসঙ্গতি একেবারে অসহনীয় অপরাধ নহে। কাব্যের বিচারসময়ে সর্বদাই প্রথমতঃ ইহাই বিচার করিতে হইবে যে, কবিকল্পিত ঘটনা-বিন্যাস দ্বারা কাব্যোচিত সত্যের মর্যাদা রক্ষিত হইয়াছে কি না?

কোনও কোনও সমালোচক দুর্গেশনন্দিনীতে সার ওয়াল্টার স্কট্ প্রণীত আইভানহো (Ivanhoe) নামক সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসের ছায়া দেখিতে পাইয়া ইহাতে বঙ্কিমের মৌলিক উদ্ভাবনশক্তির ঐকান্তিক অভাব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। দুর্গেশ-নন্দিনী বাহির হওয়ার কিছুদিন পরে Hindu Patriot পত্রে ঐরূপ একটি সমালোচনা বাহির হয়। সমালোচনাটি বোধ হয় কোনও বিজ্ঞ লোকের লেখা, কেননা বহুদিন পরে বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রনাথ বসুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ঐ সমালোচনা তাঁহার লিখিত কি না। চন্দ্রনাথের লিখিত নয় শুনিয়া বঙ্কিম বলিয়াছিলেন, প্রতিকূল হইলেও অমন সমালোচনা পড়িয়া সুখ হয়।[১]

বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রনাথ বসুর নিকট বলিয়াছিলেন যে, দুর্গেশনন্দিনী পাঠের পূর্বে তিনি (Ivanhoe) পড়েন নাই। একথা যখন বলেন তখন বঙ্কিম বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে রাজরাজেশ্বররূপে সম্মানিত, তখন তাঁহার প্রতিষ্ঠা দুর্গেশনন্দিনীর উপর বিন্দুমাত্রও নির্ভর করে না। এ অবস্থায় বঙ্কিমকে মিথ্যাবাদী মনে করা কেবল অযৌক্তিক নহে, অভদ্রোচিতও বটে। যে প্লট সার্ ওয়াল্টার স্কটের মাথায় খেলিয়াছিল, তাহা কি বঙ্কিমের কল্পনায় আসা অস্বাভাবিক? লোক-চরিত্রে অন্তর্দৃষ্টির হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রকে কোনও অংশে স্কট অপেক্ষা ন্যূন মনে করা যায় না।

---

১। প্রদীপ, ১৩০৫। [ বঙ্কিম-প্রসঙ্গে সংকলিত পৃঃ ১০৬। —স. ]

প্রথম উপন্যাস হইলেও দুর্গেশনন্দিনী যে একজন প্রতিভাশালী ও আত্মক্ষমতায় স্থির আস্থাসম্পন্ন ব্যক্তির রচিত, তাহা ঐ উপন্যাসের গোড়া হইতেই একরূপ সুপ্রকাশ। তারপর গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ পর্যন্ত আসিলে তাহাতে আর কোনও সন্দেহই থাকে না। ইহা কাঁচা হাতের মত সৃষ্টি নহে। এচিত্রে বর্ণক-প্রক্ষেপে শিল্পীর হাত কোথাও টলিয়াছে বা কাঁপিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। জানি না, কাহারও কাহারও মনে ইহাও স্কটের অনুকরণ বলিয়া মনে হইয়াছে কি না। বস্তুতঃ আইভানহোর ওয়াম্বা আর দুর্গেশনন্দিনীর বিদ্যাদিগ্‌গজ একশ্রেণীর সৃষ্টি নহে। ওয়াম্বা নামে মাত্র 'fool' কিন্তু কার্যে পণ্ডিত অপেক্ষাও সেয়ানা; গজপতি তাঁহার 'সাড়ে পাঁচ হাত দৈর্ঘ্য' ও 'আধ হাত তিন আঙুল প্রস্থের' প্রত্যেক ইঙ্গিতে গজমূর্খ। ওয়াম্বার *Pax Vobiscum* ও ঐরূপ আর দুই-একটি লাটিন উক্তি তাহার আত্মগোপনের সহায় হইয়াছিল, আর গজপতির 'অসারে খলু সংসারে সারং শ্বশুরমন্দিরং' জগৎসিংহের নিকটে তাহার স্বরূপ প্রকাশের পক্ষে সূর্যালোকের কার্য করিয়াছে। ঐরূপে তিলোত্তমা ও রাওয়েনাও একশ্রেণীর পাত্রী নয়। তিলোত্তমা কুসুমকোমলা, পিতা বন্দী হইয়াছে শুনিয়া পালঙ্কে মূর্ছিত হইয়া পড়িল, কতলু খাঁর অন্তঃপুরে বন্দিনী হইয়া সে রোদন করিতে করিতে দীনা, শীর্ণা, পাংশুজালমলিনা হইয়া গিয়াছিল। অন্তঃপুর হইতে পলায়নের অমোঘ উপায় অঙ্গুরীয়ক হস্তে পাইয়াও তাহার পলায়নের সাহস হয় না, তাহার 'পা কাঁপে, হৃদয় কাঁপে, মুখ শুকায়', সে 'একপদে অগ্রসর, একপদে পশ্চাৎপদ' হয়। জগৎসিংহের কারাগারে প্রবেশ করিবার সময় দ্বারদেশে তাহার গতিশক্তি একেবারে রোধ হইল। তাহার পরে, জগৎসিংহের মুখে 'এখানে কি অভিপ্রায়ে? পূর্বকথা বিস্মৃত হও' এইরূপ অপ্রত্যাশিত কঠোরবাণী শুনিয়া 'বৃক্ষচ্যুত বল্লীবৎ ভূতলে পতিত' হইল। রাওয়েনাতে আমরা এরূপ ভাব একটিও দেখিতে পাই না। সে দৃঢ়চিত্তা, তেজস্বিনী ও আত্মপদমর্যাদাবোধ-সমন্বিতা[১]। সে বন্দী হইয়া শত্রুভবনে স্বীয় অভিভাবক ও সঙ্গিগণ হইতে বিযুক্তা হইয়াও কখনও মূর্ছা যায় নাই। Be Bracyর মুখে Cedric ও Ivanhoeর আসন্ন বিপদের কথা শুনিবার পর একবার মাত্র তাহার সাহস তাহাকে ছাড়িবার উপক্রম করিয়াছিল, কিন্তু তখনও ভয় অপেক্ষা বিরক্তিই তাহার মনের উপর অধিক ক্রিয়া করিয়াছে। তিলোত্তমাকে কখনও রাওয়েনার ন্যায় পরীক্ষা ও প্রলোভনে পড়িতে হয় নাই। রাওয়েনাকেও

১। Her disposition was naturally that which physiognomists, consider as proper to fair complexions, mild, timid and gentle but it had been tempered, and, as it were hardened, by the circumstances of her education ...She had acquired that sort of courage and self-confidence which arises from the habitual and constant deference of the circle in which we move. —Ivanhoe, Chap. XXXIII.

কখনও স্বীয় প্রেমাস্পদের মুখ হইতে 'পূর্বকথা বিস্মৃত হও' এরূপ উক্তি শুনিতে হয় নাই। তারপর ওসমান ও Brain de Bois-Guilbertও একশ্রেণীর পাত্র নহে। Brain de Bois-Guilbertএর তুলনায় ওসমান দেবতা, ওসমানের তুলনায় Brain de Bois-Guilbert নররূপে দানব। "ওসমান পাঠান-কুলতিলক। যুদ্ধ তাঁহার স্বার্থসাধন ও নিজব্যবসায় এবং ধর্ম; সুতরাং যুদ্ধ-জয়ার্থ ওসমান কোনও কার্যেই সঙ্কোচ করিতেন না। কিন্তু যুদ্ধ-প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে পরাজিত পক্ষের প্রতি কদাচিৎ নিষ্প্রয়োজনে তিলার্ধ অত্যাচার করিতে দিতেন না। যদি কতলু খাঁ স্বয়ং বিমলা-তিলোত্তমার অদৃষ্টে দারুণ বিধান না করিতেন, তবে ওসমানের কৃপায় কদাচ তাঁহারা বন্দী থাকিতেন না। তাঁহারই অনুকম্পায় স্বামীর মৃত্যুকালে বিমলা তৎসাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন। পরে যখন ওসমান জানিতে পারিলেন যে, বিমলা বীরেন্দ্র সিংহের স্ত্রী তখন তাঁহার দয়ার্দ্রচিত্ত আরও আর্দ্রীভূত হইল।"[১] Brain de Bois-Guilbert দাম্ভিক, উদ্ধত, শিষ্টাচারলেশশূন্য, কামুক, ধর্মজ্ঞানবর্জিত। কামিনী-কাঞ্চন বর্জন যাহার ধর্ম, তাহার পক্ষে সুন্দরী স্ত্রীলোকদর্শনমাত্রেই আত্মহারা হইয়া যে কোনও উপায়ে তাহাকে হস্তগত করিবার চেষ্টা এবং তজ্জন্য নিজ ধর্ম, ব্রত ও প্রতিষ্ঠা বিসর্জন করিয়া তাহার সহিত সুদূর দেশে পলায়নের ইচ্ছা কেমন? এমন কি যে সারাসিনগণের হস্ত হইতে যীশুর সমাধিমন্দির উদ্ধার করিবে বলিয়া সে Knight Templar দলভুক্ত হইয়া কত ক্লেশস্বীকার ও কত রক্তপাত করিয়াছে, রেবেকাকে পাইলে সেই সারাসিন-দলপতি সালাদিনের শরণাপন্ন হওয়াও সে শ্লাঘ্য বিবেচনা করিত।[২] জগৎসিংহের সহিত ওসমানের দ্বন্দ্বযুদ্ধও ওসমানের মহত্ত্বেরই পরিচায়ক। "ওসমান কহিলেন, 'আমরা পাঠান'—অন্তঃকরণ প্রজ্বলিত হইলে উচিতানুচিত বিবেচনা করি না; এ পৃথিবীমধ্যে আয়েষার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী দুই ব্যক্তির স্থান হয় না, এক জন এইখানে প্রাণত্যাগ করিব।"[৩] বস্তুতঃ ওসমানের ঔচিত্যানৌচিত্য-বোধ কোনও অবস্থায়ই কম ছিল বলিয়া মনে হয় না। জগৎসিংহকে নিজের পথ হইতে অপসৃত করার অনেক উপায়ই তাঁহার হাতে ছিল, তথাপি যে ওসমান 'আমাকে বধ করিয়া আপনার পথ মুক্ত কর,—নচেৎ আমার হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়া আমার পথ ছাড়িয়া দাও' বলিয়া জগৎসিংহকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছেন, ইহা তাঁহার ন্যায় বীরেরই উপযুক্ত। ওসমান যথার্থই পাঠান-কুলতিলক। আবার জগৎসিংহও যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াও ওসমানের প্রতি পূর্ব কৃতজ্ঞতাবশতঃ প্রথমে অস্ত্রাঘাত করিতে প্রবৃত্ত হন নাই, ইহাও জগৎসিংহের ন্যায় বীরেরই উপযুক্ত। আর ইহার অনুরূপ 'আইভানহো' তে কি দেখিতে

---

১। 'দুর্গেশনন্দিনী', দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

২। Ivanhoe, Chap. XXXIX.

৩। 'দুর্গেশনন্দিনী', দ্বিতীয় খণ্ড, ১৮শ পরিচ্ছেদ।

পাই? Brain de Bois-Guilbert আইভানহোর সহিত শেষ যুদ্ধ করিতেছে কেন? অনিচ্ছায়, মানের দায়ে এবং কতকটা রেবেকার প্রতি বিরক্তিবশে।[১] সে মানও সে চুল্লীতে নিক্ষেপ করিয়া তাহার জীবনব্রতে জলাঞ্জলি দিয়া যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করিতে পারে, যদি রেবেকা তাহার ঘৃণিত প্রস্তাবে সম্মতি দেয়।

"Mount thee behind me on my steed; ...mount, I say, behind me! In one short hour are pursuit and enquiry far behind—a new world of pleasure opens to thee—to me a new career of fame. Let them speak the doom which I despise, and erase the name of Bois-Guilbert from their list of monastic slaves; I will wash out with blood whatever blot they may dare to cast on my scutcheon!"[২]

রেবেকা ও আয়েষার মধ্যে সাদৃশ্যও প্রথম দৃষ্টিতে যত ঘনিষ্ঠ বলিয়া মনে হয় প্রকৃতপক্ষে তত নহে। রেবেকা-চরিত্র পূর্ণাঙ্গ, আয়েষা সেরূপ ফুটিতে পারে নাই। একজন বিধর্মী বিজাতীয় বীরপুরুষের প্রতি প্রেম এবং সেই প্রেমও যথাসম্ভব গোপন করিবার চেষ্টা করিয়া প্রতিনায়িকার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন উভয় চরিত্রের সাদৃশ্যস্থল। রেবেকার মনে প্রেমের উৎপত্তি প্রথমতঃ কৃতজ্ঞতা হইতে। ছদ্মবেশী আইভানহো স্বীয় পিতৃগৃহে Brain de Boise-Guilbert ও তদীয় অনুচরবর্গের কথাবার্তা হইতে আইজাককে উৎপীড়ন করিয়া অর্থ আদায় করিবার সঙ্কল্পের আভাস প্রাপ্ত হন, এবং কৌশলে তাহাকে সেই অর্থগৃধ্নু টেম্প্লারের হস্ত হইতে রক্ষা করেন। তখন অবশ্য রেবেকা পিতার সঙ্গে ছিলেন না, কিন্তু এ্যাসবির শৌর্যপরীক্ষা-ক্ষেত্রে একজন অজ্ঞাতনামা বীরকে পিতার উপকারিরূপে জানিতে পারিয়াই তৎপ্রতি আকৃষ্ট হন। সেই আকর্ষণ বা প্রেম কিরূপ প্রগাঢ় ছিল তাহা আইভানহোর পাঠকমাত্রই জানেন। দ্বিতীয় দিনের শৌর্যপরীক্ষার পর আইভানহো মূর্ছিত হইয়া পড়িলে রেবেকাই তাঁহাকে স্বীয় যানে স্থাপন করাইয়া নিজের সঙ্গে লইয়া যান,[৩] এবং স্বীয় চিকিৎসার গুণে তাঁহাকে প্রাণদান করেন। রেবেকার প্রেম শেষমুহূর্ত পর্যন্ত আইভানহোর অজ্ঞাত ছিল। সেই প্রেমের গভীরতা ও আত্মগোপনের এমন কি আত্মবিলোপের চেষ্টা এমন নৈপুণ্যসহকারে চিত্রিত হইয়াছে যে, অমন একটি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ মনোহর চিত্র পূর্বে দেখিতে পাইলে, বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় সুদক্ষ শিল্পী যে তাহার ক্ষীণ ও নিকৃষ্ট অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, ইহা কিছুতেই সম্ভবপর

---

১। He has despised me—repulsed me—reviled me. And wherefore should I offer up for her whatever of estimation I have in the opinion of others? Malvoisin, I will appear in the lists. Ivanhoe, Chap. XXXIX.

২। Ivanhoe Chap. XLIII.

৩। Ivanhoe Chap. XXVIII.

নহে। পূর্বেই বলিয়াছি, প্রথম উপন্যাস হইলেও দুর্গেশনন্দিনীতে বঙ্কিমচন্দ্রের হাত তেমন কাঁচা বলিয়া বোধ হয় না। অবশ্য তাঁহার ভাষায় তাঁহার বঙ্কিমী প্রতিভাচ্ছটা তখনও ফুটে নাই। তিলোত্তমা, আয়েষা ও বিমলার রূপবর্ণনেও এখানে-ওখানে একটু কষ্ট-কল্পনা, একটু আয়াসের চিহ্ন দেখা যায়। প্রধান পাত্রসমূহের মধ্যে জগৎসিংহ ও তিলোত্তমা তেমন ভাবে না ফুটিলেও ঐ দুই চিত্র ও উইল্‌ফ্রেড্‌ আইভানহো ও রাওয়েনা অপেক্ষা শিল্পের হিসাবে নিকৃষ্ট নহে। এমন অবস্থায় কেবল এক আয়েষাকে কেন রেবেকার অঞ্চলচ্ছায়ায় মলিন দেখা যায়?

রাওয়েনা ও আইভানহোর যে প্রেম তাহা তাহাদের আশৈশব ঘনিষ্ঠতা হইতে উদ্ভূত। ওসমান ও আয়েষার মধ্যে আশৈশব ঘনিষ্ঠতা প্রেমে পরিণত হয় নাই। অথচ ওসমান যে আয়েষার প্রেমের অযোগ্য ছিলেন তাহা নহে। তাঁহার চরিত্র যে কতদূর উন্নত ও মহৎ তাহা আয়েষা চিরদিনই জানিতেন। "কাহারও কাহারও অভ্যাস আছে যে, পাছে লোকে দয়ালুচিত্ত বলে, এই লজ্জার আশঙ্কায় কাঠিন্য প্রকাশ করেন এবং দানশীলতা নারীস্বভাবসিদ্ধ বলিয়া উপহাস করিতে করিতে পরোপকার করেন। লোকে জিজ্ঞাসিলে বলেন, ইহাতে আমার বড় প্রয়োজন আছে। আয়েষা বিলক্ষণ জানিতেন, ওসমান তাহারই একজন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'ওসমান্‌! সকলেই যেন তোমার মত স্বার্থপরতায় দূরদর্শী হয়, তাহা হইলে আর ধর্মে কাজ নাই'।"[১] কিন্তু সেই ওসমান যখন বলিলেন, "আমি যে আশালতা ধরিয়া আছি, আর কতকাল তাহার তলে জল সিঞ্চন করিব?" তখনই আয়েষার মুখশ্রী গম্ভীর হইল। আয়েষা কহিলেন, "ওসমান! ভাই-বহিন্‌ বলিয়া তোমার সঙ্গে বসি দাঁড়াই। বাড়াবাড়ি করিলে তোমার সাক্ষাতে বাহির হইব না।"

ওসমানকে ছাড়িয়া পরাজিত, আহত, রুগ্নশয্যায় মৃতপ্রায়, আর মুসলমানের চক্ষে কাফের জগৎসিংহের প্রতি আয়েষার প্রেম কেন জন্মিল, সে প্রশ্নের উত্তর কে দিবে? প্রেমের স্বভাব কবিগণ চিরদিনই বক্র বলিয়া বর্ণনা করেন। 'কামস্য বামা গতিঃ।' কাজেই জগৎসিংহের প্রতি আয়েষার প্রেম অস্বাভাবিক ইহা বলিতে পারি না। বরং ইহার বক্রতার মধ্যেও ভাবগত সত্যতা poetic truth আছে বলিয়াই জগৎসিংহের পক্ষে কতলু খাঁর অন্তঃপুরে প্রবেশ প্রভৃতি কতকগুলি আপাততঃ অসম্ভাব্য ব্যাপারও কাব্যানুরাগী পাঠক সহ্য করিয়া লয়েন। কিন্তু রেবেকা যেমন রাওয়েনার প্রতি আইভানহোর আজন্ম অনুরাগের কথা জানিয়াও দৃঢ়ভাবে নিজের প্রেম গোপন করিয়া চলিয়াছে, আয়েষাতে সেরূপ দৃঢ়তা নাই। আইভানহো ২৮শ, ২৯শ পরিচ্ছেদের সঙ্গে দুর্গেশনন্দিনী, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ তুলনা করিলেই দুইটি চরিত্রের প্রভেদ স্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে।

---

১। 'দুর্গেশনন্দিনী', দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তখন আর নবাবপুত্রী-ভাব রহিল না, দূরতা রহিল না; স্নেহময়ী রমণী, রমণীর ন্যায় যত্নে, কোমল করপল্লবে রাজপুত্রের করধারণ করিলেন; আবার তখনই তাঁহার হস্ত ত্যাগ করিয়া রাজপুত্রের মুখপানে ঊর্ধ্বদৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "কুমার, এ দারুণ দুঃখ তোমার হৃদয়মধ্যে কেন? আমাকে পর জ্ঞান করিও না। যদি সাহস দেও তবে বলি,—বীরেন্দ্র সিংহের কন্যা কি"—আয়েষার কথা শেষ হইতে না হইতেই রাজকুমার কহিলেন, "ও কথায় আর কাজ কি! সে স্বপ্ন ভগ্ন হইয়াছে।"

আয়েষা নীরবে রহিলেন; জগৎসিংহও নীরবে রহিলেন। উভয়ে বহুক্ষণ নীরবে রহিলেন; আয়েষা তাঁহার উপর মুখ অবনত করিয়া রহিলেন।

রাজপুত্র অকস্মাৎ শিহরিয়া উঠিলেন, তাহার করপল্লবে কবোষ্ণ বারিবিন্দু পড়িল। জগৎসিংহ দৃষ্টি নিম্ন করিয়া আয়েষার মুখপদ্ম নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, আয়েষা কাঁদিতেছেন; উজ্জ্বল গণ্ডস্থলে দর দর ধারা বহিতেছে।

রাজপুত্র বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "একি আয়েষা? তুমি কাঁদিতেছ?"

আয়েষা কোন উত্তর না করিয়া ধীরে ধীরে গোলাপ ফুলটি নিঃশেষে ছিন্ন করিলেন। পুষ্প শতখণ্ড হইলে কহিলেন, "যুবরাজ! আজ যে তোমার নিকট এ ভাবে বিদায় লইব, তাহা মনে ছিল না। আমি অনেক সহ্য করিতে পারি, কিন্তু কারাগারে তোমাকে একাকী যে মনঃপীড়ার যন্ত্রণা ভোগ করিতে রাখিয়া যাইব, তাহা পারিতেছি না। জগৎসিংহ! তুমি আমার সঙ্গে বাহিরে আইস; অশ্বশালায় অশ্ব আছে, দিব; অদ্য রাত্রেই শিবিরে যাইও"

... ... ...

আয়েষা পুনর্বার নীরব হইয়া রহিলেন। আবার চক্ষে দর দর ধারা বিগলিত হইতে লাগিল। আয়েষা কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিতে লাগিলেন।

রাজপুত্র আয়েষার নিঃশব্দ রোদন দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। কহিলেন, "আয়েষা! রোদন করিতেছ কেন?"

আয়েষা কথা কহিলেন না। রাজপুত্র আবার কহিলেন, "... .....আমি যে বন্দিত্ব স্বীকার করিলাম, কেবল ইহাতেই কখনও আয়েষার চক্ষে জল আইসে নাই। তোমার পিতার কারাগারে আমার ন্যায় অনেক বন্দী কষ্ট পাইতেছে।"

আয়েষা আশু রাজপুত্রের কথার উত্তর না করিয়া অশ্রুজল অঞ্চলে মুছিলেন। ক্ষণেক নীরব নিস্পন্দ থাকিয়া কহিলেন, "রাজপুত্র! আমি আর কাঁদিব না।"

জগৎসিংহ যদি ইহাতেও আয়েষার মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া থাকেন, তবে মনে করিতে হইবে, তিনি কেবল যুদ্ধবিদ্যা ছাড়া এ জীবনে আর কোনও বিদ্যা চর্চা করিবার অবসর পান নাই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ইহাতেও সন্তুষ্ট হইলেন না।

তিনি ওসমানকে কারাগারে আনিয়া জগৎসিংহের সম্মুখে আয়েষার দ্বারা প্রকাশ্য স্বীকারোক্তি করাইয়া লইলেন, "ওসমান! যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর, তবে আমার উত্তর এই যে, এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর।" আবার এরূপ স্বীকার-উক্তিও বোধ হয় হাকিম বঙ্কিমের আইনের সূক্ষ্মদৃষ্টিতে যথেষ্ট বলিয়া বোধ হইল না।

> আয়েষা পুনরপি কহিতে লাগিলেন, "শুন, ওসমান, আবার বলি, এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর,—যাবজ্জীবন অন্য কেহ আমার হৃদয়ে স্থান পাইবেন না। কাল যদি বধ্যভূমি ইহার শোণিতে আর্দ্র হয়"—বলিতে বলিতে আয়েষা শিহরিয়া উঠিলেন—"তথাপি দেখিবে, হৃদয়মন্দিরে ইহার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া অন্তকাল পর্যন্ত আরাধনা করিব। এই মুহূর্তের পর, যদি আর চিরন্তন ইহার সঙ্গে দেখা না হয়, কাল যদি ইনি মুক্ত হইয়া শত মহিলার মধ্যবর্তী হন, আয়েষার নামে ধিক্কার করেন, তথাপি আমি ইহার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী দাসী রহিব।"

এইরূপে জগৎসিংহের সম্মুখে স্পষ্ট স্বীকারোক্তি দ্বারাই শিল্পের ধর্মাধিকরণে আয়েষা আপনাকে দোষী ও দণ্ডার্হ করিয়া ফেলিলেন।

ইহারই অব্যবহিত পরে পিতার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে আয়েষাকে আমরা আবার দেখিতে পাই।—"রোদনের কোলাহল পড়িয়াছে; প্রায় সকলেই উচ্চরবে কাঁদিতেছে, শিশুগণ না বুঝিয়া কাঁদিতেছে, আয়েষা চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছেন না; আয়েষার নয়নধারায় মুখ প্লাবিত হইতেছে; নিঃশব্দে পিতার মস্তক অঙ্কে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। জগৎসিংহ দেখিলেন, সে মূর্তি স্থির—গম্ভীর—নিস্পন্দ।"

এই সময়ে আয়েষা কি ভাবিতেছিলেন তাহারও কতকটা আভাস বঙ্কিম দিয়াছেন। নচেৎ সহজে তাহার কাব্য শেষ করিবার সুবিধা হয় না। "জগৎসিংহ চলিয়া যায়, আয়েষা মুখ নত করিয়া পিতাকে কি কহিয়া দিলেন।" এ আর কিছুই নহে, Dying declaration দ্বারা জগৎসিংহের নিকট তিলোত্তমার সতীত্ব প্রমাণ।

প্রতিদান-প্রাপ্তির আশাহীন প্রেমই আয়েষা ও রেবেকার, উভয়ের চরিত্রের বিশেষত্ব ও মহত্ত্ব। রেবেকা স্বীয় প্রেমকে যে ভাবে গোপন করিয়াছেন, এমন কি তাহা মনে মনে দমন করিবার পর্যন্ত প্রয়াস পাইয়াছেন তাহাতে তাঁহার নারীজনোচিত মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। আয়েষার ন্যায় তাঁহাকে কুত্রাপি স্বীকারোক্তি করিতে হয় নাই, জগৎসিংহের নিকট আয়েষার ন্যায় Ivanhoeর নিকট তাঁহাকে চিঠি লিখিয়া বলিতে হয় নাই—"মনে করিও না আয়েষা অধীরা,……সাক্ষাৎ না হইলে তুমি যে ক্লেশ পাইবে সে ভরসাও করি নাই। নিজের ক্লেশ—সে সকল সুখ-দুঃখ জগদীশ্বরের চরণে সমর্পণ করিয়াছি।…… যদি শুনিয়া থাক যে আমি তোমাকে স্নেহ করি তবে তাহা বিস্মৃত হও………

............আমি তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী নহি। আমার যাহা দিবার, তাহা দিয়াছি। তোমার নিকট প্রতিদান চাহি না।........." আইভানহো স্বীয় জীবন ভয়ানকভাবে বিপন্ন করিয়া রেবেকার প্রাণ রক্ষা করিবার পর পাছে কৃতজ্ঞতাপ্রকাশে মনের আসল ভাবটুকু ধরা পড়ে সেই ভয়ে রেবেকা লোকের চক্ষে অকৃতজ্ঞ প্রতিপন্ন হওয়াও স্বীকার করিলেন, তথাপি আইভানহোর সম্মুখীনা হইলেন না—

She was locked in the arms of her aged father, giddy and almost senseless with the rapid change of circums-tances around her. But one word form Isaac at length recalled her scattered feelings.

"Let us go," he said, "my dear daughter, my recovered treasure—let us go to throw ourselves at the feet of the good youth."

"Not so," said Rebecca, "Oh, no—no—no—I must not at this moment dare to speak to him. Alas! I should say more than—No, my father, let us instantly leave this evil place."

"But, my dear daughter," Said Isaac, "to leave him who hath come forth like a strong man with his spear and shield, holding his life as nothing, so he might redeem thy captivity; and thou, too, the daughter of a people strange unto him and his—this is service to be thankfully acknowledged."

"It is—it is—most thankfully—most devoutly acknow-ledged." said Rebecca. "It shall be still more so; but not now. For the sake of thy beloved Rachael, father, grant my request—not now!"

"Nay, but," said Isaac, insisting "they will deem us more thankless than mere dogs!"

"But thou seest, my dear father, that King Richard is in presence, and that———"

"True, my best—my dearest Rebecca! Let us hence—let us hence!........."

এ চিত্র কেমন সুন্দর, কেমন পূর্ণাঙ্গ, কেমন সর্বাবয়বসম্পন্ন! তাই

বলিতেছিলাম, বঙ্কিমচন্দ্র আইভানহো পূর্বে পড়িলে রেবেকা ও আয়েষার এত বৈষম্য হইত না।

তার পর বিমলা। এ চিত্রের অনুরূপ আইভানহোতে কি আছে? সূক্ষ্ম বুদ্ধির বাহাদুরি দেখাইবার ইচ্ছা থাকিলে Urfried বা Ulrica কর্তৃক Front-de-Bœufএর দুর্গে অগ্নিসংযোগের সহিত বিমলা কর্তৃক কতলু খাঁর হত্যার সাদৃশ্য কল্পনা অসম্ভব নহে। তবে উহা সূক্ষ্মবুদ্ধির বাহাদুরী মাত্র! যে সমগ্র যৌবনকাল পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি স্বজনহত্যাকারীর উপপত্নীরূপে কাটাইয়া বার্ধক্যে আদর নাই দেখিয়া আক্ষেপ, বিরক্তি, ঘৃণা ও ক্রোধের বশে সেই অবৈধ প্রেমভাজনের (the elder Front-de-Bœuf) বিরুদ্ধে তাহার পুত্রকে (Reginald Front-de-Bœuf) উত্তেজিত করিয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটায়, পরে আবার দুর্গে অগ্নি সংযোগ করিয়া সেই পুত্রকেও হত্যা করিয়া সেই অগ্নিতে নিজ জীবন বিসর্জন দেয়, সে কি বিমলার আদর্শ? বিমলার বুদ্ধি, বিমলার চতুরতা, দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসের প্রাণশক্তির ন্যায় সর্বত্র কার্য করিতেছে। আর Urfried বা Ulrica আইভানহো উপন্যাসের একটি অতি নগণ্য, ক্ষুদ্র পাত্রী, যাহাকে বাদ দিলেও মূলগ্রন্থের কিছুমাত্র অঙ্গহানি হয় না, যাহার জীবনকথা একটা বাজে কথার মত এক পরিচ্ছেদে শেষ করিয়া ঔপন্যাসিক আপনাকেও দায়মুক্ত মনে করিয়াছেন এবং পাঠককেও নিষ্কৃতি দিয়াছেন, এবং যাহাকে অতি সামান্য প্রয়োজন-সাধনার্থ অল্পক্ষণের জন্য আর দুই কি তিন পরিচ্ছেদে দেখাইতে বাধ্য হইয়াছেন। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বিমলা চরিত্রে এতটা মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি লিখিতেছেন, "অধিক কি বিমলার চরিত গ্রন্থকার আদ্যোপান্তই এরূপ মনোহরভাবে চিত্রিত করিয়াছেন যে, উহাকেই সময়ে সময়ে গ্রন্থের নায়িকা বলিতে আমাদের ইচ্ছা হয়।"[১] বিমলা-চরিত্র বাস্তবিকই অতি মনোহর এবং সমগ্র উপন্যাসের অর্ধেক। এমন চিত্র পুনঃ পুনঃ অঙ্কিত করিবার লোভ স্বল্পসম্বল শিল্পীর পক্ষে স্বাভাবিক। বঙ্কিমের সম্বল অল্প ছিল না বলিয়া তিনি বহুদিন বিমলাকে যবনিকার আড়াল করিয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন; পুরা বার বৎসর ও সাতখানি উপন্যাসের পরে 'রজনী'তে বঙ্কিম বিমলাকে লবঙ্গলতারূপে আবার রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত করেন। নূতন ভূমিকায় তাহার মাধুর্য কিরূপ ফুটিয়াছে তাহা আমরা যথাস্থলে বুঝিতে চেষ্টা করিব। আপাততঃ আমরা অতি সংক্ষেপে আমাদের সবিস্ময় ও সানুরাগ অভিনন্দন মাত্র জ্ঞাপন করিয়া বিমলার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।

১। 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব'; দ্বিতীয় সংস্করণ পৃঃ ২২৭

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## নানা কথা

শ্রীযুক্ত শচীশবাবু দুর্গেশনন্দিনীর পরিচয় দান প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, দুর্গেশনন্দিনী "প্রকাশিত হইল বটে কিন্তু যশ হইল না। না হউক, গ্রন্থকার আপনাকে কতকটা চিনিলেন।" আবার সেই প্রসঙ্গেই অন্যত্র লিখিয়াছেন, "বঙ্কিমচন্দ্র জানিতেন ও বুঝিতেন, দুর্গেশনন্দিনী একখানি তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাসমাত্র। তাহা রচনা করিয়া অথবা তাহার রচয়িতা বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের গৌরব কিছুমাত্র বর্ধিত হয় নাই।"[১] তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাস কথাটি শচীশবাবু অতি নিকৃষ্ট উপন্যাস অর্থেই ব্যবহার করিয়া থাকিবেন। প্রথম শ্রেণী উত্তম; দ্বিতীয় মধ্যম, তৃতীয় অধম। শচীশবাবুর কথার অন্য কোনও অর্থ আমাদের মনে আসে না। তিনি বঙ্কিমের গ্রন্থগুলির কোনও শ্রেণীবিভাগ করিয়া কোন্‌গুলি কোন্ শ্রেণীর তাহা দেখান নাই। দেখাইলে কোনও উপন্যাস চতুর্থ বা পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে কি না তাহা বুঝা যাইত।

অপর দিকে, পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বঙ্কিমের সকল উপন্যাসের মধ্যে দুর্গেশনন্দিনীকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। ন্যায়রত্ন 'সেকেলে' পণ্ডিত; তাঁহার সেকেলে বিবেচনা সকলেরই মনঃপুত হইবে এতটাও আশা করা যায় না, কিন্তু একেবারে সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস না হউক-তাহা যে নিকৃষ্টতম শ্রেণীর উপন্যাস নহে, ইহা আশা করি অনেকেই স্বীকার করিবেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতাবস্থায় যে পুস্তকের যত সংস্করণ হয় ও যতগুলি করিয়া পুস্তক ছাপা হয়, শচীশবাবু তাহার একটা হিসাব দিয়াছেন। ঐ তালিকাতে যতদূর দেখা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য পুস্তক অপেক্ষা দুর্গেশনন্দিনীরই অধিক সংস্করণ হইয়াছে এবং অন্য গ্রন্থ অপেক্ষা দুর্গেশনন্দিনী প্রায় দ্বিগুণ বিক্রয় হইয়াছে।[২] এই তালিকা সম্বন্ধে শচীশবাবু অবশ্য বলিয়াছেন যে, সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও উহা অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। সম্পূর্ণ হইলেও যে দুর্গেশনন্দিনী কাটতির হিসাবে প্রথমস্থান-চ্যুত হইত, এরূপ আশঙ্কার কারণ নাই। কেবল প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস বলিয়া যে

---

১। 'বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনচরিত' পৃ ৪৪৪ ও ৪৪৬। হারাণচন্দ্র রক্ষিতও লিখিয়াছেন, "দুর্গেশনন্দিনীতে বঙ্কিম যশোলাভ করিতে পারেন নাই—অধিকন্তু বিলক্ষণ নিন্দা ভোগ করিয়াছেন।"

২। শচীশবাবুর প্রদত্ত তালিকা হইতে হিসাব করিয়া দেখা যায় যে, বঙ্কিমের জীবিতাবস্থায় দুর্গেশনন্দিনী ১২৫০০, কপালকুণ্ডলা ও বিষবৃক্ষ প্রত্যেকটি ৭০০০, আনন্দমঠ, মৃণালিনী প্রত্যেকটি ৬০০০, দেবীচৌধুরাণী, রজনী প্রত্যেকটি ৫০০০, কৃষ্ণকান্তের উইল ৪০০০ খণ্ড বিক্রীত হয়। 'বঙ্কিমচরিত' ৩৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

[ বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে দুর্গেশনন্দিনীর তেরটি সংস্করণ হইয়াছিল; সর্বশেষ সংস্করণ হয় ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে।—স. ]

পরবর্তী পুস্তক অপেক্ষা অধিক সংস্করণ হইয়াছে তাহা বলা যায় না। ইহা পাঠক-সমাজের আদরের চিহ্ন ও বটে। পাঠকসমাজ দুর্গেশনন্দিনীকে নিকৃষ্ট শ্রেণীর গ্রন্থ বলিয়া মনে করিলে উহার এত অধিক বিক্রয় না হওয়াই সম্ভাব্য ছিল। এমত অবস্থায়, দুর্গেশনন্দিনী রচনায় বঙ্কিমের যশ হয় নাই, এমন কথা কিরূপে বলা যায়? কাটতির পরিমাণ গুণের নির্ণায়ক না হইতে পারে, কিন্তু উহা যে অযশের লক্ষণ নয় পরন্তু যশেরই নিদর্শন, ইহা নিশ্চিত। দুই-চারিজন সমালোচক যাহাই বলুন, দুর্গেশনন্দিনী লিখিয়া বঙ্কিম বায়রণের ন্যায় রাতারাতি যশস্বী না হইলেও সেকালের অবস্থা বিবেচনা করিলে তাঁহার যশ খুবই অল্প সময়ে আসিয়াছিল বলিতে হইবে।

দুর্গেশনন্দিনী পাঠকসমাজের প্রিয় হওয়ায় উহা প্রকাশিত হইবার কয়েক বৎসর পরে বেঙ্গল থিয়েটারের পরিচালকবর্গ ঐ গ্রন্থ নাটকাকারে পরিবর্তিত করিয়া অভিনয় করিতে আরম্ভ করেন।[১] বাঙ্গালা উপন্যাসের নাট্যাকারে পরিবর্তন ও অভিনয় বোধ হয় ইহাই প্রথম।[২] অভিনেতৃগণের নৈপুণ্যে উপাখ্যানের সৌন্দর্যের প্রতি আপামর সাধারণের দৃষ্টি পতিত হয়। উত্তরকালে বঙ্কিমের আরও অনেক উপন্যাস নাটকাকারে পরিবর্তিত ও অভিনীত হইয়াছে, কিন্তু সবগুলি সমান আদৃত হয় নাই। কপালকুণ্ডলা কবিত্বে অতুলনীয় হইলেও অভিনয়-যোগ্যতার অল্পতাহেতু উহা রঙ্গমঞ্চে ততদূর আদৃত হয় নাই। বঙ্কিমের গ্রন্থাবলীর মধ্যে চন্দ্রশেখর ও কৃষ্ণকান্তের উইলই ইদানীং অভিনয়-দর্শকদিগের সর্বাপেক্ষা প্রিয়।

দুর্গেশনন্দিনীর পূর্বে এদেশে সংস্কৃত, পার্শী, হিন্দী প্রভৃতি নানাভাষার গ্রন্থ হইতে সার সঙ্কলনপূর্বক বহু আখ্যায়িকা বা গল্পের বই প্রকাশিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু মৌলিক উপন্যাস দুই-একখানির অধিক প্রকাশিত হয় নাই। গল্পের বইয়ের মধ্যে পার্শী হইতে সঙ্কলিত চণ্ডীচরণ মুন্সীর তোতার ইতিহাস, বটতলার হাতেম তাই, চাহার দরবেশ প্রভৃতি, হিন্দী হইতে সঙ্কলিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেতালপঞ্চবিংশতি, সংস্কৃত হইতে সঙ্কলিত আনন্দ বিদ্যাবাগীশের বৃহৎকথা, বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা, তারাশঙ্করের কাদম্বরী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইংরাজী হইতেও কতকগুলি পুস্তক সঙ্কলিত হয়। স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার রামকমল ভট্টাচার্য-প্রণীত 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথাভ্রমণ'[৩] নামক একখানি পুস্তকের ও চুঁচুড়ার সুবোধিনী পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশিত 'ভারতবর্ষীয় কুটীর' নামক একটি গল্পের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ গল্প দুইটি নাকি 'ইংরাজী রোমান্স অব্ হিস্টরি' হইতে সঙ্কলিত। পুণ্যকীর্তি ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রণীত 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'ও ঐ পুস্তক হইতে সঙ্কলিত হয়। 'ঐতিহাসিক উপন্যাস', 'সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' এই দুই ভাগে বিভক্ত। দ্বিতীয়টি অনেকাংশে মৌলিক। ইহাতে

---

১। ১৮৭৩, ২০ ডিসেম্বর। —স.

২। 'কপালকুণ্ডলা' ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয় ১৮৭৩, ১০ মে। —স.

৩। বস্তুত উহা কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য-প্রণীত। —স.

শিবাজীর প্রতি আরঙ্গজেব-দুহিতা[1] রোসিনারার প্রেমসঞ্চার ও বিবাহ-প্রস্তাব ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। রোসিনারা শিবাজীর প্রতি মনে মনে আসক্ত হইয়াও, ম্লেচ্ছকন্যা বিবাহ করিলে নিজ সমাজে শিবাজীর সম্মান লাঘব হইবে, এই ভয়ে তাঁহার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতে সম্মত হন নাই। একজন হিন্দু বীরের প্রতি এক মুসলমানী রাজকুমারীর প্রেমকাহিনী দুর্গেশনন্দিনীতেও বর্ণিত হইয়াছে। আয়েষা কর্তৃক জগৎসিংহের শুশ্রূষার ন্যায় রোসিনারাও অস্ত্রাহত শিবাজীর রোগ-শয্যায় শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রেমসঞ্চার রেবেকার ন্যায় শুশ্রূষার পূর্বেই হইয়াছিল। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে' শিবাজী দিল্লী হইতে পলায়নকালে রোসিনারাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার উপায় উদ্ভাবনপূর্বক এক অঙ্গুরীয়ক সহ রোসিনারার সমীপে এক বারনারীকে প্রেরণ করেন। রোসিনারা বারবনিতার সহিত বাহির হইয়া না আসিয়া শিবাজীর অঙ্গুরীয়কের সহিত নিজ অঙ্গুরীয়ক বদল করিয়া তাঁহাকে একখানি পত্রে নিজের মনোগত সকল কথা অবগত করান। আয়েষা জগৎসিংহের সহিত অঙ্গুরীয়ক বিনিময় করেন নাই, কিন্তু চিঠি লিখিয়াছিলেন। রামদাস স্বামী ও অভিরাম স্বামীতেও কিঞ্চিত সাদৃশ্য আছে। একটা দ্বন্দ্ব-যুদ্ধও আছে। দুর্গেশনন্দিনী সম্পর্কে বঙ্কিমকে কেহ এপর্যন্ত 'অঙ্গুরীয়-বিনিময়'-এর নিকট ঋণী বলিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই, সেরূপ বলাও বোধ হয় অসঙ্গত হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া দুইখানি পুস্তকের উপাখ্যানে যে যৎকিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে তাহা উল্লেখের অযোগ্য নহে।

সে যাহা হউক, টেকচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল'ই বাঙ্গালা ভাষার প্রথম উপন্যাস বলিয়া বিদিত। ১২৬৪ সালে (১৮৫৭-৫৮ খৃস্টাব্দে) ঐ গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকার নিজেই ঐ গ্রন্থের ইংরাজী ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন, "The above original Novel in Bengali being the first work of the kind, is now submitted to the public with considerable diffidence" ইত্যাদি। তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ মাসিকপত্র Calcutta Review ঐ পুস্তকের সমালোচনাকালে লিখিয়াছিলেন, "We hail this book as the first novel in the Bengali language. Tek Chand Thakur has written a tale, the like of which is not to be found within the entire range of Bengali literature."

'আলালের ঘরের দুলাল' প্রথম উপন্যাস হইলেও উপন্যাসোচিত কলাকৌশলে খুব উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থ নহে। ভূদেবের 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে'র উদ্দেশ্য গল্পচ্ছলে এদেশ-বাসিগণকে 'কিঞ্চিৎ প্রকৃতি-বিবরণ ও হিতোপদেশ শিক্ষা' দেওয়া। সে উদ্দেশ্যের পক্ষে ঐ গ্রন্থের উপযোগিতা যাহাই হউক, শিল্পের হিসাবেও উহা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ নহে। দুর্গেশনন্দিনী বাঙ্গালার প্রথম কলাকৌশলময় উপন্যাস। উহা বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ

১। ইতিহাসে রোসিনারা আরঙ্গজেবের ভগিনী।

উপন্যাস না হইলেও, উহার প্রকাশকালে উহাই বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ছিল। যাহারা সে সময়ে উহার প্রতি সমুচিত আদর প্রদর্শন করিতে পারে নাই, তাহারা নিজেদেরই অজ্ঞতা ও রুচিহীনতা প্রদর্শন করিয়াছে।

দুর্গেশনন্দিনীর ভাষা নির্দোষ নহে। ইহাতে বঙ্কিমের বঙ্কিমত্ব ফুটে নাই; তবে উহার পূর্বাভাস দেখা যায় বটে। ইহাতে 'মধুদয়ে নববল্লরী যখন মন্দবায়ু-হিল্লোলে বিধূত হইতে থাকে, কে না তখন সুবাসাশয়ে সাদরে তাহার কাছে দণ্ডায়মান হয়? আর যখন নৈদাঘ ঝটিকাতে অবলম্বনবৃক্ষ-সহিত সে ভূতলশায়িনী হয়' ইত্যাদি কিংবা 'অট্টালিকা আমূলশিরঃপর্যন্ত কৃষ্ণ-প্রস্তরনির্মিত, দুইদিকে প্রবল নদীপ্রবাহ দুর্গমূল প্রহত করিত,' কিংবা 'দুর্গের যে ভাগে দুর্গমূল বিধৌত করিয়া আমোদর নদী কল কল রবে প্রবহন করে,' কিংবা 'অপরিচিত যুবাপুরুষের তেজঃপুঞ্জকান্তি দেখিয়া যদি আমার হস্তসমর্পিতা এই বালিকা মন্মথশরজালে বদ্ধ হয়, আর কিছু হউক বা না হউক, ইহার মনের সুখ চিরকালের জন্য নষ্ট হইবে, অতএব সে পথ এখনই রুদ্ধ করা আবশ্যক' ইত্যাদি-রূপ কিঞ্চিৎ উৎকট সংস্কৃতগন্ধ-যুক্ত ভাষাও যেমন আছে, তেমনই 'ওষ্ঠাধর দুইখানি গোলাবী রসে টলমল করিত; ছোট ছোট, একটু ঘুরান, একটু ফুলান, একটু হাসি হাসি,' ইত্যাদি আলালী রীতিও আছে। বঙ্কিমের ভাষা সম্বন্ধে সবিস্তর আলোচনা পরে করা যাইবে। প্রথম প্রথম অনেকে দুর্গেশনন্দিনীর 'খিচুরী ভাষা'র নিন্দা করিয়াছিলেন। কিন্তু আত্মক্ষমতায় ও নিজ রুচির উৎকর্ষে বঙ্কিমের এরূপ গভীর আস্থা ছিল যে, তিনি নিজের অবলম্বিত রীতি ত্যাগ করিবার লোক ছিলেন না। বহুগ্রন্থ রচনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রচনার প্রাঞ্জলতা বাড়িয়াছিল; কিন্তু রীতিতে বিশেষ ব্যতিক্রম হয় নাই। তদবলম্বিত রীতির শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে ইদানীং আর কাহারও সন্দেহ নাই। তাঁহার ভাষার, এমন কি তাঁহার উপন্যাস সমূহের উজ্জ্বলতার এক প্রধান কারণ তাঁহার নিজের পরিমাণবোধ ও রসজ্ঞতা। হাস্যরসের—'শুভ্র সংযত হাস্যের'—অবতারণায় বঙ্কিম কেবল বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রথম নহেন, তাঁহার সময়ে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিহীন ছিলেন। প্রথম উপন্যাস হইলেও দুর্গেশনন্দিনীতে বঙ্কিমের পরিমাণবোধ ও রসজ্ঞতা, বিশেষতঃ হাস্যরস-অবতারণায় দক্ষতা, প্রচুর রূপে প্রকটিত হইয়াছে।

দুর্গেশনন্দিনী বঙ্কিমের উপন্যাস-সমূহের প্লট বা ঘটনাবিন্যাস-কৌশলের উৎকৃষ্ট প্রতিনিধি। বঙ্কিমের কোনও উপন্যাসেই বিবরণীয় ঘটনাপুঞ্জ অসংহত বা তাহার কোনওটিই মূল ঘটনার সহিত ঘনিষ্ঠসম্পর্ক-শূন্য নহে। উপন্যাসের প্লট সচরাচর দুই রকমের হয়, এক প্রকার—সুসংহত ও ঐককেন্দ্রিকতা-ভাবযুক্ত, অপর—অসংহত বা বিক্ষিপ্ত। 'চোখের বালি' ও 'নৌকাডুবি' দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ। এক ঘটনা হইতে আর এক ঘটনা, তাহা হইতে আর এক ঘটনার সূচনা ও সঙ্গে সঙ্গে যথাস্থলে প্রয়োজনানুরূপ চরিত্র-সন্নিবেশই ইহার লক্ষণ। এই শ্রেণীর

উপন্যাস পড়িলে মনে হয় যেন, উপন্যাস-রচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে গ্রন্থকার উপন্যাসের সবগুলি ঘটনা সুক্ষ্মভাবে নির্ধারণ করিয়া না লইয়া, কি ভাবে শেষ করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে একটা স্থূল ও সাধারণ রূপ-সঙ্কল্প মনে লইয়া গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং তাঁহার প্রতিভা ধীরে ধীরে—যেন কতকটা তাঁহার অজ্ঞাতসারে—তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছে। আর প্রথম প্রকারের প্লটে গ্রন্থকার ঘটনা ও চরিত্রসমূহ পূর্বাহ্নেই যথাসম্ভব সূক্ষ্ম ও সুসমঞ্জসভাবে নিরূপিত করিয়া, চিত্রকর যেরূপ পেন্সিলে অঙ্কিত ছায়ার উপর বর্ণবিন্যাস করিয়া যায়, সেইভাবে ঘটনা ও চরিত্র চিত্রিত করিয়া যান। দুই প্রকার প্রথারই দোষ-গুণ আছে। সুসংহত প্লটের গুণ এই যে, তাহা সর্বাবয়বে সুবিন্যস্ত, সুসম্বদ্ধ, সুপরিমিত, ও সুশৃঙ্খল। শৃঙ্খলা ও ভিন্ন ভিন্ন অবয়বের মধ্যে পরিমাণ-সামঞ্জস্য যে পরিমাণে কোনও বস্তুর সৌন্দর্যবিকাশের সহায় ও দর্শকের চিত্তরঞ্জনে সমর্থ, প্রথমশ্রেণীর প্লটের উৎকর্ষও সেই পরিমাণে অধিক। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি এই শ্রেণীর। ইহার দোষ এই যে, মূল ঘটনাটিকে কেবল নিজের সৌন্দর্যের উপর নির্ভর করিতে হয়, দ্বিতীয় শ্রেণীর প্লটের ন্যায় উহা কতকগুলি অবান্তর, কিন্তু বিচিত্র ঘটনাবলী হইতে বর্ণসম্পদ লাভ করিয়া অধিকতর সমুজ্জ্বল ভাবে ফুটিয়া উঠিতে পারে না। প্রথম শ্রেণীর প্লটে চরিত্রগুলির ক্রমবিকাশও ততদূর স্পষ্টভাবে দেখান যায় না; এমন কি, অনেক সময়ে প্রধান প্রধান পাত্রগুলিরও চরিত্রের সবদিক্ স্পষ্ট করিয়া প্রদর্শন করার সুযোগ হয় না। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্লটে এই সকল বিষয়ে সুবিধা থাকিলেও গঠনের শিথিলতা যে কিয়ৎপরিমাণে সৌন্দর্যের লাঘব করে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। পুনঃ পুনঃ অবান্তর, প্রসঙ্গের অবতারণায় পাঠকের ধৈর্যলোপেরও যে আশঙ্কা না থাকে, তাহা নহে। একটা চরিত্রের ক্রমবিকাশ বা সর্বাঙ্গীণ আলেখ্য-দর্শনে আনন্দ আছে বটে, কিন্তু সেই ক্রমবিকাশ বা সর্বাঙ্গীণ আলেখ্য দেখাইবার জন্য পাঠকের ধৈর্যের ও সময়ের প্রতি কতখানি দাবী করা যুক্তিসঙ্গত এবং কতদূর গেলে ঔচিত্যের সীমা লঙ্ঘন করা হয় বা সৌন্দর্যের প্রধান উপকরণ ভিন্ন-ভিন্নাবয়বগত পরিমাণ-সামঞ্জস্যের হানি জন্মে, তৎসম্বন্ধে ঔপন্যাসিকের স্পষ্ট ধারণা ও সমুন্নত সংস্কার না থাকিলে পাঠকের রসভঙ্গ অনিবার্য হইয়া পড়ে।

বলা বাহুল্য, প্রতিভাশালী লেখকগণ শেষোক্ত দোষে কদাচিৎ দোষী হন, কিন্তু প্লটের শিথিলতা-দোষ বড় বড় ঔপন্যাসিকগণের গ্রন্থেও দুর্লভদর্শন নয়। ইংরাজী ভাষার Pickwick Papersএর প্লটের গঠন এত শিথিল যে অনেকে ইহাকে উপন্যাস বলিতেই সঙ্কুচিত হন। Pendennis, The Newcomes, Vanity fair, Joseph Andrews প্রভৃতি সুবিখ্যাত উপন্যাসেও সমালোচকগণ (চন্দ্রে কলঙ্কের ন্যায়) প্লটের শিথিলতা দোষ নির্দেশ করিয়াছেন।

পূর্বোক্ত দুই শ্রেণীর প্লটের মধ্যে কোন্‌টা উৎকৃষ্ট তাহা প্রতিপাদন করা এই

প্রসঙ্গের উদ্দেশ্য নহে। তাহা সহজও নহে। বঙ্কিম কোন্ রীতি প্রশস্ত মনে করিয়াছিলেন তাহা দেখানই এই প্রসঙ্গের উদ্দেশ্য। ঘটনাবিন্যাস-বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনীতে যে রীতি অবলম্বন করিয়াছেন, শেষ পর্যন্ত প্রায় সেই রীতিরই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার প্লটগুলি সর্বত্রই সবল ও সুসংহত। সময়ে সময়ে তাঁহাকে দুই-একটি কষ্টকল্পিত উপায় অবলম্বন করিয়াও প্লটের নিবিড়তা রক্ষা করিতে হইয়াছে। বর্তমান কালের বাঙ্গালা ঔপন্যাসিকগণের রুচি দ্বিতীয় প্রকারের প্লটের দিকেই যেন ক্রমশঃ অধিকভাবে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। ইংরাজী সাহিত্যের গতযুগের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির অধিকাংশই এই প্রথায় লিখিত। কিন্তু আধুনিক ইংরেজ ও অন্যান্য পাশ্চাত্য লেখকগণ, যে কারণেই হউক, যেন প্রথম শ্রেণীর প্লটের প্রতি ক্রমশঃ অধিক পক্ষপাত প্রদর্শন করিতেছেন।

দুর্গেশনন্দিনীর কোনও কোনও চরিত্র নূতন আকারে বা অপেক্ষাকৃত পূর্ণতর অবয়ব প্রাপ্ত হইয়া উত্তরকালীন দুই-একটি উপন্যাসে দেখা দিয়াছে। বিমলার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। অভিরাম স্বামীকেও আমরা পরে নানা স্থানে নানা বেশে দেখিব।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

## কপালকুণ্ডলা

খুলনা হইতে বঙ্কিমচন্দ্র বারুইপুরে বদলি হন। ঐ স্থানে তিনি অধিক দিন ছিলেন না। তথা হইতে ডায়মণ্ডহারবারে বদলি হন। কিন্তু ডায়মণ্ডহারবারে অল্পকাল অবস্থিতির পরই তাঁহাকে পুনরায় বারুইপুরে যাইতে হয়। ১৮৬৭ খৃস্টাব্দের জুলাই মাস পর্যন্ত বঙ্কিম বারুইপুরে ছিলেন। বঙ্কিমের কর্মজীবন সম্বন্ধে ইদানীং কোনও তথ্য সংগ্রহ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে।[১] সেকালের একজন ডেপুটির জীবনে নানা বৈচিত্র্য ছিল। কবিবর নবীনচন্দ্র সেন 'আমার জীবন' এ তাঁহার সমুদয় কার্যের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। নবীনবাবুর ন্যায় বঙ্কিমচন্দ্র চাকরিক্ষেত্রে অত্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠ কর্মচারী ছিলেন, কিন্তু হায় আমরা তাঁহার কৃত অতি অল্প কর্মেরই বিবরণ জানি। ডেপুটি বঙ্কিম তাঁহার সার্ভিসের অসন্তোষ ছিলেন, এইরূপ মর্মের দুই-একটা উক্তি এখানে-ওখানে শুনিতে পাই মাত্র। কিন্তু শাসন ও বিচারকর্তৃরূপে তিনি মানবচরিত্রাদি সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তদীয় সাহিত্যিক প্রতিভা বিকাশের পক্ষে উহা

১। সম্প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের চাকুরী-জীবনে উর্ধতন কর্মচারীর গোপনীয় মন্তব্যগুলি সংকলিত হইয়াছে। দ্র. N K. Sinha, Bankim Chandra Chatterjee in the Little World of a Civil Servant—Bengal Past and Present. July December, 1971 —স

তাঁহার কতদূর সহায় হইয়াছিল, তাহার কোনও বিবরণ কেহই দেন নাই। শচীশবাবুর গ্রন্থে খুলনায় নীলকর হাঙ্গামা এবং আরও দুই-একটি ঘটনার কিছু কিছু বিবরণ আছে। তিনি আরও দেখাইয়াছেন, অপেক্ষাকৃত অল্পকাল মধ্যে বঙ্কিমের পুনঃ পুনঃ বেতন বৃদ্ধি হইয়াছিল এবং তিনি বহুবার অনেক সিনিয়ার ডেপুটিকে অতিক্রম করিয়া পদোন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন' পাঠ করিবার পর কাহার না ইচ্ছা হয়, বঙ্কিমবাবুও স্বয়ং কিংবা তাঁহার কোনও অন্তরঙ্গ বন্ধু আমাদিগকে তদীয় চাকরি-জীবনের ঐরূপ একটা বিবরণ দিতেন? কিন্তু যাহা হয় নাই ও হইবার নহে তাহার জন্য আক্ষেপ বৃথা।

বঙ্কিমচন্দ্রের বারুইপুরে অবস্থিতিকালে কপালকুণ্ডলা লিখিত হয়। পূর্বে বলিয়াছি, তিনি ১৮৬৭ খৃস্টাব্দের মধ্যভাগ পর্যন্ত বারুইপুরে ছিলেন; ঐ বৎসরই কপালকুণ্ডলা প্রকাশিত হয়।[১]

'দুর্গেশনন্দিনী'র উৎকর্ষাপকর্ষ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও কপালকুণ্ডলা যে একখানি অতি উৎকৃষ্ট—শচীশবাবুর ভাষায়, প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস তদ্বিষয়ে কাহারও বড় সন্দেহ নাই। রায় সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত বলিয়াছেন, "কাব্যাংশে কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমের চরম সৃষ্টি,—উৎকৃষ্ট কাব্যের উৎকৃষ্টতর সৃষ্টি। এ সৃষ্টির পার্শ্বে বঙ্কিমের অন্যান্য সৃষ্টি ধরিলে ম্লান ও মলিন হইয়া যায়। শুধু কাব্যাংশে কেন—নাট্যাংশেও 'কপালকুণ্ডলা' বঙ্কিমের উৎকৃষ্ট সৃষ্টি।"[২] শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয়

১। এই পরিচ্ছেদটি 'ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনে' (আশ্বিন, ১৩২৬) প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে যোগেশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ ভারতবর্ষে (আষাঢ়, ১৩৩০) 'কপালকুণ্ডলার পরিকল্পনাক্ষেত্র' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। গ্রন্থকার শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত ওই প্রবন্ধ হইতে তাঁহার গ্রন্থের ভবিষ্যৎ সংস্করণে সন্নিবেশের জন্য একটি সংবাদ সংগ্রহ করেন।

হিজলীর অন্তর্গত দরিয়াপুর গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখিয়া বঙ্কিমের অন্তরে কপালকুণ্ডলা রচনার সূচনা হয়। (On one side vast sandy shore, on another side the sea)। হিজলী কাঁথি (নেগুয়া) কপালকুণ্ডলার পরিকল্পনাক্ষেত্র। হিজলী কাঁথির প্রবীণ উকিল শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় বি-এল দরিয়াপুর গ্রামে কপালকুণ্ডলার পরিকল্পনা-ক্ষেত্রে বঙ্কিমের একটি স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং সেই স্থানে স্মৃতিসভা ও দিবসত্রয়ব্যাপী একটি বাৎসরিক মেলা হইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

দরিয়াপুর গ্রামে যে প্রাচীন মন্দির আছে তাহার সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে লৌহদণ্ডের বেষ্টনীমধ্যে স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহাতে লেখা হইয়াছে—

বঙ্কিমচন্দ্র স্মৃতি ফলক
কপালকুণ্ডলার পরিকল্পনাক্ষেত্র
এই দরিয়াপুর গ্রামে
কাঁথিবাসিগণ কর্তৃক স্থাপিত
সন ১৩২৬ সাল। —স.

২। হারাণবাবু লিখিতেছেন, "অদৃষ্টবাদের উপর ভিত্তিস্থাপনই নাটকত্ব।" গ্রীক ট্রাজেডিতে এবং সেক্সপীয়রের হামলেট, কিং লিয়ার প্রভৃতি কয়েকখানি নাটকে অদৃষ্টের ক্রূর লীলাই নাটকীয় বস্তুর প্রতিপাদ্যরূপে প্রতিপন্ন হইলেও, কেবল অদৃষ্টবাদের উপরই

অক্ষয়চন্দ্র সরকার অতি অল্পকথায় কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধে অতি উজ্জ্বল ও সূক্ষ্ম সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "এমন অচ্ছিদ্র, উজ্জ্বল, বাচালতা-শূন্য অথচ রসপরিপূর্ণ, হিন্দুভাবে অস্থিমজ্জায় গঠিত, অদৃষ্টবাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রেখায় ওতপ্রোত কাব্যগ্রন্থ বাঙ্গালায় আর নাই। কেবল মাত্র কপালকুণ্ডলা লিখিলেই কপালকুণ্ডলাকার কবি বলিয়া পরিচিত হইতেন। অন্য গ্রন্থ লিখিবার প্রয়োজন ছিল না।"[১]

শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্ব-প্রণীত 'কপাল-কুণ্ডলাতত্ত্বে' কপালকুণ্ডলার কাব্যাংশ, বিশেষতঃ, কপালকুণ্ডলা-চরিত্র প্রচুর পাণ্ডিত্য, গবেষণা ও দক্ষতা সহকারে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি মিল্‌টনের ঈভ, কালি-দাসের শকুন্তলা, হোমারের নসিকেয়া, সেক্সপীয়রের মিরাণ্ডা ও পার্ডিটা, বায়রণের হেইডী, জর্জ এলিয়টের এপির সহিত কপালকুণ্ডলার তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, যদিও ঐ সকল চরিত্রের সহিত প্রকৃতি-পালিতা কপালকুণ্ডলার 'ন্যূনাধিক সাদৃশ্য' আছে, তথাপি কাব্যাংশে কপালকুণ্ডলা এক অপূর্ব মনোরম সৃষ্টি। তাঁহার মতে বঙ্কিমচন্দ্র 'পূর্বগামী কবিগণের কাব্য হইতে কোন কোন ভাব ও উপাদান গ্রহণ করিলেও তাঁহার মৌলিকত্ব ক্ষুণ্ণ হয় নাই।' কপালকুণ্ডলা চরিত্রের সমগ্র সৌন্দর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে ললিতবাবুর 'কপালকুণ্ডলাতত্ত্ব' খানি একবার পাঠ করা আবশ্যক।

কিন্তু ললিতবাবুর পাণ্ডিত্য যেরূপ তদীয় সমালোচনার ঔজ্জ্বল্য সাধন করিয়াছে, গ্রন্থকারের প্রতি হয়ত সেরূপ সুবিচার করে নাই, কেননা কপালকুণ্ডলা-চরিত্রের সৃষ্টিকালে ললিতবাবুর উল্লিখিত সবগুলি চরিত্রচিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে প্রকটভাবে বিরাজিত ছিল কিনা বলা যায় না। অন্ততঃ ঐ সময়ে হোমারের নসিকেয়া, মিল্টনের ঈভ ও জর্জ এলিয়টের এপির চরিত্র তাঁহার মানসদর্পণে আদৌ প্রতিফলিত হইয়াছিল কিনা তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। জর্জ এলিয়টের 'সাইলাস্ মার্নার' উপন্যাস ১৮৬১ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কপালকুণ্ডলা ১৮৬৭ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হইলেও, পরে দেখিব, নেগুয়া মহকুমায় অবস্থিতিকালেই উহার আখ্যানবস্তু বঙ্কিমের কল্পনায় কিয়ৎপরিমাণে আকার ধারণ করিয়াছিল। শচীশ-বাবুর মতে ১৮৬০ খৃস্টাব্দের নবেম্বর মাসে বঙ্কিম নেগুয়া হইতে খুলনায় বদলি হন।

নাটকের ভিত্তি স্থাপিত, একথা অনেকেই স্বীকার করিবেন না। সুতরাং কপালকুণ্ডলার নাট্যাংশ সম্বন্ধে রায় সাহেবের মত সর্বাংশে গ্রহণীয় নয়।

১। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন কপালকুণ্ডলায় তাদৃশ সৌন্দর্য দেখিতে পান নাই। তিনি বলেন, "গ্রন্থের নায়ক বা নায়িকার গুণ সকল এরূপ হওয়া উচিত যাহা অন্যের স্পৃহণীয় হইতে পারে। কপালকুণ্ডলার রূপ ও অন্যান্য রমণীয় গুণ ছিল সত্য, কিন্তু তাঁহার তাদৃশী উদাসীন প্রকৃতিকতা কি কোন সংসারীর বাঞ্ছনীয় হইতে পারে? কপালকুণ্ডলার ন্যায় কামিনীকে কোন পাঠক আপন গৃহিণী করিতে চাহেন কি? আমরা ত কখনই না।" !!!

ইহা ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র যে নূতন একখানি বিলাতী উপন্যাস বাহির হইলেই আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন ইহাও আমাদের মনে হয় না। পূর্বে দেখিয়াছি দুর্গেশনন্দিনী লিখিবার পূর্বে তিনি স্কটের আইভানহো-ই পাঠ করেন নাই; অথচ উহা একখানি সর্বজনপরিচিত উপন্যাস, এবং উহা বঙ্কিমের জন্মের প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্বে (১৮১৯ খৃস্টাব্দে) প্রকাশিত হইয়াছিল। জর্জ এলিয়টের উপন্যাস সম্বন্ধে বঙ্কিমের মত কমলাকান্তের মুখে কিঞ্চিৎ প্রকাশ পাইয়াছে। কমলাকান্ত বলিতেছেন, স্ত্রীলোকের বিদ্যা নারিকেলের মালার ন্যায় "কখন আধখানা বৈ পুরা দেখিতে পাইলাম না। নারিকেলের মালা বড় কাজে লাগে না, স্ত্রীলোকের বিদ্যাও বড় নয়। মেরী সমরবিল বিজ্ঞান লিখিয়াছেন, জেন অস্টেন বা জর্জ এলিয়ট উপন্যাস লিখিয়াছেন, মন্দ হয় নাই, কিন্তু দুই মালার মাপে।" অবশ্য, জর্জ এলিয়টের কতকগুলি উপন্যাস না পড়িলে তিনি এরূপ মতে উপনীত হইলেন কিরূপে? কিন্তু তাই বলিয়া কপালকুণ্ডলা লেখার পূর্বে তিনি সাইলাস মার্নার পড়িয়াছিলেন এরূপ সিদ্ধান্ত নিঃসংশয়রূপে করা যায় না। আর সাইলাস্ মার্নার খানি ঠিক 'মালার মাপে'ও নয়।

তুলনামূলক সমালোচনায় যে গ্রন্থকারের প্রতি সব সময়ে সুবিচার হয় না, পরন্তু ঐ পদ্ধতিতে যে একটা বিপদ আছে, তাহা শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক ললিতবাবু না বুঝিয়াছেন, তাহা নয়; সেইজন্য 'কপালকুণ্ডলা'র পুনঃ পুনঃ নায়িকার ঘনকৃষ্ণ নিবিড় অবদ্ধ চিকুরজাল-বর্ণনায় প্রতি লক্ষ্য করিয়া এবং হেইডী, এপি প্রভৃতির কেশ-বর্ণনার সহিত ঐ বর্ণনার সাদৃশ্য উল্লেখ করিয়া সুরসিক সমালোচক বলিয়াছেন, "এই সকল উদ্ধৃত বাক্যের ঘটা দেখিয়া কেহ যেন ভাবিয়া না বসেন 'যে, বঙ্কিমচন্দ্রের মানসী সৃষ্টি কপালকুণ্ডলার চুল ধার করা অর্থাৎ পরচুলা মাত্র!" ললিতবাবুর কপালকুণ্ডলা-তত্ত্বের প্রথমাংশ পড়িয়া অসতর্ক পাঠকমাত্রেরই কপালকুণ্ডলা-চরিত্রের মৌলিকতা সন্দেহ করিবার আশঙ্কা আছে। ললিতবাবু অবশ্য ইহার জন্য দায়ী নহেন, তবে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং তদবলম্বিত রীতি কিয়ৎ-পরিমাণে দায়ী বটে। পণ্ডিত কর্তৃক তুলনামূলক রীতির বিচারে জগতের কবি ও ঔপন্যাসিকগণের মধ্যে অনেকেরই মৌলিকতা-খ্যাতির মূলে সন্দেহোৎপাদন সম্ভব। বিদ্বানের একটি নাম দোষজ্ঞ। পণ্ডিতের হাতে পড়িলে দোষ ত ধরা পড়েই, অনেক নির্দোষ ব্যক্তিও অনেক সময়ে দোষী প্রতিপন্ন হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশ-নন্দিনীর মৌলিকতা সম্বন্ধে বিচার ইতিপূর্বে করা গিয়াছে। আমরা দেখিয়াছি, অনেকে তাঁহাকে স্কটের নিকট ঋণী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। কিন্তু নানাদেশীয় সাহিত্যে কৃতবিদ্য একজন পণ্ডিতের হাতে দুর্গেশনন্দিনীখানি ফেলিয়া দাও, দেখিবে তিনি বঙ্কিমের আরও কয়জন উত্তমর্ণ আনিয়া উপস্থিত করেন। এক দেবালয়ে প্রেমের সূচনাসম্পর্কেই তিনি হয়ত দেখাইবেন Musæusএর Hero ও Leander গ্রন্থেও সেস্টসের ভিনাস্ দেবীর মন্দিরে নায়ক-নায়িকার প্রথম দর্শন

হয়। Helidorusএর Aethiopicaয় নায়ক Theagenes নায়িকা Charicleaকে ডেল্‌ফির উৎসবে প্রথম দেখেন। বস্তুতঃ একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি (Rohde) বলিয়াছেন, গ্রীক উপন্যাস (Romance) মাত্রেই নায়ক-নায়িকার প্রথম দর্শন প্রায়ই দেবালয়ে ঘটিয়াছে দেখা যায়। গ্রীক সমাজের উচ্চস্তরের যুবক-যুবতীগণের মধ্যে পরস্পর সাক্ষাৎকারের অন্যবিধ পন্থা একরূপ ছিল না-ই বলা যায়। পণ্ডিতের পক্ষে বাস্তব জীবন হইতেও দেবালয়ে প্রথম দর্শনের দৃষ্টান্ত দেওয়া কঠিন নয়। এক ভজনালয়েই (Chapel) লরার সহিত পিট্রার্কের প্রথম পরিচয় হয়, এবং নেপল্‌সের নগ্নপাদ ভিক্ষুগণের ভজন-মন্দিরে (Church of the bare-footed friars of Naples) বোকাচিও মেরায়ার সহিত প্রণয়বন্ধনে আবদ্ধ হন। সংস্কৃত কথাসরিৎসাগর প্রভৃতি হইতেও দেবালয়ে প্রেম-ঘটনার উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। এইরূপে চেষ্টা করিলে কেবল দুর্গেশনন্দিনীর কেন, যে কোনও ঔপন্যাসিকের যে কোনও গ্রন্থের একটা না একটা 'আদর্শ' আবিষ্কার করা বিদ্বানের পক্ষে অসাধ্য নয়।

আবার প্রকৃতিপালিত স্ত্রীচরিত্রবর্ণনকারী কোনও কবির কৃতি দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র একবারেই উপকৃত হয়েন নাই, ইহা বলাও আমাদের উদ্দেশ্য নহে। শচীশচন্দ্রের গ্রন্থে দেখিতে পাই বঙ্কিম বলিয়াছেন যে, কপালকুণ্ডলা রচনার সময় তিনি সেক্সপীয়রের নাটকাবলী খুব পড়িতেন। আর বায়রন সে কালের শিক্ষিত ব্যক্তি-গণের ত প্রিয়কবি ছিলেনই, পরন্তু বঙ্কিম কপালকুণ্ডলার এক পরিচ্ছেদের শিরোভাগে 'ডন্ জুয়ান' হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃতও করিয়াছেন। সুতরাং মিরাণ্ডা, (এবং হয়ত পার্ডিটাও) এবং হেইডী কপালকুণ্ডলার রচনাকালে বঙ্কিমের মনে ছিল এরূপ অনুমান করা অযৌক্তিক নহে। তাহা হইলেও, মোটের উপর পূর্বগত কোনও কবির নিকটই বঙ্কিমের ঋণ যে অধিক নহে, তাহা অধ্যাপক ললিতবাবুর গবেষণাপূর্ণ সমালোচনা দ্বারাই উপপন্ন হয়।

কপালকুণ্ডলার উপাখ্যানবস্তু যে ভাবে বঙ্কিমের কল্পনায় আকার পরিগ্রহ করে, তাহা তদীয় সহোদর পূর্ণচন্দ্রের বর্ণিত নিম্নলিখিত বৃত্তান্তটুকু হইতে কতকটা অবগত হওয়া যায়। পূর্ণবাবু লিখিয়াছেন—

> যখন বঙ্কিমচন্দ্র নেগুয়া মহকুমাতে ছিলেন, (এক্ষণে উহাকে কাঁথি মহকুমা বলে) তখন সেইখানে একজন সন্ন্যাসী কাপালিক তাঁহার পশ্চাৎ লইয়াছিল, মধ্যে মধ্যে নিশীথে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিত। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে নানাপ্রকার ভয়প্রদর্শন করিতেন, তবুও মধ্যে মধ্যে আসিত। যখন তিনি সমুদ্রতীরে চাঁদপুর বাঙ্গালায় বাস করিতেন, তখন এই সন্ন্যাসী প্রতিদিন গভীর রাত্রিকালে দেখা দিত। চাঁদপুরের কিছুদূরে সমুদ্রতীরে নিবিড় বনজঙ্গল ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা হইয়াছিল যে ঐ সন্ন্যাসী সমুদ্রতীরে সেই বনে বাস করিত। কিছুদিন পরে বঙ্কিমচন্দ্র ঐ স্থান হইতে খুলনা মহকুমায় (খুলনা

তখন জেলা ছিল না) বদলি হন। ঐ সময়ে[১] তিন-চারিদিন বাটীতে অবস্থিতিকালে দীনবন্ধু আসিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে, একটি প্রশ্ন করিলেন, যথা—

"যদি শিশুকাল হইতে ষোল বৎসর পর্যন্ত কোনও স্ত্রীলোক সমুদ্রতীরে বনমধ্যে কাপালিক দ্বারা প্রতিপালিতা হয়,' কখনও কাপালিক ভিন্ন অন্ত কাহারও মুখ না দেখিতে পায়, কেবল বনে বনে সমুদ্রতীরে বেড়ায়, পরে সেই স্ত্রীলোকটিকে যদি কেহ বিবাহ করিয়া সমাজে লইয়া আইসে, তবে সমাজ-সংসর্গে তাহার কতদূর পরিবর্তন হইতে পারে ও তাহার উপর কাপালিকের প্রভাব কি একেবারে অন্তর্হিত হইবে ?" যখন বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুকে এই প্রশ্ন করেন, তখন সেই স্থানে কেবল সঞ্জীবচন্দ্র ও আমি উপস্থিত ছিলাম। সঞ্জীবচন্দ্র ব্যঙ্গপ্রিয় ছিলেন। তিনি বলিলেন, "যদি দরিদ্র ঘরে তাহার বিবাহ হয়, তাহা হইলে মেয়েটা চোর হইবে ; বনজঙ্গলে ভাল দ্রব্যাদি খাইতে পাইত না, সমাজে আসিয়া ভাল খাদ্যদ্রব্যাদি দেখিয়া বড় লোভী হইবে; দরিদ্র ঘরে ভাল আহার জুটিবে না, পরের ঘরে চুরি করিয়া খাইবে, অলঙ্কারাদি চুরি করিয়া পরিবে।" পরে ব্যঙ্গ ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কিছুকাল সন্ন্যাসীর প্রভাব থাকিবে, পরে সন্তানাদি হইলে, স্বামিপুত্রের প্রতি স্নেহ জন্মাইলে সমাজের লোক হইয়া পড়িবে, সন্ন্যাসীর প্রভাব তাহার মন হইতে একেবারে তিরোহিত হইবে।" ভাবগতিকে বুঝিলাম বঙ্কিমচন্দ্রের একথা মনোমত হইল না। দীনবন্ধু কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না। ইহার পর দুই বৎসরের মধ্যে[২] কপালকুণ্ডলা প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমচন্দ্র এই কাপালিক-প্রতিপালিতা কন্যাকে সমুদ্রতটবিহারিণী বনচারিণী সৃষ্টিছাড়া এক অপূর্ব মধুর প্রকৃতির মোহিনী মূর্তিরূপে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।[৩]

উদ্ধৃত বিবরণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে, বঙ্কিম যেন সমাজ-বিজ্ঞান বা মনো-বিজ্ঞানের একটা জটিল এবং তৎকালপর্যন্ত অসমাহিত সমস্যা সমাধান করিবার জন্যই কপালকুণ্ডলা লিখিতে প্রবৃত্ত হন। মানুষের চরিত্রের কতখানি সমাজের প্রভাবে গঠিত হয়, এবং কতখানি প্রকৃতি হইতে পাওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে নানা মনীষী নানা ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ দেখাইয়াছেন, জীবজগতে বৈচিত্র্যমাত্রই আবেষ্টনের প্রভাবে উৎপন্ন হয়। জীব-বিজ্ঞানে ঐ তত্ত্ব Laws of Variation নামে পরিচিত। সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক এ, আর্ ওয়ালেস্ এই আবেষ্টনের বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব সম্বন্ধে অতি স্পষ্টভাবে স্বীয় মত ব্যক্ত করিয়াছেন।[৪] সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ মানুষের স্বভাবে দুইটি স্বতন্ত্র দিক্

১। শচীশবাবুর মতে, ১৮৫০ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসে।

২। এইস্থানে পূর্ণবাবুর ভ্রম হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

৩। ভারতী, চৈত্র, ১৩২১।

৪। Not only is each organism necessarily related to and affected by all

দেখিয়াছেন ; মানুষ আংশিক পরিমাণে প্রকৃতির শিশু, সে প্রকৃতি হইতে কতকগুলি শক্তি, ও কতকগুলি প্রবৃত্তি—তাহার দৈহিক ও মানসিক কতকগুলি সম্পদ্ প্রাপ্ত হয়। আবার বহুল পরিমাণে সে সমাজেরও সন্তান বটে ; সমাজ তাহার মনোবৃত্তিগুলিকে একটা বিশিষ্ট ভাবে নিয়মিত করিয়া—তাহার বুদ্ধির উন্মেষ সাধন, ন্যায়ান্যায়-বোধের মাত্রা ও প্রকার নির্দেশ, ও স্বাভাবিক প্রেরণাগুলির নিয়ন্ত্রণ দ্বারা —তাহার সংস্কারগুলি গঠিত করে, এমন কি, অবস্থাবিশেষে তাহার রুচি ও আচরণ পর্যন্ত পূর্ব হইতে নির্ধারিত করিয়া দেয়। সমাজের এই প্রভাবের ফল ভাল কি মন্দ এবং কতখানি ভাল ও কতখানি মন্দ তৎসম্বন্ধে বহু বাদবিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে। এককালের ফরাসি দার্শনিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, সমাজের প্রভাবে মানুষের চিত্ত কলুষিত হয়, তাহার সহজাত সরলতা ও পবিত্রতা বিলুপ্ত হয়। তাঁহারা মানুষের পক্ষে প্রকৃতির অঞ্চলের ছায়ায় প্রত্যাবর্তনই সামাজিক সর্ববিধ দুঃখ, দৈন্য, তাপ, দোষ, অত্যাচার, অবিচার প্রভৃতি হইতে মুক্তিলাভের উপায় বলিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন। কবিবর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থও কতকটা তাঁহাদের সুরে সুর মিলাইয়া সমাজের প্রভাব অপেক্ষা প্রকৃতির প্রভাবকে চিত্তের ঔদার্যসাধক ও পরমকল্যাণকর বলিয়া গাহিয়াছিলেন। মানুষের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া মানুষ কিরূপ একটা জীবে পরিণত হইতে পারে, তাহা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিবার সুযোগ কাহারও হয় নাই, হওয়া সম্ভব নহে। কেননা, কবিগণ প্রকৃতিমাতাকে যতই বৎসলা বলিয়া ব্যাখ্যা করুন, বিজ্ঞান বলে, সেই মায়ের সাথে প্রতিমুহূর্তে সংগ্রামই জীবমাত্রের একমাত্র কার্য। একটি শিশুকে নিঃসহায়ভাবে প্রকৃতির হাতে ফেলিয়া দেও, দেখিবে প্রকৃতিধাত্রী কি রাক্ষসী! তথাপি যখনই মানুষের কোনও শক্তি বা বৃত্তি বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মূল সম্বন্ধে বিচার উপস্থিত হইয়াছে, তখনই কি কবি, কি বৈজ্ঞানিক, কি দার্শনিক, কেহই মানুষের ঐরূপ একটা নিঃসঙ্গ অবস্থা কল্পনা করিয়া এক-একটা সিদ্ধান্ত করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। ভাষাবিজ্ঞানের উৎপত্তির ইতিহাস হইতে ইহার একটা কৌতুকজনক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। কোনও মনুষ্যশিশু সমাজ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে পালিত হইলে স্বভাবতঃ কোনও ভাষা শিখিবে কি না, এবং শিখিলে কোন্ ভাষা শিখিবে, তৎসম্বন্ধে য়ুরোপের খৃস্টান পণ্ডিতগণ এককালে বহু জল্পনাকল্পনা করিয়া পরিশেষে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, ভাষা মানুষের প্রকৃতিদত্ত একটা সম্পদ্ ; মানুষ মা, বাপ, ভাই, বোন্ কাহারও মুখে কোনও কথা না শুনিলেও ভাষা শিখিবে, এবং ঐরূপে স্বভাবতঃ যে ভাষা শিখিবে তাহা ইংরাজী, ফরাসী, জার্মাণ প্রভৃতি আধুনিক

---

things, living and dead, that surround it, but every detail of form and structure, of colour, food and habits, must—it is now held—have been developed in harmony with, and to a great extent as a result of, the organic environments.—A. R. Wallace.

কোনও ভাষা নহে, গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি ভাষাও নহে, খৃস্টানগণের আদিপুস্তকের ভাষা হিব্রু! অধ্যাপক মোক্ষমূলর দেখাইয়াছেন, আমাদের দেশের বৌদ্ধগণও এককালে ঐ রীতিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, কোনও শিশু যদি মা, বাপ বা আর কাহারও ভাষা না শুনিতে পায় তবে সে স্বতঃ মাগধী ভাষা শিখিবে! সে যাহা হউক, ঐরূপে নানা দেশের নানা কবিও নিজ নিজ রুচি অনুসারে যথাসম্ভব প্রকৃতির শিশু কল্পিত করিয়া তাহাদিগকে কতকগুলি দোষগুণে সম্পন্ন অন্য কতকগুলি গুণে ও দোষে বঞ্চিত দেখাইয়াছেন। কবিগণের মধ্যে অনেকে নারীচরিত্র লইয়াই অধিক বিচার করিয়াছেন। বিবসনা বা বিরলবসনা নারীর প্রতিকৃতি অঙ্কন যেমন চিত্রশিল্পিগণের একটা বড় সাধের 'motif' সেইরূপ যতদূর সম্ভব সমাজ-প্রভাবমুক্ত নারীচরিত্র সৃষ্টিও কবিগণের এক প্রিয় ব্যবসায়। বঙ্কিমচন্দ্রও বোধ হয় সেই জন্যই তাহার কবিজীবনের সূচনায় ঐরূপ একটা চরিত্রসৃষ্টির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। য়ুরোপে কিছুদিন যাবৎ একটা কথা উঠিয়াছে, নর ও নারীর মধ্যে স্বভাবদত্ত শক্তি ও রুচিতে কোনও প্রভেদ নাই; কোমলতার আধিক্য, দৃঢ়তার অভাব, রক্ষণশীলতার দিকে প্রবণতা প্রভৃতি নারীচরিত্রের যে সকল ধর্মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া পুরুষগণ তাহাদিগকে রাজনৈতিক ও সামাজিক নানা অধিকারে বঞ্চিত রাখিতে চাহেন, তাহা নারীর স্বভাবসিদ্ধ নহে, সমাজেরই কুব্যবহারের ফল। Nature made women, society made them feminine. বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিতে সে সমস্যার কতটুকু সমাধান আছে তাহা পরে দেখা যাইবে। কিন্তু এখানে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, কপালকুণ্ডলা সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির শিশু নহেন; আরও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, বঙ্কিমচন্দ্র বিজ্ঞান বা দর্শন লিখিতে বসেন নাই, কবির রীতি ও বৈজ্ঞানিকের রীতি এক নহে। বঙ্কিম 'কপালকুণ্ডলা'য় একটা বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক সমস্যার কাব্যনীতিসম্মত ব্যাখ্যা দিয়াছেন মাত্র। সমস্যাটা সংক্ষেপতঃ এই—নারীচরিত্রে এমন কিছু নিজস্ব আছে কি না যাহা আবেষ্টন-নিরপেক্ষ? যদি থাকে তবে তাহা কি? এবং আবেষ্টনের প্রভাব তাহার উপর কতদূর ক্রিয়া করে?

কপালকুণ্ডলার আখ্যানবস্তু কখন কিরূপ ঘটনা-সূত্রে ধীরে ধীরে বঙ্কিমের মানসদর্পণে স্বীয় ছায়াপাত করে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। নিশীথকালে সমুদ্র-তীরবর্তী বনপ্রান্তে কাপালিকের অবাধ সঞ্চরণ যে বঙ্কিমের মনে একটা গুরুতর শঙ্কামিশ্রিত কৌতূহলের উদ্রেক করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কাপালিক ও অঘোরপন্থীদিগের বীভৎস কুৎসিত জীবন, তাহাদের নরঘাতকতা ও স্ত্রী-সম্পৃক্ত আচারাদি সম্বন্ধে তিনি নানা তথ্য নানা স্থানে শিক্ষা করিয়া থাকিবেন। কাপালিক সম্প্রদায়টা আমাদের দেশে খুবই প্রাচীন। 'শঙ্করবিজয়ে' কাপালিকমতের এবং একদা এক কাপালিক কর্তৃক শঙ্করের উপাংশুবধ-চেষ্টার কথা উল্লিখিত আছে। 'মালতীমাধবে' কাপালিকগণের বীভৎস ক্রিয়াকলাপের উল্লেখ আছে। বঙ্কিম ঐ

নাটকখানি হইতে কপালকুণ্ডলা নামটি গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কপালকুণ্ডলা ও ভবভূতির কপালকুণ্ডলা এক শ্রেণীর সৃষ্টি নহে। ভবভূতির কপালকুণ্ডলা সর্বাংশে কাপালিকের যোগ্যশিষ্যা। সে যাহা হউক কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনাবলীর কল্পিত কালে তান্ত্রিক উপাসনা ও নানাবিধ তান্ত্রিক আচার বা অনাচার বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল। কাপালিকগণও ছিল,—বঙ্কিমের সময় পর্যন্তই ছিল, তখন আর না থাকিবে কেন? শুনিতে পাই এখনও কাশীধামে দুই-একটি কাপালিকের হঠাৎ আবির্ভাব হয়। বলা বাহুল্য, এখন অবাধে নর-বলিদান ইত্যাদি সম্ভব নহে; কোনও কালেই প্রকাশ্যে ঐ ধর্ম আচরণ করা সম্ভব ছিল কিনা সন্দেহ। তাই বঙ্কিম সমুদ্রতীরে বনমধ্যে কাপালিকের স্থান নির্দেশ করিয়াছেন, এবং ঐরূপে তাঁহার কল্পিত নারীচরিত্র-সমস্যা সমাধানেরও কতক সুবিধা হইয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি, বঙ্কিমের কোনও উপন্যাসেরই আখ্যানবস্তুতে বিশেষ জটিলতা নাই, কপালকুণ্ডলা আবার এবিষয়ে বোধ হয় সকল উপন্যাসের তুলনায় সরল; ইহাতে ঘটনাবৈচিত্র্য নিতান্ত অল্প। ইহার বিশেষত্ব ঘটনাবৈচিত্র্যে বা উপখ্যান-বস্তুর জটিলতায় নহে; কিসে তাহা পূর্বে কতকটা বলা হইয়াছে,—সূক্ষ্ম দার্শনিক-তত্ত্বের কাব্যনীতি-সম্মত বিশ্লেষণে, আর গ্রীক্ বিয়োগান্ত নাট্যগুলির ন্যায় অদৃষ্টের ক্রূরলীলা প্রদর্শনে।

দুর্গেশনন্দিনীতেও অদৃষ্টবাদ আছে—স্পষ্ট ও অস্পষ্ট, উভয় ভাবেই আছে। অভিরাম স্বামীর 'জ্যোতিষী গণনা' ও অদৃষ্টের অবশ্যম্ভাবিতা-বিষয়ক উক্তি এ বিষয়ে প্রমাণ; আর সমগ্র ঘটনার শেষ পরিণতিতেও অদৃষ্টবাদের ছায়া আছে; কিন্তু উহা ছায়ামাত্র। কপালকুণ্ডলায় বঙ্কিম দৃঢ়হস্তে তুলিকা ধরিয়া অদৃষ্টের ক্রূরলীলার অতি বিষাদময় অথচ অতীব মনোরম আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন।

কবিত্বের হিসাবেও দুর্গেশনন্দিনী অপেক্ষা কপালকুণ্ডলা অনেক উচ্চ শ্রেণীর গ্রন্থ। দুর্গেশনন্দিনীকেও ঠিক উপন্যাস বা নভেল বলা যায় না; ইংরাজীতে যাহাকে রোমান্স্ বলে, এবং প্রচুর কাব্যধর্মযুক্ততাই যাহার প্রধান লক্ষণ, দুর্গেশ-নন্দিনী তাহাই। উহাতে একটা ঐতিহাসিক বা অর্ধ-ঐতিহাসিক ঘটনাকে নিরঙ্কুশ কল্পনার সাহায্যে পল্লবিত ও কাব্যরসে সিক্ত করিয়া আখ্যায়িকার আকারে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। কপালকুণ্ডলায় কাব্যধর্মভূয়িষ্ঠতা আরও স্পষ্ট। বস্তুতঃ কপালকুণ্ডলাকে উপন্যাস এমন কি, রোমান্সও না বলিয়া, কাব্য বলাই যুক্তিযুক্ত।[১] কাব্যধর্ম ইহার পত্রে পত্রে পরিস্ফুট; পড়িতে পড়িতে ইহার মাধুর্যে ও কমনীয়তায় পাঠকের হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠে। ইহা কেবল তুলনায় সমালোচনক্ষম পণ্ডিতের আস্বাদ্য নহে, কিংবা মনস্তত্ত্ব বা সমাজতত্ত্বের আলোচনায় নিরত দার্শনিকের

১। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের পরিভাষা অনুসারে উপন্যাস (আখ্যায়িকা)ও কাব্য বটে; এস্থলে ইংরাজী Novelএর প্রতিশব্দরূপে অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ অর্থে 'উপন্যাস' শব্দ ব্যবহার করিয়া কাব্যের সহিত উহার প্রভেদ কল্পনা করা হইল।

ভাবিবার যোগ্য সন্দর্ভ নহে, যে কেহ কাব্যের সৌন্দর্য ও রসবত্তা আস্বাদ করিতে সমর্থ, তাহারই আদরের ও উপভোগের বস্তু।

কপালকুণ্ডলার সহিত নবকুমারের এবং পাঠকেরও প্রথম সাক্ষাৎ প্রদোষ-তিমিরাক্রান্ত সমুদ্রতটে। সন্ধ্যাকাল চিরদিনই কবিগণের পরমপ্রিয়—কবির কল্পনাকে প্রবুদ্ধ করিবার সামর্থ্য সন্ধ্যার যত আছে, এত বোধ হয় দিন বা রাত্রির (অবশ্য, জ্যোৎস্নাময়ী না হইলে) নাই। যাহা অর্ধ ঘণ্টা পূর্বে অতি স্পষ্ট ও উজ্জল ছিল, তাহার উপরে একখানি অতি সূক্ষ্ম আবরণ টানিয়া দিয়া মোহময়ী সন্ধ্যা দর্শকের বহিরিন্দ্রিয়ের বৃত্তি আংশিকরূপে রোধ করিয়া তদীয় অন্তরিন্দ্রিয়গুলিকে প্রতিবুদ্ধ করে। দিনে সবই স্পষ্ট, রাত্রিতে সবই অস্পষ্ট—এই স্পষ্ট ও অস্পষ্টের মাঝখানে, আলো ও আঁধারের মধ্যে থাকিয়া সন্ধ্যা প্রকৃতিকে এক অপূর্ববেশে সজ্জিত করিয়া কবির বহির্নেত্র ও মনোনেত্র উভয়েরই সম্মুখে স্থাপন করে। এই কুহকময় মুহূর্তে গম্ভীরনাদী বারিধিকূলে কবি কপালকুণ্ডলাকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। সে মূর্তি বড় সুন্দর, সে চরিত্রও বড় মনোরম! কিন্তু সান্ধ্য প্রকৃতির মত, সমুদ্রের গর্জনের মত, তাহার সবটা স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায় না, যেন তাহার অল্প অংশই বহিরিন্দ্রিয়-গোচর হয়, এবং অধিকভাগ কল্পনা ভিন্ন অন্য কোনও বৃত্তির নিকট আত্মরহস্য উদ্ঘাটিত করে না।

> কেশভার—অবেণীসংবদ্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুল্ফলম্বিত কেশভার; তদগ্রে দেহরত্ন, যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। অলকাবলীর প্রাচুর্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতেছিল না—তথাপি মেঘ-বিচ্ছেদ-নিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। বিশাললোচনে কটাক্ষ, অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর, অথচ জ্যোতির্ময়। সে কটাক্ষ, এই সাগরহৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্র-কিরণ-লেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জল দীপ্তি পাইতেছিল। কেশরাশিতে স্কন্ধদেশ ও বাহুযুগল আচ্ছন্ন করিয়াছিল। স্কন্ধদেশ একেবারে অদৃশ্য; বাহুযুগলের বিমলশ্রী কিছু কিছু দেখা যাইতেছিল। রমণীদেহ একেবারে নিরাভরণ। মূর্তিমধ্যে যে একটি মোহিনী শক্তি ছিল তাহা বর্ণিতে পারা যায় না। অর্ধচন্দ্রনিঃসৃত কৌমুদীবর্ণ; ঘনকৃষ্ণ চিকুরজাল; পরস্পরের সান্নিধ্যে কি বর্ণ কি চিকুর উভয়েরই যে শ্রী বিকসিত হইতেছিল, তাহা সেই গম্ভীরনাদী সাগরকূলে সন্ধ্যালোকে না দেখিলে, তাহার মোহিনীশক্তি অনুভূত হয় না।

সাগরের গম্ভীরনাদের সহিত কপালকুণ্ডলার সৌন্দর্যের সম্পর্ক কবির একটা অতি অপূর্ব মনোরম কল্পনা। কবিবর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থও তদীয় Education of Nature কবিতায় ঐরূপ কথা কহিয়াছেন—

> The stars of midnight shall be dear
> To her ; and shall lean her ear
> Ia many a secret place

Where Rivulets dance their wayward round,
And beauty born of murmuring sound
Shall pass into her face.

কপালকুণ্ডলা 'অনিমেষলোচনে বিশালচক্ষুর স্থির দৃষ্টি নবকুমারের মুখে ন্যস্ত করিয়া' নিঃস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া আছেন, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টিতে 'বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ হইতেছিল।' এ উদ্বেগ অবশ্য কাপালিক-কবলগ্রস্ত নবকুমারের জীবনের জন্য। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি নবকুমারকে কহিলেন, "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ ?" এই কথা নবকুমারেরর 'কানের ভিতর দিয়া মরমে' প্রবেশ করিল; তাঁহার যে অবস্থা হইল, তাহার বর্ণনাও জগতের যে কোনও কবির লেখনীর যোগ্য।

এই কণ্ঠস্বরের সঙ্গে নবকুমারের হৃদয়বীণা বাজিয়া উঠিল। বিচিত্র হৃদয়যন্ত্রের তন্ত্রীচয় সময়ে সময়ে এরূপ লয়হীন হইয়া থাকে যে যত যত্ন করা যায় কিছুতেই পরস্পর মিলিত হয় না, কিন্তু একটি শব্দে একটি রমণীকণ্ঠসম্ভূত স্বরে সংশোধিত হইয়া যায়। সকলই লয়বিশিষ্ট হয়, সংসারযাত্রা সেই অবধি সুখময় সঙ্গীত-প্রবাহ বলিয়া বোধ হয়। নবকুমারের কর্ণে সেইরূপ এ ধ্বনি বাজিল।

'পথিক, পথ হারাইয়াছ ?' এ ধ্বনি নবকুমারের কর্ণে প্রবেশ করিল। কি অর্থ; কি উত্তর করিতে হইবে, কিছুই মনে হইল না। ধ্বনি যেন হর্ষবিকম্পিত হইয়া বেড়াইতে লাগিল, যেন পবনে সেই ধ্বনি বহিল; বৃক্ষপত্রে মর্মরিত হইতে লাগিল; সাগরনাদে যেন মন্দীভূত হইতে লাগিল। সাগরবসনা পৃথিবী সুন্দরী; রমণী সুন্দরী; ধ্বনিও সুন্দর; হৃদয়তন্ত্রীমধ্যে সৌন্দর্যের লয় মিলিতে লাগিল।

কপালকুণ্ডলা উত্তর না পাইয়া কহিলেন, "আইস", এবং স্বয়ং চলিতে লাগিলেন। 'পদক্ষেপ লক্ষ্য হয় না, বসন্তকালে মন্দানিলসঞ্চালিত শুভ্র মেঘের ন্যায় অলক্ষ্য পদবিক্ষেপে' চলিলেন। এই বর্ণনায় আবার ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের একটি ছত্র মনে পড়িবে—

The floating Clouds their state shall lend
To her.

একটু দূর গিয়াই কপালকুণ্ডলা হঠাৎ অদৃশ্য হইলেন। সমুদ্র-দর্শনের স্মৃতি মনে পড়ায় নবকুমার কলিদাসের 'দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী' কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন; তিনি আধুনিক কালের ইংরাজী পড়ুয়া যুবক হইলে হয়ত এই সময়ে বলিতেন—

She was a phantom of delight
When first she gleamed upon my sight;
A lovely Apparition, sent
To be a moment's ornament;

Her eyes as stars of twilight fair ;
Like twilight's too her dusky hair ;
But all things else about her drawn
From May-time and the cheerful Dawn ;
A dancing Shape, an Image gay,
To haunt, to startle, and waylay.

ইহার পরদিনও কপালকুণ্ডলা সেই অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দুই বার হঠাৎ দেখা দিয়া হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিলেন। প্রথম বার তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "কোথা যাইতেছ? যাইও না। ফিরিয়া যাও—পলায়ন কর।" দ্বিতীয় বার বলিয়াছিলেন, "এখনও পলাও, নরমাংস নহিলে তান্ত্রিকের পূজা হয় না, তুমি কি জান না?"

এইখানে প্রশ্ন হইতে পারে, কপালকুণ্ডলা কেন একজন অপরিচিত যুবার অমঙ্গলভয়ে এত উদ্বিগ্ন, এত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন? প্রথম দর্শনে প্রেমসঞ্চার কাব্যে নূতন ঘটনা নহে, বঙ্কিমচন্দ্রও তিলোত্তমা-জগৎসিংহকে প্রথম দর্শনে পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় প্রণয়ে আবদ্ধ করিয়া বিড়ম্বনার একশেষ করিতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু, এ ক্ষেত্রে ত প্রেমের গন্ধমাত্রও আশঙ্কা করা যায় না। কবি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত দেখাইয়াছেন, নবকুমারের প্রতি কখনও কপালকুণ্ডলার প্রণয় জন্মে নাই। কপালকুণ্ডলা সর্বদাই তাঁহার বিপদে করুণা, তাঁহার দুঃখে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদের জীবন-নাট্যে যবনিকাপাতের পূর্ব মুহূর্তেও যখন কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'কাঁপিতেছ কেন?' তখনও কবি বড় সতর্কভাবে বলিয়া দিয়াছেন, "এ প্রশ্ন কপালকুণ্ডলা যে স্বরে বলিলেন, তাহা কেবল রমণী-কণ্ঠেই সম্ভবে। যখন রমণী পরদুঃখে গলিয়া যায়, কেবল তখনই রমণী-কণ্ঠে সে স্বর সম্ভবে।" এই পরদুঃখে গলিয়া যাওয়াই—এই কারুণ্যই তাঁহার চরিত্রের বড় একটা ধর্ম। বৎসদর্শনে গাভীর স্তন হইতে ক্ষীরধারা যেমন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বৎসের পিপাসার্ত কণ্ঠ সিক্ত করে, তেমনই যখনই কেহ কোনও বিপদ বা বেদনা লইয়া কপালকুণ্ডলার সম্মুখে পড়িয়াছে, সে নর হউক, নারী হউক, এবং নারীর মধ্যেও ননান্দা হউক বা নিজ পতির প্রেমপ্রার্থিনী অন্য রমণী হউক, কপালকুণ্ডলা, তখনই তাহার দুঃখে গলিয়া নিজ করুণামৃতধারায় তাঁহার শুষ্ক কণ্ঠ সিক্ত করিয়াছেন। কপালকুণ্ডলার হৃদয় সম্বন্ধে লেডি ম্যাকবেথের ভাষায় বলা যাইতে পারে—

It is too full o' the milk of human kindness.

তাঁহার করুণা সমাজের কোনও সংস্কার, কোনও প্রচলিত বিধি-নিষেধ মানে না। কপালকুণ্ডলা কাপালিকের গৃহে প্রতিপালিতা হইয়াছেন, কাপালিককে পিতা বলিয়া সম্বোধন করেন, পিতার মত দেখেন, বিশেষ যে ঘৃণা করেন তাহা নয়, ভয়ও করেন, তাঁহার নিকট অকৃতজ্ঞও নহেন; নবকুমারের সহিত বিবাহের প্রস্তাবে

সম্মতি দিবার সময় বলিয়াছিলেন, "কিন্তু তাঁহাকে ( কাপালিককে ) ত্যাগ করিয়া যাইতে আমার মন সরিতেছে না। তিনি যে আমাকে এতদিন প্রতিপালন করিয়াছেন।" কাপালিক যে ভৈরবীর পূজায় নবকুমারকে বলি দেওয়া মনস্থ করিয়াছিল, সে দেবতার প্রতিও তাঁহার ভক্তি অতি গাঢ়, অতি অটল; দেবীর পূজায় ব্যাঘাত করা যে অন্যায় তাহাও তিনি বিশ্বাস করেন, তথাপি কাপালিকের বিরক্তি উৎপাদনের ভয় উপেক্ষা করিয়া, দেবীর পূজার ব্যাঘাত করিয়া, নবকুমারের প্রাণ রক্ষা করিলেন। আবার সপ্তগ্রামে আসিবার পর শ্যামাসুন্দরীর স্বামিবিরহ-দুঃখে গলিয়া স্বামীর অপ্রীতি উৎপাদন করিয়াও কপালকুণ্ডলাকে রাত্রিতে ঘরের বাহিরে যাইতে দেখিতেছি। শ্যামাসুন্দরী যখন বলিলেন, "দাদাকে কেন অসুখী করিবে?" তখন কপালকুণ্ডলা অম্লানবদনে বলিলেন, "ইহাতে তিনি অসুখী হয়েন, আমি কি করিব?" নবকুমার রাত্রিকালে তাঁহার একাকী বহির্গমনে আপত্তি করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন, "তুমি পরের উপকারে বিঘ্ন করিও না।" কাপালিক-ভবন হইতে সপ্তগ্রামের পথে একটা ভিক্ষুককে মতিবিবি-প্রদত্ত মহামূল্য অলঙ্কারগুলি দিয়াছিলেন।[১] এই যে অতিভূমিপ্রাপ্ত করুণা, ইহা কপালকুণ্ডলা কোথায় পাইলেন? কাপালিক-গৃহে নহে, অধিকারীর নিকটেও বোধ হয় নহে। ইহা প্রকৃতির শিশুর মাতৃপ্রদত্ত একটা impulse বা উৎকট প্রেরণা। ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতায় প্রকৃতি লুসী সম্বন্ধে বলিতেছেন—

Myself will to my darling be
Both law and impulse.

কপালকুণ্ডলাকে প্রকৃতি এই একটা প্রবল impulse দিয়াছেন। প্রকৃতি-প্রদত্ত প্রবল প্রেরণা বলিয়াই উহা বিপন্নের বিপন্মোচনে, দুঃখীর দুঃখ দূরীকরণে কোনও বাধা গণ্য করে না—কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ করে না।

কিন্তু কপালকুণ্ডলার সমগ্র জীবন এইরূপ একটা স্বাভাবিক প্রেরণা দ্বারাই পরিচালিত হয় নাই, হইলে তাহা এত মধুর হইত কি না সন্দেহ। তাহার মধ্যে যেমন impulse আছে, তেমনই lawও আছে। সেই law বা নীতির প্রাধান্য সামাজিক সংস্কারপ্রসূত না হইলেও তাহা উচ্চতম সামাজিক আদর্শের বিরোধী নহে। আমরা দেখিয়াছি, কপালকুণ্ডলা কাপালিকের প্রতি অকৃতজ্ঞ নহেন; স্বামিগৃহে দেখা যায়, স্বাধীনতাপ্রিয় হইলেও উচ্ছৃঙ্খল নহেন, তাঁহার আত্মমর্যাদা-বোধ আছে, সমাজের নিন্দা গণ্য না করিলেও সতীত্বের স্পর্ধা করিতে জানেন এবং

১। ইহা তাঁহার অলঙ্কারের প্রতি নির্লোভতার নিদর্শনও বটে। সঞ্জীবচন্দ্র ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন, "পরের ঘরে চুরি করিয়া খাইবে, অলঙ্কারাদি চুরি করিয়া পরিবে।" কথাটা ব্যঙ্গ হইলেও বঙ্কিমচন্দ্র উহা একেবারে উপেক্ষা করেন নাই, এবং সেই জন্যই ভিক্ষুককে আনিয়া দেখাইতেছেন, ভাল খাওয়া, ভাল পরার লোভ নারীর স্বভাবসিদ্ধ নহে। গহনা ইত্যাদির লোভ সমাজেরই ব্যবস্থাদোষে নারীচরিত্র কলুষিত করে।

করেন, কেননা নারীর পক্ষে সতীত্ব যে আত্মমর্যাদারই নামান্তর। শ্যামাসুন্দরী যখন বলিলেন, "একা রাত্রে বনে বনে বেড়ান কি গৃহস্থের বৌ-ঝির—ভাল?" তখন কপালকুণ্ডলা উত্তর দিলেন "ক্ষতিই কি? তুমি কি মনে করিয়াছ যে, আমি রাত্রে ঘরের বাহির হইলেই কুচরিত্রা হইব?"

শ্যামা সুন্দরী। আমি তা মনে করি না, কিন্তু মন্দ লোকে মন্দ বলিবে।

কপালকুণ্ডলা। বলুক না, আমি তাতে মন্দ হব না।

আবার সেই রাত্রিতেই নবকুমার যখন নানা কথা বলিয়া কপালকুণ্ডলাকে রাত্রিতে বাহিরে যাওয়া হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে না পারিয়া বলিলেন, "চল আমি তোমার সঙ্গে যাইব।" তখন কপালকুণ্ডলা 'গর্বিত বচনে' বলিয়াছিলেন, "আইস আমি অবিশ্বাসিনী কি না স্বচক্ষে দেখিয়া যাও।"

এই যে নিজের নারীত্বের সম্মান ইহাতেও কি কপালকুণ্ডলার চরিত্রে law বা নীতির প্রাধান্য প্রদর্শিত হয় নাই? এই নীতির প্রাধান্যও প্রকৃতিই কপালকুণ্ডলার চিত্তে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহা তাঁহাকে কোনও মানুষে শিখায় নাই। এখানে তাঁহার উচ্ছৃঙ্খলতা নাই। কপালকুণ্ডলা বিবাহ-বিহিত দাসীত্ব ঘৃণা করেন, কিন্তু সেটা করুণার বিধান পূর্ণমাত্রায় পালন করিবার জন্য, কোনওরূপ ইন্দ্রিয়লালসা হইতে নহে। তাঁহার শরীর ও মন উভয়ই অকলঙ্ক ও পবিত্র। শিশুকাল হইতে সামাজিক আচারে অনভিজ্ঞা বলিয়াই বিবাহ যে দাসীত্ব তাহা এই প্রকৃতির শিশু জানে না। বিবাহ যে কি তাহাই কি জানিত? অধিকারী নবকুমারের সহিত তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব করিলে,

> 'বি-বা-হ!' এই কথাটি কপালকুণ্ডলা অতি ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিলেন। বলিতে লাগিলেন, "বিবাহের নাম ত তোমাদের মুখে শুনিয়া থাকি, কিন্তু কাহাকে বলে সবিশেষ জানি না। কি করিতে হইবে?"
>
> অধিকারী ঈষন্মাত্র হাস্য করিয়া কহিলেন, "বিবাহ স্ত্রীলোকের ধর্মের সোপান; এই জন্য স্ত্রীকে সহধর্মিণী বলে; জগন্মাতাও শিবের বিবাহিতা।"
>
> অধিকারী মনে করিলেন, সকলই বুঝাইলেন;[১] কপালকুণ্ডলা মনে করিলেন, সকলই বুঝিলেন; বলিলেন, "তাহাই হউক।"

বিবাহ কাহাকে বলে, তাহাতে কি করিতে হয়, অর্থাৎ বিবাহ দ্বারা যে স্ত্রীলোক সমাজিক হিসাবে কতকগুলি কর্তব্য ও দায় এবং তৎসঙ্গে কতকগুলি অধিকারও অর্জন করে তদ্বিষয়ে দার্শনিকের ন্যায় স্পষ্টভাবে বিচার করিতে না পারিলেও, সমাজের প্রত্যেক বালিকাই জানে যে, বিবাহ হইলে স্ত্রীকে শ্বশুর-গৃহে যাইতে হয়, তথায় শ্বশুর শ্বশ্রূ ইত্যাদি গুরুজনের আদেশ পালন করিয়া চলিতে হয়,

১। কণ্ব তাপস হইয়াও শকুন্তলার পতি-গৃহ গমনকালে "শুশ্রূষস্ব গুরূন্" প্রভৃতি কথায় গৃহধর্ম উপদেশ করিয়াছেন। অধিকারী তাহা করেন নাই, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

যখন-তখন যথায়-তথায় স্বাধীনভাবে যাওয়া-আসা যায় না, স্বামীর স্নেহের ও তাঁহার সদাচরণের উপর একটা দাবী থাকে, এবং তাঁহার অভিপ্রায়ের অনুবর্তী হইয়া চলিতে হয় ইত্যাদি। কপালকুণ্ডলা সামাজিক শিক্ষার ধার ধারেন না বলিয়া এ বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ। বিবাহ যে ধর্মের সোপান ইহা বিবাহের সামাজিক দিক্ নহে, আধ্যাত্মিক দিক্। কপালকুণ্ডলা ঐ দিক্‌টুকুই শিখিলেন, তাহাও বোধ হয় বড় স্পষ্টভাবে নয়। জগন্মাতা যখন বিবাহিতা, তখন বিবাহ স্ত্রীলোকের একটা অবশ্যকর্তব্য কার্য—ইহার অধিক বোধ হয় তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। বস্তুতঃ অধিকারী ও কাপালিক হইতে কপালকুণ্ডলা সামাজিক সংস্কার কিছুই লাভ করেন নাই বলা যায়। তবে তাঁহার চরিত্রে কি ইহাদের প্রভাব নাই? আছে; সে কোথায়?—না আধ্যাত্মিকতায়। এবিষয়ে কপালকুণ্ডলা প্রকৃতির শিশু নহেন, তান্ত্রিকের সন্তান। কাপালিক ও অধিকারী উভয়েই, জ্ঞাতসারে হউক অজ্ঞাতসারে হউক, কপালকুণ্ডলার চরিত্রের আধ্যাত্মিক দিকটা খুব পরিপুষ্ট করিয়াছে। প্রথম হইতেই দেখিতেছি, কপালকুণ্ডলা 'মায়ের পায়ে অখণ্ড বিল্বদল স্থাপন' করিয়া তাঁহার আদেশ গ্রহণ করিতে শিখিয়াছিলেন; নবকুমারের সঙ্গে বিবাহের পর অধিকারীর মঠ হইতে যাত্রাকালে কালীর পদে স্থাপিত বিল্বদল স্থানচ্যুত হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল দেখিয়া ভীত হইয়াছিলেন। অধিকারীকে ঐ কথা বলিলে, অধিকারীও বলিয়াছিলেন, "এখন পতিমাত্র তোমার ধর্ম। পতি শ্মশানে গেলে তোমাকেও সঙ্গে সঙ্গে যাইতে হইবে।"[১] ঐ কথা এবং ঐ ঘটনা হইতেই আর কপালকুণ্ডলা স্বামি-গৃহে সুখের আশা করেন নাই। উহা যে তাঁহার মনে কতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা কবি তাঁহার মুখেই প্রকাশ করিয়াছেন।[২] সেই জন্যই গৃহিণী হইয়াও কপালকুণ্ডলা সন্ন্যাসিনীর মত ছিলেন। তার পর তিনি স্বপ্নে, বিশেষতঃ স্বপ্নে প্রাপ্ত ভৈরবীর আদেশে, বিশ্বাস করিতেন—ইহাও তান্ত্রিকগণের সহবাসেরই ফল। ঔপন্যাসিক বলিতেছেন[৩]—

> কপালকুণ্ডলা অন্তঃকরণসম্বন্ধে তান্ত্রিকের সন্তান; তান্ত্রিক যেরূপ কালিকা-প্রসাদাকাঙ্ক্ষায় পরপ্রাণসংহারে সঙ্কোচশূন্য, কপালকুণ্ডলাও সেই আকাঙ্ক্ষায় আত্মজীবনবিসর্জনে তদ্রূপ। কপালকুণ্ডলা যে কাপালিকের ন্যায় অনন্যচিত্ত হইয়া শক্তিপ্রসাদপ্রার্থিনী হইয়াছিলেন, তাহা নহে; তথাপি শক্তিভক্তি শ্রবণ, দর্শন ও সাধনে তাঁহার মনে মনে কালিকানুরাগ বিশিষ্ট প্রকারে জন্মিয়াছিল।

---

১। পতির সঙ্গে সত্যসত্যই তাঁহাকে শ্মশানে যাইতে হইয়াছিল। এইরূপ সুকৌশলে ছন্নিমিত্তসূচনা কপালকুণ্ডলায় বহুস্থানে আছে। অধ্যাপক ললিতবাবু কপালকুণ্ডলা-তত্ত্বে কয়েকটি প্রদর্শন করিয়াছেন। এইটি এবং আরও দুই-একটি তাঁহারও সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে।

২। 'কপালকুণ্ডলা' দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের শেষ প্যারাগ্রাফ দ্রষ্টব্য।

৩। ঐ, চতুর্থ খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ভৈরবী যে সৃষ্টি-শাসনকর্ত্রী, মুক্তিদাত্রী, ইহা বিশেষমতে প্রতীত হইয়াছিল। কালিকার পূজাভূমি নরশোণিতে প্লাবিত হয়, ইহা তাঁহার পরদুঃখদুঃখিত হৃদয়ে সহিত না, কিন্তু আর কোনও কার্যে ভক্তিপ্রদর্শনের ত্রুটি ছিল না। এখন সেই বিশ্ব-শাসনকর্ত্রী, সুখদুঃখবিধায়িনী, কৈবল্যদায়িনী ভৈরবী স্বপ্নে তাঁহার জীবন সমর্পণ আদেশ করিয়াছেন। কেনই বা কপালকুণ্ডলা সে আদেশ পালন না করিবেন? ······এ সংসারবন্ধনে প্রণয় প্রধান রজ্জু ; কপালকুণ্ডলার সে বন্ধন ছিল না। তবে কপালকুণ্ডলাকে কে রাখে?

সুতরাং আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে কপালকুণ্ডলা স্বীয় বাল্য ও কৈশোরের সামাজিক আবেষ্টনের (অর্থাৎ তান্ত্রিক-সংসর্গের) প্রভাবে সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিতা। তাঁহার চরিত্রের এই অংশে প্রকৃতির প্রভাব স্পর্শ করে নাই। কিন্তু তাঁহার করুণা তাঁহার আবেষ্টন-নিরপেক্ষ। বঙ্কিমের মতে করুণা-ধর্মটি নারীর স্বভাবসিদ্ধ—উহা তাহার পক্ষে সামাজিক ধর্ম নহে। সরলতা, পবিত্রতা ও তৎসহযুক্ত আত্মমর্যাদা-বোধও নারীর স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম। প্রকৃতির শিশু কেমন করিয়া স্বীয় সরলতা ও অমলতা দ্বারা বিশ্বজয় করিয়াছে, তাহা কপালকুণ্ডলায় বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। কাপালিক তাঁহার সম্বন্ধে দুরভিসন্ধি পোষণ করিয়াও যে কারণেই হউক তাহা কার্যে পরিণত করে নাই বা করিতে পারে নাই। অধিকারী কপালকুণ্ডলাকে 'মায়ের মত' দেখিতেন। নবকুমার তাঁহাকে দেখিয়া আত্মহারা! সপ্তগ্রামের পথে চটীতে দেখিতে পাই, মতিবিবি নিজের সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য প্রদর্শন দ্বারা সপত্নীকে বিমুগ্ধ করিতে আসিয়া তাঁহার অব্যাজ-মনোহর বপুঃ ও সরল চোখের চাহনি দেখিয়া নিজেই বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। ননান্দা শ্যামাসুন্দরী ভ্রাতৃজায়ার রূপে-গুণে মুগ্ধা। বাঙ্গালীর একান্নবর্তী সংসারে ননান্দৃগণ ভ্রাতৃজায়ার প্রতি স্বভাবতঃ প্রীতিযুক্তা নহেন, ইহা কে না জানে? ননান্দাকে নন্দিত করাতেও প্রকৃতির শিশুর বিশ্বজয়-সামর্থ্য দ্যোতিত হইয়াছে। দিগ্বিজয়ী সেকন্দর শাহ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তিনি এক দেশের পর অন্যদেশ জয় করিতে করিতে চলিতেন—conquering and to conquer. কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধেও ঐরূপ বলা যায়—তিনি তাঁহার জীবনযাত্রায় এক চিত্তের পর অন্য চিত্ত জয় করিতে করিতে চলিয়াছেন।

এইবার কপালকুণ্ডলা-চরিত্রের সর্বাপেক্ষা জটিলতম দিক্ বিচার করা আবশ্যক। প্রকৃতির শিশুর চরিত্রে সরলতা, পবিত্রতা, করুণা ও তৎসঙ্গে এক প্রকারের দৃঢ়তাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গিয়াছে; কিন্তু সে চরিত্রে যে পতিপ্রেমের গন্ধও নাই তাহা প্রসঙ্গক্রমে আভাসে উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র। অনেকের মনেই এমন একটা সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে—প্রকৃতিপালিতা যুবতীর চরিত্রে প্রেমের[১] নিতান্ত অভাব,—ইহা কি স্বাভাবিক? অন্য কোনও কবি ত এভাব

১। 'প্রেম' শব্দটি আমরা এস্থলে স্বামি-স্ত্রীর বা যুবক-যুবতীর পরস্পরের প্রতি বিশিষ্ট রকমের অনুরাগ বা আকর্ষণ অর্থে ব্যবহার করিলাম।

বর্ণনা করেন নাই। শকুন্তলা, মিরাণ্ডা, পার্ডিটা, হেইডী, এপি—কেহই ত এমন সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি নহেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে চিত্র আঁকিয়াছেন, ইহা কি স্বভাবসঙ্গত? যদি না হয়,—তবে এ অলীক, অসম্ভব, উদ্ভট, গুলিখুরী সৃষ্টিকে একটা আষাঢ়ে গল্পের নায়িকা অপেক্ষা উচ্চস্থান দেওয়া উচিত কি?

এই প্রসঙ্গে প্রথমে কাব্যে তথাকথিত সত্য ও স্বাভাবিকতার স্থান বিচার করা যাক্। কবির কৃতিকে যে সর্বদা বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষিত বা ঐতিহাসিকের নির্ধারিত সরণি অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে, এমন কোনও নিয়ম নাই। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ কবির নির্মিতিকে নিয়তিকৃত-নিয়মরহিতা, অনন্যপরতন্ত্রা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের পরীক্ষার এক নিয়ম ছিল,—তাঁহারা দেখিতেন কাব্যে রস আছে কি না, পাঠ করিলে বিমল আনন্দের অনুভব হয় কি না। যদি রস থাকে, যদি 'বিগলিতবেদ্যান্তর' 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর' আনন্দানুভূতি হয়, তবে বাহ্য প্রকৃতির সহিত তাহার সামঞ্জস্য থাকুক আর নাই থাকুক, তাহাকে উচ্চশ্রেণীর কাব্য বলিয়া গ্রহণ করিতে তাঁহাদের কোনও আপত্তি ছিল না। পাশ্চাত্যদেশে প্লেটো কাব্যের সত্যাসত্য সম্বন্ধে একটা সঙ্কীর্ণ রকমের ধারণাবশতঃ কবিগুরু হোমারের সৃষ্টিগুলিকেও অলীক বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু এরিস্টটল বুঝিয়াছিলেন, কাব্যের সত্য ও বহিঃপ্রকৃতিতে নিরীক্ষিত বা ঐতিহাসিকের পরীক্ষিত সত্য ত একবস্তু নহেই, পরন্তু কাব্যের সত্য গভীরতর ও ব্যাপকতর; কবি বিজ্ঞান ও ইতিহাসের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে বাধ্য নহেন, তাঁহার উক্তিতে বা সৃষ্টিতে সম্ভাব্যতার (Ideal probability) সীমা অতিক্রান্ত না হইলেই যথেষ্ট। কবির কৃতিতে ঐরূপ ব্যাপকতা ও গভীরতা আছে বলিয়া কবিকে বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিকের ন্যায় পুনঃ পুনঃ স্বীয় সিদ্ধান্ত পরিবর্তন ও পরিবর্জন করিয়া চলিতে হয় না। তিনি সাধারণ মানুষ হইতে অনেক বেশী দেখেন, অনেক বেশী বুঝেন; এই জন্য কবিকে ঋষি বা prophet বলা হয়।

তথাপি হয়ত প্রশ্ন হইবে, কপালকুণ্ডলায় অন্যনারীসুলভ প্রেমের অভাব প্রদর্শন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র কি আদর্শ-সম্ভাব্যতার সীমাও অতিক্রম করেন নাই? অনেক, স্বভাবতঃ কঠোরা, নারীর হৃদয়ও যে প্রথমে করুণা বা সহানুভূতিতে গলিয়া, পরে প্রেমের শাসন বরণ করিয়া লইয়াছে, ইহার দৃষ্টান্ত প্রাচীন ও আধুনিক কাব্যসমূহে পুনঃ পুনঃ দৃষ্ট হয়। কপালকুণ্ডলায় করুণা আছে, একটু অধিক মাত্রায়ই আছে, কিন্তু প্রেমের ছায়ামাত্রও নাই কেন?

বিজ্ঞানের দিক হইতে এ প্রশ্নের সম্যক্ সমাধান করিবার চেষ্টা বৃথা; কেন না বিজ্ঞান এরূপ ঘটনা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। তবে রমণীহৃদয়ে প্রেমের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে জীববিজ্ঞান ও নরবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত যে বঙ্কিমের কল্পনাকে একেবারেই সমর্থন করে না, তাহা নহে। Henry

Drummondএর Ascent of Man নামক পুস্তকে[১] মনুষ্যত্বের ক্রমাভিব্যক্তির ধারা সম্বন্ধে অতি উজ্জ্বল ও মনোরম আলোচনা আছে। ঐ পুস্তকের শেষ দুই পরিচ্ছেদে আমাদের আলোচ্য সমস্যার একটা উত্তর পাওয়া যায়। Drummond-এর সকল উক্তি এস্থলে উদ্ধৃত করা সম্ভব নহে। কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হইতেছে।

নারীর নারীত্বের, তথা মাতৃত্বের সহিত ধৈর্য, সমবেদনা, সতর্কতা ও কোমলতা —এই চারিটি গুণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এবং মনুষ্যত্বের অভিব্যক্তির সূচনায়ই উহাদের বিকাশের কথা উল্লেখ করিয়া Drummond বলিতেছেন—

> The idea that the existence of sex accounts for the existence of love is untrue. Marriage among early races, as we have seen, has nothing to do with love. Among savage peoples the phenomenon everywhere confronts us of wedded life without a grain of love. Love then is no necessary ingredient of the sex relation ; it is not an outgrowth of passion. Love is love, and has always been love ; and has never been anything lower. Whence, then, came it ? If neither the Husband nor the Wife bestowed this gift upon the world, Who did ? It was A Little Child. Till this appeared, Man's affection was non-existent ; Woman's was frozen. The Man did not love the Woman, the Woman did not love the Man. But one day from its Mother's very heart, from a shrine which her husband never visited nor knew was there, which she herself dared scarce acknowledge, a Child drew forth the first fresh bud of a Love which was not passion, a Love which was not selfish, a Love which was an incense from its Maker, and whose fragrance from that hour went forth to sanctify the world. Later, long later, through the same tiny and unconsious intermediary, the father's soul was touched. And one day in the love of a little child, Father and Mother met.
>
> That this is the true lineage of love, that it has descended not from Husbands and Wives but through children, is proved by the simplest study of savage life.

১। এই পুস্তক ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

Love for children is always a prior and a stronger thing than love between Father and Mother. The indifference of the Husband to his Wife—though often greatly exaggerated by anthropology—is all too manifest and throughout the whole regions the Wife does not love but only fears her Husband.

ইহার মর্ম এইরূপ—

জগতে স্ত্রীপুরুষ-ভেদের সত্তা হইতে যে প্রেমের জন্ম হইয়াছে, এরূপ মত সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। দেখা গিয়াছে, আদিম জাতিসমূহের মধ্যে বিবাহের সহিত প্রেমের কোনও সম্বন্ধ নাই। স্ত্রীপুরুষ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে প্রেমের গন্ধমাত্র নাই, এরূপ দৃশ্য অসভ্য জাতিসমূহের মধ্যে সর্বদাই দৃষ্ট হয়। স্বতরাং প্রেমকে স্ত্রীপুরুষ-সম্বন্ধের একটা আবশ্যক উপকরণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না; ইহা কামজ নহে। প্রেম, প্রেমই (কাম নহে); ইহা চিরদিনই প্রেম, এবং কখনও ইহা নিম্নতর বৃত্তি ছিল না। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, উহার উৎপত্তি কেমন করিয়া হইল? যদি স্বামী বা স্ত্রী কেহই এই বস্তু জগৎকে দান না করিয়া থাকেন, তবে কে ইহা দান করিল? এই প্রশ্নের উত্তরে ইহাই বক্তব্য যে, প্রেম প্রকৃত পক্ষে একটি ক্ষুদ্রতর শিশুর দান। এই শিশুর উৎপত্তির পূর্বে পুরুষের হৃদয়ে প্রেম ছিল না, নারীর হৃদয়ে প্রেম শিলীভূত হইয়া ছিল। পুরুষ (স্বভাবতঃ) নারীকে ভালবাসে নাই, নারীও (স্বভাবতঃ) পুরুষকে প্রেমদান করেন নাই। কিন্তু মাতৃহৃদয়ের যে গুপ্তমন্দিরে স্বামী কখনও প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই, কিংবা যাহার সত্তা স্বামী জানিতেই পারে নাই এবং নারী নিজেও অঙ্গীকার করিতে সাহসী হন নাই, সেই পুণ্যনিকেতন হইতে একদিন একটি ক্ষুদ্র শিশু কামগন্ধহীন, স্বার্থলেশশূন্য, বিধাতা হইতে প্রাপ্ত ধূপবাসের ন্যায় (জগৎপাবন) প্রেমের একটি সদ্যোজাত কলিকা টানিয়া বাহির করিয়াছিল। আবির্ভাব-মুহূর্ত হইতেই সেই প্রেমের সৌরভ চারিদিক প্রসৃত হইয়া জগৎ পবিত্র করিয়াছিল। ইহার পরে, বহু পরে, সেই এক ক্ষুদ্র ও অজ্ঞান শিশুর মধ্যস্থতায় পিতার হৃদয়ও প্রভাবিত হইয়াছিল এবং পরিশেষে একদিন সন্তানের স্নেহে পিতা ও মাতার প্রেমমিলন সংঘটিত হইয়াছিল।

প্রেমের জন্মের ইহাই যে যথার্থ ইতিহাস অর্থাৎ ইহা যে পতি বা পত্নী হইতে জগতে অবতীর্ণ হয় নাই, কিন্তু সন্তানের মধ্য দিয়া ইহার আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা অসভ্যজাতিসমূহের জীবন সম্বন্ধে যৎসামান্য আলোচনা দ্বারাই উপপন্ন হয়। সন্তানের প্রতি স্নেহ, মাতাপিতার পরস্পরের প্রতি প্রেমোৎপত্তির পূর্বে সঞ্জাত হইয়াছিল, এবং উহা উক্তরূপ প্রেমাপেক্ষা বলবত্তরও

বটে। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর উপেক্ষা নরবিজ্ঞান শাস্ত্রে অনেক সময়ে অতিরঞ্জিত হইলেও এরূপ সুপ্রকাশ যে, উহা অস্বীকার করিবার জো নাই, এবং (অসভ্য সমাজে) সর্বত্রই দেখা যায় যে স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে না, কেবল ভয়ই করিয়া থাকে।

হেন্‌রি ড্রামণ্ডের উক্তি হইতে অন্ততঃ ইহা বুঝা গেল যে প্রেম রমণীর স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম নয়, উহা একটি পারিবারিক গুণ; সন্তানের স্নেহে মাতা-পিতার হৃদয়ের মিলনের ফলে উহার উদ্ভব হইয়াছে। সমাজে যে অসঞ্জাতবৎসা রমণী ও অলব্ধ-পিতৃত্ব পুরুষের মধ্যে প্রবল প্রেমবন্ধন লক্ষিত হয়, তাহা সামাজিক শিক্ষার বা অভিজ্ঞতার ফল বলিয়াই মনে করিতে হইবে। অবশ্য উহা আংশিকরূপে নরনারীর পুরুষানুক্রমিক সংস্কারেরও ফল হইতে পারে। কপালকুণ্ডলার তাদৃশ সংস্কার থাকিলেও সামাজিক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার অভাবে তাহার স্ফুরণ হয় নাই বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ স্বীকৃতির সহিত কোনও বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের বিশেষ বিরোধ নাই। কাজেই যাহারা কাব্যের গুণবিচারে কেবল সৌন্দর্যের প্রামাণিকতা স্বীকার করেন না, কবির প্রত্যেক সিদ্ধান্তকে বিজ্ঞানের, (বা অবস্থাবিশেষে ইতিহাস বা প্রত্নতত্ত্বের) আলোকে পরীক্ষা করিয়া লইতে চান, তাঁহারাও কপালকুণ্ডলা-চরিত্রে প্রেমের অভাব অস্বাভাবিক বলিতে পারেন না। সঞ্জীবচন্দ্র যে বলিয়াছিলেন, 'কিছুকাল সন্ন্যাসীর প্রভাব থাকিবে, পরে সন্তানাদি হইলে স্বামীপুত্রের প্রতি স্নেহ জন্মাইলে সমাজের লোক হইয়া পড়িবে' সেরূপ মত বিজ্ঞানসম্মত। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রকৃতির শিশুর একটা 'সমাজের লোকে' পরিণতি নিতান্ত চমৎকারহীন মনে করিয়া তাহাকে মাতৃত্বলাভ করিতে দেন নাই।

অধ্যাপক ললিতবাবু কপালকুণ্ডলা-চরিত্রে পত্নীত্ব ও মাতৃত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ না দেখিয়া কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। তাঁহার মতে 'হিন্দু এই চিত্রে তৃপ্ত হয়েন না' তবে "যাঁহারা কাব্যে নীতিশিক্ষার বা আদর্শপ্রতিষ্ঠার আশা না করিয়া কাব্য-সৌন্দর্য, কলাকৌশল, কল্পনার বিচিত্র লীলার উপলব্ধি করিতে চাহেন, যাঁহারা 'Arts for Arts' sake সূত্রের অনুরাগী, তাঁহারা এ ক্ষেত্রে কবির ভূয়া রসানাং গহনাঃ প্রয়োগাঃ, চিত্রা কথা, বাচি বিদগ্ধতা চ, উপভোগ করিয়া প্রীত হইবেন এবং তাঁহার কুহকিনী কল্পনা ও বিচিত্র লিপিচাতুর্যের বহুমান করিবেন।" কপালকুণ্ডলার গোড়ার দার্শনিক তত্ত্বটুকু 'সত্য' কিনা তদ্বিষয়েও তাঁহার কিছু সন্দেহ আছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ঐ সংশয়াধ্যাসিত "ভিত্তির উপর তিনি (বঙ্কিম) যে অপূর্ব বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছেন," ললিতবাবু বলিতেছেন, "তাহার শোভাসম্পদ্ স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারি না।"

কপালকুণ্ডলার গোড়ার তত্ত্বটুকু যে বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ নয় তাহা যথাসাধ্য প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। নবকুমারের চরিত্রালোচনাকালে এ সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা বলা আবশ্যক হইবে। সুতরাং এখানে আর অধিক কিছু বলিব না।

বঙ্কিমচন্দ্র যে ভাবে এই কাব্যের উপাখ্যানবস্তু বিন্যস্ত করিয়াছেন এবং ইহাতে পদে পদে যেরূপ নিমিত্ত, সঙ্কেত প্রভৃতির সূচনা করিয়াছেন, তাহাতে কপালকুণ্ডলাকে স্বামীর প্রতি প্রেমবতী[১] ও সন্তানসুখে সুখিনী করিলে তিনি কি বিজ্ঞান কি দর্শন (মনস্তত্ত্ব), কি শিল্প ইহাদের প্রত্যেকের দ্বারে অপরাধী হইতেন। তবু যদি কোনও হিন্দু কপালকুণ্ডলায় পতিপ্রেম ও মাতৃত্বের সমাবেশ দ্বারা আদর্শ-নারীত্বের বিকাশ না দেখিয়া দুঃখ বোধ করেন, তবে তাঁহার প্রবোধার্থ এই কথা বলা যায় যে, কপালকুণ্ডলা যে তাদৃশ আদর্শ-নারীত্ব লাভের সুযোগ পাইবেন না ইহা ত জগদম্বারই ইচ্ছা বলিয়া কবি (হিন্দুসমাজের অনুরোধে না হউক স্বীয় কাব্যকলার অনুরোধেই) ভূয়োভূয়ঃ সূচিত করিয়াছেন। সুতরাং কোনও প্রজ্ঞাবান্ হিন্দুর এ বিষয়ে দুঃখিত হওয়ার হেতু নাই। বরং শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার যেমন বলিয়াছেন, বঙ্কিমের এই কাব্যখানি 'হিন্দুভাবে অস্থি-মজ্জায় গঠিত এবং অদৃষ্টবাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরেখায় ওতপ্রোত,' প্রত্যেক হিন্দু পাঠকেরই সেইরূপ প্রতীতি হওয়া স্বাভাবিক। কবির কৌশলে ইহাতে হিন্দুর কোনও আদর্শ ক্ষুন্ন হয় নাই, পরন্তু ললিতবাবু-লক্ষিত অপূর্ণতার মধ্যেও হিন্দুর প্রকৃষ্ট প্রবোধের স্থল আছে।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

## কপালকুণ্ডলা : অনুবৃত্তি

পূর্বপরিচ্ছেদে আমরা কপালকুণ্ডলা-চরিত্রের কমনীয়তা ও বিশেষত্ব কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। বর্তমান পরিচ্ছেদে আরও কয়েকটি চরিত্র সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। উহা না হইলে 'কপালকুণ্ডলা' যে কেন ভাবুক সমালোচকগণের নিকট এতদূর আদৃত হইয়াছে তাহা হয়ত স্পষ্ট বুঝা যাইবে না।

শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক ললিতবাবু 'কপালকুণ্ডলাতত্ত্বে' লিখিয়াছেন, "কপালকুণ্ডলায় চিত্রপট (canvas) অল্পপরিসর, বৃত্তান্ত ক্ষুদ্র, বিশেষতঃ নায়িকার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধযুক্ত বৃত্তান্ত নিতান্ত ক্ষুদ্র"। এ কথা সত্য হইলেও, কপালকুণ্ডলা পুস্তকখানি

---

১। তৃতীয় বর্ষের (১২৮৩ সনের) আর্যদর্শনের কয়েক সংখ্যায় একজন সমালোচক কপালকুণ্ডলার বিস্তৃত আলোচনা করেন। তৎপ্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছিলেন, "প্রণয় কিরূপ, তাহা তিনি (কপালকুণ্ডলা) জানিতেন না। হৃদয়ে অনুরাগমাত্রের সঞ্চার হইতেছিল। নবকুমার সেই নবমুকুলিত অনুরাগের পাত্র হইলেন। তাঁহার প্রতি প্রণয় জন্মিল, সরল প্রণয়, এই প্রণয়ই কপালকুণ্ডলার একমাত্র ধন ও বন্ধনী।" এই সমালোচনার অর্থ ভাল বুঝা যায় না। আমাদের দৃষ্টিতে এই মত বিচারসহ নহে।

অভিনিবেশসহকারে পাঠ করিবার পর ইহাই কি সকলের মনে হয় না যে, এই উপন্যাসখানিতে নায়িকাই বার আনা, আর অন্যান্য পাত্র চারি আনা মাত্র বা তদপেক্ষাও কম? অর্থাৎ কপালকুণ্ডলার 'চিত্রপটে' একমাত্র কপালকুণ্ডলার চিত্রই প্রধান স্থান বা অগ্রভূমি (foreground) অধিকার করিয়া আছে, আর সকল চিত্র পশ্চাতে (back groundএ) থাকিয়া প্রধান চিত্রেরই সৌন্দর্যবিকাশে সহায়তা করিতেছে মাত্র। নবকুমারকে অধ্যাপক ললিতবাবু 'এই আখ্যায়িকার নায়ক' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কাব্যসমালোচকরূপে ললিতবাবুর পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্মদর্শিতার প্রতি আমাদের আন্তরিক প্রগাঢ়তম শ্রদ্ধাসত্ত্বেও তাঁহার এই মত আমরা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বিষয়টি অবিশেষজ্ঞ পাঠকের পক্ষে দুর্বোধ বলিয়া আমাদের বক্তব্য একটু বিস্তৃতভাবেই বলিতে চেষ্টা করিব।

'নায়ক' শব্দ অলঙ্কারশাস্ত্রে সাধারণতঃ কিঞ্চিৎ সঙ্কীর্ণ অর্থে প্রযুক্ত হয়। শৃঙ্গাররসাত্মক কবিতায় পতি বা প্রিয়কে নায়ক বলা হয়। শব্দকল্পদ্রুম 'রসমঞ্জরী'র অনুসরণ করিয়া 'নায়ক' শব্দের অর্থ দিয়াছেন—'শৃঙ্গারসাধকঃ, স চ ত্রিবিধঃ পতিরুপপতির্বৈশিকশ্চ' ইত্যাদি; উইলসন্ লিখিতেছেন, '(In erotic poetry) The man, husband or lover'। ঐরূপ 'নায়িকা' শব্দের অর্থ শব্দকল্পদ্রুমে দেওয়া হইয়াছে—'শৃঙ্গাররসালম্বনবিভাবরূপা নারী, সা চ ত্রিবিধা স্বীয়া, পরকীয়া, সামান্যবনিতা চ' ইত্যাদি। 'আলম্বনবিভাব' শব্দের অর্থ—যাহাকে অবলম্বন করিয়া রসবিশেষের উদ্গম হয়। উইলসন্ 'নায়িকা'র অর্থ লিখিয়াছেন, 'A mistress, a wife, the famale in the amatory poetry of the Hindus'। উভয় অভিধানেই 'নায়ক' ও 'নায়িকা' শব্দের অন্যান্য অর্থও প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু ঐ অর্থগুলির কোনওটিই অলঙ্কারশাস্ত্রের পারিভাষিকরূপে প্রদত্ত হয় নাই। যথা 'নায়ক' শব্দের অর্থ, নেতা (leader),[১] শ্রেষ্ঠ, হারমধ্যমণি; 'নায়িকা' শব্দের অর্থ দুর্গাশক্তি, কস্তুরীবিশেষ। রসমঞ্জরী প্রভৃতি কেবল শৃঙ্গাররসে 'নায়ক' 'নায়িকা'র প্রয়োগ সীমাবদ্ধ করায় উহা কাব্যে ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণার্থ পাইয়া আসিয়াছে। এককালে আমাদের দেশে কাব্যবিচারটা সাধারণতঃ খুচরা ভাবেই

---

১। "নায়কো নেতরি শ্রেষ্ঠে হারমধ্যমণাবপি" বিশ্ব ও হেমচন্দ্র।

কেহ কেহ নেতৃশব্দ হইতেই 'নায়কের' কাব্যগত অর্থ টানিয়া আনিয়াছেন, যথা বিশ্বনাথ—

"আলম্বনং নায়কাদিস্তমালম্ব্যরসোদ্গমাৎ......তত্র নায়কঃ—
ত্যাগী কৃতি কুলীনঃ সুশ্রীকো রূপযৌবনোৎসাহী।
দক্ষোঽনুরক্তলোকস্তেজোবৈদগ্ধ্যশীলবান্ নেতা।"

এইস্থানে 'নেতা' ও 'নায়ক' পরস্পরের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। উভয় শব্দ মূলে এক হইলেও রসবিচারে নায়ক শব্দেরই সর্বদা ব্যবহার হয়, নেতৃ শব্দের ব্যবহার কম। তথাপি যে একবারে নাই তাহা বলা যায় না। শিশুপালবধটীকায় মল্লিনাথ লিখিয়াছেন,—

নেতাস্মিন্ যদুনন্দনঃ সভগবান্ ইত্যাদি।

অর্থাৎ এক একটি শ্লোক লইয়াই অধিক হইত, সমগ্র একখানি কাব্য লইয়া তেমন হইত না। ইহাতেই নায়ক শব্দের অর্থে ঐরূপ সঙ্কীর্ণতা আসিয়া পড়িয়াছিল। তথাপি ইহা বলা আবশ্যক যে শব্দকল্পদ্রুম বা উইলসনে না পাওয়া গেলেও একখানি সমগ্রকাব্যের প্রধান পাত্ররূপ অর্থে 'নায়ক' শব্দের প্রয়োগ যে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত নহে তাহা নয়। বিশ্বনাথ কবিরাজ মহাকাব্যের লক্ষণ দিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

সর্গবন্ধো মহাকাব্যং তত্রৈকো নায়কঃ সুরঃ।
সদ্বংশঃ ক্ষত্রিয়ো বাপি ধীরোদাত্তগুণান্বিতঃ॥
একবংশভবাঃ ভূপাঃ কুলজা বহবোঽপি বা। ইত্যাদি

মহাকাব্যের একজন নায়ক থাকেন, তিনি দেবতা বা সদ্বংশজ ক্ষত্রিয় এবং ধীরোদাত্তগুণান্বিত। কখনও কখনও একবংশসম্ভূত কুলীন বহু ভূপতিও নায়ক হইতে পারেন। 'রঘুবংশ' বোধ হয় শেষোক্ত বহুনায়ক মহাকাব্যের উদাহরণরূপে অভিপ্রেত হইয়াছে, যদিও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দেখাইয়াছেন যে, ঐ পুস্তকেও বস্তুতঃ একই নায়ক। সে যাহা হউক, মহাকাব্যের যিনি 'নায়ক' তাহাকে সর্বদাই শৃঙ্গারসাধক[১] বলা যায় না। নায়ক শব্দ এস্থলে অঙ্গীরসের নেতা, সুতরাং কাব্যের প্রধান, বা আখ্যানবস্তুর কেন্দ্রীভূত পাত্র অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

ইংরাজী ভাষাতেও hero ( নায়ক ) শব্দের প্রতিপাদ্য সম্বন্ধে মতভেদ আছে। একটা উদাহরণ দিয়া এই বিষয়টি বিশদ করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। মিল্টনের 'প্যারাডাইস্ লস্ট' একখানি সুবিখ্যাত মহাকাব্য। পাঠকগণ অনেকেই হয়ত জানেন ইহাতে ঈশ্বরতনয়ের প্রতি ঈর্ষাবশতঃ সয়তান কর্তৃক পরিচালিত কতকগুলি বিদ্রোহী পরীর (angel) স্বর্গ হইতে নরকে পতন, তথায় পুনঃ ষড়যন্ত্র, তৎপর সয়তান কর্তৃক মানবজাতির আদি মাতা ঈভের প্রলোভন ও তাহার ফলে ঈশ্বরের আদেশে নন্দন-কানন (Paradise) হইতে আদম ও ঈভের নির্বাসন প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। এই কাব্যখানির নায়ক কে তৎসম্বন্ধে দুই শতাব্দীর অধিককাল যাবৎ তর্ক চলিতেছে। কেহ বলিয়াছেন,—স্বয়ং ঈশ্বর ইহার নায়ক; কেহ বলিয়াছেন,—মহাকাব্যের আবার নায়ক কি? ইহাতে নায়ক মোটেই নাই; তবে যদি একজনকে নায়ক বলিতেই হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরতনয় (Messiah—ভাবী খৃষ্ট) ইহার নায়ক; কাহারও কাহারও মতে আদম নায়ক, আবার কেহ কেহ সয়তানকে নায়ক বলিয়াছেন।[২] প্রত্যেক পক্ষেরই যুক্তির মূলে, স্পষ্টভাবে

---

১। অন্ততঃ শৃঙ্গার শব্দ উপলক্ষণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। শব্দকল্পদ্রুম বা উইলসন্-প্রদত্ত অর্থ হইতে উপলক্ষণের ভাব পাওয়া যায় না।

২। সেক্সপীয়রের মার্চ্যাণ্ট অব্ ভিনিস নামক নাটকের নায়ক সম্বন্ধে মতভেদও উল্লেখযোগ্য অল্পসংখ্যক লোকের মতে পোর্সিয়া নায়িকা বলিয়া বেসানিও এই নাটকের

হউক বা অস্পষ্টভাবে হউক, 'নায়ক' শব্দের এক-একটা বিশিষ্ট অর্থ সংস্থাপনের চেষ্টা হইয়াছে। ঐ অর্থগুলি কতকটা এইরূপ—

(১) কাব্যোল্লিখিত পাত্রগণের মধ্যে যাহার কৃতিত্ব অধিক বা কবি যাহাকে জয়যুক্ত করিয়াছেন তিনি নায়ক ;

(২) যিনি গুণে প্রধান বলিয়া স্বীকার্য্য তিনি নায়ক ;

(৩) যাহাকে লক্ষ্য করিয়া কবি সকল কার্য নির্দেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ যিনি অধিকাংশ ঘটনার ফলভোগী তিনি নায়ক ;

(৪) যে পাত্রের সৃষ্টিতে কবির কৃতি-কৌশল ও আন্তরিক (যদিও অনেক সময়ে প্রচ্ছন্ন) সহানুভূতি সর্বাপেক্ষা অধিক প্রদর্শিত হইয়াছে তিনি নায়ক।

প্রত্যেক মতেই কাব্যের প্রধান পাত্রই নায়ক বটে, কিন্তু সেই প্রাধান্যটা কোন্ প্রকারের তাহা লইয়াই যত গোল। প্রথম তিনটি মত বুঝিতে কষ্ট হয় না ; চতুর্থ পক্ষের কথা এই—কাব্যে জয়-পরাজয়, নৈতিক শ্রেষ্ঠতা, এবং কতকগুলি, এমন কি অধিকাংশ, ঘটনার সহিত লিপ্ত থাকাও শিল্পের হিসাবে অবান্তর প্রসঙ্গমাত্র। সমালোচককে কবির অঙ্কিত চিত্রপটের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে হইবে, কোন্ আলেখ্য তাঁহার কল্পনাকে সমধিক উদ্দীপিত করিয়াছে, কোন্‌টির সহিত তাঁহার যথার্থ অর্থাৎ রসানুগত সহানুভূতি অধিক, এবং সেই জন্য কোন্ পাত্রটিকে তিনি (সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে হউক বা কিয়ৎপরিমাণে অজ্ঞাতসারেই হউক[১]) চিত্রপটের অগ্রভূমিতে স্থাপন করিয়াছেন। এইরূপে যে পাত্র কেবল নীতিবলে নয়, কতকগুলি ঘটনার ফল ভোক্তৃরূপেও নয়, কিন্তু কবির কৃতি-কৌশল-গুণে কাব্যের সরসতার কেন্দ্র হইয়া পড়ে তাহাকেই নায়ক বলিতে হইবে।

এখন দেখা যাক্ 'নায়ক' শব্দের পূর্বোল্লিখিত অর্থগুলির কোন্ কোনটি নবকুমার সম্পর্কে প্রযুক্ত হইতে পারে। প্রথমতঃ রসমঞ্জরীর প্রদত্ত অর্থ ধরিলে, খুচরা রীতিতে 'কপালকুণ্ডলা'র নানাস্থান হইতে কতকগুলি বর্ণনা ধরিয়া দেখান যায় যে, কপালকুণ্ডলা নবকুমারগত রতিনামক স্থায়ী ভাবের আলম্বন-বিভাব বটে ; সুতরাং কপালকুণ্ডলা নায়িকা ও নবকুমার নায়ক ; পারিভাষিক শব্দের

---

নায়ক, অনেকের মতে এণ্টনিও নায়ক, ইদানীং কাহারও কাহারও মতে সাইলক নায়ক। এইরূপ আরও বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

১। সয়তানকে প্যারাডাইস্ লস্টের নায়ক স্বীকার করিয়া অধ্যাপক ওয়াণ্টার র‍্যালে লিখিয়াছেন,—It was not for nothing that Milton stultified the professed moral of his poem, and emptied it of all spiritual content. He was not fully conscious, it seems, of what he was doing ; but he builded better than he knew. ('Milton' ১৩৩ পৃষ্ঠা) সাইলককে যাহারা মার্চ্যাণ্ট অব ভিনিসের নায়ক বলেন, তাঁহারাও বোধ হয় এইরূপ কথাই বলিবেন। তবে সেক্সপীয়রের 'professed moral' কিছু নাই। আর তিনি প্রথমে Merchant of Veniceএর অন্যতম নাম The Jew of Veniceই দিয়াছিলেন।

আরও ছড়াছড়ি করিলে বলা যায়, নবকুমার 'পতি', 'ধীরপ্রশান্ত' ও 'অনুকূল' জাতীয় নায়ক। অধ্যাপক ললিতবাবু এরূপ খুচরা রীতিতে নবকুমারকে নায়ক বলেন নাই। এরূপ বলা যে অসঙ্গত তাহা সংস্কৃতজ্ঞ অল্প লোকেই তাঁহার অপেক্ষা অধিক বুঝে। দ্বিতীয় অর্থে নবকুমারকে নায়ক বলা যায় না। 'কপালকুণ্ডলা' কাব্যখানি সমগ্রভাবে ধরিলে দেখা যায়, যে কপালকুণ্ডলার প্রতি নবকুমারের প্রেম এই কাব্যের প্রধান বর্ণনীয় বস্তু নহে। সুতরাং নবকুমার অঙ্গীরসের নেতা বা আখ্যানবস্তুর কেন্দ্র নহেন।

প্যারাডাইস্ লস্টের নায়কবিষয়ক তর্ক হইতে আমরা নায়ক শব্দের যে বিশিষ্ট অর্থগুলি পাইয়াছি তাহাদের প্রথমটি এ কাব্য সম্পর্কে প্রযোজ্য নহে। দ্বিতীয় অর্থে নবকুমারকে নায়ক বলা চলে। নবকুমারের এত গুণ যে যাঁহারা আদর্শচরিত্র সৃষ্টি করাই কাব্য ও উপন্যাসরচনার একমাত্র প্রয়োজন বলিয়া মানেন, তাঁহারাও একাধারে এতদধিক গুণ আশা করিতে পারেন না।[১] কিন্তু কেবল গুণভূয়িষ্ঠতা কোনও পাত্রকে নায়করূপে স্বীকার করিতে ইদানীং অল্প লোকেই সম্মত হইবেন। তৃতীয় অর্থ নবকুমার সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করা যায় না, কেন না যদিও নবকুমার গ্রন্থগত সবগুলি ঘটনারই ফলভোগী, তথাপি তাঁহাকে উদ্দিষ্ট বা কেন্দ্র করিয়া কবি সকল ঘটনার নির্দেশ বা ব্যবস্থাপনা করিয়াছেন এমন কথা বলা যায় না। চতুর্থ মতানুসারেও নবকুমার নায়ক নহেন। এই পরিচ্ছেদের সূচনায় কপালকুণ্ডলার সহিত অন্য পাত্রের সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিয়াছি তাহা হইতেই উহা উপপন্ন হইবে। কপালকুণ্ডলা যদি Romeo and Julietএর মত কাব্য হইত তবে কপালকুণ্ডলাকে নায়িকা ও নবকুমারকে নায়ক বলা যাইত। 'রোমিও এ্যাণ্ড জুলিয়েটে' রোমিও ও জুলিয়েট উভয়েরই স্থান তুল্য, উভয়ের প্রতিই কবি ও পাঠকের রসানুগত সহানুভূতি প্রায় সমান; রোমিওর প্রতি কিঞ্চিৎ অধিক হইলেও জুলিয়েটের স্থানও অগ্রভূমিতে এবং রোমিওর পার্শ্বে সমসূত্রে। নবকুমার ও কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় কি? কপালকুণ্ডলার চিত্রপটে নবকুমারকে —এবং কেবল নবকুমারকে বলি কেন—মতিবিবি, কাপালিক, শ্যামা, অধিকারী ইহাদের প্রত্যেককে—পশ্চাদ্ভূমিতে যথাযোগ্য স্থানে স্থাপন করিয়া সুনিপুণ শিল্পী

---

১। উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাকে নানা দুর্লভ গুণে ভূষিত করিবার প্রথার প্রতি লক্ষ্য করিয়া একজন পাশ্চাত্য ঔপন্যাসিক (Anthony Trollope) লিখিয়াছেন—Perhaps no terms have been so injurious to the profession of the novelist as those two words hero and heroine. In spite of the latitude which is allowed to the writer in putting his own interpretation upon these words, something heroic is still expected; whereas if he attempt to paint from Nature, how little that is heroic should he describe! "Claverings" xxviii.

বঙ্কিমচন্দ্র অনাবশ্যকরূপে নবকুমারকে নানাগুণে গরীয়ান্ করেন নাই। একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায়, তাঁহার সবগুলি গুণই কপালকুণ্ডলা কাব্যের পক্ষে আবশ্যক।

বঙ্কিমচন্দ্র অগ্রভূমিবর্তিনী কপালকুণ্ডলার চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।[১] নবকুমারের প্রত্যেকটি গুণ বিশেষতঃ তাঁহার সুগভীর প্রেম, এবং তাঁহার ধৈর্য, গাম্ভীর্য ও আত্মত্যাগ—সকলই কপালকুণ্ডলার বৈশিষ্ট্যবিকাশের জন্য একান্তরূপে প্রয়োজনীয়। তাঁহার প্রতি পাঠকের যে সহানুভূতি জন্মে, তাহা গভীর হইলেও গৌণ। পাঠকের মুখ্য সহানুভূতি কপালকুণ্ডলাতেই নিবদ্ধ। সেইজন্য আমরা কপালকুণ্ডলাকে নায়িকা বলি, কিন্তু নবকুমারকে নায়ক বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। কাহারও কাহারও কানে হয়ত নায়কহীন উপন্যাস[২] বা নায়কহীন নায়িকা শুনিতে কিছু অদ্ভুত লাগিবে। কিন্তু 'নায়ক'-হীনতাই কপালকুণ্ডলা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের গৌরব।

গ্রন্থারম্ভেই নবকুমারের সহিত পাঠকের পরিচয় হয়, এবং প্রথম হইতেই তাঁহার প্রতি পাঠকের একটা প্রীতি ও সহানুভূতির বন্ধন স্থাপিত হয়। যদিও কপাল-

---

১। স্বর্গীয় গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী স্বপ্রণীত 'বঙ্কিমচন্দ্রের' কপালকুণ্ডলা-খণ্ডে নবকুমারকে 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চরিতাবলীর' অন্তর্গত করিয়া শ্যামা, অধিকারী ও কাপালিকের সহিত একপর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। মতিবিবি 'ক্ষুদ্র চরিতাবলীর' মধ্যে গণ্য হয় নাই। তৃতীয় বর্ষের বঙ্গদর্শনের কয়েক সংখ্যায় কপালকুণ্ডলার যে বিস্তৃত সমালোচনা বাহির হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে পূর্বে (৮২ পৃ, পাদটীকা) একবার উল্লেখ করিয়াছি। সমালোচকের নাম পূর্ণচন্দ্র বসু। তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন, "এ গ্রন্থের প্রধান চিত্র নায়িকা কপালকুণ্ডলা। তাহারই চরিত্র তাহারই প্রকৃতি বিশেষরূপে প্রদর্শন করিবার জন্য যাবতীয় ঘটনার আয়োজন ও গ্রন্থীয় ব্যাপার কল্পনার সৃষ্টি।" অন্যত্র লিখিয়াছেন, "কপালকুণ্ডলার পুরুষ-পাত্রগণ যে অতি যৎসামান্য তাহা বলিয়া দিবার আবশ্যক করে না। তাহা পাঠক অনায়াসে বুঝিতে পারেন। এই উপন্যাসে কপালকুণ্ডলা ও মতিবিবিই প্রধানা। বঙ্কিমবাবুর প্রায় সকল উপন্যাসই স্ত্রীপ্রধান।" আবার অন্যত্র লিখিয়াছেন, "কপালকুণ্ডলার উপাখ্যানে এই মতিবিবির চিত্র যেমন উজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত হইয়াছে, এমত কাহারই নহে। মতিবিবির চিত্র সুস্পষ্ট উজ্জ্বল, কপালকুণ্ডলার চিত্র অস্পষ্ট, মলিন। মতিবিবিকে প্রকাণ্ড দেখায়, কপাল-কুণ্ডলাকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দেখায়।" নবকুমার কপালকুণ্ডলার তুলনায় অপ্রধান পাত্র বটে, কিন্তু মতিবিবির তুলনায় 'ক্ষুদ্র' বা 'যৎসামান্য' নহে। কপালকুণ্ডলা যে মতিবিবির তুলনায় 'অস্পষ্ট, মলিন' ও 'অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র' ইহাতে চিত্রপটে মতিবিবি হইতে তাহার প্রাধান্যের হ্রাস হয় নাই। বরং নায়িকার চিত্রে বর্ণবাহুল্যের অভাবে কবির কৃতিত্ব অধিক দ্যোতিত হইয়াছে।

২। ইংরাজীতে অভিজ্ঞ পাঠকমাত্রেই জানেন সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক থেকারের সর্বোৎকৃষ্ট উপন্যাস Vanity Fairএর অন্যতর নাম A Novel without a Hero (নায়কহীন উপন্যাস)। অবশ্য এইরূপ নামকরণের মূলে থেকারের স্বভাবসিদ্ধ বক্রোক্তিপ্রিয়তা ও সমসাময়িক ঔপন্যাসিকদিগের রচিত গ্রন্থাবলীর প্রতি কটাক্ষ আছে। থেকারে যে অর্থে নিজ উপন্যাসকে নায়কহীন বলিয়াছেন, সে অর্থে তাঁহার উপন্যাসে নায়িকাও নাই। একজন সমালোচক যথার্থই বলিয়াছেন, ঐ গ্রন্থের পাত্রপাত্রীগণের মধ্যে যাহারা সৎ তাহারা সব হাবা, এবং যাহারা চতুর তাহারা সকলেই বজ্জাত। থেকারে স্বীয় উপন্যাসকে নায়কহীন বলিলেও, এ. ট্রলপ্‌ বেকী সার্পকে নায়িকা ও রডন ক্রলিকে নায়ক বলিয়াছেন। আবার অনেকে এমিলিয়াকে নায়িকা ও ডবিনকে নায়ক বলিয়াছেন।

কুণ্ডলার বর্ণনীয় ঘটনাগুলির কল্পিত কাল সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ,[১] তথাপি গ্রন্থের মধ্যে কোথাও নবকুমারকে নিতান্ত সেকেলে লোক বলিয়া মনে হয় না, বরং মনে হয়, তিনি এই সে দিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও একটা উচ্চ পরীক্ষা দিয়া হয়ত ফলের প্রতীক্ষায় বাড়ীতে বসিয়াছিলেন এবং একটু অবসর বুঝিয়া গঙ্গাসাগর দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তিনি বলেন, 'যদি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি তবে তীর্থদর্শনে যেরূপ পরকালের কর্ম হয়, বাটী বসিয়াও সেরূপ হইতে পারে।' তারপর যখন তাঁহার সঙ্গী বৃদ্ধটি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তবে তুমি গঙ্গাসাগরে এলে কেন?' তিনি বলিলেন, 'আমি ত আগেই বলিয়াছি যে, সমুদ্র দেখিব বড় সাধ ছিল, সেই জন্যই আসিয়াছি।' আবার কেবল ইহাই নহে, সমুদ্রের স্মৃতি মনে পড়ায় অমনি কালিদাসের রঘুবংশ হইতে একটা শ্লোক আবৃত্তি করিয়া ফেলিলেন। নবকুমারের কথাবার্তায় ও মতাবলীতে যাহাকে একটা আধুনিক কালের ছাপ বলিয়া মনে হইতে পারে, বস্তুতঃ উহা বাঙ্গালী যুবকের চিরন্তন মুদ্রাচিহ্ন। নবকুমারের কোনও ধর্মই অসাময়িকত্ব দোষে নষ্ট নহে।[২] নবকুমারের ন্যায় রসজ্ঞ অথচ উদার উন্নতচরিত্রশালী, বহু যুবক চিরদিনই বাঙ্গালায় ছিল, এবং আশা করা যায় চিরদিনই থাকিবে।

নবকুমার শিক্ষিত, কুসংস্কারহীন, সৌন্দর্যবোধ-সম্পন্ন, বিনয়ী, ধীর, আত্মত্যাগশীল ও সাহসী। কপালকুণ্ডলার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়ার পূর্বেই আমরা তাঁহার এই গুণগুলির পরিচয় পাই। কাপালিকের কবল হইতে পলায়ন করিয়া যখন তিনি কপালকুণ্ডলার সহিত অধিকারীর মঠে আসিলেন, তখন দেখিতে পাই, তিনি স্বীয় প্রাণরক্ষয়িত্রীর বিপদাশঙ্কা করিয়া অধিকারীকে বলিতেছেন, "আমার প্রাণদান করিলে যদি কোনও প্রত্যুপকার হয়, তবে তাহাতেও প্রস্তুত আছি। আমি এমন সঙ্কল্প করিতেছি যে, আমি সেই নরঘাতকের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া আত্মসমর্পণ করি। তাহা হইলে ইহার রক্ষা হইবে।" শেষে অধিকারী ধীরে ধীরে ও 'রাঢ় দেশের ঘটকালির' সুকৌশলপূর্ণ কায়দায় যখন বুঝাইয়া দিলেন যে নবকুমারের সহিত বিবাহ হইলেই কপালকুণ্ডলার মঙ্গল; তখন কিন্তু নবকুমার সহসা

১। বাদশাহ আকবরের মৃত্যুর কিছু পূবে লুৎফ উন্নিসা আগরা হইতে উড়িষ্যা যাত্রা করেন। উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে যে রজনীতে তাঁহার নবকুমারের সহিত সাক্ষাৎ হয় সেই রজনীতেই তিনি সংবাদ পাইলেন আকবরের মৃত্যু হইয়াছে এবং সেলিম বাদশাহ হইয়াছেন। ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন আকবর শাহের মৃত্যু ১৬০৫ খৃস্টাব্দে ঘটে।

২। নবকুমারের সঙ্গী বৃদ্ধটির মধ্যেও বাঙ্গালী গ্রাম্যবৃদ্ধের চিরন্তন মুদ্রাচিহ্ন আছে। "তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, এখন পরকালের কর্ম করিব না ত কবে করিব?"—এ বোধও আছে; আবার "বেটারা বিশ পঁচিশ বিঘার ধান কাটিয়া লইয়া গেল ছেলেপিলে সংবৎসর খাবে কি?"—সে জন্য সরোষব্যগ্রতাও আছে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের Skylarkএর ন্যায় ইনিও **True to the kindred points of Heaven and Home!** এরূপ গ্রাম্যবৃদ্ধ বাঙ্গলায় চিরদিনই ছিল, এখনও আছে।

উত্তর করিলেন না। তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং অতি দ্রুত পাদবিক্ষেপে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অধিকারী তাঁহার মনের ভাব সম্পূর্ণ বুঝিতেছিলেন কি না জানি না, কিন্তু তিনি নবকুমারকে ভাবিবার অবসর দিয়া গেলেন। নবকুমার কি ভাবিতেছিলেন ? তিনি কুলীনসন্তান আর কপাল-কুণ্ডলা অজ্ঞাতকুলশীলা বলিয়া কুলভঙ্গভয়ে আড়ষ্ট হইয়াছিলেন কি ? তাহা নয়। তিনি কপালকুণ্ডলার রূপে আত্মহারা, তাঁর কাছে প্রাণদান পাইয়াছেন। নবকুমারের চিন্তা তাঁহার নিজের জন্য নয়, কপালকুণ্ডলার জন্য। অজ্ঞাতকুলশীলা কপালকুণ্ডলাকে গ্রহণ করিলে সমাজ উৎপীড়ন করিতে পারে, এবং সে উৎপীড়নে তাঁহার স্বজনগণ হয়ত কপালকুণ্ডলাকেই হেতু মনে করিয়া তাহাকে অনাদর, অপমান ও আরও কত কি করিতে পারেন, সেই ভয়ে নবকুমার বিবাহপ্রস্তাবে সহসা সম্মত হইলেন না। তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন না, বিবাহ কপালকুণ্ডলার ভবিষ্যৎ সুখের ও শান্তির হেতু হইবে কি না। শেষে সমস্ত রাত্রি ভাবিয়া চিন্তিয়া বিবাহ করাই স্থির করিলেন, এবং পরদিন প্রাতে বলিলেন, "আজ হইতে কপালকুণ্ডলা আমার ধর্মপত্নী, ইহার জন্য সংসার ত্যাগ করিতে হয় তাহাও করিব।"

বিবাহ হইল। অধিকারী তিথি নক্ষত্রাদি 'সবিশেষ সমালোচনা' করিয়া কহিলেন,—"আজি যদিও বিবাহের দিন নহে তথাচ বিবাহের কোন বিঘ্ন নাই। গোধূলিলগ্নে কন্যা সম্প্রদান করিব।" ঠিক বলিতে পারি না বঙ্কিমচন্দ্র এখানেও সুকৌশলে একটা নিমিত্ত সূচনা করিয়াছেন কি না। অধিকারী জ্যোতিষশাস্ত্র জানেন ; কিন্তু সেটা যে মাঘ মাস তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। গোধূলিলগ্নে বিবাহ প্রশস্ত বটে, কিন্তু জ্যোতিষশাস্ত্রে বলে—"মার্গশীর্ষে তথা মাঘে গোধূলিঃ প্রাণ-নাশিকা।" ভবিতব্যতা প্রবল, তাই প্রাণনাশক লগ্নে নবকুমার-কপালকুণ্ডলার বিবাহ হইল !

বিবাহের পর অধিকারীর মঠ হইতে সপ্তগ্রামযাত্রার পথে মতিবিবির সহিত নবকুমারের সাক্ষাৎ হয়। উভয়ের আলাপ হইতে বুঝিতে পারি নবকুমার নবপরিণীতা পত্নীর রূপে অন্তরে অন্তরে গর্ব ও আনন্দ বোধ করিতেছিলেন। কিন্তু কই, অন্যান্য উপন্যাসে বর্ণিত যুবক প্রেমিকদিগের মত নবকুমার ত কপালকুণ্ডলার সহিত একটি-বারও প্রেমালাপ করিলেন না ? এ আবার কেমন ? এই কপালকুণ্ডলাকে সমুদ্রতীরে প্রথম দেখিয়া না তাঁহার 'বাক্‌শক্তি রহিত' হইয়াছিল ? এবং তাঁহার কণ্ঠের প্রথম কথা—'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ ?' শুনিয়া না তাঁহার হৃদয়বীণা বাজিয়া উঠিয়াছিল, এবং সেই ধ্বনি তাঁহার কানে বা মনে হর্ষবিকম্পিত হইয়া বেড়াইতেছিল, পবনে বহিতেছিল, বৃক্ষপত্রে মর্মরিত হইতেছিল, এবং তাঁহার হৃদয়-তন্ত্রীমধ্যে সৌন্দর্যের লয় মিলিতেছিল ? নবকুমারকে ত প্রেমালাপ করিতে শুনিলামই না, এমন কি কপালকুণ্ডলার সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে মিলামিশা করিতেও দেখিলাম না। ইহার হেতু কি ?—নবকুমার নিজের সুখ খোঁজেন না ;

কপালকুণ্ডলার সুখশান্তির কথাই তিনি এখনও ভাবিতেছিলেন। তাঁহার গৃহে আসিয়া কপালকুণ্ডলা—তাঁহার বড় সাধের, বড় গর্বের ধন কপালকুণ্ডলা,—তাঁহার প্রাণাধিকা প্রাণরক্ষয়িত্রী কপালকুণ্ডলা—আদৃতা হইবেন কি না? যে পর্যন্ত তিনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে না পারিতেছিলেন সে পর্যন্ত তাঁহার মনে শান্তি ছিল না। তিনি চপল প্রেমিক নহেন; 'ভবিষ্যতে যাহাই হউক, বর্তমানের আনন্দটুকু হইতে কেন আপনাকে বঞ্চিত করি,' এ বোধ তাঁহার নাই। কপালকুণ্ডলার সুখের চেয়ে আপনার আনন্দ তাঁহার কাছে বড় নয়! প্রেমে অন্য উপন্যাসের নায়ককে চপল করে; প্রেমে নবকুমারের স্বভাবতঃ ধীর প্রকৃতিকে গম্ভীরতর করিয়া ফেলিল।

নবকুমার যখন বাড়ী আসিলেন, তখন হারাধন পাইয়া তাহার আত্মীয়স্বগণ নাকি একেবারে 'আহ্লাদে অন্ধ' হইলেন। "তখন তাঁহাকে কে জিজ্ঞাসা করে যে, তোমার বধূ কোন্ জাতীয় বা কাহার কন্যা?" ভালই হইল। দেবীবরের মেলবন্ধনের পরে এমন কুলীন সমাজ বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যের প্রয়োজনেই নবকুমারের ভাগ্যে জুটিয়াছিল।[১] সে যাহা হউক,

> যখন নবকুমার দেখিলেন যে, কপালকুণ্ডলা তাঁহার গৃহমধ্যে সাদরে গৃহীতা হইলেন, তখন তাঁহার আনন্দসাগর উছলিয়া উঠিল; অনাদরের ভয়ে তিনি কপালকুণ্ডলা লাভ করিয়াও কিছুমাত্র আহ্লাদ বা প্রণয়লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই, অথচ তাঁহার হৃদয়াকাশ কপালকুণ্ডলার মূর্তিতেই ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছিল। এই আশঙ্কাতেই তিনি কপালকুণ্ডলার পাণিগ্রহণপ্রস্তাবে অকস্মাৎ সম্মত হয়েন নাই; এই আশঙ্কাতেই পাণিগ্রহণ করিয়াও এ পর্যন্ত বারেকমাত্র কপাল-কুণ্ডলার সহিত প্রণয়সম্ভাষণ করেন নাই, পরিপ্লবোন্মুখ অনুরাগসিন্ধুতে বীচিমাত্র বিক্ষিপ্ত হইতে দেন নাই। কিন্তু সে আশঙ্কা দূর হইল; জলরাশির গতিমুখ হইতে বেগনিরোধকারী উপল মোচনে যেরূপ দুর্দম স্রোতোবেগ জন্মে সেইরূপ বেগে নবকুমারের প্রণয়সিন্ধু উছলিয়া উঠিল।

এই প্রেমাবির্ভাব সর্বদা কথায় ব্যক্ত হইত না, কিন্তু নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে দেখিলেই যেরূপ সজললোচনে তাঁহার প্রতি অনিমিষ চাহিয়া থাকিতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত। যেরূপ নিষ্প্রয়োজনে প্রয়োজন কল্পনা করিয়া কপালকুণ্ডলার কাছে আসিতেন তাহাতে প্রকাশ পাইত। যেরূপ বিনাপ্রসঙ্গে কপালকুণ্ডলার প্রসঙ্গ উত্থাপনের চেষ্টা পাইতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত, যেরূপ দিবানিশি কপালকুণ্ডলার সুখস্বচ্ছন্দতার অন্বেষণ করিতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত। সর্বদা অন্যমনস্কতাসূচক পদবিক্ষেপে প্রকাশ পাইত। তাঁহার প্রকৃতি পর্যন্ত পরিবর্তিত হইতে লাগিল। যেখানে চাপল্য ছিল, সেখানে গাম্ভীর্য জন্মিল,

---

১। দেবীবর ঘটক ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রাদুর্ভূত হন বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

যেখানে অপ্রসাদ ছিল, সেখানে প্রসন্নতা জন্মিল, নবকুমারের মুখ সর্বদাই প্রফুল্ল। হৃদয় স্নেহের আধার হওয়াতে অপর সকলের প্রতি স্নেহের আধিক্য জন্মিল; বিরক্তিজনকের প্রতি বিরাগের লাঘব হইল। মনুষ্যমাত্র প্রেমের পাত্র হইল; পৃথিবী সৎকর্মের জন্য মাত্র সৃষ্ট বোধ হইতে লাগিল; সকল সংসার সুন্দর বোধ হইতে লাগিল। প্রণয় এইরূপ! প্রণয় কর্কশকে মধুর করে, অসৎকে সৎ করে, অন্ধকারকে আলোকময় করে।[১]

ভালবাসা পাইয়াও ভালবাসিতে শিখিল না বলিয়া যাঁহারা কপালকুণ্ডলাকে বেয়াড়া বা অস্বাভাবিক প্রভৃতি ভাবেন, তাঁহাদের পক্ষে এই কথাগুলি মনোযোগ দিয়া পাঠ করা উচিত।

যে প্রেমাবির্ভাব কথায় ব্যক্ত হয় না, তাহাও সমাজের রীতিনীতিতে অভিজ্ঞা, স্বামিপ্রেমলোলুপা কোনও চতুরা কিশোরীর সতর্ক দৃষ্টি এড়াইতে পারে না, কাজেই তাহার সমুচিত প্রতিদানও যথাসময়ে পাওয়া যায়। কিন্তু নবকুমারের দুর্ভাগ্যক্রমে কপালকুণ্ডলা লোকচরিত্রে—বিশেষতঃ সামাজিক লোকের চরিত্র-বিষয়ে—নিতান্ত অনভিজ্ঞা। সমাজের সকল বালিকাই কপালকুণ্ডলার বয়সপ্রাপ্ত হইবার পূর্বেই মা, মাসী, খুড়ী, পিসী প্রভৃতির পরস্পর কথোপকথনে, কিংবা সখীগণের সহিত আলাপ-আলোচনায় স্বামিস্ত্রীর ভালবাসার বাহ্য নিদর্শন সম্বন্ধে অনেক তথ্যই শিখে, এবং স্বামীর ভালবাসা যে স্ত্রীর একান্ত কাঙ্ক্ষণীয় তাহাও বাল্যাবধিই শুনিতে পায়। অবশ্য বাল্যে তাহার সকল মর্ম বুঝিতে পারে না, কিন্তু বুঝিবার বয়স হইলে সেই সকল পূর্বশ্রুত তথ্য আপনা হইতেই তাহাদের মনে উদিত হয়। কিন্তু কপালকুণ্ডলা জীবনে তাদৃশ সামাজিক শিক্ষার অবসর পান নাই। পরন্তু তান্ত্রিকসংলগ্নে তিনি যে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহার ফলে দেবীর পাদপদ্ম হইতে ত্রিপত্রচ্যুতিদর্শনে তাঁহার দৃঢ় সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, স্বামিসংসর্গ তাঁহার শুভকর হইবে না।[২] তাঁহার ন্যায় 'সৃষ্টিছাড়া' প্রেমপাত্রীকে আপনার করিয়া লইতে হইলে প্রেমিককে নবকুমারের ন্যায় চাপা লোক হইলে চলিবে কেন? 'কপালকুণ্ডলা' পড়িতে পড়িতে ইহা কি মনে হয় না, আহা!

---

১। মানবের মনে প্রেমের প্রভাব সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের এই মনোরম উক্তিগুলি পড়িতে পড়িতে টেনিসনের নিম্নলিখিত কবিতা মনে পড়ে—

> Love took up the glass of Time, and turn'd it in his
> glowing hands;
> Every moment, lightly shaken, ran itself in golden sands
> Love took up the harp of Life, and smote on all the
> chords with might;
> Smote the chord of Self, that, trembling, pass'd in
> music out of sight.

২। 'কপালকুণ্ডলা', দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নবকুমার অন্য প্রেমিকের মত হইলে বুঝি বা কপালকুণ্ডলা তাঁহাকে ভালবাসিতে শিখিত? যে বিষয়ে যাহার স্বাভাবিক প্রবণতা নাই, পূর্বপ্রাপ্ত শিক্ষারও একান্ত অভাব, সে বিষয়ে তাহাকে কেবল নিজের বুদ্ধি বা সুমতির উপর ফেলিয়া রাখিলে চলিবে কেন? শ্যামাসুন্দরী হিতৈষিণী সখীর ন্যায় যোগিনীকে প্রেমময়ী গৃহিণীরূপে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তৎপক্ষে যে তিনি কতদূর চেষ্টা করিয়াছেন তাহা বুঝা যায় না। আর চেষ্টা করিলেও, তাঁহার চেষ্টা ও নবকুমারের চেষ্টার ফল এক্ষেত্রে তুল্য হইবে কেন? নবকুমার ভালবাসেন; কিন্তু গম্ভীর বলিয়া, আত্মবিসর্জনে অভ্যস্ত বলিয়া, হয়ত অতি উচ্চশ্রেণীর প্রেমিক বলিয়াই, ভালবাসাইবার কৌশল প্রয়োগ করিতে শিখেন নাই। যে মুখে বলে, 'ভালবাসিবে বলে ভালবাসি নে'[১] কিংবা 'আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি, তুমি অবসর মত বাসিও'[২] সে যাহা বলে, তাহা তাহার মনের প্রকৃত ভাব নহে। নবকুমারের মুখে ওরূপ ভাব প্রকাশ করিতে না শুনিলেও—হয়ত শুনি না বলিয়াই—আমরা বুঝি, উহাই তাঁহার ভালবাসার মূলমন্ত্র। কিন্তু 'গুণ হৈয়া দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায়।' অদৃষ্টদোষে ঐরূপ গাম্ভীর্য, ঐরূপ প্রতিদানপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাহীন ভালবাসাই তাঁহার কাল হইল, তাঁহার বড় আদরের, বড় গর্বের ধন কপালকুণ্ডলারও কাল হইল। সে ভালবাসিতে,—একান্তভাবে তাঁহার উপরে নির্ভর করিতে,—নিজের হৃদয় তাঁহার সমক্ষে খুলিয়া দিতে শিখিল না। তাই সেই কালরাত্রিতে ব্রাহ্মণ যুবকবেশিনী লুৎফ উন্নিসা যখন কপালকুণ্ডলাকে বলিল 'আমার প্রাণদান দাও—স্বামিত্যাগ কর,' তখন কপালকুণ্ডলা "চিন্তা করিতে লাগিলেন—পৃথিবীর সর্বত্র মানসলোচনে দেখিলেন—কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না। অন্তঃকরণমধ্যে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন—তথায় ত নবকুমারকে দেখিতে পাইলেন না, তবে কেন লুৎফ উন্নিসার সুখের পথ রোধ করিবেন?" এই যে জীবনের একটা গুরুতর সংকটময় মুহূর্তে অন্তঃকরণ মধ্যে দৃষ্টি করিয়া স্বামীকে দেখিতে না পাওয়া, ইহা কেবলই কপালকুণ্ডলার বেয়াড়ামি নয়, ইহাতে নবকুমারেরও যেন একটু দায়িত্ব আছে বলিয়া মনে হয়। ইহা অস্বাভাবিকপ্রকৃতিকতার চিহ্নও নয়; নবকুমারকে বঙ্কিম যেমনটি করিয়াছেন, তেমনটি রাখিয়া কপালকুণ্ডলাকে তাঁহার প্রতি প্রণয়িনী করিয়া তুলিলেই সে চরিত্র অস্বাভাবিক হইত, না তোলায় অস্বাভাবিক হয় নাই।

সপ্তগ্রামে মতিবিবির সহিত ব্যবহারে নবকুমারের দৃঢ় আত্মসংযম প্রকাশ পাইয়াছে। ওজোগুণে ঐ পরিচ্ছেদটি গ্রন্থের মধ্যে অতুলনীয়। নবকুমার ও মতিবিবি দুইটা চিত্রই অতি উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত। একের দিকে চাহিতে যেন চক্ষু ঝলসিয়া যায়, অন্যের দিকে চাহিতে তেমন হয় না বটে, কিন্তু মনে হয়—'পর্বতের

১। শ্রীধর কথক-রচিত গান—স.
২। রবীন্দ্রনাথ-রচিত—স.

চূড়া যেন সহসা প্রকাশ।' দুয়ের সম্মিলনফলও অতি অপূর্ব। নবকুমার যেন অভ্রভেদী গৌরীশঙ্কর-শৃঙ্গ; আর মতিবিবি যেন তাহার পাদদেশলাঞ্ছিনী দাবাগ্নিশিখা। আগুন শত বাহু বিস্তার করিয়া সহস্রশতপ্রলোভনকর সৌন্দর্য বিকাশ করিয়া গিরিশৃঙ্গকে আলিঙ্গন করিতে চাহিতেছে, কিন্তু গিরিশৃঙ্গ নির্বিকার-ভাবে আপন অটল মহিমায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। মতির প্রার্থনার উত্তরে নবকুমারের মুখ হইতে যে দুই চারিটি কথা বাহির হইতেছে, তাহা গিরিগাত্রস্খলিত তুষারখণ্ডের ন্যায় দাবাগ্নিশিখাকে এক একবার দমিত করিয়া দিতেছে। কিছুক্ষণ পরেই আগুন আবার বাহুবিস্তার করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতে চাহিতেছে। মতির একটা কথা শুন—

তুমি কি চাও? পৃথিবীতে কিছু কি প্রার্থনীয় নাই? ধন, সম্পদ্, মান, প্রণয়, রঙ্গ, রহস্য পৃথিবীতে যাহাকে সুখ বলে সকলই দিব।

কথাটি শুনিয়া সয়তানকর্তৃক যীশুর প্রলোভন মনে পড়ে—

And the devil said unto him, All this power will I give thee, and the glory of them; for that is delivered unto me; and whomsoever I will I give it. (St. Luke iv)

ধন মান প্রণয় রঙ্গ রহস্যের প্রলোভন নিষ্ফল হইলে মতি নিষ্কাম প্রেমের নামে নবকুমারের মনে দয়ার উদ্রেক করিবার চেষ্টা করিল এবং শেষে পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু এ যে গিরিশৃঙ্গ,—পাষাণ। তাহাতে কোমলতা কোথায়? অথচ পাঠক মনে রাখিবেন, নবকুমার স্ত্রীসুখে সুখী নহেন। তাঁহার এক স্ত্রী যৌবনোদ্গমের পূর্বেই পিতার ধর্মান্তরগ্রহণ হেতু বর্জিতা হইয়াছিলেন। (নবকুমার অদ্যাপি জানেন না যে তাঁহার প্রলোভনকারিণীই সেই স্ত্রী) দ্বিতীয় পত্নী যুবতী ও রূপবতী হইলেও তাঁহার প্রতি অনুরাগবতী নহেন। এমন অবস্থায় অন্য কোনও যুবার পক্ষে কি সম্ভব তাহা চিন্তা করিলে নবকুমারের চরিত্রের ঔন্নত্য বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যাইবে।

ক্রমে নবকুমারের গাম্ভীর্য ও আত্মবিসর্জনশীলতা তাঁহাকে আত্মপীড়নে প্রবৃত্ত করিল। তিনি স্বভাবতঃ চাপা লোক ছিলেন; শেষ দিকে দেখি, কপালকুণ্ডলার অবাধ্যতায় পদে পদে মর্মাহত হইয়াও তিনি নিজ মনোদুঃখ কথায় ব্যক্ত করিতে জানেন না। তিনি কেবলই ভাবেন আর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন, কর্তব্যের পথ ভাল দেখিতে পান না। কপালকুণ্ডলাকে একাকিনী রাত্রিতে বাহিরে যাইতে কৃত-সঙ্কল্পা দেখিয়া যখন তিনি বলিয়াছিলেন, "চল আমি তোমার সঙ্গে যাইব," তখন—

কপালকুণ্ডলা গর্বিত বচনে কহিলেন, "আইস, আমি অবিশ্বাসিনী কি না, স্বচক্ষে দেখিয়া যাও।"

নবকুমার আর কিছু বলিতে পারিলেন না। নিশ্বাসসহকারে কপাল-কুণ্ডলার হাত ছাড়িয়া দিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

তার পর কপালকুণ্ডলার কবরীচ্যুত চিঠি হাতে পাইয়া নবকুমার যখন তাঁহার চরিত্রে সন্দিহান হইলেন, তখনই বা তিনি কি করিলেন?

নবকুমার নীরবে বসিয়া অনেকক্ষণ রোদন করিলেন। রোদন করিয়া কিছু সুস্থির হইলেন। তখন তিনি কিংকর্তব্যসম্বন্ধে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন। আজি তিনি কপালকুণ্ডলাকে কিছু বলিবেন না। কপালকুণ্ডলা যখন সন্ধ্যার সময় বনাভিমুখে যাত্রা করিবেন, তখন গোপনে তাহার অনুসরণ করিবেন, কপাল-কুণ্ডলার মহাপাপ প্রত্যক্ষীভূত করিবেন, তাহার পর এ জীবন বিসর্জন করিবেন। কপালকুণ্ডলাকে কিছু বলিবেন না; আপনার প্রাণ সংহার করিবেন। না করিয়া কি করিবেন?—এ জীবনের দুর্বহ ভার বহিতে তাঁহার শক্তি হইবে না।

যখন উৎসাহ উদ্যমের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা অধিক, ঠিক সেই সময়ে এইরূপ অপুরুষোচিত সঙ্কল্প নিতান্তই অশোভন মনে হয় না কি? নবকুমার যদি স্বভাবতঃ একটু চাপা, একটু ভাবুক, একটু আত্মবিসর্জনশীল না হইতেন তাহা হইলে তাঁহার মনে হয়ত এসময়ে এরূপ সঙ্কল্পের উদয় হইত না। নবকুমারের জীবনের এই ভাগটা পড়িতে পড়িতে কাহারও কাহারও হয়ত হ্যামলেটকে মনে পড়িবে। হ্যামলেটও নানাগুণে বিভূষিত হইয়া ভাগ্যদোষে আত্মপীড়নে রত। এক সময়ে তাঁহাকেও জীবনে বীতরাগ দেখিতে পাওয়া যায়। নবকুমার যেমন স্থির করিলেন এ জীবন বিসর্জন করিবেন,—এ জীবনের দুর্বহ ভার বহিতে তাঁহার শক্তি হইবে না, হ্যামলেটও সেইরূপই ভাবিয়াছিলেন—

To die—to sleep,
No more;—and by a sleep, to say we end
The heart-ache, and the thousand natural shocks
That flesh is heir to,—'t is a consummation
Devoutly to be wish'd

নবকুমার হ্যামলেটের মত অধিক বিচার করেন না। তিনি অদৃষ্টদোষে যেন মোহগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। অদৃষ্টের প্রভাব হ্যামলেট নাটকেও অতি স্পষ্ট। হ্যামলেট নিজেই বলিয়াছেন—

There's a divinity that shapes our ends
Roughhew them how we will.

নবকুমারচরিত্রে ঐ প্রভাব আরও স্পষ্ট। নবকুমার জীবনের অতি গুরুতর মুহূর্তে যেটুকু কার্যও করিবেন বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছিলেন তাহাও পারিলেন না। তিনি স্থির করিয়াছিলেন, কপালকুণ্ডলা বাহির হইবার সময় গোপনে তাঁহার অনুসরণ করিবেন—তাঁহার 'মহাপাপ' প্রত্যক্ষ করিবেন। যদি তিনি তাহা করিতে পারিতেন তাহা হইলে (কে বলিতে পারে?) হয়ত তাঁহার সকল সন্দেহের সুমীমাংসা হইয়া

যাইত—লুৎফ উন্নিসাকে চিনিয়া ফেলিতে পারিতেন। কিন্তু যখন বাহিরে যাইতেছিলেন সেই সময় কাপালিক আসিয়া তাঁহার পথে পড়িল, তাহার সহিত কথোপকথনে বিশেষতঃ তাহার প্রদত্ত সুরাগরল পান করিয়া নবকুমারের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিল। স্বস্থাবস্থায় হয়ত তিনি ক্রোধের বেগে বা সন্দেহ ভালরূপে নিরসন করিবার উদ্দেশ্যে লুৎফ উন্নিসার সম্মুখীনও হইতে পারিতেন, কিন্তু কাপালিক সঙ্গে থাকায় তাহা সম্ভব হইল না। পুরুষবেশিনী লুৎফ উন্নিসার সহিত একত্র দেখিবার পরও তিনি কপালকুণ্ডলাকে কোনও কথা সময় থাকিতে জিজ্ঞাসা করিলেন না, কোনও তিরস্কার করিলেন না। কাপালিকের কথায়, ও হয়ত তাঁহার প্রদত্ত সুরার প্রভাবে, পূর্বকৃত আত্মহননের সঙ্কল্পও বিস্মৃত হইলেন—মূঢ়ের ন্যায় তাহার পূজার আয়োজনের পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন এবং তাহার আদেশ মত কপালকুণ্ডলাকে স্নান করাইতে চলিলেন। যখন তাঁহার মোহ মন্দীভূত হইয়া আসিল তখন উভয়েরই কাল ফুরাইয়া আসিয়াছে। জীবনের সেই শেষ মুহূর্তে চিরাভ্যস্ত গাম্ভীর্য ভুলিয়া, চাপা ভাব দূরে নিক্ষেপ করিয়া নবকুমার সুচিরাবদ্ধ হৃদয়কপাট উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। হ্যামলেটেরও কি এইভাবে জীবনের শেষ মুহূর্তে কর্তব্যজ্ঞান জাগিয়া ওঠে নাই? শ্মশানের মধ্য দিয়া ভাগীরথীর দিকে যাইতে যাইতে কপালকুণ্ডলা দেখিতে পাইলেন নবকুমার কাঁপিতেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভয় পাইতেছ?" নবকুমার বলিলেন "ভয়ে মৃন্ময়ী?—তাহা নহে।" "তবে কাঁপিতেছ কেন?"

নবকুমার কহিলেন, "ভয়ে নহে। কাঁদিতে পারিতেছি না, এই ক্রোধে কাঁপিতেছি।"

কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসিলেন, "কাঁদিবে কেন?"

নবকুমার কহিলেন, "কাঁদিব কেন? তুমি কি জানিবে মৃণ্ময়ি! তুমি ত কখনও রূপ দেখিয়া উন্মত্ত হও নাই।" বলিতে বলিতে নবকুমারের কণ্ঠস্বর যাতনায় রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। "তুমি ত কখনও আপনার হৃৎপিণ্ড আপনি ছেদন করিয়া শ্মশানে ফেলিতে আইস নাই।" এই বলিয়া সহসা নবকুমার চীৎকার করিয়া রোদন করিতে করিতে কপালকুণ্ডলার পদতলে আছাড়িয়া পড়িলেন।

"মৃণ্ময়ি! কপালকুণ্ডলে! আমায় রক্ষা কর। এই তোমার পায়ে লুটাইতেছি একবার বল যে তুমি অবিশ্বাসিনী নও, একবার বল, আমি তোমায় হৃদয়ে তুলিয়া গৃহে লইয়া যাই।"

পাঠকের কি মনে হয় না হায়! এমন কথাগুলি নবকুমার আর একটু আগে বলেন নাই কেন? তাহা হইলেই ত তাঁহাদের এ দুর্গতি হইত না। নবকুমারের আচরণে যে ত্রুটি ছিল তাহা সরলা কপালকুণ্ডলাও বুঝিয়াছেন।

কপালকুণ্ডলা হাত ধরিয়া নবকুমারকে উঠাইলেন—মৃদুস্বরে কহিলেন "তুমি ত জিজ্ঞাসা কর নাই।"

তার পর যখন নবকুমার শুনিলেন, ব্রাহ্মণবেশী প্রকৃতপক্ষে পদ্মাবতী, এবং কপালকুণ্ডলা অবিশ্বাসিনী নহেন, তখনও অদৃষ্ট প্রসন্ন থাকিলে তাঁহারা ফিরিয়া গৃহে আসিতে পারিতেন। অবশ্য কপালকুণ্ডলা 'ভবানীর চরণে দেহ বিসর্জন করিতে' কৃতসঙ্কল্পা হইয়াছিলেন। কিন্তু ভগ্নবাহু কাপালিকের পক্ষে নবকুমারের সাহায্য ভিন্ন কপালকুণ্ডলাকে বলি দেওয়া সম্ভব ছিল না। মতিবিবিও একার্যে তাহার সহায় নহে, আর সে সঙ্গেও ছিল না। কিন্তু অদৃষ্টের বিধান অন্যরূপ। তাই যখন সকল সন্দেহ মিটিয়া গেল, ঠিক সেই মুহূর্তে—

> চৈত্রবায়ুতাড়িত এক বিশাল তরঙ্গ আসিয়া তীরে যথায় কপালকুণ্ডলা দাঁড়াইয়া তথায় তটাগ্রভাগে প্রহত হইল; অমনি তট মৃত্তিকাখণ্ড কপাল-কুণ্ডলার সহিত ঘোর রবে নদীপ্রবাহমধ্যে ভগ্ন হইয়া পড়িল।

তারপর যাহা হইল তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। এ ব্রতের যে এই কথা তাহা ত ভবানীর পাদপদ্মে ত্রিপত্রচ্যুতি হইতে এবং শেষ রজনীতে কপালকুণ্ডলার গৃহত্যাগ-কালে প্রদীপ নির্বাণ হইতেই[১] পাঠক আশঙ্কা করিতেছেন। তথাপি এমন দুইটি জীবনের এমন শোচনীয় পরিণতি অনেকের প্রাণেই সহ্য হয় না। হয়ত সেইজন্যই স্বর্গীয় দামোদর মুখোপাধ্যায় কপালকুণ্ডলার মূলগত অদৃষ্টবাদটুকু বুঝিয়াও বুঝিতে চাহেন নাই। তিনি হয়ত ভাবিয়াছিলেন, বিবাহের পূর্বে অধিকারিপ্রদত্ত ত্রিপত্র ত জগজ্জননী গ্রহণই করিয়াছিলেন; তবে এ বিবাহ অমঙ্গলান্ত কেন হইবে? সেই জন্যই তাঁহার 'মৃণ্ময়ী' রচিত হয়। বাঙ্গালার কোনও পাঠকের নিকটই দামোদরবাবুর 'মৃণ্ময়ী' আদৃত হয় নাই। সুতরাং দামোদরবাবুকর্তৃক কপালকুণ্ডলার 'উপসংহার' রচনার প্রতি কটাক্ষ করিয়া রায়সাহেব হারাণচন্দ্র যে লিখিয়াছেন, "কপালকুণ্ডলা এদেশের অতি অল্প লোকেই বুঝিয়াছে," তাহা কিরূপে উপপন্ন হয়?

মতিবিবির চরিত্র উপরে আমরা নিতান্ত আংশিকভাবে দেখিয়াছি; তাহাতে তাহাকে সমগ্রভাবে বুঝিবার সুবিধা হয় নাই। কলাকুশল কবি তাহাকে স্বীয় চিত্রপটের এমন একস্থানে স্থাপন করিয়াছেন যাহাতে সে যেমন অন্য চিত্রের ভাব পরিস্ফুরণে সাহায্য করিতেছে তেমনি আপনিও এক এক চিত্রের পার্শ্বে এক একটা অপূর্বভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সন্ন্যাসিনী কপালকুণ্ডলার পার্শ্বে মোগল দরবারের এই বিলাসিনীর চিত্র দেখিতে কেমন? একটি উষার অমলশিশিরস্নাত বনপ্রকৃতির স্বহস্তলালিত সদ্যঃ প্রস্ফুটিত কুন্দকুসুম, আর একটি রাজোদ্যানললামভূতা শত আমির ওমরাহের লোলুপদৃষ্টিনন্দিতা প্রদীপ্তরবিকরবিনোদিনী সূর্যমুখী। একটি বড় কোমল, আর একটি বড় উজ্জ্বল। এ দুই চিত্র যেন একহাতের আঁকা নয়, যেন দুই বিভিন্ন-সম্প্রদায়ের চিত্রকরের রচনা। একটি অতি মৃদু, অতি সূক্ষ্ম, অতি সতর্ক রেখাপাতে অঙ্কিত, অপরটি অতি উজ্জ্বল, অতি প্রবল, অতি বিচিত্র বর্ণসম্পদে উদ্ভাসিত।

---

১। 'কপালকুণ্ডলা', চতুর্থ খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দুর্গেশনন্দিনীর সব কয়টি নারীচিত্রই বঙ্কিম যথাসম্ভব উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন; তন্মধ্যে আয়েষা ও বিমলা (আয়েষা অপেক্ষাও বিমলা বেন) বর্ণসম্পদে অধিক উজ্জ্বল। কিন্তু সে চিত্রেও ভাবগত বৈচিত্র্যের অভাব। দুর্গেশনন্দিনীর শিল্পী দৃঢ়হস্তে তুলিকা ধরিতে শিখিয়াছেন, কিন্তু ভাবরাজ্যের জটিলতা উদ্ভাসিত করিতে শিখেন নাই। তিলোত্তমা আগাগোড়া একরূপ, আয়েষাও তাহাই, বিমলাও প্রায় তাহাই, কেবল শেষদিকে একবার তাহাতে একটা পরিবর্তন দেখি, কিন্তু সে পরিবর্তনও কোনও জটিল ভাবসঙ্ঘাত-সমুদ্ভূত নহে। কপালকুণ্ডলা একরূপ হইলেও উহা তিলোত্তমা-আয়েষার ন্যায় মোটা মোটা রেখায় ও উজ্জ্বল বর্ণসম্ভারে চিত্রিত নহে। তিলোত্তমা-আয়েষা দিবালোকোজ্জ্বল মূর্তি, কপালকুণ্ডলা সন্ধ্যালোকের ঈষৎ স্পষ্ট ও ঈষৎ অস্পষ্ট মহিমায় মহীয়সী। উহার কলাকৌশল বড় সূক্ষ্ম, বড় গূঢ়, তাই উপন্যাসের শেষ পর্যন্ত কোথাও তাহাকে সমগ্রভাবে দেখিয়াছি বা বুঝিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। মতিবিবির চিত্রে কবি কতকগুলি জটিল ভাবের ঘাত-প্রতিঘাত প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাই এই চিত্রের অনন্যসাধারণ শিল্পগৌরব। দুর্গেশনন্দিনীর মাত্র দুই বৎসর পরে কপালকুণ্ডলা প্রকাশিত হয়; এই দুই বৎসরে বঙ্কিমচন্দ্র চরিত্রসৃষ্টিতে যে পরিপক্বতা লাভ করিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

মতিবিবি সম্পর্কে বঙ্কিম-সহোদর শ্রদ্ধাস্পদ পূর্ণবাবু লিখিয়াছেন—

> কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের 'মতিবিবি' একটা গল্প অবলম্বনে অঙ্কিত হয়। কোন দরিদ্র গৃহস্থের বধূ যৌবনারম্ভে কুলত্যাগিনী হইয়া কোন ধনাঢ্য যুবার রক্ষিতা হয়। প্রায় পাঁচ-ছয় বৎসর পরে হঠাৎ একদিন তাহার স্বামীকে দেখিল, দেখিয়া তাহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল, সে কান্না আর থামিল না। কিছুদিন পরে প্রভুর অতুল ঐশ্বর্য ত্যাগ করিয়া তাহার যাহা কিছু সঞ্চিত ধন ছিল তাহা লইয়া স্বামিদর্শন-আকাঙ্ক্ষায় তাহাদের গ্রামে আসিয়া বাস করিল। এমত স্থানে বাসা লইল যাহাতে প্রতিদিন স্বামীকে দেখিতে পায়। প্রতিদিন তাঁহাকে দেখিত আর কাঁদিত। এইরূপ দিবানিশি কাঁদিত। কুলত্যাগিনী হইলেও তাহার প্রতিবেশিনীগণ তাহার দুঃখ দেখিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে আসিত। এইরূপে কিছুদিন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া এই চির অভাগিনীর যৌবনেই জীবনান্ত হইল।[১]

এই গল্পে বর্ণিতা রমণীর সহিত মতিবিবির কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য আছে, এবং কোথায় কোথায় বৈসাদৃশ্য তাহার বিচারে সময়ক্ষেপ করিব না। জগতের

---

১। নারায়ণ, বৈশাখ ১৩২২। এই প্রবন্ধে পূর্ণচন্দ্র আরও বলিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্র ও তিনি একবার ক্ষুদ্র বটিকার মধ্যে গঙ্গা পার হইতে গিয়া কূল না পাইয়া ভাটার স্রোতে নৈহাটি হইতে মূলাযোড়ে গিয়া পড়িয়াছিলেন। এই দিনের ঘটনা অবলম্বনে 'কপালকুণ্ডলার' প্রথম দৃশ্যটি কল্পিত হইয়াছে।

সকল শ্রেষ্ঠ কবি ও শিল্পীই যেখানে স্ব-প্রয়োজনোপযোগী যে উপাদান পাইয়াছেন তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন, এবং আপনাদের সৃষ্টিকুশলা প্রতিভার বলে উহাকে নবভাবে সন্দীপিত করিয়া উজ্জ্বলতর আকারে জগৎকে দান করিয়াছেন। মতিবিবি ঐ সত্যের আর একটা উদাহরণস্থল।

চটিতে নবকুমারের পরিচয়লাভের পূর্বে মতির চরিত্র কিরূপ ছিল, তাহা বঙ্কিম সবিস্তার বর্ণন করিয়াছেন। মতি 'পারসিক, সংস্কৃত, নৃত্য, গীত, রসবাদ ইত্যাদিতে সুশিক্ষিতা'; 'তাঁহার মনোবেগ সকল দুর্দমবেগবতী; ইন্দ্রিয়দমনের কিছুমাত্র ক্ষমতাও নাই, ইচ্ছাও নাই; সদসতে সমান প্রবৃত্তি।' 'তাঁহার পূর্বস্বামী বর্তমান,—ওমরাহেরা কেহ তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন না, তিনিও বড় বিবাহের অনুরাগিণী হইলেন না। মনে মনে ভাবিলেন, কুসুমে কুসুমে বিহারিণী ভ্রমরীর পক্ষচ্ছেদ কেন করাইব? প্রথমে কাণাকাণি, শেষে কালিমাময় কলঙ্ক রটিল।' মতি অনেককে গোপনে কৃপাবিতরণ করিতেন। তন্মধ্যে যুবরাজ সেলিম একজন ছিলেন। ক্রমে তিনি সেলিমের প্রধানা পত্নীর সখীরূপে তাঁহার অবরোধে স্থান গ্রহণ করিলেন, এবং সেলিম বাদশাহ হইলে তাঁহার প্রধানা বেগম হইবার স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।

এই সময়ে কি সেলিম কি অন্য কোনও অনুগ্রহভাজন ব্যক্তি—কাহারও প্রতি মতির প্রাণে প্রেমের লেশমাত্রও ছিল না। সে কুসুমে কুসুমে বিহারিণী ভ্রমরী; কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষা-প্রদীপ্তা। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা রাজ্যের মধ্যে সকল রমণীর শ্রেষ্ঠা—দিল্লীর বাদশাহের প্রধানা বেগম হওয়া। কিন্তু যখন সে দেখিল যে, তাহার প্রতি সদয় হইলেও সেলিমের যথার্থ 'ভাবনিবন্ধনা রতি' তখনও মেহেরুন্নেসার উপরই প্রবল, তখন সে সেলিমের অকৃতজ্ঞতার প্রতিশোধ দিবার জন্য ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইল। সেলিমের প্রধানা পত্নী মানসিংহ-ভগিনী হইতে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি আদায় করিল যে, যদি সেলিম রাজ্যচ্যুত হয়, তবে সে কোনও প্রধান রাজপুরুষের সর্বময়ী ঘরণী হইবে।

মতি কাহারও প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী নহে; সে চায় বিলাস, আড়ম্বর, ঐশ্বর্য; তথাপি সে মানুষী, দানবী নহে; তাই ঐশ্বর্য, আড়ম্বর, বিলাসের মধ্যেও সে যথার্থ সুখিনী নহে। তাহার উদ্দাম মনোবৃত্তিগুলির নীচ দিয়া যে গোপনে গোপনে একটা অতৃপ্তির ক্ষীণ প্রবাহ বিপরীত মুখে বহিতেছিল, সে উহা এখনও স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারে নাই। তাই কেবলই ঐশ্বর্যের, আড়ম্বরের ও বিলাসের মোহে মুগ্ধ হইয়া পাপের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া চলিয়াছে; এবং অবৈধ প্রেমের বৈধপরিণতির আশা সুদূর পরাহত দেখিয়া বিদ্রোহের আয়োজনে তৎপর হইয়াছে।

এমন সময়ে ঘটনাক্রমে এক ঘনঘটাচ্ছন্ন রজনীতে নবকুমারের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। বাহিরের অন্ধকার বোধ হয় তাহার হৃদয়ের অন্ধকারেরই

প্রতিচ্ছায়া। সে যাহা হউক, মতি বিপদে পড়িয়াও চটুলা, রসিকা। তাহার মুখে 'ব্যঙ্গ শুনিয়া নবকুমার ঈষৎ প্রসন্ন হইলেন', এবং ক্রমে তাহাকে স্বীয় স্কন্ধে ভর করিয়া চলিতে দিয়া তাহাকে লইয়া নিরাপদে চটিতে উপস্থিত হইলেন। এইখানে ক্রমে মতি তাঁহার পরিচয় পাইলেন এবং তাহার চরিত্রে একটা পরিবর্তনের সূচনা হইল।

নবকুমার কহিলেন, আমার নিবাস সপ্তগ্রাম।

বিদেশিনী কোনও উত্তর করিলেন না, সহসা তিনি মুখাবনত করিয়া প্রদীপ উজ্জ্বল করিতে লাগিলেন।

ক্ষণেক পরে মুখ না তুলিয়া বলিলেন, "দাসীর নাম মতি। মহাশয়ের নাম কি, শুনিতে পাই না?"

নবকুমার কহিলেন 'নবকুমার শর্মা।' প্রদীপ নিবিয়া গেল।

প্রদীপটি যে বাতাসে হঠাৎ নিবে নাই তাহা পাঠক সহজেই বুঝিতে পারেন। কেন না, ইহার পরই নবকুমার যখন গৃহস্বামীকে অন্য প্রদীপ আনিতে বলিলেন, তখন গৃহমধ্যে তিনি অন্ধকারে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনিতে পাইয়াছিলেন। মতি মনে মনে কি ভাবিতেছিল, তাহা আমাদের অনুমানের প্রয়োজন নাই। তবে ইহা সত্য যে, সে সেই মুহূর্তেই স্বামিপ্রেমে উন্মাদিনী হয় নাই। সে উপযাচিকা হইয়া সপত্নীকে দেখিতে আসিল। হয়ত তাহার মনে কৌতূহলের সঙ্গে ঈষৎ একটু বিদ্রূপমিশ্রিত ঈর্ষাও উদ্দীপিত হইয়া থাকিবে। কেন না, সে নিজ সৌন্দর্যে গর্বিতা। তাই অত বেশ-ভূষার আয়োজন! কিন্তু শেষে সে অলঙ্কারগুলি নিজের শরীর হইতে খুলিয়া সপত্নীকে পরাইয়া গেল, আর নবকুমারকে বলিল, "আপনিও কখন কখন পরাইয়া মুখরা বিদেশিনীকে মনে করিবেন।"

বঙ্কিমের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় 'পাষাণে আগুন প্রবেশ করিয়াছিল'—পাষাণ বলিয়াই সহসা গলাইতে পারে নাই। তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তখনও কমে নাই। সে মেহেরুন্নিসার মন পরীক্ষা করিতে চলিল। সেখানে গিয়া যাহা শুনিল, তাহাতে আর জাহাঙ্গীরের প্রধানা মহিষী হইবার সুদূর আশাও তাহার মনে রহিল না। ইহাতে সে যে অধিক দুঃখিত হইল তাহা নহে, কেন না সে এখন নিজের অন্তর পরীক্ষা করিতে শিখিয়াছে। তাহার উদ্দাম মনোবৃত্তিগুলির নীচ দিয়া এত দিন যে অতৃপ্তির ক্ষীণধারা ধীরে ধীরে বহিতেছিল, সে এতকাল পরে উহার সত্তা উপলব্ধি করিল। কিন্তু সে যে পাষাণ তাই তীব্র অনুতাপ আসিল না, যাহা আসিল তাহা তাহার জীবনগ্রন্থের দুই-চারিটা পাতা উল্টাইয়া ফেলিয়া একটা নূতন অধ্যায় আরম্ভ করিবার সঙ্কল্পমাত্র।

আমি এতকাল হিন্দুদিগের দেবমূর্তির মত ছিলাম। বাহিরে সুবর্ণ-রত্নাদিতে খচিত, ভিতরে পাষাণ। ইন্দ্রিয়-সুখান্বেষণে আগুনের মধ্যে বেড়াইয়াছি, কখনও আগুন স্পর্শ করি নাই। এখন একবার দেখি যদি

পাষাণমধ্যে খুঁজিয়া একটা রক্তশিরাবিশিষ্ট অন্তঃকরণ পাই।[১]

মতি সপ্তগ্রামে আসিয়াছে, সুবর্ণখচিতবসন-ভূষিত, দাসদাসীতে পরিপূর্ণ, গন্ধদ্রব্য, গন্ধবারি, কুসুমদামে আমোদিত, স্বর্ণ-রৌপ্য-গজদন্তাদি-নির্মিত নানাসজ্জায় শোভিত অট্টালিকায় বাস করিতেছে, এবং মাঝে মাঝে নবকুমারকে ডাকাইয়া আনিয়া দেখা করিতেছে। সে যেরূপ জীবনে অভ্যস্তা সেইরূপই ত তাহার রুচি হইবে। সে 'ধন-সম্পদ, মান-প্রণয়, রঙ্গ-রহস্য প্রভৃতি পৃথিবীতে যাহাকে যাহাকে সুখ বলে' তৎসমুদয়ের প্রলোভন দিয়া নবকুমারকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিল। সে চেষ্টা বৃথা হইল। শেষে সে অভিমানের সোপানে এক পদ নামিয়া ও যথার্থ প্রেমের সোপানে আর এক পদ উঠিয়া বলিল, "ভাল, সে যাউক। বিধাতার যদি সেই ইচ্ছা তবে চিত্তবৃত্তি সকল অতল জলে ডুবাইব। আর কিছু চাহি না, এক-একবার তুমি এই পথে যাইও, দাসী ভাবিয়া এক একবার দেখা দিও, কেবল চক্ষু পরিতৃপ্তি করিব।" সে প্রার্থনাও নিষ্ফল হইল। তারপর সে নবকুমারের চরণপ্রান্তে লুটাইল। কেন? নবকুমারকে পাইতেই হইবে। তাহার মন বলিতেছে, উহাতেই সুখ! সে সুখ পাইতেই হইবে। সে ইহার পূর্বে একদিন দাসীকে বলিয়াছে, "সুখের তৃষ্ণা বাল্যাবধি বড়ই প্রবল ছিল। সে তৃষ্ণার পরিতৃপ্তির জন্য বঙ্গদেশ ছাড়িয়া এপর্যন্ত (আগ্রা পর্যন্ত) আসিলাম। এ রত্ন কিনিবার জন্য কি ধন না দিলাম? কোন্ দুষ্কর্ম না করিয়াছি?.........এত করিয়াও কি হইল?.........এক মুহূর্তের জন্যও কখন সুখ ভোগ করি নাই।" এখন ভালবাসিয়া সুখী হইতে সে আগ্রা হইতে বঙ্গদেশে আসিয়াছে। কিন্তু ভালবাসা এক কথা, আর ভালবাসা পাইবার জন্য উৎকট-ব্যগ্রতা যে আর-এক কথা তাহা ত সে জানে না। তাহার 'বেগবতী মনোবৃত্তি'-গুলি তাহাকে কেবল আত্মপ্রতিষ্ঠার পথেই চালাইয়াছে, আত্মবিসর্জন শিখায় নাই। তাই তাহার প্রেম বিশুদ্ধ নহে। বিশুদ্ধ নহে বলিয়াই সে প্রত্যাখ্যাতা হইয়া স্বামীর প্রেমপাত্রীর সর্বনাশ-সাধনের সঙ্কল্প করিল। পাষাণে আগুন প্রবেশ করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার ফলে পাষাণ ফাটিয়া কপালকুণ্ডলাকে আক্রমণ করিতে চলিল।

একদিন মতি সেলিমের মনের উপর অনন্যসামান্য প্রাধান্যস্থাপনে বিফলপ্রয়াস হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, আজ স্বামীর হৃদয়ে প্রাধান্য স্থাপনের জন্য নূতন রকমের এক ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইল।

অধ্যাপক ললিতবাবু 'কপালকুণ্ডলাতত্ত্বে' একস্থানে লিখিয়াছেন, "ইন্দ্রিয়-সুখনিরতা উপনায়িকা পদ্মাবতীর পতিপ্রেমের প্রভাবে চরিত্রের পরিবর্তন ও পরিশোধন হৃদয়স্পর্শী।" উপরে যেরূপ দেখিলাম তাহাতে পদ্মাবতীর পরিবর্তন

১। 'কপালকুণ্ডলা' তৃতীয় খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ। ইহার পরবর্তী পরিচ্ছেদে বঙ্কিম মতিবিবির প্রণয়ের সঞ্চার ও পরিণতির বিবরণ দিয়াছেন। উহা বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

বা পরিশোধন কোনটিই আত্যন্তিক নহে। বরং এ বিষয়ে গিরিজাবাবুর মতটি অধিক সমীচীন বোধ হয়। তিনি লিখিয়াছেন, "পদ্মাবতী আদিতে যেরূপ দুর্দমনীয় প্রবৃত্তি-স্রোতে ভাসিতেছিল, এখনও সেইরূপ ভাসিতে লাগিল। তবে পার্থক্য এতখানি যে, পূর্বের প্রবৃত্তি পঙ্কিল ছিল, শেষের প্রবৃত্তি 'প্রায়' নির্মল। 'প্রায়' বলিলাম এইজন্য যে, এখনও পদ্মাবতী পাপের হস্ত হইতে সম্যক্ মুক্ত হইতে পারে নাই। নবকুমার তাহার স্বামী, নতুবা এখনও তাহাকে প্রণয়াসক্তা বেশ্যা বলা যাইতে পারে। নবকুমারের সহিত সে যেরূপ ভাবে কথা কহিল, কপালকুণ্ডলার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিল, তাহাতে সে উচ্চশ্রেণীর বারনারী ভিন্ন অন্য আখ্যা পাইবার যোগ্যা নহে। তবে তাহার পূর্বের প্রকৃতি ভাবিয়া দেখিলে, সে সংশোধনের পথে আসিয়াছে, ইহাও বলা যায়। পূর্বে অন্তঃকরণে অনুরাগ ছিল না, এখন অনুরাগ হইল এবং সেই অনুরাগ স্বামীর প্রতি—তাই ভরসা করি[১], পদ্মাবতী কালে সংশোধিতা হইয়াছিল। এতদতিরিক্ত কিছু বলা যায় কি? প্রকৃত প্রণয়ের অভাব ও সদ্ভাবেই এই পার্থক্য জন্মাইল।"

কপালকুণ্ডলাকে অলঙ্কারদানে মতির চরিত্রের একটা উৎকৃষ্ট দিক প্রদর্শিত

---

১। ১৯১৯ সনের Indian Review পত্রিকায় একজন সমালোচক মতিবিবির পরিবর্তন সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন, The change was only temporary. She again fell to the modes of her wayward and immoral life. এটা গিরিজাবাবুর বিপরীত অনুমান। মতিবিবির ভবিষ্যৎ আচরণ সম্বন্ধে কেহ ভাল বা মন্দ কোনও প্রকার অনুমানের অধিকারী নহেন। কেন না, কবি এরূপ অনুমানের কোনও অবসর দেন নাই।

আর্য্যদর্শনের সমালোচক মতির 'সংশোধন' লক্ষ্য করিয়া সমাজের উপকারার্থ এক নীতিপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছেন। "লুৎফউন্নিসা পতিপ্রেমে দৃঢ় অনুরাগিণী ও পবিত্রা হইয়া সংসারে প্রবেশ করিলেন, সংসার তাহাকে গ্রহণ করিতে চাহে না, কারণ সংসার এখনও তত পরিশুদ্ধ ও উন্নত হয় নাই। এইখানে আমরা একদা সংসারের নীচতা ও লুৎফউন্নিসার হৃদয়ভাবের উচ্চতা সুস্পষ্ট উপলব্ধি করি। লুৎফউন্নিসার পবিত্র হৃদয়ভাব ও প্রগাঢ় অনুরাগকে অশ্রদ্ধা করিতে আমাদিগের অণুমাত্র ইচ্ছা হয় না। তন্মধ্যে মানবপ্রকৃতির যে উচ্চতা ও গৌরব উপলব্ধ হয় তাহা সংসারে বড় দুর্লভ। সেরূপ প্রগাঢ় অনুরাগিণী রমণীমণ্ডলীর রত্নস্বরূপ; বিশেষতঃ যে রমণী পাপপথ হইতে ঘৃণায় রাজসিংহাসন ত্যাগ করিয়া এইরূপ পরিশুদ্ধ প্রেমপথে পদার্পণ করিয়াছেন, এইরূপ দৃঢ় অনুরাগের সহিত একান্ত মনে পতির শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে পূজা করিতে যাইতেছেন, সে রমণীতে যে স্বেচ্ছাকৃত দৃঢ় পতিপরায়ণতা ও পবিত্রতা আছে, তাহা সংসারের জড়ভাবাপন্ন পতিব্রততা ও সঙ্কীর্ণ পবিত্রতা হইতে নিশ্চয় গরীয়ান্। সংসারের অন্ততঃ এতদূর উন্নত হওয়া চাই, যেন সে প্রকার পবিত্রতার গৌরব বুঝিতে পারে।...সংসারের ধর্মনিয়ম অস্বাভাবিক, তাহা মানবের স্বভাব অনুযায়ী নির্দিষ্ট হয় নাই। যাহা অস্বাভাবিক তাহা ধর্মনিয়ম নহে।........."

বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই এ সমালোচনা পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। এ সমালোচনার মূল্য যাহাই হউক, একাল পর্যন্ত জীবিত থাকিলে হয়ত এসব যুক্তিও ক্রমে তাঁহার সহিয়া যাইত। এখন এই শ্রেণীর বহু যুক্তি পত্রে-পুষ্পে শ্রীসম্পন্ন হইয়া সাহিত্যে এক নবযুগ প্রবর্তিত করিবার চেষ্টা করিতেছে।

হইয়াছে, কিন্তু তদপেক্ষাও উৎকৃষ্ট আর-একটা দিক্ দেখিতে পাই কাপালিকের সহিত ষড়যন্ত্রের সময় কপালকুণ্ডলার প্রাণনাশে তাহার ঐকান্তিক অসম্মতিতে। "আমি ইহজন্মে কেবল পাপই করিয়াছি, কিন্তু পাপের পথে আমার এতদূর অধঃপাত হয় নাই যে, আমি নিরপরাধে বালিকার মৃত্যু সাধন করি।" "এ দুর্বৃত্ত চিত্তের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু ভরসা করি যে, কখনই স্বীকৃত হইব না, বরং এ সঙ্কল্পের প্রতিকূলতাচরণ করিব, এই অভিপ্রায়েই আমি তোমার (কপালকুণ্ডলার) সহিত সাক্ষাৎ করিলাম"—এই উক্তিগুলির আন্তরিকতায় অবিশ্বাস করিবার হেতু ত নাই-ই, বরং ঐরূপ উক্তি মতিবিবির মুখে দিয়া বঙ্কিম তাঁহাকে রক্তমাংসের মানুষ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। দার্শনিকগণ বলেন, প্রকৃতি সর্বত্রই ত্রিগুণাত্মিকা, তবে আধার বিশেষে কোনও গুণের আধিক্য, কোনও গুণের অল্পতা,—কোনটির প্রকাশ, কোনটির পরিভব লক্ষিত হয়। জগতের অধিকাংশ মানুষই ভাল-মন্দের সমষ্টি; কবির বা ঔপন্যাসিকের সৃষ্ট জগতেও ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম শোভমান হয় না। সেইজন্য যখনই কাব্যে বা উপন্যাসে কাহাকেও একেবারে মন্দ করিয়া অঙ্কিত করা হয়, তখন ইহাই সকলের মনে হইতে পারে যে, ঐ চিত্রটা স্বভাবসঙ্গত হয় নাই। লেডী ম্যাকবেথকে দুরন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষাপরায়ণা ও সেই আকাঙ্ক্ষাবশতঃ রাজার বধসাধনার্থ স্বামীকে নিরন্তর উৎসাহদানশীলা করিয়াও যখন সেক্সপীয়র দেখাইলেন যে, তিনি সুপ্তরাজার সহিত পিতার সাদৃশ্যদর্শনে সুযোগ সত্ত্বেও স্বহস্তে রাজাকে বধ করিতে পরাঙ্মুখী, তখন বুঝিলাম যে কবি একটা রক্তমাংসের রমণী সৃষ্টি করিলেন। লেডী ম্যাকবেথ স্বয়ং রাজাকে বধ না করিলেও তাহার বধের জন্য ব্যাকুলা। মতি কিন্তু সেরূপ জিঘাংসাবৃত্তি পূর্বাপরই বলপূর্বক দমন করিয়াছে।

মতির রূপবর্ণনা সম্বন্ধে এইস্থানে একটা কথা বলা যায়। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন লিখিয়াছেন, "মতিবিবি—লুৎফউন্নিসা—বা পদ্মাবতীকে গ্রন্থকার মুখে যেরূপ রূপবতী বলিয়াছেন, তাঁহার বর্ণনা পাঠ করিয়া আমরা উহার সে প্রকার রূপ দেখিতে পাইলাম না—আমাদের চক্ষুতে মতিবিবি বাটামুখী এক ধূমোধামা মাগী হইয়া দাঁড়াইয়াছে"।[১] মতির চরিত্রের প্রতি পণ্ডিতোচিত অনাদরই বোধ হয় ন্যায়রত্নকে তাহার রূপের প্রতি অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। বঙ্কিমের বর্ণনায় কষ্টকল্পনা আছে সন্দেহ নাই, নারীর রূপবর্ণনায় দুর্গেশনন্দিনীতে যে আয়াস লক্ষ্য করা গিয়াছে, এখানেও তাহা সংশোধিত হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র যে কালিদাসের 'তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা' ইত্যাদি শ্লোক মনে করিয়া মতির রূপবর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। ঐরূপ পরের ভাবের ও পরের ভাষার চাপে বঙ্কিমের বর্ণনা কিছু ঘোরাল হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি ইহা স্বীকার করিতেই

---

১। 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব', দ্বিতীয় সংস্করণ (১২৯৪) পৃ ২৮২।

হইবে যে, মতির রূপবর্ণনা পড়িয়া তাহাকে একজন যথার্থ সুন্দরী ভিন্ন অন্য কিছু বোধ হয় না। অবশ্য সে সৌন্দর্যে আত্মগরিমার সঙ্গে সঙ্গে চিরাভ্যস্ত বিলাসের ও বুদ্ধির প্রখরতার ছায়া আছে। তাহাতে যে সৌন্দর্যের হ্রাস হইয়াছে, এমন ত মনে হয় না। তবে যদি Oscar Wildeএর একটি পাত্রের সঙ্গে একমত হইয়া কেহ বলেন, "Beauty, real beauty ends where an intellectual expression begins"[১] তবে সেটা স্বতন্ত্র কথা!

মতিবিবির পুরুষবেশ-গ্রহণে সেক্ষপীয়রের বহুনাটকে অবলম্বিত একটি রীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, এবং শচীশবাবু যে লিখিয়াছেন, বঙ্কিম বলিয়াছিলেন কপালকুণ্ডলা রচনার সময় তিনি সেক্ষপীয়রের নাটকাবলী অধিক পাঠ করিতেন, উহাতে সে কথার আর একটা প্রমাণ পাওয়া যায়। ইংরাজী-শিক্ষিত পাঠকমাত্রেই জানেন, সেক্ষপীয়র নানা নাটকে নানা নাগরীকে নাগরবেশে সজ্জিত করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। Merchant of Veniceএ পোর্‌সিয়া, As you like It নাটকে রোজালিণ্ড, Cymbeline নাটকে আইমোজেন, Twelfth Nightএ ভায়োলা, এবং The Two Gentlemen of Veronaতে জুলিয়া নরবেশ ধারণ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া, যেখানে কাপালিক রজনীযোগে দূর হইতে কপাল-কুণ্ডলাকে একজন অপরিচিত যুবার (পুরুষবেশ-ধারিণী মতিবিবির) সহিত বিশ্রম্ভালাপে প্রবৃত্তা দেখাইয়া নবকুমারের নিকট তাহাকে অসতী বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছে, ঐ স্থানটা[২] পড়িতে পড়িতে, অনেকেরই সেক্ষপীয়রের Much Ado About Nothing নাটকে ডন জন কর্তৃক হিরোর চরিত্রে ক্লডিওর সন্দেহ উৎপাদনচেষ্টার কথা মনে পড়িবে। অবশ্য সাদৃশ্য অধিক নহে। সেক্ষপীয়রের নাটকে একজন পরিচারিকা (মারগারেট) নায়িকার বেশ ধারণ করিয়া একজন যথার্থ পুরুষের (বোরাচিওর) সহিত কথা কহিয়াছিল। এখানে সেরূপ নহে। তদ্ভিন্ন কাপালিক ডন জনের ন্যায় জঘন্যপ্রকৃতি খলও নহে।

মতিবিবির ন্যায় কাপালিক চরিত্রও বঙ্কিমচন্দ্রের জটিল চরিত্রসৃষ্টি-কৌশলের অপূর্ব নিদর্শন। যে পাত্র নিজের দুষ্প্রবৃত্তিবশে নানা কুচেষ্টা দ্বারা নায়ক-নায়িকার বিপদ বা অনিষ্ট সংঘটন করে ইংরাজী নাট্যশাস্ত্রের পরিভাষায় তাহাকে villain বলে। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে উহার ঠিক প্রতিশব্দ নাই। আমরা villain-কে খল বলিয়া অনুবাদ করিতে পারি। ডন জন, আয়েকিমো[৩] বা আয়েগো[৪] খলের দৃষ্টান্ত, তন্মধ্যে আয়েগো চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। কাপালিককে আমরা প্রথমাবধি নবকুমারের প্রাণনাশে কৃতসঙ্কল্প দেখি এবং কপালকুণ্ডলার প্রতিও যে তাহার

১। 'The Picture of Dorian Grey.'
২। 'কপালকুণ্ডলা' চতুর্থ খণ্ড, সপ্তম পরিচ্ছেদ।
৩। Cymbeline নাটকের Villain.
৪। Othelo নাটকের Villain.

কুৎসিত অভিসন্ধি ছিল তাহাও প্রথমে অধিকারীর মুখে এবং পরে তাহার নিজ স্বীকারোক্তিতে শুনিতে পাই বটে, তথাপি তাহাকে আমরা কপালকুণ্ডলা গ্রন্থের Villain বলিতে অনিচ্ছুক। বস্তুতঃ সে যতদূর কৃপার পাত্র, ততদূর ঘৃণার পাত্র নহে। সেও যেন ক্রূর অদৃষ্টের হাতের আর একটি ক্রীড়াপুত্তলিকা ও ( নবকুমার ও কপালকুণ্ডলা সম্পর্কে ) অদৃষ্টেরই স্বহস্তব্যবহৃত একটি অবশ অনিষ্টসাধক অস্ত্রমাত্র।

পাঠকের মনে করিতে হইবে যখন সঙ্গিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত নবকুমার ক্ষুৎপিপাসা ও প্রাণভয়ে আকুল হইয়া বালিয়াড়ির শিখরাসীন কাপালিকের সম্মুখীন হন, তখন কাপালিক ধ্যানে রত। সে তান্ত্রিক ; তাহার শাস্ত্র বা গুরূপদেশ হইতে সে শিখিয়াছে যে, নরবলির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলি আর নাই। ভবানীর তৃপ্তিসাধন ও মোক্ষলাভের উহাই প্রকৃষ্টতম উপায়। কাপালিকের শাস্ত্র, কাপালিকের ধর্মমত, কাপালিকের আচার ঘৃণার যোগ্য হইতে পারে, কিন্তু যে সেই শাস্ত্রমত বা আচারের প্রতি সরল বিশ্বাসবশে জীবনের ভোগবিলাস ত্যাগ করিয়া উপাস্যদেবতার উপাসনায় নিরন্তর রত থাকে, সে নিতান্তই ঘৃণার যোগ্য নহে। কাপালিকের শাস্ত্র আরও বলে, দেবী সময় সময় উপাসকের ভক্তিপরীক্ষার্থ নানা ছলনা করেন, নানা আকার ধারণ করিয়া কখনও তাহাকে ভীত, কখনও প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করেন। তাই কাপালিক যখন চক্ষু মেলিয়া দেখিল সম্মুখে এক নরমূর্তি দণ্ডায়মান, তখন সে অপবিত্র প্রাকৃতে ( বাঙ্গালায়) কথা না বলিয়া দেবভাষায় জিজ্ঞাসা করিল, "কস্ত্বং ?" তারপর যখন সে বুঝিল এ ভৈরবীর মায়া নহে, একটা সত্য মানুষ, তখন তার মনে ধারণা জন্মিল, এমন বিজন স্থানে অকস্মাৎ একটা মানুষের উপস্থিতির হেতু আর কিছুই নহে, স্বয়ং ভৈরবী তাহার ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া তাহার সিদ্ধির উপায় নরবলি আনিয়া তাহার হস্তে দিয়াছেন। তাই নবকুমার আহার্য-সামগ্রী চাহিলে সে বলিল, "ভৈরবীপ্রেরিতোঽসি, মামনুসর, পরিতোষস্তে ভবিষ্যতি।" তার পরদিনও নবকুমারের সহিত সাক্ষাৎ হইলে কাপালিক তাহাকে কোনও মিথ্যা বাক্যে প্রতারিত করে নাই।

> সায়াহ্নকালে সমুদ্রতীর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া নবকুমার দেখিলেন যে, কাপালিক কুটীর মধ্যে ধরাতলে উপবেশন করিয়া নিঃশব্দে আছে। নবকুমার প্রথমে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে কাপালিক কোন উত্তর করিল না।
>
> নবকুমার কহিলেন, "এপর্যন্ত প্রভুর দর্শনে কি জন্য বঞ্চিত ছিলাম ?" কাপালিক কহিল, "নিজব্রতে নিযুক্ত ছিলাম।"
>
> নবকুমার গৃহগমনাভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। কহিলেন, "পথ অবগত নহি, পাথেয় নাই ; যদ্বিহিত বিধান প্রভুর সাক্ষাৎ পাইলেই হইতে পারিবে, এই ভরসায় আছি।"
>
> কাপালিক কেবলমাত্র কহিল, "আমার সঙ্গে আগমন কর।"

কাপালিক নবকুমারের হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। মনুষ্যঘাতী করস্পর্শে নবকুমারের শোণিত ধমনী মধ্যে শতগুণবেগে প্রধাবিত হইল, লুপ্ত সাহস পুনর্বার আসিল। কহিলেন, "হস্ত ত্যাগ করুন।"

কাপালিক উত্তর করিল, "না"। নবকুমার পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমায় কোথায় লইয়া যাইতেছেন ?"

কাপালিক কহিল, "পূজার স্থানে।"

নবকুমার কহিলেন, "কেন ?"

কাপালিক কহিল, "বধার্থ।"

... ... ...

নবকুমারের বল প্রকাশ দেখিয়া কাপালিক কহিল, "মূর্খ! কি জন্য বল প্রকাশ কর ? তোমার জন্ম আজি সার্থক হইল। ভৈরবীর পূজায় তোমার এই মাংসপিণ্ড অর্পিত হইবে। ইহার অধিক তোমার তুল্য লোকের আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে ?"

বলিদান যে কেবল যজমানের পারলৌকিক অভ্যুদয়ের হেতু তাহা নহে, বলিরূপে প্রদত্ত পশুরও অভ্যুদয়ের হেতু, ইহা শাস্ত্রের মত। ঐ মতের প্রতি কটাক্ষ করিয়াই না লোকায়তিকগণ বলিয়া থাকেন—

পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি।
স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে ॥

জ্যোতিষ্টোমে নিহত পশু যদি স্বর্গে যায়, তবে যজ্ঞকারী নিজের বাপকে কেন বলি দেয় না ? এ যুক্তির উত্তর কি ? উত্তর পশুবলিদানকারিগণ বলেন, শাস্ত্রমতে পশুই বলি দিতে হয় বা দেওয়া যায় ; মানুষ আর পশু এক নহে। কাপালিক-প্রভৃতি যাহারা নরবলি দেয়, তাহারা অবশ্য বাপকে বলি দেয় না ; কিন্তু তাহাদের শাস্ত্রে নরবলিকে পশুবলি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলি বলে। শাস্ত্রটা বীভৎস সন্দেহ নাই, কিন্তু পশুবলির ব্যবস্থাও বীভৎস নয় কিসে ? সে যাহা হউক, উপস্থিতক্ষেত্রে কাপালিক দেখিতেছে স্বয়ং ভৈরবীই নিজ তৃপ্তির ব্যবস্থা নিজে করিয়াছেন—অসম্ভাবিত উপায়ে একটা মানুষকে আনিয়া তাহার হস্তে স্থাপন করিয়াছেন। নবকুমারের বধ যে ভৈরবীর অভীপ্সিত, তদ্বিষয়ে কাপালিকের ধারণা এমনই দৃঢ় ছিল যে, সে বালিয়াড়ির শিখর হইতে স্খলিত ও ভগ্নবাহু হইয়া যখন নিঃসংজ্ঞ অবস্থায় পড়িয়া ছিল, সেই সময়ে সে স্বপ্নে দেখিয়াছিল, যেন ভবানী তাহার প্রত্যক্ষীভূতা হইয়া "ভ্রুকুটী করিয়া তাড়না করিতেছেন ও কহিতেছেন, 'রে দুরাচার! তোরই চিত্তাশুদ্ধি হেতু আমার পূজার বিঘ্ন জন্মিয়াছে।'"[১]

কপালকুণ্ডলার শোণিতেও ভৈরবীর পূজা করাই প্রথমে কাপালিকের ইচ্ছা

১। 'কপালকুণ্ডলা' চতুর্থ খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ছিল।' শেষে অন্যভাব তাহার মনে স্থান পাইয়াছিল। সে ভাব কার্যে পরিণত করিবার সময় বা সুযোগ যে উপস্থিত হয় নাই তাহা নহে। তবে কাপালিক তাহাতে সচেষ্ট হয় নাই কেন? বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনে হইবে, কাপালিক জানিত যে, ইন্দ্রিয়-লালসা তাহার শাস্ত্রে গর্হিত, এবং সেইজন্যই পাপভয়ে এপর্যন্ত তাহাতে প্রবৃত্ত হয় নাই। তাহার যে সে ধর্মবোধ ছিল, স্বপ্নে তাহার ক্রিয়া দেখিতে পাই। সে স্বপ্নে দেখিয়াছিল, ভৈরবী বলিতেছেন, "রে দুরাচার! তোরই চিত্তাশুদ্ধি হেতু আমার পূজার বিঘ্ন জন্মিয়াছে। তুই এ পর্যন্ত ইন্দ্রিয়লালসায় বদ্ধ হইয়া এই কুমারীর শোণিতে এতদিন আমার পূজা করিস্ নাই। অতএব এই কুমারী হইতে তোর পূর্বকৃত্যফল বিনষ্ট হইল। আমি তোর নিকট আর কখনও পূজা গ্রহণ করিব না।"

স্বপ্নসকল অমূলক চিন্তামাত্র বলিয়া এখন সকলেই বিশ্বাস করে কি না জানি না। যোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীর হিন্দুরা করিত না ইহা নিশ্চিত। এখনও হিন্দুদের একটা দৃঢ় সংস্কার এই যে, স্বপ্নে যদি কোনও দেবতা কিছু বলেন, তবে তাহা অলীক কল্পনা বলিয়া বুঝিতে হইবে না—তাহা সত্য দেবতার কথা[১]। তাই যখন কাপালিক স্বপ্নে শুনিল ভৈরবী বলিতেছেন, "ভদ্র, ইহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিব; সেই কপালকুণ্ডলাকে আমার নিকট বলি দিবে; যতদিন না পার আমার পূজা করিও না," তখন কপালকুণ্ডলাকে বলি দিবার ব্যবস্থাই তাহার একমাত্র চিন্তা হইয়া উঠিল।

যে ভৈরবীর সাধনায় সমগ্র জীবন কাটাইয়া প্রায় সিদ্ধির সম্মুখীন হইয়াছিল বলিয়া মনে করিত, তাহার চক্ষে 'যত দিন কপালকুণ্ডলাকে বলি দিতে না পার তত দিন আমার পূজা করিও না', এমন আদেশের গুরুত্ব কত অধিক তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।[২] সে কি এ আদেশ উপেক্ষা করিতে পারে? সুতরাং সে যে কেবল, ব্যাঘ্র যেরূপ পলায়মান শিকারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটে ঠিক সেই ভাবে, রোষবশতঃ কপালকুণ্ডলার ও নবকুমারের অনুসরণ করিয়াছে তাহা নহে। রোষ অপেক্ষা কাপালিকের মনে ভবানীর আজ্ঞাপালন ও তদ্দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত বা লুপ্তসুকৃতির উদ্ধার-কামনাই প্রবলতর ছিল। কপালকুণ্ডলা যখন পুরুষবেশিনী মতিকে বিদায় দিয়া নবকুমার ও কাপালিকের সম্মুখে পড়িলেন,

১। কাপালিকের স্বপ্নটি প্রভাতকালে দৃষ্ট হয়। সে বলিতেছে, "প্রভাতকালে আমার সংজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে পুনরাবির্ভূত হইল। তাহার অব্যবহিত পূর্বে আমি এক স্বপ্ন দেখিতেছিলাম।" শাস্ত্রে বলে, প্রাতঃ স্বপ্নশ্চ ফলদস্তৎক্ষণং যদি বোধিতঃ।" ইংরেজগণের মধ্যেও ঐরূপ সংস্কার আছে।

২। তাহার স্বপ্নবৃত্তান্ত অলীক এবং নবকুমার ও মতিবিবিকে ভুলাইবার জন্য কল্পিত তাহা নহে। এবিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্ট নিদর্শন দিয়াছেন। কাপালিক যখন স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিল তখন 'বলিতে বলিতে কাপালিকের শরীর রোমাঞ্চিত হইল।' কল্পিত ঘটনাবর্ণনে কাহারও শরীর রোমাঞ্চিত হয় না।

তখন 'নবকুমার দৃঢ়মুষ্টিতে কপালকুণ্ডলার হস্ত ধারণ করিলেন;' কিন্তু 'কাপালিক করুণার্দ্র মধুময় স্বরে কহিলেন, "বৎসে! আমাদের সঙ্গে আইস।"' কাপালিককে কপালকুণ্ডলা পিতা বলিতেন। কাপালিক তাহার পালক। মাঝে কিয়দ্দিনের জন্য তাহার প্রতি তাহার মনোভাব যাহাই হউক, স্বহস্তে পালিতা বালিকাকে বলি দিতে কাহার না চিত্ত দ্রব হয়? এইখানে অন্য কবি হইলে হয়ত কাপালিকের চিত্ত একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে প্রলুব্ধ হইতেন। বঙ্কিমের হাত কাঁচা নহে বলিয়া অস্থানে একজন অপ্রধান পাত্রের চিত্তবৃত্তি বিশ্লেষণ করিতে বসেন নাই। দুইটি কথায় কর্তব্য সমাধা করিয়াছেন; অথচ ঐ দুইটি কথায় ভাবুক পাঠকের মনে কতই না ভাবের তরঙ্গ খেলাইয়া দিয়াছেন!

কপালকুণ্ডলার চরিত্র স্বয়ং নির্মল জানিয়া কাপালিক যে বিদ্বেষ-বুদ্ধিতে বা স্বপ্রয়োজন-সাধনার্থ ডন জন, আয়েকিমো, বা আয়েগোর ন্যায় তৎপ্রতি নবকুমারের মিথ্যা সন্দেহ জন্মাইয়াছিল তাহা নহে। মতিবিবিকে সে ব্রাহ্মণকুমার বলিয়াই জানিত, এবং তাহার সহিত রজনীযোগে কপালকুণ্ডলাকে মিলিত হইতে দেখিয়া তাহাকে অসতী বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। সে মিথ্যাবাক্যে নবকুমারকে প্রতারিত করিয়া কপালকুণ্ডলার বধে নিযুক্ত করে নাই।

কাপালিকের শাস্ত্র ঘৃণার যোগ্য তাহা সহস্রবার স্বীকার করি, কিন্তু কপালকুণ্ডলার কাপালিক কেবলই ঘৃণার যোগ্য পাত্র নহে।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

## চরিতকথা ও মৃণালিনী

কপালকুণ্ডলা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার রচয়িতার যশোরশ্মি চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল এবং বাঙ্গালার তদানীন্তন 'শিক্ষিত' সমাজের মধ্যে যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের খবর রাখা অপমানজনক মনে করিতেন না, তাঁহারা বঙ্কিমকে প্রায় একবাক্যে বাঙ্গালা সাহিত্যজগতের গ্রহপতি বলিয়া সাদরে অভিনন্দন করিলেন। তখন বাঙ্গালা সাহিত্যকলা কৈশোর অতিক্রম করিতেছিল মাত্র। বাঙ্গালা সাহিত্যের তদানীন্তন অবস্থা সম্বন্ধে নিবন্ধান্তরে[1] যাহা বলিয়াছি, তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল। "১৮৬২ খৃস্টাব্দে পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রধান গ্রন্থ 'সীতার বনবাস'[2] ও ১৮৬৫ খৃস্টাব্দে অতুলকীর্তি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয়। ঐ দুইখানি মহামূল্য গ্রন্থ একত্র

---

১। কালীপ্রসন্ন ঘোষের সাহিত্যসাধনা-বিষয়ক প্রবন্ধ।—ঢাকা রিভিউ ১৯১৯, মে ও জুন।

২। বস্তুতঃ 'সীতার বনবাস' প্রকাশিত হয় ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে।—স.

মিলাইয়া দেখিলে বাঙ্গালা সাহিত্যকলার যে মূর্তি নয়নগোচর হয়, উহা নিতান্তই বাল্যমূর্তি নহে, উহা এক মনোরম বয়ঃসন্ধির অবস্থা, বিদ্যাপতির ভাষায়—

'কো কহে বালা কো কহে তরুণী।'

সীতার বনবাসে আমরা বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যকলাকে পিতার আদরিণী নবকিশোরীরূপে দেখিতে পাই ;—অনুপম সুষমার সঙ্গে পিতার সযত্নাহৃত লোচন-লোভনীয় আভরণসম্ভারের সংযোগ হওয়ায় লাবণ্যরাশি যেন উছলিয়া পড়িতেছে; কিন্তু তখনও তাহার প্রাণে যে কোনও নূতন ভাবের আবেশ হইয়াছে বা কোনও নূতন প্রেরণার অনুভূতি জন্মিয়াছে, তাহার স্পষ্ট নিদর্শন সে মূর্তিতে লক্ষ্য হয় না। দুর্গেশনন্দিনীতে উহা নয়নগোচর হয়, কিন্তু আংশিকভাবে মাত্র। আরও দুই বৎসর পরে···বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলায় সাহিত্যকলার যৌবনপ্রতিমা দেখিতে পাই। সে অপরূপ রূপ কপালকুণ্ডলারই মত অমল, স্নিগ্ধ, ও অব্যাজমনোহর। অঙ্গে অলঙ্কারের বাহুল্য নাই, কিন্তু মনে হয়,—

আভরণস্যাভরণং প্রসাধনবিধেঃ প্রসাধনবিশেষঃ।
উপমানস্যাপি সখে প্রত্যুপমানং বপুস্তস্যাঃ॥

তাহার কমনীয় দেহলতা—অলঙ্কারের অলঙ্কার, প্রসাধনবিধির বিশিষ্ট প্রসাধন, উপমানের প্রত্যুপমান। বাঙ্গালা সাহিত্যের রত্নবেদীতে বঙ্কিমচন্দ্র যে দিন এই অপূর্ব দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহা ঐ সাহিত্যের ইতিহাসে একটি চিরস্মরণীয় দিন।

প্রতিমাপ্রতিষ্ঠা হইল, ভক্তগণের জয়ধ্বনি এবং শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসরের বিপুল রোলে বঙ্গসাহিত্য-মন্দির মুখরিত হইল ; যাঁহারা অন্যভাবে বিভোর হইয়া অন্য মন্দিরে আরাধনায় রত ছিলেন, তাঁহাদের কর্ণেও সে ধ্বনি পৌঁছিল, কিন্তু সকলেই যে ফিরিয়া চাহিলেন তাহা নহে। যে দুই-চারি জন চাহিলেন, তাঁহাদের প্রাণে নূতন ভাবতরঙ্গ খেলিল। তাঁহারা বুঝিলেন, বিদেশী সাহিত্য-কলার সেবা শুষ্ক সাধনা—তাহাতে হৃদয়ের যথার্থ ভাবনিবন্ধনা-প্রীতির সংযোগ নাই। অথচ ঐ প্রীতিই সাধনার প্রবর্তক ও পুরস্কার। তাঁহাদের মোহ ভাঙ্গিল, কিন্তু সকলের ভাঙ্গিল না, তাই তখনও মাতৃভাষার রত্নবেদীর নীচে আনন্দবাজার মিলিল না!"

এই আনন্দবাজার মিলাইতে বঙ্কিম ও তৎসহকারিগণকে কয়েক বৎসর পরে—অপেক্ষাকৃত বিপুলতর আয়োজন করিতে হইয়াছিল। সে কথা যথাস্থানে আলোচিত হইবে। 'কপালকুণ্ডলা' বঙ্কিমের যশঃশুভ্র ললাটে রাজটীকা পড়াইয়া দিয়াছিল—বাঙ্গালা সাহিত্যমণ্ডলের সম্রাট্-পদে বৃত হইবার জন্য তিনিই যে যোগ্যতম ব্যক্তি তাহা একরূপ নিঃসংশয় রূপে প্রতিপাদিত করিয়াছিল। এই গ্রন্থখানি তদানীন্তন বাঙ্গালা সাহিত্যিক-পারাবতগণের সঙ্কীর্ণায়তম পঞ্জরমধ্যে যে বিরূপ গুরুতর পক্ষাস্ফালনের সূচনা করিয়া দিয়াছিল তাহার উদাহরণ রূপে বলা যায় যে, একজন সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক নাকি স্বীয় যশ পুনরুদ্ধার করিবার জন্য

একেবারে দুই খানি নাটক যন্ত্রস্থ করিয়াছিলেন ! হায় রে ঈর্ষার প্রতারণা !

'Tis pleasant sure to see one's name in print ;
A book's a book, although there's nothing in't.[১]

বঙ্কিমচন্দ্রের বারুইপুর-জীবন সম্বন্ধে অতি অল্প কথাই সাধারণ্যে প্রচারিত হইয়াছে। বারুইপুরে অবস্থিতি-কালে তাঁহার দুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুণ্ডলা দুইখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তখনকার বাঙ্গালা পাঠকসমাজের সহস্র চক্ষু যে যুগপৎ তাহার উপর পতিত হইয়াছিল, এবং তাঁহার প্রতিভা, তাঁহার তেজস্বিতা, তাঁহার বিদ্যাগৌরব এবং তৎসঙ্গে তাঁহার চরিত্রগত দুই-একটা দোষও বহু লোকেরই জল্পনা ও আলোচনার বিষয় হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বঙ্কিমের মৃত্যুর পর বারুইপুর রেজেস্টরি আফিসের ভূতপূর্ব হেড্ক্লার্ক[২] প্রদীপ পত্রিকায় তৎসম্বন্ধে কিছু লিখেন। তাহাতে বঙ্কিমের বিজ্ঞানালোচনা, বন্ধুপ্রীতি প্রভৃতি গুণ এবং নাস্তিকতা ও পানদোষ প্রভৃতি দোষের কথাও অল্পাধিক স্পষ্টভাবে[৩] উল্লেখ করেন। মহাপুরুষ-চরিত্রের দোষোদ্ঘাটন কাহারও গৌরবের বিষয় নহে বটে, কিন্তু তৎসঙ্গে পাঠকমাত্রেরই ইহাও মনে রাখা কর্তব্য যে, বঙ্কিম এককালে নাস্তিকতা, পানদোষ বা অন্যবিধ দোষে দুষ্ট ছিলেন, একথা বলিলেই বঙ্কিমকে একেবারে লোকের চক্ষে এমন হীন করিয়া ফেলা হয় না যে, তাহার জন্য বঙ্কিমের অনুরাগিমাত্রের লজ্জায় অধোবদন হওয়া আবশ্যক হয়। শ্রদ্ধাস্পদ ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার বলিয়াছেন, কোনও সত্য কথায় কাহারও মর্যাদাহানি হয় না। ভল্টেয়ার বলিয়াছেন, We owe consideration to the living, to the dead we owe only truth. (জীবিত ব্যক্তির মনের দিকে তাকান আবশ্যক, মৃতব্যক্তির সম্বন্ধে একমাত্র সত্যই আলোচ্য।) সে যাহা হউক, বঙ্কিমের সময়ে বাঙ্গালার 'ইংরাজী-শিক্ষিত' ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকগুলি দোষ, বিশেষতঃ পানদোষ কিরূপ প্রবল ছিল, তাহা এই গ্রন্থের সূচনাতেই উল্লিখিত হইয়াছে। যদি রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিগণ পর্যন্ত জীবনের এক ভাগে ঐ দোষ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত না থাকিয়া থাকেন তাহা হইলে, বঙ্কিমকে ঐ দোষের জন্য গুরুতর নিন্দা-ভাজন মনে না করিয়া উহা যুগধর্মের প্রভাবমাত্র ভাবিয়া তাঁহাকে অযথা নিন্দার হাত হইতে অবশ্য মোচনীয় জ্ঞান করাই উচিত।

প্রতিভা স্বভাবতঃ লোককে একটু চপল, একটি উচ্ছৃঙ্খল, একটু নিয়ম-বন্ধনে অসহিষ্ণু করে। জ্যোতিষ্ক মাত্রেরই স্বীয় আবর্তনকক্ষ হইতে বাহিরে ছুটিয়া যাইবার

১। English Bards and Scotch Reviewers.

২। কালীনাথ দত্ত। বঙ্কিম-প্রসঙ্গে সঙ্কলিত। —স.

৩। 'আমার জীবন'-এ কবিবর নবীনচন্দ্র অতি স্পষ্ট ভাবেই বঙ্কিমের পানদোষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

দিকেই স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা যায়। অনেক আকর্ষণ, অনেক বন্ধন, অনেক নিয়মের সমবায়ে সে নিজ কক্ষে আবদ্ধ থাকিয়া জগৎকে আলো দেয়। এই স্বাভাবিক উচ্ছৃঙ্খলতা বা উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতি প্রবণতা হেতুই চিকিৎসকগণ প্রতিভাকে উন্মাদ-রোগের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গালীর গৌরবের বিষয় যে, আধুনিক যুগের পাশ্চাত্য অনেক লেখকের ন্যায় বঙ্কিম কুত্রাপি মানব-স্বভাবনিহিত, কিন্তু নীতিশাস্ত্রে গর্হিত কোনও প্রবণতাকে আভাসেও সমর্থন করিতে প্রবৃত্ত হন নাই। আধুনিক বাঙ্গালী লেখক-সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুকরণে প্রবৃত্তিকে নীতির উপরে স্থান দিতে ব্যগ্র হইয়াছেন, তাহারা এই বিষয়টি আর-একবার বিবেচনা করিয়া দেখিলে ভাল হয়। বঙ্কিমের গ্রন্থাবলী যিনি অবহিত ভাবে পাঠ করিয়াছেন, তিনিই জানেন পানদোষ ও চরিত্রদোষের তদপেক্ষা তীব্রতর নিন্দুক আর ছিল না। তবে কি বঙ্কিম বক-ধার্মিক বা বৈড়াল-ব্রতিক ছিলেন? তাহা নহে। তিনি অল্পকাল মধ্যে সকল মোহজাল কাটিয়া উঠিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কোনও বিষয়েই অনান্তরিকতা ছিল না—তিনি কপটতা ভালবাসিতেন না। উঠন্ত বয়সে শিক্ষা ও সংসর্গ-দোষে তিনি যে মোহগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাহা উত্তর কালে স্পষ্টভাবে স্বীকার করিয়াছেন। একদিন তিনি স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "আমার জীবনে অনেক ভ্রমপ্রমাদ আছে, তা বলা বড় কঠিন, কাজেই জীবনী হইল না। সে সব বলিতে পারিলে, অনেক কাজ হয়। এক জনের প্রভাব আমার জীবনে বড় বেশী রকমের—আমার পরিবারের। আমার জীবনী লিখিতে হইলে তাঁহারও লিখিতে হয়। তিনি না থাকিলে আমি কি হইতাম, বলিতে পারি না।[১] আমার যত ভ্রম-প্রমাদ, তিনি জানেন আর আমি জানি। আমার জীবনের কতক বড় শিক্ষাপ্রদ, সকল বলিলে লোকে ভাবিবে, কি যে কি এক রকমের অদ্ভুত লোক ছিল। আগে আমি নাস্তিক ছিলাম। তাহা হইতে হিন্দুধর্মে আমার মতি-গতি আশ্চর্য রকমের। কেমন করিয়া তাহা হইল জানিলে লোক আশ্চর্য হইবে। আমি আপন চেষ্টায় যা কিছু শিখেছি। কুসংসর্গটা ছেলেবেলায় বড় বেশী হয়েছিল। বাপ থাক্‌তেন বিদেশে, মা সেকেলের উপর আর একটু বেশী, কাজেই তাঁর কাছে কিছু শিক্ষা হয় নি। নীতিশিক্ষা কখন হয় নি। আমি যে লোকের ঘরে সিঁদ দিতে কেন শিখি নি বলা যায় না।" পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট বঙ্কিম এতদপেক্ষাও স্পষ্টভাবে নিজ জীবনের দুই-একটা গুরুতর মোহের কথা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। সেসকল কথা ঈদৃশ গ্রন্থে আলোচ্য নহে।

---

১। 'লোক-রহস্য'-এ দাম্পত্য-দণ্ডবিধির আইনে বঙ্কিম যে বলিয়াছেন—পূর্বজন্মকৃত পাপের জন্য পুরুষের প্রায়শ্চিত্তবিশেষকে বিবাহ বলে, বিবাহের সেরূপ সংজ্ঞাবিধান অন্ততঃ তাঁহার জীবনসম্পর্কে মোটেই খাটে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রে পত্নীর প্রভাব প্রসঙ্গে এস্থলে বলা আবশ্যক, বঙ্কিমচন্দ্র দুই-বার দার-পরিগ্রহ করেন। ১৮৪৯ খৃস্টাব্দে, বঙ্কিমের একাদশ বর্ষ পূর্ণ হইবার পূর্বেই তাঁহার প্রথম বিবাহ হয়। সেকালে এইরূপ অল্পবয়সে বিবাহ কিছুমাত্র বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল না; বরং উহাই একরূপ চলিত রীতি ছিল। বঙ্কিমের পত্নীর বয়স নাকি তখন পাঁচ বৎসর। টিউডার বংশের রাজত্বকাল পর্যন্ত ইংলণ্ডেও, অন্ততঃ উচ্চশ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে, বর-কন্যার এইরূপ অল্পবয়সে বিবাহ চলিত ছিল। নানা কারণে ইংলণ্ডের ন্যায় এদেশেও বর-কন্যা উভয়েরই বিবাহের বয়স বাড়িয়া চলিয়াছে। খুব প্রাচীন যুগে বোধ হয় ভারতবর্ষেও সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সেই স্ত্রী-পুরুষগণের বিবাহ হইত। সমাজের গতি অতি বিচিত্র। কত কি অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়প্রায় শক্তি যুগে যুগে সমাজকে কত প্রথা অবলম্বন, বর্জন ও পুনরবলম্বন করিতে বাধ্য করে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

সে যাহা হউক প্রথম বারে বঙ্কিম স্বগ্রাম হইতে অদূরবর্তী নারায়ণপুর-নামক গ্রামের নবকুমার চক্রবর্তী-নামক এক ভদ্রবংশীয় ব্রাহ্মণের কন্যাকে বিবাহ করেন। দশবৎসর পরে বঙ্কিম বিপত্নীক হয়েন। তৎপর বৎসর প্রসিদ্ধ হালিসহর গ্রামে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। বঙ্কিমের এই পত্নীর—পূজনীয়া রাজলক্ষ্মী দেবীর—প্রভাবের কথাই বঙ্কিমের পূর্বোদ্ধৃত উক্তিতে বর্ণিত হইয়াছে। বঙ্কিমের প্রথমা পত্নীর গর্ভে কোনও সন্তান হয় নাই। দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে তিন কন্যা জন্মে। ইঁহাদের মধ্যে একজন (সর্বকনিষ্ঠা কন্যা) বঙ্কিমের জীবিতাবস্থায়ই আত্মহত্যা দ্বারা জীবনলীলা সংবরণ করেন।[১] অন্য দুই কন্যার গর্ভজাত সন্তানগণের কেহ কেহ জীবিত আছেন।

বঙ্কিম কন্যা ও দৌহিত্রগণের, বিশেষতঃ প্রথমা কন্যার গর্ভজাত দৌহিত্রগণের প্রতি অতিশয় স্নেহপ্রবণ ছিলেন। তাঁহার প্রথম জামাতা ৺রাখালচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয় তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। বঙ্কিমের নাস্তিকতার কথা তাঁহার নিজ ভাষায় ও অন্যের কথায় উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। সে কালে ইংরাজী-শিক্ষিত কয়জন লোক নাস্তিকতা-দোষে অদুষ্ট ছিলেন? তখন কোমৎ, বেন্থাম প্রভৃতি প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকগণের প্রভাব বড় অধিক। বঙ্কিমও যুগধর্ম ও নিরীশ্বরা শিক্ষার প্রভাবে নাস্তিক হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের বনিয়াদ ভাল ছিল বলিয়া তদীয় চরিত্রে ধর্ম সম্বন্ধে গুরুতর উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যায় নাই। ইংরাজী শিক্ষা ও কুসংসর্গ তাঁহার হৃদয় হইতে ধর্মবিশ্বাসের মূলোৎপাটন করে নাই। বরং জনক-জননীর প্রতি ভক্তি প্রভৃতিতে তদীয় ধর্মবিশ্বাসের মূলের সজীবতাই নিরীক্ষণ করা যায়। কালক্রমে অনুকূল অবস্থায় ঐ মূলই নানা দিক

---

১। ঢাকা রিভিউ, নবেম্বর-ডিসেম্বর ১৯১৬; শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র বিশ্বাস-রচিত বঙ্কিম-প্রসঙ্গ। তারকবাবু বলিয়াছেন, ঐ ঘটনার পর হইতেই বঙ্কিমচন্দ্রের বহুমূত্র ব্যাধির সূচনা হয়।

হইতে রস সঞ্চার করিয়া শাখা-প্রশাখা বিস্তারপূর্বক বঙ্কিমকে কেবল ঈশ্বরবিশ্বাসী নহে, হিন্দুধর্মের একান্ত অনুরাগী ভক্তে ও ব্যাখ্যাতায় পরিণত করিয়াছিল। শচীশবাবুর প্রদত্ত বিবরণ সত্য হইলে[১] দুহিতা ও দৌহিত্রগণের প্রতি স্নেহই তাঁহার হৃদয়ে ধর্মবিশ্বাসকে উদ্বোধিত করিয়াছিল বলিতে হইবে। নিরীশ্বরা শিক্ষায় তাঁহার হৃদয়পদ্মার এককোণে যে বালুকাময় চরের সূচনা করে, দুহিতা ও দৌহিত্রগণের আসন্ন মরণের আশঙ্কায় ভক্তি, বিশ্বাস ও ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর হঠাৎ প্রবল হইয়া ভাবের বন্যা উৎপাদনপূর্বক এক মুহূর্তে তাহার চিহ্ন পর্যন্ত লুপ্ত করিয়া দিয়াছিল।[২] বঙ্কিম সুকৃতী ছিলেন বলিয়া তাঁহার আর্তি ঈশ্বরভক্তি উদ্বোধিত করিয়াছিল। গীতায় ভগবান নিজে বলিয়াছেন—

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥

(চারি প্রকারের সুকৃতী আমাকে ভজনা করে—আর্ত, জ্ঞানলিপ্সু, অর্থকামী ও জ্ঞানী।) সকল আর্তই কি ঈশ্বর ভজনা করে? তাহা ত নহে। তাই গীতায় সুকৃতী শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। বঙ্কিমকেও সেই জন্যই আমরা সুকৃতী, তাঁহার হৃদয়ের বনিয়াদ ভাল বলি। তাঁহার পিতার পুত্র কিরূপে অন্যরূপ হইবে?

কপালকুণ্ডলা-প্রকাশের পর অর্থাৎ ১৮৬৭ খৃস্টাব্দের মধ্যভাগে বঙ্কিমচন্দ্র গবর্ণমেণ্ট-নিয়োজিত 'আমলাগণের বেতননির্ধারণার্থ কমিশনের' সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। বঙ্কিম উক্ত কমিশনের পাকা সেক্রেটারি ছিলেন না, কিন্তু পাকা সেক্রেটারি (হাইকোর্টের একজন ইংরেজ জজ) ছুটীতে যাওয়ায় বঙ্কিম অল্পকালের জন্য ঐ পদে নিযুক্ত হন। অল্পকালের জন্য হইলেও বাঙ্গালীকে কমিশনের সেক্রেটারি করায় ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, বঙ্কিম এই সময়ের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের নিকট স্বীয় প্রতিভা, কর্মদক্ষতা, বিশেষতঃ ইংরাজীতে রচনাশক্তির বিশিষ্ট পরিচয় দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ঐ কর্ম হইতে অবসর পাইয়াই তিনি আলিপুরে বদলি হন এবং মৃণালিনী রচনা ও আইন অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হন। ১৮৬৮ খৃস্টাব্দের মধ্যভাগে মৃণালিনী রচনা ও সংশোধনাদি শেষ করিয়া মুদ্রাঙ্কন জন্য ছাপাখানায় দিয়া তিনি কাশীধামে যাত্রা করেন। ১৮৬৮ খৃস্টাব্দের শেষার্ধে তিনি ছুটিতে ছিলেন।[৩] সম্ভবতঃ আইন-পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার উদ্দেশ্যেই তিনি ছুটী লন এবং তজ্জন্যই কাশীতে যান।

---

১। বঙ্কিম-জীবনী—পৃষ্ঠা ১৯০। শচীশবাবু বলিয়াছেন, বঙ্কিমের জ্যেষ্ঠা কন্যার প্রসব-বেদনা উপস্থিত হইলে তাঁহার জীবনাশঙ্কায় বঙ্কিম স্বগৃহে রাধাবল্লভ বিগ্রহের নিকট কাতর প্রাণে সাশ্রুনেত্রে তাহার সুপ্রসব প্রার্থনা করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ দৌহিত্রের কঠিন পীড়ার সময়ও নাকি ঐরূপ করিয়া রাধাবল্লভের নিকট তাহার রোগমুক্তি প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

২। শচীশবাবু কিন্তু মনে করেন বঙ্কিমের ধর্মভাব সহসা জাগে নাই। কিন্তু বঙ্কিমের চরিত্রালোচনা করিয়া বর্তমান গ্রন্থকারের অন্যরূপ ধারণা জন্মিয়াছে।

৩। ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দের ৫ই জুন হইতে ছয়মাস ছুটিতে ছিলেন, ১৮৬৮তে নয়।—স.

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই তিনি আইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু মৃণালিনী প্রকাশ হইতে ঐ বৎসর প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছিল।[১] মৃণালিনী মুদ্রাযন্ত্রের কবল হইতে বাহির হইবার পূর্বেই দুর্গেশনন্দিনীর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

'দুর্গেশনন্দিনী' ও মৃণালিনী'তে সোদরাসুলভ সাদৃশ্য অতি স্পষ্ট; কপালকুণ্ডলার সহিত ঐরূপ সাদৃশ্য অল্প। কপালকুণ্ডলা মৃণালিনীর পূর্বে রচিত হইয়াছিল ইহা না জানিয়া যদি কেহ কেবল আভ্যন্তরিক প্রমাণবলে মৃণালিনী দুর্গেশনন্দিনীর অব্যবহিত পরবর্তী গ্রন্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করে, তাহা হইলে তাহাকে বড় বেশী দোষ দেওয়া যায় না। দুর্গেশনন্দিনী ও মৃণালিনী অপেক্ষা কপালকুণ্ডলায় রচয়িতার অধিকতর কল্পনাকুশলতা ও শিল্পচাতুর্য প্রদর্শিত হইয়াছে। কপাল-কুণ্ডলা-চরিত্রের অলৌকিকপ্রায় সৌন্দর্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও, দেখা যায় কাপালিক ও মতিবিবির মত জটিল চরিত্র মৃণালিনীতে একটিও নাই। পশুপতিকে বঙ্কিম কুটিল করিয়াছেন, কিন্তু জটিল করিতে পারেন নাই। মনোরমার জটিল-তাও বাহিরের, ভিতরের নহে। মনোরমার মূর্তিটি শিল্পী প্রায় আয়েষার মত করিয়াই গড়িয়া ফেলিয়াছেন, কেবল বর্ণসংযোগের সময় যে তুলিকায় কপাল-কুণ্ডলার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, হয়ত অনবধানতাবশতঃ বিশেষ ভাবে না ধুইয়া লইয়া সে তুলিটি দ্বারাই মনোরমার মূর্তিতে বর্ণপ্রক্ষেপ করিয়াছেন। সেই জন্য প্রথমাঙ্কিত মূর্তির বর্ণিকাচিহ্ন কিয়ৎ পরিমাণে দ্বিতীয় চিত্রে লাগিয়া গিয়াছে। অসতর্ক পাঠকের দৃষ্টিতে মনোরমা যতটুকু প্রহেলিকাময়ী বলিয়া মনে হয়, চিত্রকর সাবধান হইলে ততটুকুও হইত না। বৃদ্ধ রামগতি ন্যায়রত্ন মনোরমার চরিত্র সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "মনোরমাকে গ্রন্থকার একটি অদ্ভুত পদার্থ করিয়া তুলিয়াছেন। উহার বিবরণ পাঠ করিতে মনে একপ্রকার আমোদ হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু এক স্ত্রীরই বহুরূপার ন্যায় এক ক্ষণে 'সরল বালিকাভাবে'র ও পরক্ষণেই 'গম্ভীর-প্রকৃতি প্রৌঢ় যুবতীভাবে'র প্রাপ্তি হওয়া কতদূর স্বভাবসঙ্গত তাহা আমরা বলিতে পারি না।" হ্যামলেটের উন্মাদের ন্যায় মনোরমা-চরিত্রের বালিকাভাবটি অন্ততঃ আংশিকপরিমাণে কৃত্রিম হইতে পারে, এ সন্দেহ ন্যায়রত্নের মনে উদিত হয় নাই। বস্তুতঃ মনোরমা চরিত্রের ভিত্তি তাহার চিত্তের অসাধারণ দৃঢ়তায়। তাহার বয়স পঞ্চদশ কি ষোড়শ তাহা বঙ্কিম স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই[২], আয়েষা দ্বাবিংশতিবর্ষ-বয়স্কা। কিন্তু দুঃখের কঠোর শিক্ষাগারে শিক্ষালাভ করিয়া মনোরমা যে তাহার বয়সের তুলনায় অধিক পরিপক্বতা, অধিক অভিজ্ঞতা ও অধিক দৃঢ়তা লাভ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই সে পশুপতির ভাষায় এত 'গম্ভীরা, তেজস্বিনী, প্রতিভাময়ী, প্রখরবুদ্ধিশালিনী।' তাহার ঐরূপ প্রতিভা ও বুদ্ধি-প্রাখর্য আয়েষাচরিত্রেরই অনুরূপ। শান্তশীল প্রভৃতি কর্তৃক রজনীযোগে আক্রমণের

১। 'মৃণালিনী' প্রকাশের তারিখ ১০ই নভেম্বর ১৮৬৯।—স.

২। 'মৃণালিনী' দ্বিতীয় খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পর হেমচন্দ্র যখন শোণিতস্রাবে রুগ্ন ও দুর্বল হইয়া পালঙ্ক আশ্রয় করিয়াছিলেন, তখন তদীয় শয্যাপার্শ্বে শুশ্রূষানিরতা মনোরমাকে দেখিলেও আয়েষার কথাই মনে হয়। কিন্তু আয়েষার ন্যায় মনোরমার চিত্তে অলক্ষিতভাবেও প্রেমসঞ্চার হয় নাই, কেন না তিনি পশুপতিকর্তৃক পরিণীতপূর্বা এবং স্বামীতে অনুরাগবতী। হেমচন্দ্রের সহিত ঐ সময়ে মনোরমার যে কথোপকথন হয়[১] উহা নানা কারণেই পুনঃ পুনঃ পড়িবার যোগ্য। ঐ পরিচ্ছেদে মনোরমাকে ভাল চেনা যায়। প্রেম-সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা যে কত উচ্চ ছিল তাহা আমরা পূর্বে একবার দেখাইয়াছি[২]। এখানে আরও একটু দেখাইতে চাই—

> মনোরমা কহিতে লাগিল, "তুমি পুরাণ শুনিয়াছ? আমি পণ্ডিতের নিকট তাহার গূঢ়ার্থ শুনিয়াছি। লেখা আছে, ভগীরথ গঙ্গা আনিয়াছিলেন, এক দাম্ভিক মত্ত হস্তী তাহার বেগ সংবরণ করিতে গিয়া ভাসিয়া গিয়াছিল। ইহার অর্থ কি? গঙ্গা প্রেম প্রবাহস্বরূপ; ইহা জগদীশ্বরপাদপদ্মনিঃসৃত, ইহা জগতে পবিত্র,—যে ইহাতে অবগাহন করে, সেই পুণ্যময় হয়। ইনি মৃত্যুঞ্জয়জটাবিহারিণী; যে মৃত্যুকে জয় করিতে পারে, সেও প্রণয়কে মস্তকে ধারণ করে। আমি যেমন শুনিয়াছি, ঠিক সেইরূপ বলিতেছি। দাম্ভিক হস্তী দম্ভের অবতারস্বরূপ। সে প্রণয়বেগে ভাসিয়া যায়; প্রণয় প্রথমে একমাত্র পথ অবলম্বন করিয়া উপযুক্ত সময়ে শতমুখী হয়; প্রণয় স্বভাবসিদ্ধ হইলে শত পাত্রে ন্যস্ত রয় ও পরিশেষে সাগরসঙ্গমে লয়প্রাপ্ত হয়—সংসারস্থ সর্ব জীবে বিলীন হয়।"
>
> ... ... ...
>
> আমি অবলা; জ্ঞানহীনা; বিবশা; আমি ধর্মাধর্ম কাহাকে বলে তাহা জানি না। আমি এই মাত্র জানি ধর্ম ভিন্ন প্রেম জন্মে না।

দুর্গেশনন্দিনী ও মৃণালিনী এই দুই গ্রন্থের শিল্পগত সাদৃশ্য কতদূর ঘনিষ্ঠ, তাহা সম্পূর্ণরূপ বিশ্লেষণ করিয়া দেখান এই গ্রন্থের সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে সম্ভব নহে। দিগ্‌গজের কথায় তিলোত্তমার চরিত্রে জগৎসিংহের সন্দেহ, কতলুখাঁর মৃত্যুশয্যায় তদীয় উক্তি দ্বারা ঐ সন্দেহ নিরাশ, প্রত্যাখ্যাতা তিলোত্তমার স্বপ্ন—ইহার প্রত্যেকটির অনুরূপ ঘটনা মৃণালিনীতে দেখিতে পাওয়া যায়।

চরিত্রগত সাদৃশ্যের মধ্যে, আয়েষা, মনোরমা ছাড়া অভিরামস্বামীর সহিত মাধবাচার্যের সাদৃশ্য প্রথমে উল্লেখযোগ্য। অভিরামস্বামী কেবল বীরেন্দ্রসিংহের শ্বশুর নহেন, তিনি রাজনীতিও চর্চা করেন, আবার জ্যোতিষশাস্ত্রেও তাঁহার অধিকার আছে। 'জ্যোতিষী গণনায়' মোগল সেনাপতি হইতে তিলোত্তমার মহৎ অমঙ্গল দেখিয়া তিনি বীরেন্দ্র সিংহকে মোগলের সহিত সন্ধি করিতে পরামর্শ

১। 'মৃণালিনী' তৃতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।
২। ৯১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দিয়াছিলেন। রাজনীতিচর্চা মাধবাচার্যের জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু তিনিও জ্যোতিষ আলোচনা করেন, এবং গণনা করিয়া দেখিয়াছিলেন, "যখন পশ্চিম দেশীয় বণিক্ বঙ্গরাজ্যে অস্ত্রধারণ করিবে, তখন যবনরাজ্য উৎসন্ন হইবে।"

কেশবের মেয়ের ( মনোরমার ) ভবিষ্যৎ বৈধব্য ও তৎসহকৃত সহমরণ-বিষয়ক গণনা মাধবাচার্যের না হইলেও এখানে উল্লেখযোগ্য।

দুর্গেশনন্দিনীতে আমরা অদৃষ্টবাদ লক্ষ্য করিয়াছি। 'কপালকুণ্ডলা'র প্রতি পত্রে ও প্রায় প্রতিচ্ছত্রে উহা অত্যন্ত উজ্জ্বল ভাবে দেদীপ্যমান। কিন্তু 'মৃণালিনী'তে উহা কেবল মনোরমার নিয়তিতেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

হেমচন্দ্র বীরত্বে জগৎসিংহ অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন মনে হয় না; পিতৃরাজ্যহর্তা বখতিয়ার খিলিজিকে স্বহস্তে যুদ্ধে নিধন করিবেন বলিয়া তিনি তাহাকে ক্ষিপ্ত হস্তীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। আবার নবদ্বীপে নিশীথে একাকী তিনজন আক্রমণকারীকে ব্যর্থমনোরথ করিয়াছিলেন। জগৎসিংহের ন্যায় তিনিও প্রেমিক, কিন্তু জগৎসিংহ অপেক্ষা তাঁহার অধৈর্য, অভিমান ও ক্রোধ অত্যন্ত অধিক। নবকুমারের ধৈর্যের পরকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া হেমচন্দ্রে কবি একবারে প্রায় বিপরীত-সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। হেমচন্দ্র মৃণালিনীর সহিত মিলনে অধৈর্যবশতঃ 'রাজ্য—শিক্ষা—গর্ব অতল জলে' ডুবাইয়া দিতে প্রস্তুত[১]; মৃণালিনীর মৃত্যুর হেতু ভাবিয়া গুরু মাধবাচার্যকে নিহত করিতে উদ্যত, আবার, মৃণালিনী অবিশ্বাসিনী এই সন্দেহে, মাধবাচার্যকে করস্থ শূল দেখাইয়া কহিতেছেন, 'মৃণালিনীকে এই শূলে বিদ্ধ করিব'।[২] নবকুমার কপালকুণ্ডলার চরিত্রে সন্দেহ করিয়া স্থির করিয়াছিলেন, কপালকুণ্ডলাকে কিছু বলিবেন না, আত্মহত্যা করিবেন। জগৎসিংহের মনে তিলোত্তমাকে বধ করিবার চিন্তা উদিত হয় নাই, বরং কারাগারে তাঁহার সম্মুখে তিলোত্তমা মূর্ছিত হইয়া পড়িলে, তিনি নিজ বস্ত্র দ্বারা তাঁহাকে ব্যজন করিয়াছিলেন।[৩] আর তদবস্থায় হেমচন্দ্র মৃণালিনীকে ফেলিয়া গিরিজায়াকে পদাঘাত করিয়া গিয়াছিলেন।[৪] যে প্রেম লোককে এত অধীর, এত মর্যাদাভেদক, এত কর্তব্যজ্ঞানান্ধ করে তাহার মূল্য কি?

মৃণালিনী ও তিলোত্তমার চরিত্রের সাদৃশ্য ও বৈষম্য বিশেষভাবে আলোচনা না করিলেও চলে। কিন্তু উভয় চরিত্রে একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করিবার যোগ্য। আয়েষার কাছে তিলোত্তমা যেমন ম্লান, মনোরমার কাছে মৃণালিনীও সেইরূপ ম্লান। স্কটের অনেকগুলি প্রধান নারীচরিত্রই তাদৃশ চিত্তাকর্ষক নহে বলিয়া কোনও

---

১। 'মৃণালিনী' প্রথম খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ।
২। ঐ তৃতীয় খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ।
৩। 'দুর্গেশনন্দিনী' দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্দশ পরিচ্ছেদ।
৪। 'মৃণালিনী' তৃতীয় খণ্ড, দশম পরিচ্ছেদ।

কোনও সমালোচক মত প্রকাশ করিয়াছেন।[১] দুর্গেশনন্দিনী ও মৃণালিনীর প্রধান দুইটি নারী-চরিত্র সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে।

গিরিজায়ার চরিত্রে বিমলার প্রফুল্লতা ও পরিহাস-রসিকতার ছায়া আছে, কিন্তু বিমলার বিমলাত্ব নাই, মাধুর্যের সহিত গাম্ভীর্যের, রসিকতার সহিত প্রতিভার, তরলতার সহিত দৃঢ়তার মধুর মিলন নাই। তথাপি বলিতে হইবে, শিল্পের হিসাবে বিমলা যেমন 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের একপ্রকার প্রাণস্বরূপ, গিরিজায়াও 'মৃণালিনী' উপন্যাসের প্রায় তদ্রূপ। গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদ হইতে গিরিজায়ার সহিত পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই পাঠক যেন তাহার কমনীয় কণ্ঠের মধুময়ী স্বর-লহরীতে ভাসিতে ভাসিতে একেবারে এক দিব্য কল্পনালোকে গিয়া উপনীত হন। বিমলা নাচিতে গাহিতে জানিতেন ইহা গ্রন্থাকারের মুখে আমাদের শোনা আছে, দিগ্‌গজ সঙ্গে যাইতে যাইতে প্রান্তরে একটা গান গাহিয়াছিলেন সেকথাও শুনিয়াছি, কিন্তু সে গানের স্বর বা পদ আমাদের কর্ণপর্যন্ত আসিয়া পৌঁছে নাই। দুর্গেশনন্দিনীতে বঙ্কিম আমাদিগকে কেবল গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের দিগ্‌গজী গান শুনাইয়াছেন—

সেই দিন পুড়িল কপাল মোর—
কালি দিলাম কুলে,
মাথায় চূড়া হাতে বাঁশী, কথা কয় হাসি হাসি
বলে ও গোয়ালা মাসী—কলসী দিব ফেলে।

কপালকুণ্ডলায় শ্যামাসুন্দরীর মুখে একটা ছড়া মাত্র শুনিয়াছি। মৃণালিনীতে কবি ষোড়শী ভিখারিণীর কণ্ঠে যে গান শুনাইয়াছেন, তাহা চিরকাল বাঙ্গালা পাঠকের কানে বাজিবে। গিরিজায়ার কণ্ঠে মোট সাতটি গান শুনিতে পাই,[২] তার দুইটি অর্থাৎ (১) "মথুরাবাসিনী মধুরহাসিনী শ্যামবিলাসিনি রে!" ও (২) যমুনার জলে

---

১। আমেরিকার Yale বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক W. L, Phelps তদীয় নবপ্রকাশিত The Advance of the English Novel নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন "Although Jane Austen's robust contemporary Walter Scott sometimes makes his heroines act and talk in a way that seems to us insipid, his best girls are full of vigour, both of body and mind. Mr. Saintsbury had the courage to name five nineteenth century women whom he would have been glad to marry.......... Among all of Scott's creations, it is notable that the modern critic selected Diana Vernon, the all round athlete. কপালকুণ্ডলার প্রতি স্যায়রভের বিরাগের কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। মৃণালিনী বা তিলোত্তমার অনুরাগী কেহ আছেন কি না জানি না। আমাদের দেশের একজন শ্রেষ্ঠ সমালোচক বঙ্কিমের সকল নারীচরিত্র অপেক্ষা কমলমণির অধিক অনুরাগী।

২। যে ফুল ফুটিত সখি (?) গৃহ তরু শাখে—
কেন রে পবনা উড়ালি তাকে।
গানটি সম্পূর্ণ নহে। উহা পূর্বোক্ত সাতটির অতিরিক্ত।

মোর কি নিধি মিলিল"—বোধ হয় হেমচন্দ্রের রচিত, আর একটি—"কণ্টকে গঠিল বিধি মৃণাল অধমে"—মৃণালিনীর রচিত। এই তিনটির ভাব ত প্রসঙ্গানুগত হইবেই। ইহা ছাড়া আর যে চারিটি গান তাহা গিরিজায়া যেখানেই শিখুক, সেগুলিও যে প্রসঙ্গানুগত হইয়াছে, ইহাতে গিরিজায়ার যেমন বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও রসজ্ঞতা প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনই তাহার গানের ভাণ্ডারও যে অফুরন্ত ছিল তাহাও অনুমান করিবার হেতু আছে। কিন্তু দিগ্বিজয়ের সহিত বিবাহের পর বঙ্কিম কেবল সেই পতিপ্রাণা রমণীর পতির পৃষ্ঠে সমুচিত নিষ্ঠার সহিত সংমার্জনী-সঞ্চালনের কথাই বলিয়াছেন; তাহার বিদ্যাধরীবিনিন্দী কণ্ঠের কমনীয় স্বর-লহরীতে তাহার গার্হস্থ্যলীলার ক্ষেত্র কিরূপ মুখরিত হইত তদ্বিষয়ে কোনও উল্লেখ করেন নাই। গিরিজায়ার কণ্ঠ যদি হেমচন্দ্র মৃণালিনীর মিলন ঘটাইয়া নীরব হইয়া গিয়া থাকে, তবে জগতের যে বড় একটা ক্ষতি হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গীতরচনা ও সঙ্গীতচর্চা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা কয়েক বৎসর পূর্বে ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত 'বঙ্কিম-যুগের কথা' শীর্ষক ধারাবাহিক একটি প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছিল। ঐ প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন[১]—

> বঙ্কিমচন্দ্র গান বাজনা বড় ভালবাসিতেন। কাঁটালপাড়ায় যদুনাথ ভট্টাচার্য নামে একটি লোক থাকিতেন, তিনি সুকণ্ঠ ও সুবাদক ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে পঁচিশ টাকা মাহিনা দিয়া নিজ বাড়ীতে রাখিয়াছিলেন। মাহিনার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি চমৎকার বরাদ্দ ছিল—কিঞ্চিৎ গঞ্জিকা। যদুনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে হারমোনিয়াম বাজাইতে শিখাইতেন। বঙ্কিম নিজে গাহিতে বড় ভাল পারিতেন না। গলা ছিল পূর্ণ বাবুর! পূর্ণ বাবু গান ধরিতেন, বঙ্কিম বাজাইতেন।··· ··· ··· তাঁহার উপন্যাসে যে গানগুলি আছে, তাহার সঙ্গে সুরসংযোগ করিয়াছিলেন যদুনাথ।[২]

গিরিজায়ার সহিত দিগ্বিজয়ের বিবাহবৃত্তান্তে অনেকেরই সেক্ষপীয়রের Merchant of Venice নাটকে বেসানিও ও পোর্সিয়ার বিবাহের পরই বেসানিওর ভৃত্য গ্রেসিয়ানোর সহিত পোর্সিয়ার পরিচারিকা ও সখী নেরিসার বিবাহের কথা মনে পড়ে। Merchant of Veniceএর আরও এক কৌতুককর স্থলের সহিত মৃণালিনীর একটি অংশের তুলনা করা যায়।

হেমচন্দ্র তিনজন আক্রমণকারীর অস্ত্রাঘাতজনিত শোণিতস্রাবে দুর্বল হইয়া

---

১। "ভারতী" ১৩১৮ কার্তিক সংখ্যা।

২। "সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে" এই গানটি রচনার একটি ইতিহাস পূজ্যপাদ অধ্যাপক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি। বঙ্কিমই শাস্ত্রী মহাশয়কে উহা বলিয়াছিলেন। নানা কারণে উহা এ গ্রন্থে উল্লেখযোগ্য নহে। ['সাধের তরণী' গানটিতে সুর দিয়াছিলেন সরলা দেবী।—স.]

শয্যায় শয়ান, মনোরমা তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া শুশ্রূষায় রত। তাহাদের মধ্যে কি কথোপকথন হয় শুনিবার আশায় গিরিজায়া বাহিরে বাতায়ন নিম্নে বসিয়া থাকিতে থাকিতে ক্লান্ত হইয়া পাত্রান্তর অভাবে আপনার সহিতই মনে মনে কথোপকথন আরম্ভ করিল। ঐ কথোপকথনের রকমটি এইরূপ—

প্রশ্ন—"ওলো, তুই বসিয়া কে লো?" উত্তর—গিরিজায়া লো।" প্রঃ—"এখানে কেন লো?" উঃ—"মৃণালিনীর জন্যে লো।" "মৃণালিনী তোর কে!" "কেউ না।" "তবে তার জন্য তোর এত মাথা ব্যথা কেন?" "আমার আর কাজ কি? বেড়াইয়া বেড়াইয়া কি করিব?" "মৃণালিনীর জন্যে এখানে কেন?" "এখানে তার একটি শিকলীকাটা পাখী আছে।" "পাখী ধরিয়া নিয়ে যাবি নাকি?" শিকলী কেটে থাকে ত ধরিয়া কি করিব? ধরিবই বা কিরূপে?" "তবে বসিয়া কেন?" "দেখি, শিকল কেটেছে কি না?" কেটেছে না কেটেছে জেনে কি হইবে?" পাখীটির জন্য মৃণালিনী প্রতি রাত্রে কত লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে—আজ না জানি কত কাঁদবে। যদি ভাল সংবাদ লইয়া যাই, তবে অনেক রক্ষা হইবে।" "আর যদি শিকল কেটে থাকে?" "মৃণালিনীকে বলিব যে, পাখী হাত ছাড়া হয়েছে—রাধাকৃষ্ণ নাম শুনিবে ত আবার বনের পাখী ধরিয়া আন। পড়া পাখীর আশা ছাড়। পিঞ্জরা খালি রাখিও না—" ইত্যাদি।

Merchant of Veniceএ ইহার অনুরূপ এইটুকু দেখিতে পাই—

Launcelot Gobbo.—Certainly, my conscience will serve me to run from this Jew my master. The fiend is at mine elbow, and tempts me, saying to me,—"Gobbo, Launcelot Gobbo, good Launcelot", or "good Gobbo" or "good Launcelot Gobbo, use your legs take the start, run away." My conscience says,—"No; take heed, honest Launcelot; take heed, honest Gobbo;" or as aforesaid, "honest Launcelot Gobbo; do not run; scorn running with thy heels." Well the most courageous fiend bids me pack. "Via!" says the fiend; "away!" says the fiend; "for the heavens rouse up a brave mind", says the fiend, "and run." Well, my conscience, hanging about the neck of my heart, says very wisely to me,—"My honest friend Launcelot, being an honest man's son." or rather an honest woman's son;—for indeed my father did something smack,—something grow to—he had a kind

of taste :—well, my conscience says, 'Launcelot, budge not." "Budge", says the fiend : "budge not" says my conscience. "Conscience," say I "you counsel well," "fiend," say I "you counsel well ;" to be ruled by my conscience, I should stay with the jew my master, who (God bless the mark !) is a kind of devil.

'কৃষ্ণকান্তের উইলে' একবার রোহিণীর ও আর একবার গোবিন্দলালের মনে সুমতি-কুমতির যে দ্বন্দ্ব বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সেক্ষপীয়রের উক্ত অংশের সহিত আরও অধিক সাদৃশ্যযুক্ত। আবার বিশেষজ্ঞগণ জানেন সেক্ষপীয়রেরও ঐ অংশ মৌলিক নহে।

গানে ও শুভ্র সংযত সরল রসিকতায় মৃণালিনী গ্রন্থখানি অতি অপূর্ব। দুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুণ্ডলার ন্যায় ইহাতেও উপন্যাস অপেক্ষা কাব্যের ধর্ম অধিক বিরাজিত। কল্পনা ও শিল্পকুশলতায় ইহা কপালকুণ্ডলা অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইলেও, ইহা একখানি অতি অপূর্ব বস্তু, কল্পনালোকেরই সামগ্রী। Victor Hugo, Dumas, Cooper, Sienkiewicz প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ রোমান্স লেখক-দিগের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তাঁহারা "find this world too cramped, and are forced to make their own world where they can have elbow room".[১] বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধেও তাহাই বলা যায়।

ভবিষ্যতে কোনও কোনও গ্রন্থে যে বঙ্কিম অতুলনীয় স্বদেশভক্তির পরিচয় দিয়াছেন, 'মৃণালিনীতে' তাহার সূচনা দেখা যায়। সপ্তদশ পাঠান অশ্বারোহী এই বাঙ্গালা দেশটাকে একদিনে জয় করিল বলিয়া যে আখ্যান ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে উহার অযৌক্তিকতার বিরুদ্ধে বঙ্কিমই বোধ হয় প্রথম লেখনী ধারণ করেন। মৃণালিনীতে তিনি যুক্তিসহচারিণী কল্পনাবলে বাঙ্গালীর সেই কলঙ্ক ধুইতে চেষ্টা করিয়াছেন। মুসলমান কর্তৃক বঙ্গজয়ের ইতিহাসপ্রচলিত বিবরণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তিনি 'মৃণালিনী'তে বলিয়াছেন—

> ষষ্ঠি বৎসর পরে যবন ইতিহাসবেত্তা মিন্‌হাজউদ্দীন এইরূপ লিখিয়াছিলেন। ইহার কতদূর সত্য কতদূর মিথ্যা তাহা কে জানে? যখন মনুষ্যের লিখিত চিত্রে সিংহ পরাজিত মনুষ্য সিংহের অপমানকর্তা স্বরূপ চিত্রিত হইয়াছিল, তখন সিংহের হস্তে চিত্রফলক দিলে কিরূপ চিত্র লিখিত হইত? মনুষ্য মূষিকতুল্য প্রতীয়মান হইত সন্দেহ নাই। মন্দভাগিনী বঙ্গভূমি সহজেই দুর্বলা, আবার তাহাতে শত্রুহস্তে চিত্রফলক।

১২৮১ সনের বঙ্গদর্শনে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় রচিত বাঙ্গালার ইতিহাসের সমালোচনায় তিনি আবার এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার পরে

১। The Advance of the English Novel, Prof. Phelps.

১২৮৭ সনের বঙ্গদর্শনে 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্কিম লিখিয়াছিলেন—

সতের অশ্বারোহীতে বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, এ উপন্যাসের ঐতিহাসিক প্রমাণ কি? মিন্‌হাজউদ্দিন বাঙ্গালা জয়ের ষাট বৎসর পরে এই এক উপকথা লিখিয়া গিয়াছেন। আমি যদি আজ বলি যে, কাল রাত্রে আমি ভূত দেখিয়াছি, তোমরা তাহা কেহ বিশ্বাস কর না, আর মিন্‌হাজউদ্দিন তাহা অপেক্ষা অসম্ভব কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তোমরা অম্লানবদনে বিশ্বাস কর।·········তুমি বলিবে যে তোমার ভূতের গল্পে বিশ্বাস করি না, তাহার কারণ এই যে, ভূত প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধ? আরিস্‌টটল হইতে মিল পর্যন্ত সকলে প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে বিশ্বাস করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ভাই বাঙ্গালি! তোমায় জিজ্ঞাসা করি, সতের জন লোকে লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীকে বিজিত করিল, এইটাই কি প্রাকৃতিক নিয়মের অনুমত? যদি তাহা না হয়, তবে হে চাকরীপ্রিয়! তুমি কেন একথায় বিশ্বাস কর?

বাস্তবিক সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখতিয়ার খিলিজি যে বাঙ্গালা জয় করেন নাই, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। সপ্তদশ অশ্বারোহী দূরে থাকুক বখতিয়ার খিলিজি বহুতর সৈন্য লইয়া বাঙ্গালা সম্পূর্ণ জয় করিতে পারে নাই। বখতিয়ার খিলিজির পর সেনবংশীয় রাজগণ পূর্ববাঙ্গালায় বিরাজ করিয়া অর্ধেক বাঙ্গালা শাসন করিয়া আসিলেন, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। উত্তর বাঙ্গালা, দক্ষিণ বাঙ্গালা, কোন অংশই বখতিয়ার খিলিজি জয় করিতে পারে নাই। লক্ষ্মণাবতী নগরী এবং তাহার পরিপার্শ্বস্থ প্রদেশ ভিন্ন বখতিয়ার খিলিজি সৈন্য লইয়াও কিছু জয় করিতে পারে নাই। সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখতিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, একথা যে বাঙ্গালীতে বিশ্বাস করে, সে কুলাঙ্গার।

অন্যত্রও বঙ্কিম এই কথা আলোচনা করিয়াছেন। বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর ভীরুতাপবাদ তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই। ১২৯৯ সনের[১] 'প্রচার' পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় 'বাঙ্গালার কলঙ্ক'-শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি নানা যুক্তি ও প্রমাণ প্রয়োগ বাঙ্গালীর ভীরুতাকলঙ্ক ক্ষালন করিয়াছেন। 'মৃণালিনী'তে তিনি লিখিয়াছেন "বঙ্গভূমির অদৃষ্টলিপি এই যে, এভূমি যুদ্ধে জিত হইবে না; চাতুর্যেই ইহার জয়। চতুর ক্লাইব সাহেব ইহার দ্বিতীয় পরিচয় স্থান।" পরে বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছিলেন, "পলাশীতে প্রকৃত যুদ্ধ হয় নাই। একটা রঙতামাসা হইয়াছিল। আমার কথা বিশ্বাস না হয়···সএর মুতাক্ষরীণ নামক গ্রন্থ পড়িয়া দেখ।"

১। সম্ভবতঃ মুদ্রণপ্রমাদ, ১২৯১ হইবে।—স.

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

## বহরমপুর ও বঙ্গদর্শন

আলিপুরে বঙ্কিমচন্দ্র তিনবার চাকরি করেন, শেষ বারে এই স্থান হইতেই সরকারি কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। মৃণালিনী প্রকাশ ব্যতীত আলিপুরে প্রথমবারে অবস্থিতিকালীন বিশেষ কোনও স্মরণীয় ঘটনা কেহ লিপিবদ্ধ করেন নাই। ১৮৬৯ খৃস্টাব্দের শেষ ভাগে বঙ্কিম বহরমপুরে বদলি হন। এই স্থানে বঙ্কিম চারি বৎসর—১৮৭৪ খৃস্টাব্দের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত ছিলেন, মাঝে (১৮৭০ খৃস্টাব্দে) মাতৃবিয়োগের পর কিছু দিনের জন্য ছুটি লইয়াছিলেন। বহরমপুরে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত অক্ষয়চন্দ্রের পরিচয় হয়, সে বিবরণ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে।[১] বঙ্কিমচন্দ্র এখানে খুবই অহঙ্কারী লোক বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। তাহাও পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে।[২] সম্প্রতি প্রকাশিত ভূদেবচরিতে ঐ বিষয়ে আরও কিছু উল্লিখিত হইয়াছে।[৩] সে যাহা হউক ভূদেববাবু বহরমপুরে থাকা কালে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার বাসায় আসিয়া নানা বিষয়ে—বিশেষতঃ সংস্কৃত-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। সাহিত্য-চর্চার পক্ষে এই সময়ে বহরমপুরে মহাশুভক্ষণ উপস্থিত হইয়াছিল বলিতে হইবে। ডাক্তার রামদাস সেনের বাড়ী বহরমপুরে; তাঁহার বিপুল লাইব্রেরী ব্যবহার করিবার সুযোগ বঙ্কিমের হইয়াছিল। ভূদেব, রামদাস সেন ছাড়া অন্যান্য সাহিত্যিকও অনেকেই এই সময়ে বহরমপুরে ছিলেন—বঙ্কিমের প্রিয় বন্ধু দীনবন্ধু মিত্র ছিলেন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ছিলেন, রামগতি ন্যায়রত্ন, লোহারাম শিরোরত্ন ছিলেন, গঙ্গাচরণ সরকার ছিলেন, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন। গুরুদাসবাবু তখন এখানে ওকালতি ও আইনের অধ্যাপকতা করিতেন। বহরমপুরেই নাকি রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে বঙ্কিমের পরিচয় হয়।[৪] সুপ্রসিদ্ধ রেভারেণ্ড লালবিহারী দেও এই সময়ে বহরমপুরে অধ্যাপকতা করিতেন। কথিত আছে, তিনি শিক্ষিতসমাজে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্মানের প্রতি কিঞ্চিৎ ঈর্ষান্বিত ছিলেন।

বহরমপুরে অবস্থানকালে একবার বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তত্রত্য সেনানিবেশের প্রধানকর্মচারী কর্ণেল ডাফিনের কলহ হয়। শচীশবাবুর বঙ্কিমজীবনীতে উহার সবিস্তর বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। শচীশবাবু বলেন, বঙ্কিমচন্দ্র শিবিকারোহণে

---

১। দ্র. পৃ ৩৬-৩৭।

২। দ্র. পৃ ৩৯-৩০।

৩। 'ভূদেবচরিত' প্রথম ভাগ, পৃ ৩৯৮-৪০০।

৪। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনপঞ্জী—"মানসী", চৈত্র ১৩২১। কিন্তু Literature of Bengal পুস্তকে রমেশচন্দ্র যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে বহরমপুরেই যে উভয়ের প্রথম পরিচয় হয় তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না।

সেনানিবেশের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণের একটা সরু পথ দিয়া যাইতেছিলেন, ঐ সময়ে কর্ণেল ডাফিন ( Duffin ) তাঁহাকে অপমান করেন। সাহেবের বঙ্কিমকে অপমান করার হেতু এই যে, তিনি সেনানিবেশের ভূমিতে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছিলেন ; বঙ্কিমের জবাব এই যে, সেনানিবেশের প্রাঙ্গণের ঐ সরুপথে অনেকেই চলাচল করিত। যাহা হউক বঙ্কিমের আত্মসম্মানবোধ এত তীব্র ছিল যে, তিনি সাহেবকৃত অপমান সহ্য করেন নাই। তিনি ডাফিনের বিরুদ্ধে ফৌজদারীতে নালিশ করেন, শেষে ডাফিন প্রকাশ্যভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করায় মোকদ্দমা আপোষে মিটিয়া যায়। এই ঘটনাসম্পর্কে শ্রীযুক্ত তারকনাথ বিশ্বাস মহাশয় লিখিয়াছেন, "শচীশবাবু কর্ণেল সাহেবের দোষ যেরূপ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, প্রকৃত প্রস্তাবে তত দোষ তাঁহার ছিল না। কেন না এই বিষয় লইয়া সে সময় বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল এবং আমারও কিছু স্মরণ আছে। যাহা স্মরণ আছে তাহা উল্লেখ না করিয়া এই মাত্র বলিতে পারি যে, এই অংশটুকু পরিত্যক্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। শুধু এইটি নয়। একবার ট্রেজারি গার্ডের সহিতও বঙ্কিমবাবুর একটু ধস্তাধস্তি হইয়াছিল"। এই দুইটি ব্যাপার নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে তাঁহাকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলিতে পারিব না। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে তাঁহার স্বভাব উদ্ধত ছিল, রাগের সময় তিনি হিতাহিত বিবেচনাশূন্য হইতেন।[১]" বঙ্কিম হয়ত নির্দোষ ছিলেন না, কিন্তু মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে কর্ণেল সাহেব যখন প্রকাশ্যভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন তখন তাঁহারই যে দোষ অধিক ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। আত্মমর্যাদাবোধ, বঙ্কিমের যোল-আনার উপরেও কিছু অধিক ছিল ইহার দৃষ্টান্তরূপে কর্ণেল ডাফিন-সম্পৃক্ত ঘটনাটি শচীশবাবুর গ্রন্থে দেওয়ার কোনও দোষ হয় নাই। তবে তারকবাবু যে বলিতেছেন শচীশবাবুর প্রদত্ত বিবরণ সত্য নহে সেটা অবশ্য গুরুতর কথা। সত্য কথা কি, তাহা তারকবাবু বা অন্য কেহ প্রকাশ করেন নাই। যে স্থলে একপক্ষে একজন পদস্থ সাহেব, অন্য পক্ষে বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজের শিরোমণি বঙ্কিম, সেরূপ স্থলে আংশিকরূপেও মিথ্যা বিবরণ গ্রন্থভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

বঙ্কিমের আত্মমর্যাদাবোধ সম্বন্ধে তৎকর্তৃক মুর্শিদাবাদের নবাব বাড়ীর নিমন্ত্রণ-প্রত্যাখ্যানের কথাও শচীশবাবু উল্লেখ করিয়াছেন। মুর্শিদাবাদের নবাবেরা উৎসব উপলক্ষে সহরের সকল পদস্থ ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিতেন। সাহেবেরা এক এক ছড়া জরির মালা পাইতেন ; বাঙ্গালীদের মধ্যে নবাবের উকীল গুরুদাসবাবু ও ( তারকবাবুর পিতা ) সব-জজ দিগম্বর বিশ্বাস মহাশয় ব্যতীত অন্য কেহ ওরূপ ভাবে অভ্যর্থিত হইতেন না। এই বৈষম্যহেতু বঙ্কিম নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করায়, তদবধি নিমন্ত্রিত বাঙ্গালীরাও সাহেবদের ন্যায় সম্মানিত হইতে লাগিলেন। দিগম্বরবাবুর মালাপ্রাপ্তির হেতুসম্বন্ধে শচীশবাবু ( সম্ভবতঃ ভ্রমক্রমেই ) একটা মিথ্যা ও আপত্তি-

---

১। Dacca Review—Feb. and March 1917.

জনক উক্তি করিয়াছেন। উহার সংশোধন বাঞ্ছনীয়। কথাটি অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া এস্থলে বিশেষভাবে আলোচিত হইল না।

বঙ্কিমচন্দ্রের বহরমপুর বাস বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই বহরমপুরে অবস্থিতিকালেই বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদকতায় 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হইতে থাকে। বাঙ্গালা ১২৭৯ সনের (১৮৭২ খৃস্টাব্দ) বৈশাখ হইতে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়। শ্রদ্ধাস্পদ অক্ষয়চন্দ্র সরকার এতৎসম্পর্কে লিখিতেছেন—

"কতদিন কত জল্পনা চলিতে লাগিল। শেষে কয়জন লেখকের নাম দিয়া ভবানীপুরের খ্রীস্টান ব্রজমাধব বসু প্রকাশকরূপে, বঙ্গদর্শনের বিজ্ঞাপন প্রচারিত করিলেন। লেখকগণের নাম বাহির হইল—

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
লেখক—শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র।
" হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
" জগদীশনাথ রায়।
" তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।
" কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য।
" রামদাস সেন।
এবং " অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

আর সকলে নামজাদা, আমিই কেবল নামহীন, অথচ আমার নাম ছাপা হইল। ইংরেজী, সংস্কৃত, বাঙ্গালা—নানা পুস্তক ঘাঁটিয়া আমি 'উদ্দীপনা' প্রবন্ধ প্রণয়ন করিলাম। বঙ্কিমবাবু বড় খুসি।"[১]

বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিপুষ্টি বিষয়ে বঙ্গদর্শনের দৃষ্টান্ত ও প্রভাব কিরূপ কার্য্য করিয়াছে তাহা এখানে স্পষ্টরূপে নির্দেশ করা আবশ্যক। বঙ্গদর্শন যে সে সময়কার সকল পত্রিকা হইতে সুলিখিত ও সুসম্পাদিত ছিল তাহা বোধ হয় না বলিলেও চলে না। বঙ্গদর্শনেরই আদর্শে উত্তরকালে বান্ধব, আর্যদর্শন, প্রবাহ, নব্যভারত, ভারতী, সাধনা, সাহিত্য, প্রদীপ, জন্মভূমি, প্রবাসী, মানসী, প্রতিভা, ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন, ভারতবর্ষ, নারায়ণ, মালঞ্চ এবং আরও কত উৎকৃষ্ট মাসিক পত্র প্রকাশিত হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের অসাধারণ উন্নতি সাধন করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কয়েকখানি ইতিমধ্যে ভৌতিক লীলা সংবরণ করিয়া অক্ষয় সারস্বত স্বর্গে—মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির শ্রেষ্ঠ সেবকগণের লভ্য অমরধামে—বঙ্গদর্শনের সাযুজ্য লাভ করিয়াছে; এবং কয়েকখানি নানা পরিবর্তন, উত্থান, পতনের মধ্য দিয়া ন্যূনাধিক উজ্জ্বল ভাবে বঙ্গ সাহিত্যের ও বঙ্গসমাজের যথেষ্ট সেবা করিয়া আসিতেছে। বস্তুতঃ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাসে বঙ্গদর্শনের স্থান অত্যন্ত উচ্চ, তাহা

১। বঙ্গবাসী আফিস হইতে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থের অন্তর্গত "পিতাপুত্র" প্রবন্ধ।

কে না স্বীকার করিবে ? কিন্তু অতীতের প্রতি অন্ধ অনুরাগবশতঃ আমরা যেন এমন সিদ্ধান্ত না করি যে, বঙ্গদর্শনের মত সুলিখিত বা সুসম্পাদিত, বা বিচিত্র ও গভীর-চিন্তাপূর্ণ মাসিকপত্র আর হয় নাই। কথাটা বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দিবার হেতু এই যে, এখনও অনেকের মনে সেইরূপ ধারণাই বদ্ধমূল বলিয়া মনে হয়। অন্যে পরে কা কথা ? রায় সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত পর্যন্ত বলিয়াছেন, 'বঙ্গদর্শন জাতীয়-সাহিত্যের একমাত্র কোহিনুর'। বঙ্গদর্শন যে বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের প্রথম পত্র নহে—তাহার পূর্বেও যে তত্ত্ববোধিনী প্রভৃতি বাঙ্গালা সাহিত্যের ও বাঙ্গালা সমাজের নিতান্ত তুচ্ছ সেবা ও নগণ্য উপকার করে নাই—তাহাও যেন রায় সাহেব বিস্মৃত হইয়া লিখিয়াছেন, "বঙ্গদর্শনের সৃষ্টি হইতেই বাঙ্গালী ভাবিতে শিখিল, তাহার চক্ষের ঠুলি খুলিল" ইত্যাদি। অনুরাগ ভাল, অন্ধতা ভাল নহে। আমরা আমাদের দেশ ও সমাজের গৌরবময় অতীতের প্রতি চিরদিনই ভক্তিযুক্ত ; আমরা ইহাও বিশ্বাস করি যে, অতীতের প্রতি সমুচিত অনুরাগ না থাকিলে বর্তমানকে ভাল করিয়া জানা যায় না এবং বর্তমানকে যথার্থ ভাবে জানিতে ও বুঝিতে না পারিলে ভবিষ্যৎ বড় অনিশ্চিত, বড় বিপৎসঙ্কুল থাকিয়া যায়। বঙ্গদর্শন বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিপুষ্টিবিষয়ে যে সাহায্য করিয়াছে তাহার তুলনা নাই, ইহা আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, কিন্তু ইহা স্বীকার করি না যে, বঙ্গদর্শন হইতেই বাঙ্গালী ভাবিতে শিখিয়াছে। কেন করি না তাহা পরে সাময়িক পত্রিকার ইতিহাস আলোচনার সময় বুঝা যাইবে। বঙ্গদর্শন বাঙ্গালীকে প্রথম ভাবিতে শিখায় নাই, তবে বঙ্গদর্শন যাহা শিখাইয়াছিল তাহা পূর্বতন কোনও পত্রিকা শিখায় নাই। বঙ্গদর্শন দেখাইয়াছিল, কাব্যকথা বল, বিজ্ঞান বল, দর্শন বল, ইতিহাস বল, চটুল রসিকতা বল, গুরু-গম্ভীর প্রত্নতত্ত্ব বল—সকল বিষয়ই বাঙ্গালায় রচনা করা যায়, এবং লেখক ক্ষমতাশালী হইলে তাহা মনোজ্ঞ ও শিক্ষাপ্রদ উভয়ই হইতে পারে। বঙ্গদর্শন বুঝাইয়াছিল, বাঙ্গালা যে তৎকাল পর্যন্ত শিক্ষিত বাঙ্গালীর ভাবপ্রকাশের বাহন হয় নাই তাহার প্রকৃত কারণ বাঙ্গালা ভাষার অপ্রতিবিধেয় দারিদ্র্য নহে, শিক্ষিত সমাজের রুচিবিকার এবং লেখকগণের অরসজ্ঞতা ও ক্ষমতাহীনতা। দুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুণ্ডলায় আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যের নবোদ্ভিন্ন যৌবন-প্রতিমা দেখিয়াছি ; বঙ্গদর্শন সেই প্রতিমার সর্বাঙ্গীণ প্রসাধনের সূচনা করিয়াছিল।

বঙ্গদর্শন যে 'বাঙ্গালা সাহিত্যের একমাত্র কোহিনুর' নহে, ইহা প্রতিপাদনার্থ প্রমাণ-প্রয়োগ নিতান্তই অনাবশ্যক। তবে বঙ্গদর্শন যেরূপ সুবিধা ও অসুবিধা—অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা সাধন করিয়াছিল, যেরূপ ভাবে আপনার গন্তব্য পথের জঙ্গল আপনি কাটিয়া লইয়া সগৌরবে সাহিত্যের নব নব ক্ষেত্রে মাতৃভাষার বিজয়-পতাকা প্রথম প্রোথিত করিয়াছিল, তাহার উদাহরণরূপে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য। একদিন শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র

সমাজপতি মহাশয়ের সহিত কথা-প্রসঙ্গে বঙ্কিম বলিয়াছিলেন, "এখন যে সব কাগজ বাহির হইতেছে, বঙ্গদর্শনের যে সুবিধা ছিল, তাহাদের সে সুবিধা নাই। তখন বাঙ্গালায় অনেক জিনিষ লেখা হয় নাই, প্রবন্ধ লেখা সহজ ছিল। যে বিষয়ে লোকে কিছু জানে না, সে বিষয় যৎসামান্ত লিখিলেই চলিত, লোকে তাহাই পড়িত, সেইটুকুই শিখিত। এখন আর তাহা চলে না। এই তোমার 'সাহিত্যের' কথাই ধর। উমেশ বটব্যালের মত original research করিয়া 'বঙ্গদর্শনে' কেহ প্রবন্ধ লিখেন নাই। বটব্যালের বৈদিক প্রবন্ধগুলি, নগেন গুপ্তের 'মৃত্যুর পরে'—উচু দরের লেখা। বঙ্গদর্শনে এরকম প্রবন্ধ ছাপা হয় নাই।"[১] বঙ্কিমচন্দ্র যাহাকে 'সুবিধা' বলিয়াছেন, আমরা তাহাকে একটা গুরুতর অসুবিধাও বলি; বঙ্কিম কতকটা আত্মশ্লাঘা পরিহার করিবার জন্যই ঐরূপ বলিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। বঙ্গদর্শনের সম্পাদকরূপে তাঁহাকে যেমন স্বয়ং নানা বিষয়ে লেখা তৈয়ারি করিতে হইয়াছে, তেমনি লেখকও তৈয়ারি করিতে হইয়াছে। ইহা যে বড় সহজ ব্যাপার তাহা নহে। পথ প্রস্তুত হইলে তাহাতে চলা সহজ, পদে পদে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাধা প্রতিহত করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে বৃহৎ ব্যাপার সাধন করিবার শক্তি কাজেই কম হয়। বঙ্গদর্শনকে অনেক বিষয়েই পথ প্রস্তুত করিয়া লইতে হইয়াছিল—এবং ঐরূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু বাধা প্রতিহত করিয়া অন্যের পক্ষে স্বল্প কিন্তু কঠিনতর বাধাসমূহ অতিক্রম করিবার সুবিধা করিয়া দিতে হইয়াছিল।

বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের ইতিহাস অতি বিচিত্র। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব' হইতে জানা যায় ১৮১৬ খৃস্টাব্দে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য নামক কোনও এক ব্যক্তি 'বেঙ্গল গেজেট' এই ইংরাজী নাম দিয়া একখানি বাঙ্গালা সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন, উহাতে বিদ্যাসুন্দর, বেতালপচিশী প্রভৃতি কাব্য প্রতিকৃতি সহ মুদ্রিত হইত।[২] এতদধিক আর কিছুই উক্ত পত্রিকাখানি সম্বন্ধে জানা যায় না। ইহার দুই বৎসর পরে ১৮১৮ খৃস্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে মিশনারিগণের উদ্যোগে 'দিগ্‌দর্শন' নামক মাসিক পত্র বাহির হয়। বেঙ্গল গেজেট মাসিক কি সপ্তাহিক পত্র ছিল জানা যায় না। সুতরাং দিগ্‌দর্শনকে বাঙ্গালার প্রথম মাসিক পত্র বলিলে বিশেষ কোনও দোষ হইবে না। বাঙ্গালা অভিধানের ন্যায় প্রথম বাঙ্গালা মাসিক পত্রও খৃস্টান মিশনারীগণের দান। 'দিগ্‌দর্শন' নামে সংবাদপত্র ছিল, কার্যতঃ ইহাতে নানাবিষয়ক প্রবন্ধ থাকিত। 'দিগ্‌দর্শনের' সময় বাঙ্গালা সাহিত্যের নিতান্ত

---

১। নারায়ণ বৈশাখ ১৩২২। [বঙ্কিমপ্রসঙ্গে সঙ্কলিত—স.]

২। বস্তুত গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের বাঙ্গাল গেজেটি ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে যে মাসে সমাচার দর্পণ পত্রিকার (২৩শে মে) দু-চারদিন আগে অথবা পরে প্রকাশিত হইয়াছিল। গঙ্গাকিশোর শ্রীরামপুর মিশনের কম্পোজিটর ছিলেন, পরে কর্মত্যাগ করেন।—স.

অপোগণ্ডাবস্থা; তাহাতে আবার অধিকাংশ প্রবন্ধের লেখকগণ বিদেশী মিশনারী ছিলেন; সুতরাং ভাষার হিসাবে উহা যে কি অপূর্ব বস্তু ছিল তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। তথাপি ইহা বলা যাইতে পারে ইহার তিন বৎসর পরে প্রকাশিত রাজা রামমোহনের 'ব্রাহ্মণসেবধি' মাসিক পত্র অপেক্ষা ইহার ভাষা মোটের উপর প্রাঞ্জল। রামমোহনও 'দিগ্‌দর্শনে' কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। দিগ্‌দর্শনের ৫৪ বৎসর পরে বঙ্গদর্শনের আবির্ভাব হয়। দুইখানি পত্রিকায় নামের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিবার যোগ্য। কিন্তু এই ৫৪ বৎসরে বাঙ্গালা সাহিত্য যেরূপ অভাবনীয় উন্নতিসাধন করিয়াছিল তাহা যথার্থই বিস্ময়কর। দিগ্‌দর্শন তিনবৎসর কাল স্থায়ী হয়। ব্রাহ্মণসেবধির জীবনকাল মাত্র এক বৎসর। ইহার পর নানা নামে বহু বাঙ্গালা সাপ্তাহিক, দৈনিক, বার্ষিক, ও মাসিক 'সংবাদপত্র' বাহির হইয়াছিল। এবং প্রায় সবগুলিতেই যৎসামান্য সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ গদ্য পদ্য প্রবন্ধ বাহির হইত। ১৬৯১ খৃস্টাব্দে প্রচারিত The Gentleman's Journal নামক মাসিকপত্রখানিতেই নাকি বিলাতের আধুনিক মাসিক পত্রসমূহের বীজ উপ্ত হয়। ঐ পত্রিকাখানিতেও আমাদের বাঙ্গালা দেশের পূর্বোক্ত প্রাচীন পত্রগুলির ন্যায় সংবাদ ও গদ্য পদ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। ১৮১৭ খৃস্টাব্দে Blackwood's Edinburgh Magazine প্রকাশিত হয়। উহাই বঙ্গদর্শনের আদর্শ ছিল বলিয়া বোধ হয়। অন্ততঃ উভয় পত্রিকার সাদৃশ্য বড় ঘনিষ্ঠ। Scott, Lockhart, Hogg, Maginn Syme, এবং John Wilson প্রভৃতি তদানীন্তন প্রধান লেখকগণ Blackwood's Edinburgh Magazine পত্রিকায় লিখিতেন। বঙ্গদর্শনের কৃতিত্বও উহাতে সাময়িক কয়েকজন প্রধানতম লেখকের রচনার একত্র সম্মিলন সাধনে। বাঙ্গালা সাময়িকপত্রের সবিস্তর ইতিহাস বর্ণন এস্থলে সম্ভব নহে। কিন্তু এতৎসম্পর্কে কয়েকখানি পত্রিকার নাম না করিলে কর্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। প্রথম গুপ্ত কবির 'সংবাদ প্রভাকর'; ইহাতে অক্ষয়কুমার দত্ত, কবি রঙ্গলাল, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, মনমোহন বসু প্রভৃতি সাহিত্যমহারথগণের সকলেরই একরূপ হাতে খড়ি হয়। প্রভাকর প্রথমে সাপ্তাহিক ছিল, পরে দৈনিক হয়, আবার উহার একটা মাসিক সংস্করণও বাহির হইয়াছিল। ১৮৩১ খৃস্টাব্দে প্রভাকর প্রবর্তিত হয়। ইহার পর অক্ষয়কুমার দত্ত ১৮৪২ খৃস্টাব্দে প্রভাকরের অপর একজন লেখক প্রসন্নকুমার ঘোষের সহিত মিলিত হইয়া 'বিদ্যা-দর্শন' নামে এক মাসিক পত্র বাহির করেন। বিদ্যাদর্শনেও উত্তরকালীন বঙ্গদর্শনের ন্যায় দিগ্‌দর্শনের নামের গন্ধ আছে। বিদ্যাদর্শন মাত্র এক বৎসর চলিয়াছিল, ইহার পরে ১৮৪৩ খৃস্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে তত্ত্ববোধিনী সভা ও তদানীন্তন ব্রাহ্ম-সমাজের মুখপত্র রূপে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। ঐ পত্রিকাখানি অদ্যাপি জীবিত আছে। বিদ্যাদর্শন ও তত্ত্ববোধিনী বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যে নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়াছিল। উভয়ের রচনা গম্ভীর ও

তেজঃপূর্ণ ছিল। তত্ত্ববোধিনীর পর পুণ্যস্মৃতি বিদ্যাসাগর মহাশয় ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'সর্বশুভকরী' নাম্নী মহিলামনোরঞ্জিনী মাসিকা পত্রিকা ও রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থসংগ্রহ' উল্লেখযোগ্য। বিবিধার্থসংগ্রহের বিষয়বৈচিত্র্য তত্ত্ববোধিনী অপেক্ষা অধিক, কিন্তু ভাষা নীরস ও প্রাণহীন ছিল। এই সময়ের কিছু পরেই মফঃস্বলেও সাময়িক পত্রিকা প্রচার আরম্ভ হইয়াছিল। ঢাকা নগরী হইতে ক্রমে ক্রমে তিনখানি পত্রিকা 'মনোরঞ্জিকা' (১৮৫৯) 'কবিতাকুসুমাবলী' (১৮৬১) 'চিত্তরঞ্জিকা' (১৮৬২) প্রকাশিত হয়। প্রথমখানির সম্পাদক ছিলেন কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, দ্বিতীয় ও সম্ভবতঃ তৃতীয় খানিরও সম্পাদক ছিলেন কবি হরিশ্চন্দ্র মিত্র। বাঙ্গালা সমাজের ন্যায় বাঙ্গালা সাহিত্যেও শৈশব-মৃত্যুর উৎপাত বড় অধিক। উক্ত প্রত্যেকখানি পত্রই বড় স্বল্পজীবী হইয়াছিল। ১৮৬৩ খৃস্টাব্দে 'বামাবোধিনী' ও তৎপরবৎসর 'ধর্মতত্ত্ব' প্রচারিত হয়। বামাবোধিনী অদ্যাপি জীবিত আছে। ধর্মতত্ত্ব এখন বড় একটা দেখিতে পাই না, শুনিতে পাই উহাও নাকি শকুন্তলার কঞ্চুকীর মত 'প্রস্থানবিক্লবগতি' হইলেও আসর ছাড়ে নাই। ধর্মতত্ত্ব কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বাধীন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র ছিল। ইহা প্রথমে মাসিক পত্রিকা ছিল, পরে পাক্ষিক হয়।

দিগ্‌দর্শন হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গদর্শনের পূর্ব পর্যন্ত প্রকাশিত বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের সংখ্যা বড় কম নহে, কতকগুলি কেবল দলাদলির পুষ্টি ও গালাগালিই জীবনের প্রধান ব্রত করিয়া লইয়াছিল। অনেকগুলি—বিশেষতঃ তত্ত্ববোধিনী—দেশীয় সমাজকে সুনীতি ও সুরুচি শিক্ষা দেওয়া ও মিশনারিগণের আক্রমণ হইতে হিন্দু-সমাজকে রক্ষা করা প্রধান কর্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছিল। বস্তুতঃ তত্ত্ববোধিনী বঙ্গদর্শনের জন্য কার্যক্ষেত্র আংশিকরূপে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। তত্ত্ববোধিনীর তত্ত্বকথা কতকটা এক ঘেয়ে ছিল। কিন্তু তাহাতে জানিবার, ভাবিবার ও শিখিবার বিষয় যথেষ্ট থাকিত। ভাবুক পাঠকেরা তত্ত্ববোধিনীকে আদর করিতেন, তত্ত্ববোধিনী দ্বারা সমাজের যে উপকার হইতেছিল তাহা স্মরণ করিয়া তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। তদানীন্তন বাঙ্গালা পাঠকগণের মনের উপর ইহার প্রভাবও কম বিস্তৃত হয় নাই। কথিত আছে, তত্ত্ববোধিনীতে ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা-বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে বহু ব্যক্তি নিজ নিজ বাড়ীতে ব্যায়ামশালা নির্মাণ করিয়াছিলেন; আমিষ অপেক্ষা নিরামিষ ভোজনের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে বহু হিন্দু ও ব্রাহ্ম যুবক মৎস্য-মাংস বর্জন করিয়াছিলেন; মদ্য পানের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে কেহ কেহ নাকি মদ্যও ত্যাগ করিয়াছিলেন[১]। তারপর একদিন যখন তত্ত্ববোধিনীর তৈয়ারি আসরে

১। বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকা সমূহের সবিস্তার বিবরণ জানিতে হইলে কেদারনাথ মজুমদার প্রণীত 'বাঙ্গালাসাময়িক সাহিত্য' (প্রথম খণ্ড) দ্রষ্টব্য। উদ্ধৃত বিবরণ সংকলনে ঐ গ্রন্থ হইতে বিপুল সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। [ পরবর্তী কালে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালা সাময়িক পত্র ১৩৫৪ ইহার পূর্ণতর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।—স. ]

বঙ্গদর্শন বিচিত্র সুরে ও বিচিত্র তালে বাঁধা সম্পূর্ণ নূতন ধরনের সঙ্গীত কণ্ঠে করিয়া আবির্ভূত হইল, তখন সামাজিকগণ সমস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া তাহাকে অভ্যর্থিত করিলেন ; তাঁহারা স্পষ্ট উপলব্ধি করিলেন যে সাময়িক সাহিত্যে এতদিনে অসামান্য প্রতিভার জগন্মোহিনী আলোকচ্ছটা পতিত হইয়াছে। যাঁহারা বিলাতী magazine-এর বিষয়-বৈচিত্র্য ও রচনাকৌশলের অনুরাগী ছিলেন, তাঁহারা তদনুরূপ বস্তু বাঙ্গালা ভাষায় পাইয়া তাহার আদর করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথম সংখ্যা হইতেই বঙ্গদর্শনের প্রতিষ্ঠা দেশে বদ্ধমূল হইল—তারপর যে চারি বৎসর বঙ্কিম উহার সম্পাদকতা করেন ততদিন ঐ প্রতিষ্ঠার ক্রমশঃ বৃদ্ধিই হইয়াছে। শচীশবাবুর গ্রন্থে দেখা যায় 'বঙ্গদর্শন' প্রথম সংখ্যা একসহস্র মাত্র মুদ্রিত হইয়াছিল। চারিমাস মধ্যেই উহার গ্রাহক-সংখ্যা দেড়গুণ হয়, পরে দ্বিগুণ হইয়াছিল। বঙ্কিম যখন বঙ্গদর্শন উঠাইয়া দেন তখন উহার গ্রাহক-সংখ্যা নাকি ষোলশত। সে যাহা হউক, এখন যে বাঙ্গালা দেশে শিক্ষার এত বিস্তার ও বাঙ্গালা সাহিত্যের, বিশেষতঃ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের, প্রতি বাঙ্গালীর এত আদর হইয়াছে শুনিতে পাই, এখনও কয়খানি মাসিকপত্রের সংখ্যা সেকালের বঙ্গদর্শনের গ্রাহকসংখ্যা হইতে অধিক ? চারিবৎসর পরে বঙ্কিম যখন ঐ পত্রখানি উঠাইয়া দেন, তখন বাঙ্গালা পাঠকসমাজে যে বিষাদ ও পরিতাপ দৃষ্ট হইয়াছিল তাহার তুলনা কোনও দেশের সাহিত্যের ইতিহাসে মিলে না। কবি নবীনচন্দ্র লিখিয়াছেন, "বঙ্গদর্শনের অদর্শনের সহিত বঙ্গ সাহিত্যে এবং আমাদের হৃদয়ে যেন একটা নিরানন্দ ও নিরুৎসাহ সঞ্চারিত হইয়াছিল।"[১] প্রতিযোগী মাসিক পত্রগুলি পর্যন্ত 'বঙ্গদর্শনের বিদায়ে' আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিল। আর্যদর্শন-সম্পাদক লিখিয়াছিলেন "জ্যেষ্ঠ সহোদরের মৃত্যু সংবাদে যে যাতনা, এই সংবাদে আজ আমাদের সেই যাতনা উপস্থিত হইল।······আজ চারিবৎসর বঙ্গদর্শন বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজের এক অপূর্ব সৃষ্টি বলিয়া পরিকীর্তিত হইতেছে······আজি চারিবৎসর বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজে এক নবজীবন সংক্রামিত হইয়াছে······" ইত্যাদি[২]। 'বান্ধব' সম্পাদক স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ অন্তর্দৃষ্টিসহকারে লিখিয়াছিলেন, "আমরা আশা করি বঙ্গদর্শন শীঘ্রই আবার অন্য কোনও মূর্তিতে পুনর্জীবিত হইবে।······বাঙ্গালায় আজিও সাহিত্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, আজিও শিক্ষাভিমানী বাঙ্গালীর সহিত বাঙ্গালার দৃঢ় সম্বন্ধ জন্মে নাই, আজি পর্যন্তও বাঙ্গালার অভাব ও প্রভাবের সীমারেখা নির্দিষ্ট হয় নাই। যে পর্যন্ত না এ সমস্ত গুরুতর কার্য সুসম্পন্ন হয়, সে পর্যন্ত আমরা বঙ্গদর্শনের মত প্রতিভান্বিত সহায়কে বিদায় দিতে পারিব না।"[৩]

বাঙ্গালা সাহিত্যের এমন গৌরবের বস্তু, বাঙ্গালীর এমন আদরের ধন বঙ্গদর্শনকে

---

১। 'আমার জীবন' ২য় ভাগ।
২। 'আর্যদর্শন' শ্রাবণ, ১২৮৩।
৩। 'বান্ধব' আষাঢ়, ১২৮৩।

বঙ্কিমচন্দ্র অকালে কেন উঠাইয়া দিলেন তৎসম্বন্ধে অনেক জল্পনা হইয়াছে। চতুর্থ বৎসরের শেষ সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনের বিদায়' নামক প্রবন্ধে লিখেন—

"চারি বৎসর গত হইল বঙ্গদর্শন প্রকাশ আরম্ভ হয়। যখন ইহাতে আমি প্রবৃত্ত হই, তখন আমার কতকগুলি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। পত্রসূচনায়[১] কতকগুলি ব্যক্ত করিয়াছিলাম; কতকগুলি অব্যক্ত ছিল, এক্ষণে তাহার অধিকাংশই সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে আর বঙ্গদর্শন রাখিবার প্রয়োজন নাই।

যখন বঙ্গদর্শন প্রকাশারম্ভ হয়, তখন সাধারণের পাঠযোগ্য অথচ উত্তম সাময়িক পত্রের অভাব ছিল। এক্ষণে তাদৃশ সাময়িক পত্রের অভাব নাই। যে অভাব পূর্ণ করিবার ভার বঙ্গদর্শন গ্রহণ করিয়াছিল, এক্ষণে বান্ধব, আর্য-দর্শন প্রভৃতির দ্বারা তাহা পূরিত হইবে। অতএব বঙ্গদর্শন রাখিবার আর প্রয়োজন নাই। যদি কেহ বঙ্গদর্শনের এমত বন্ধু থাকেন যে, বঙ্গদর্শনের লোপ তাঁহার কষ্টদায়ক হইবে, তাঁহার প্রতি আমার এই নিবেদন যে যখন আমি এই বঙ্গর্শনের ভার গ্রহণ করি, তখন এমত সঙ্কল্প করি নাই যে যত দিন বাঁচিব এই বঙ্গদর্শনে আবদ্ধ থাকিব।············ইহ সংসারে এমন অনেক গুরুতর ব্যাপার আছে বটে যে, তাহাতে এই জীবন মৃত্যুকাল পর্যন্ত নিবদ্ধ রাখাই উচিত। কিন্তু এই ক্ষুদ্র বঙ্গদর্শন তাদৃশ গুরুতর ব্যাপার নহে।

বঙ্গদর্শন আপাততঃ রহিত করিলাম বটে, কিন্তু কখনও যে এই পত্র পুনর্জীবিত হইবে না এমত অঙ্গীকার করিতেছি না। প্রয়োজন দেখিলে স্বতঃ বা অন্যতঃ ইহা পুনর্জীবিত করিব ইচ্ছা রহিল।"

'বঙ্গদর্শনের বিদায়' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন উঠাইয়া দিবার স্পষ্ট কোনও হেতু দেন নাই। পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এতৎসম্পর্কে বলিয়াছেন, "(বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন) কেন ছাড়িয়া দেন, অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কোন খোলসা জবাব পাই নাই। টাকার অভাবে যে উহা ছাড়েন নাই, তা নিশ্চয়·····তিনি ছাপাখানার কাজ বেশ বুঝিতেন। তবে সম্পাদকতা ছাড়িলেন কেন, ঠিক বুঝা যায় না। বোধ হয় তিনি ঝঞ্ঝাট ভালবাসিতেন না, এবং সঞ্জীববাবুর একটা উপায় হয়, সেটাও তাঁহার ইচ্ছা ছিল। সঞ্জীববাবু খুব রসিক লোক ছিলেন, একদিন একজন বড় সাহেবের সহিত রসিকতা করিতে গিয়া তাঁহার ডেপুটিগিরিটি যায়। তখন তিনি সবরেজিস্ট্রার থাকিলেন, কিন্তু এখানেও তিনি বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। তাই বঙ্গদর্শন এক বৎসর বন্ধ থাকার পর ১২৮৪ সনে সঞ্জীববাবুর সম্পাদকতায় আবার বাহির হয়। কিন্তু বঙ্কিমবাবু কার্যতঃ বঙ্গদর্শনের সর্বময় কর্তা ছিলেন, তিনি নিজে ত লিখিতেনই, অন্য লোকের লেখা পছন্দ করিয়া দিতেন, অনেককে বঙ্গদর্শনে লিখিবার জন্য লওয়াইতেন,

---

১। 'বঙ্গদর্শনের' সূচনা প্রবন্ধ 'বিবিধ প্রবন্ধ' ২য় ভাগে মুদ্রিত হইয়াছে।

অনেকের লেখা সংশোধন করিয়া দিতেন। পূর্বেও তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে যেমন চলিত বঙ্গদর্শন এখনও তেমনি চলিতে লাগিল।”[১]

শাস্ত্রী মহাশয় যে লিখিয়াছেন, ‘সঞ্জীববাবুর একটা উপায়’ করা বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন উঠাইয়া দিবার অন্যতর উদ্দেশ্য হইতে পারে, তাহা সমীচীন মনে হয় না। তাহা হইলে বঙ্গদর্শন পুনঃ প্রচারিত হইবার পূর্বে এক বৎসর বন্ধ থাকিত না।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশবাবু ‘বঙ্কিমজীবনী’র একস্থলে লিখিয়াছেন “১২৮৩ সালের প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্র কোনও কারণ বশতঃ বঙ্গদর্শন উঠাইয়া দিয়া সপরিবারে চুঁচুড়ায় চলিয়া গেলেন।”[২] অন্যত্র লিখিয়াছেন, “বঙ্গদর্শন উঠিয়া যাইবার দুইটি কারণ দেখা যায়। একটি আত্মীয়-বিরোধ। দ্বিতীয়টি প্রবন্ধলেখকদের দক্ষিণার দাবী। যাঁহারা প্রবন্ধ লিখিতেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রবন্ধের মূল্যস্বরূপ অর্থ প্রার্থনা করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধ কিনিতে অসম্মত হইয়া কাগজ তুলিয়া দিলেন।”[৩]

শচীশবাবু বঙ্কিমবাবুর স্বপরিবারের লোক; বঙ্গদর্শন উঠিয়া যাইবার সময় তিনি নিতান্ত শিশু হইলেও এসম্বন্ধে তাঁহার প্রকাশিত মত উপেক্ষা করা যায় না; অথচ স্বীকার করিতেই হইবে সঞ্জীববাবুর সম্পাদকতাকালে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের জন্য যেরূপ খাটিতেন বলিয়া শাস্ত্রী মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন, উহার সহিত আত্মীয়বিরোধ হেতুটি খুব সুসঙ্গত হয় না। আর এই ‘আত্মীয়বিরোধ’টি কখন ঘটিয়াছিল? শাস্ত্রী মহাশয়ের বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে, উহা (অন্ততঃ তীব্র-ভাবে) বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় পর্যায় বাহির হইবার কিঞ্চিৎ পরে ঘটিয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয় সঞ্জীববাবু-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন বাহির হইবার নাকি প্রায় এক বৎসর পরে লক্ষ্ণৌ যান। যাইবার দিন বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত দেখা করিতে গিয়া একখানি ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ উপহার পান। বৎসর খানেক পরে—

> “লক্ষ্ণৌ হইতে ফিরিয়া আমি কাঁটালপাড়ায় গিয়া দেখি বঙ্কিমবাবু সেখানে নাই। শুনিলাম তিনি চুঁচুড়ায় বাসা করিয়াছেন। শিবের মন্দিরের পাশে সে ঘরগুলিতে চাবীবন্ধ। বাগানটি গতপ্রায়। সেইদিনই বৈকালে চুঁচুড়ায় গেলাম ......... এক বৎসরের পর হঠাৎ আমাকে দেখিয়া খুব খুসী হইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘আপনি চুঁচুড়ায় বাস করিয়াছেন, ইহার ভিতরে কি কিছু কৃষ্ণকান্তী আছে?’ তিনি বলিলেন, ‘তুমি ঠিক বুঝিয়াছ, আমি বড় খুসী হইলাম, তোমার কাছে আমার বেশী কৈফিয়ৎ দিতে হইল না’।”[৪]

---

১। নারায়ণ, বৈশাখ ১৩২২। [বঙ্কিম-প্রসঙ্গ. পৃ ১৫৮-১৫৯,—স.]

২। ‘বঙ্কিমজীবনী’, পৃ ১৮৯।

৩। ঐ পৃ ৩৭২।

৪। নারায়ণ, বৈশাখ ১৩২২। শুনা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা বঙ্কিমকে বসত বাড়ীর অংশ দেন নাই।

অবশ্য ইহা খুবই সম্ভব যে, আত্মীয়বিরোধ তীব্রভাবে প্রকটিত হইবার পূর্বে ভিতরে ভিতরে ধূমায়মান বহ্নির ন্যায় জ্বলিতেছিল, এবং প্রথমে ঐ বিরোধে সঞ্জীববাবুর সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের তেমন মনোমালিন্য জন্মে নাই।[১] বঙ্গদর্শন উঠাইয়া দিয়াই যে বঙ্কিমচন্দ্র সপরিবারে চুঁচুড়ার বাসায় চলিয়া যান নাই, ইহার অন্য প্রমাণ কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবন' গ্রন্থেও পাওয়া যায়। কবিবর যখন বঙ্কিম-চন্দ্রের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করেন, তখন 'বঙ্গদর্শন' উঠিয়া গিয়াছে, দ্বিতীয় পর্যায় আরব্ধ হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র তখনও কাঁটালপাড়ায়। ঐখানেই নবীনচন্দ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।[২] নবীনচন্দ্রের প্রদত্ত বিবরণে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের কথায়ই বঙ্গদর্শন উঠাইয়া দিবার কয়েকটি হেতু পাওয়া যায়। নবীনচন্দ্র লিখিতেছেন—

"পরদিন ( দ্বিতীয় দিন ) প্রাতে 'বঙ্গদর্শন' পুনঃ প্রচারের প্রস্তাব উত্থাপন করিলাম। 'বঙ্গদর্শন' অল্পদিন পূর্বে বঙ্কিমবাবু, অক্ষয়বাবুর ভাষায়, 'গলা টিপিয়া মারিয়াছিলেন।' উহা পুনঃ প্রচারিত করিবার চেষ্টা করা আমার এইবার বিদায় লওয়ার আর একটা উদ্দেশ্য ছিল। কারণ 'বঙ্গদর্শনের' অদর্শনের সহিত বঙ্গসাহিত্য এবং আমাদের হৃদয়ে যেন একটা নিরানন্দ ও নিরুৎসাহ সঞ্চারিত হইয়াছিল। অতএব চুঁচুড়ায় অক্ষয়বাবুর সঙ্গে এ সম্বন্ধে আমার অনেক কথা হইয়াছিল। পরদিন প্রাতে আমি বঙ্গদর্শনের পুনঃ প্রচারের প্রস্তাব উত্থাপন করিলাম। বঙ্কিমবাবু বলিলেন—'বটে। বঙ্গদর্শন বন্ধ করাটা তোমাদের বড়ই প্রাণে লাগিয়াছে। লাগিবারই কথা। কিন্তু কি করিব? আমি একে ত দাসত্বভারে পীড়িত, তাহার উপর স্বাস্থ্যের ও পরিশ্রমশক্তিরও সীমা আছে।[৩] ইদানীং 'বঙ্গদর্শনের' প্রায় তিন ভাগ লেখার ভার আমার উপর পড়িয়াছিল।[৪] কাজেই আমি আর পারিলাম না।

১। সঞ্জীববাবু নাকি বঙ্কিমকে নিজ অংশের কিয়দংশ দান করেন। বঙ্কিমবাবু সঞ্জীববাবুকে বহুকাল প্রতিমাসে আর্থিক সাহায্য করিয়াছিলেন।

২। 'আমার জীবন', ২য় ভাগ। বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত নবীনচন্দ্রের প্রথম সাক্ষাতের বিবরণ পূর্বে ( পৃ ৪০-৪৩ ) কিয়ৎপরিমাণে প্রদত্ত হইয়াছে।

৩। পূজ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয় যে বলিয়াছেন 'বঙ্কিমবাবু বোধ হয় ঝঞ্ঝাট ভালবাসিতেন না', সে কথার সহিত উদ্ধৃত অংশের সমন্বয় হয়। কিন্তু কার্যতঃ ( সম্ভবতঃ বঙ্গদর্শনের নামের গৌরবরক্ষার্থ ) তিনি সে ঝঞ্ঝাট এড়াইতে পারেন নাই।

৪। কেন? শচীশবাবু যে বলিয়াছেন প্রবন্ধলেখকগণ এই সময় প্রবন্ধের মূল্য চাহিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই জন্য কি? কথাটা যদি সত্য হয় তবে প্রবন্ধের মূল্য দিতে অস্বীকার করা বঙ্কিমের পক্ষে সমুচিত হয় নাই। কেন না বঙ্গদর্শনের দ্বারা লাভই হইতেছিল। যথা-সাধ্য প্রবন্ধের মূল্য দিতে আরম্ভ করিলে, প্রবন্ধলেখকগণের উৎসাহও হয়, এবং সম্ভবতঃ প্রবন্ধ তদনুপাতে উৎকৃষ্ট হয়। বাঙ্গালা মাসিকপত্রে ঐ আচার প্রতিষ্ঠিত করিয়া গেলে বঙ্কিমচন্দ্র যে এ দেশের সাময়িক সাহিত্যের একটা গুরুতর উপকার করিতেন সন্দেহ নাই। বিলাতের কোনও কোনও পত্রিকার ন্যায় বঙ্গদর্শন হয়ত অক্ষুণ্ণগৌরবে চিরকাল চলিতে পারিত।

তাহা ছাড়া নিরপেক্ষ সমালোচনায় একটা দেশ আমার শত্রু হইয়া উঠিতেছিল। শুনিয়াছি কোনও কোনও গ্রন্থকার আমাকে মারিতে পর্যন্ত সঙ্কল্প করিয়াছিল। গালাগালির ত কথাই নাই। সার জর্জ কেম্বেলের পর বোধ হয় আমি এ বাঙ্গালার গালাগালির প্রধান পাত্র (I am the worst abused man in Bengal next only to Sir George Campbell); তোমরা 'বঙ্গদর্শন' পুনঃ প্রচার করিতে চাহ, আমার আপত্তি নাই। কিন্তু আমি আর সম্পাদক হইব না।' আমরা তাঁহাকে অনেক বুঝাইলাম, অনেক অনুনয় করিলাম; কিন্তু তিনি কিছুতেই টলিলেন না। তিনি অক্ষয়বাবু কি সঞ্জীববাবুকে সম্পাদক প্রস্তাব করিলেন। সমস্ত দিনটা তর্কে বিতর্কে ও পরামর্শে কাটিয়া গেল। অক্ষয়বাবু বলিলেন তিনি বৈতনিক সম্পাদকমাত্র হইতে পারেন, কার্যাধ্যক্ষ তিনি হইবেন না। সঞ্জীববাবু কার্যাধ্যক্ষ হইতে স্বীকার করিলেন।[১] তখন অক্ষয়বাবু মাসিক দুইশত টাকা বেতন চাহিলেন। বঙ্কিম-বাবু বলিলেন এত বেতন চলিবে না; কারণ বঙ্গদর্শনের দুই শত টাকার অধিক আয় কখন হয় নাই। তখন স্থির হইল যে, সঞ্জীববাবু উভয় সম্পাদক ও কার্যাধ্যক্ষ হইবেন, এবং এভাবে 'বঙ্গদর্শন' পুনঃ প্রচারিত হইবে।······ আমার ইচ্ছা ছিল (আর্যদর্শন-সম্পাদক, বান্ধব-সম্পাদক ও সঞ্জীববাবু এই) তিন জনের সম্পাদকতায় বঙ্গদর্শন পুনঃ প্রচারিত করিব। তাহা হইল না। উহা কেবল সঞ্জীববাবুর সম্পাদকতায় পুনঃ প্রচারিত হইবার স্থির হইল। তদনুসারে হইয়াও ছিল। কিছু দিন পরে চন্দ্রনাথ বসু সম্পাদক হন। কিন্তু কোথায় সূর্য ও কোথায় জোনাকি! কিছু কাল অর্ধমৃত অবস্থায় চলিয়া 'বঙ্গদর্শন' আবার বন্ধ হইল।"[২]

দেখা গেল, প্রধানতঃ শাস্ত্রী মহাশয়-কথিত ঝঞ্ঝাটের দরুণই বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' উঠাইয়া দেন। চাকরির ঝঞ্ঝাটের উপর 'বঙ্গদর্শনের' ঝঞ্ঝাট তাঁহার নিকট প্রায়

---

অবশ্য বলা যাইতে পারে, বঙ্কিমের নিজের পরিশ্রমের কি মূল্য নাই? প্রবন্ধলেখকগণকে লাভাংশ দিতে থাকিলে তাঁহার নিজ রচনার মূল্য তিনি কি পাইতেন? ইহার উত্তর এই যে, বঙ্কিম যে লাভের দিকে নজর রাখিয়া পত্রিকাপ্রচার করিয়াছিলেন তাহা মনে হয় না। একটা মহৎ উদ্দেশ্য সাধনাভিপ্রায়েই তিনি এতবড় ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে নিয়াছিলেন। ঝঞ্ঝাটটা যখন স্বীকার করিলেন, তখন উদ্দেশ্যসিদ্ধির অন্যতর উপায় অপর লেখকগণের প্রবন্ধের মূল্যদান বিষয়ে তিনি কৃপণ হইলেন কেন?

১। এতকাল কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা কার্য ধ্যক্ষতা করিতেছিলেন।

২। ৺চন্দ্রনাথ বসু কখনও বঙ্গদর্শন সম্পাদন করেন নাই। ইহা নবীনচন্দ্রের একটা ভ্রম। সঞ্জীববাবু বঙ্গদর্শন ছাড়িয়া দিলে ৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদার উহা কিছুদিন চালান। এটা 'বঙ্গদর্শনের' তৃতীয় পর্যায়। বহুকাল পরে শ্রীশচন্দ্রের ভ্রাতা ৺শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদকতায় 'বঙ্গদর্শনের' চতুর্থ পর্যায় প্রকাশিত হয়। উহাও কয়েক বৎসর মাত্র চলিয়াছিল।

আত্মকৃত ব্যাধিতুল্য হইয়া উঠিয়াছিল। হয়ত ধূমায়মান পারিবারিক অশান্তিবহ্নিও তাঁহার ঝঞ্ঝাটের বৃদ্ধি করিয়াছিল। কিন্তু ইহাই সমগ্র কারণ নহে। নিজের ঘাড়ে লিখিবার ভার অধিক পড়ায় অনেক সময়ে তাঁহাকে সত্বরতার সহিত রচিত অপেক্ষাকৃত অসতর্ক যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ দ্বারা[১] বঙ্গদর্শনের ফর্মা পূরণ করিতে হইয়াছে। বাহিরে প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যাহাই হউক, চতুর্থ বর্ষের 'বঙ্গদর্শন' যে প্রথম তিনবৎসরের 'বঙ্গদর্শন' অপেক্ষা প্রবন্ধাবলীর গুণগরিমায় হীন হইয়া পড়িতেছিল, ইহা বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। এদিকে 'আর্যদর্শন', 'বান্ধব' দ্রুতপদে বঙ্গদর্শনের সমকক্ষতা লাভ করিতেছিল। বঙ্গদর্শনের ব্রতোদ্‌যাপনার্থ প্রথম হইতেই বঙ্কিম-চন্দ্রকে বাধ্য হইয়া নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে হইত। সাহিত্য-সেবার জন্ত রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বঙ্কিমের অবসর পর্যাপ্ত ছিল না। মানুষ সকলকে ফাঁকি দিতে পারে, চাকরিকে ফাঁকি দিতে পারে না। চাকরির দৈনন্দিন দায় ষোল আনা পরিশোধ করিয়া সাহিত্যসেবার জন্ত তিনি যে সময়টুকু পাইতেন, 'বিজ্ঞানরহস্ত' 'লোকরহস্ত' 'গদ্যপদ্য' প্রভৃতিতে সংগৃহীত প্রবন্ধাবলীর অধিকাংশের ন্যায় বঙ্গদর্শনের বিষয়বৈচিত্র্যসাধনই যাহাদের একমাত্র না হইলে অন্ততঃ প্রধানতম উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়, তাদৃশ প্রবন্ধমালার রচনায় সে সময়টুকুও ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে প্রয়োগ করা বঙ্কিমের পক্ষে মহত্তর কার্যসাধন-পটীয়সী শক্তির অপপ্রয়োগ নয় কি? তিনি চারি বৎসর যে ভাবে বঙ্গদর্শন চলাইয়াছিলেন, তাহা একমাত্র তাঁহার ন্যায় লোকোত্তর প্রতিভাশালী লোকের পক্ষেই সম্ভব ছিল। কিন্তু এই চারি বৎসরে তিনি হয়ত মনে করিয়াছিলেন যে, বঙ্গদর্শনের ঐ সকল চুটকি বাঙ্গালীর প্রতি তদীয় প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান নহে; এবং তিনি যথেষ্ট অবসর পাইলে যাহা দিতে পারেন, বঙ্গবাসীদিগকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিতেছিলেন। তাই একতঃ স্বদেশবাসিগণকে স্বীয় প্রতিভার যোগ্য দান হইতে চিরবঞ্চিত না রাখিবার উদ্দেশ্যে, অন্যতঃ নিজের পর্যাপ্ত সময়াভাবের ফলে[২] বঙ্গদর্শন উত্তরোত্তর নিকৃষ্টতর রচনায় পূর্ণ না হয় সেই জন্ত বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের বিলোপ সাধন করিলেন। কালিদাসের ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের 'যশঃশরীরে দয়ালু' হইয়া তাহার 'ভৌতিক পিণ্ডে অনাস্থা' প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

অনেক বিজ্ঞ ও কৃতী লেখকই 'বঙ্গদর্শনের' ব্রতোদ্‌যাপনে সাহায্য করেন।

১। পর পরিচ্ছেদে 'সাম্য' প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

২। দ্বিতীয় পর্যায়ের বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যায় 'বঙ্গদর্শনের পুনরুত্থান' প্রবন্ধে বঙ্কিম লেখিয়াছিলেন, "ইউরোপীয় সাময়িক পত্র ও এতদ্দেশীয় সাময়িক পত্রের বিশেষ প্রভেদ এই যে এখানে যিনিই সম্পাদক, তিনিই প্রধান লেখক, ইউরোপীয় সম্পাদক সম্পাদকমাত্র—কদাচিৎ লিখক। পত্র এবং প্রবন্ধের উদ্বাহের তিনি ঘটকমাত্র, বরং বরকর্তা হইয়া সচরাচর উপস্থিত হন না। এবার বঙ্গদর্শন সেই প্রণালী অবলম্বন করিল।"

তাঁহাদের কয়েকজনের নাম বঙ্গদর্শনের বিজ্ঞাপনপত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক কালের মাসিক পত্রিকাগুলিতে যেমন প্রায় প্রত্যেক প্রবন্ধেরই নীচে লেখকের নাম দেওয়া হয়, বঙ্গদর্শনে তাহা হইত না। কদাচিৎ রামদাস সেন, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, লালমোহন বিদ্যানিধি, শ্রীকৃষ্ণ দাস প্রভৃতি দুই একটি নাম দেখা যায় মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্র গল্প ও উপন্যাস ছাড়া স্বয়ং যে সকল প্রবন্ধ ও সমালোচনা রচনা করেন, তাহার প্রায় সকলগুলিই তিনি উত্তরকালে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি তিনি 'বিজ্ঞানরহস্য' ( ১৮৭৫ ) নামে প্রকাশিত করেন। 'লোকরহস্যে' কয়েকটি কৌতুককর চুটকির সহিত সমসাময়িক রুচিবিকার-প্রভৃতির প্রতি তীব্র কটাক্ষপূর্ণ প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 'বিবিধ সমালোচনে' ( ১৮৭৬ ) 'উত্তর চরিত'-শীর্ষক প্রবন্ধ 'অবকাশরঞ্জিনী'র সমালোচনাত্মক 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধ, 'প্রকৃত এবং অতি প্রকৃত' 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব', শ্যামাচরণ শ্রীমাণি-প্রণীত 'সূক্ষ্ম শিল্পের উৎপত্তি ও আর্য জাতির শিল্প-চাতুরী'-নামক গ্রন্থের সমালোচনামূলক 'আর্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প' শীর্ষক প্রবন্ধ, ও 'দ্রৌপদী' ( প্রথম প্রস্তাব ) প্রকাশিত হয়। ঐ প্রবন্ধগুলি পরে 'বিবিধ প্রবন্ধ' প্রথম খণ্ডে স্থান পাইয়াছে। 'বিবিধ প্রবন্ধ' দ্বিতীয় খণ্ডেও বঙ্গদর্শনের কয়েকটি প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে। উহার অন্য প্রবন্ধগুলি 'প্রচারে' প্রকাশিত হয়। 'কবিতা পুস্তকে' ( ১৮৭৮ ) বঙ্কিমের কয়েকটি স্বরচিত কবিতা ও তিনটি গদ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, দ্বিতীয় সংস্করণে ( 'গদ্য-পদ্যে' ) বঙ্গদর্শন হইতে আরও একটি গদ্য প্রবন্ধ ( 'দুর্গোৎসব' ) এবং প্রচার হইতে 'পুষ্প নাটক' ও 'রাজার উপর রাজা' কবিতা সন্নিবেশিত হয়। 'কমলাকান্তের দপ্তরে' (১৮৭৬) প্রথমে তাঁহার স্বকৃত কয়েকটি প্রবন্ধই প্রকাশিত হয়, পরে ঐ গ্রন্থ সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন হইতে বঙ্কিমের রচিত 'কমলাকান্তের পত্র'-গুলি ও 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী' প্রবন্ধ এবং তাঁহার স্বসম্পাদিত বঙ্গদর্শন হইতে ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার রচিত 'চন্দ্রালোকে' ও ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় রচিত 'স্ত্রীলোকের রূপ' এই প্রবন্ধদ্বয় সহ 'কমলাকান্ত' এই নবনামে প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য অক্ষয়বাবু ও রাজকৃষ্ণবাবুর প্রবন্ধদ্বয় বঙ্গদর্শনে 'কমলাকান্তে'র নামেই প্রকাশিত হইয়াছিল। চতুর্থ বর্ষের বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যায় কমলাকান্তের নামে প্রকাশিত 'মশক'-শীর্ষক প্রবন্ধটি কিন্তু পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। বঙ্কিম বলিয়াছেন, উহা তাঁহার নিজের লেখা নহে, কাহার লেখা তাহা বলেন নাই। প্রবন্ধটি কি ভাবে, কি রচনাকৌশলে কমলাকান্তের অন্য সকল প্রবন্ধ হইতে একটু খাটো। 'ঢেঁকি'-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ বঙ্কিমের নিজ রচনা হইলেও ভুলক্রমে 'কমলাকান্তের' দ্বিতীয় সংস্করণের পূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। কি ভাষার মাধুর্যে, কি ভাবের মনোহারিত্বে, কি শুভ্র সংযত সরস রসিকতায়, কি অকৃত্রিম স্বদেশপ্রেমে কমলাকান্ত বঙ্গদর্শনের গৌরব। কমলাকান্ত একাধারে কবি, দার্শনিক, সমাজশিক্ষক, রাজনীতিজ্ঞ ও স্বদেশপ্রেমিক ; অথচ তাহাতে কবির

অভিমান, দার্শনিকের আড়ম্বর, সমাজশিক্ষকের অরসজ্ঞতা, রাজনৈতিকের কল্পনা-হীনতা, স্বদেশপ্রেমিকের গোঁড়ামি নাই। হাসির সঙ্গে করুণের, অদ্ভুতের সঙ্গে সত্যের, তরলতার সহিত মর্মদাহিনী জ্বালার, নেশার সঙ্গে তত্ত্ববোধের, ভাবুকতার সহিত বস্তুতন্ত্রতার, শ্লেষের সহিত উদারতার এমন মনোমোহন সমন্বয় কে কবে দেখিয়াছে? কেহ কেহ এখনও জিজ্ঞাসা করে কমলাকান্তের দপ্তরের মৌলিকতা কতখানি? হায় রে অদৃষ্ট! 'মৌলিকতা' 'মৌলিকতা' করিয়া অথবা আপনাদের দেশের সৃষ্টিমাত্রেরই মৌলিকতা সন্দেহ করিতে করিতে দেশটা অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছে। কৈশোরে 'কমলাকান্ত' প্রথম পাঠ করিবার পর যখন বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়াছিলাম, তখন ইংরাজী সাহিত্যে জ্ঞানাভিমানী এক ব্যক্তি বড় গম্ভীরভাবে বলিয়াছিলেন, "ওটা De Quinceyর Confessions of an English Opium-Eater-এর অনুকরণ।" বড় হইয়া বুঝিয়াছি উহা পণ্ডিতের যোগ্য উক্তি নয়। কমলাকান্তের দুই দশটা উক্তির অনুরূপ উক্তি বিশাল ইংরাজী সাহিত্যের কোথাও নাই এমন কথা বলিব না, কমলাকান্তের জোবানবন্দী Pickwick Papers-এর Sam-এর জোবানবন্দীর আদর্শে রচিত হইয়াছে তাহাও বিশ্বাস করি, তবু বলিব উহাতে কমলাকান্তের মৌলিকতার হানি হয় নাই।

সেকালের কোনও লোককে এখন বঙ্গদর্শনের বিশেষত্বের কথা জিজ্ঞাসা করিলে প্রায়ই শুনা যায় বঙ্গদর্শন গ্রন্থাদি সমালোচনায় যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল, তেমনটি আর বাঙ্গালা সাহিত্যে হয় নাই। বঙ্গদর্শনের সমালোচনা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, বঙ্কিম একহস্তে পুষ্পমাল্য, অন্য হস্তে সম্মার্জনী লইয়া পুস্তকসমালোচনায় অগ্রসর হইতেন। যে সকল লেখকের রচনায় প্রতিভার চিহ্ন না পাইতেন, বাঙ্গালা সাহিত্য তাহাদের হস্তকণ্ডূয়নের উৎপাতে উৎপীড়িত ও ভারাক্রান্ত না হইয়া পড়ে তজ্জন্য তিনি এমন তীব্র সমালোচনা করিতেন যে, তাদৃশ লেখক যেন গোড়াতেই সাহিত্য-সৃষ্টির দুরাশা পরিত্যাগ করে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থ গুণবান্ লোককে যথোচিত আদর করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না; এমন কি প্রতিযোগী পত্রিকাগুলিরও মুক্তকণ্ঠে গুণগান করিতেন। 'আর্যদর্শন' সম্বন্ধে বঙ্গদর্শন বলিয়াছিলেন, "এখানির বিশেষ পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক, আপনার গুণে ইহা সকলের নিকট পরিচিত হইয়াছে।" 'বান্ধব' পত্রিকা প্রকাশিত হইলে বঙ্কিম বলিয়াছিলেন—"পশ্চিম বাঙ্গালায় অনেকগুলি উৎকৃষ্ট মাসিকপত্র প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু পূর্ব বাঙ্গালায় সেরূপ ছিল না। অথচ পূর্ববঙ্গবাসিগণ পশ্চিমবঙ্গবাসিগণ অপেক্ষা বিদ্যা-বুদ্ধিতে ন্যূন ইহা আমরা স্বীকার করি না। অতএব ঢাকা হইতে এই উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রের প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। ......আকারে ক্ষুদ্র হইলেও গুণে অন্য কোন পত্রাপেক্ষা লঘু বলিয়া আমাদিগের বোধ হইল না। রচনা অতি সুন্দর এবং লেখকদিগের চিন্তাশক্তি অসামান্য। ইহা যে বাঙ্গালার একখানি সর্বোৎকৃষ্ট পত্র মধ্যে গণ্য হইবে তদ্বিষয়ে আমাদিগের

সংশয় নাই।"[১] সমালোচকের কর্তব্যসম্বন্ধে বঙ্কিমের এমন উচ্চ ধারণা ছিল যে, রায়সাহেব হারাণচন্দ্রকে তিনি বলিয়াছিলেন, "যদি সাহিত্যের যথার্থ উপকার করিতে চাও, তবে প্রকৃত সমালোচনা করিতে সুরু কর।" অবশ্য সমালোচনার তীব্রতায় কখনও কখনও বঙ্কিম যে মাত্রা অতিক্রম করিয়া না যাইতেন তাহা নহে। কবি আনন্দচন্দ্র মিত্রের 'হেলেনা' কাব্যের সমালোচনা ইহার দৃষ্টান্তস্থল। এতকাল পরে আর ঐ বিস্মৃতপ্রায় সমালোচনার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া উক্ত কবির প্রতি সাধারণের অনাদর নবীকৃত করিতে বাঞ্ছা করি না। বস্তুতঃ কবি আনন্দচন্দ্র যে শক্তিহীন ছিলেন তাহা নহে; বঙ্গদর্শনের সমালোচনাই তদীয় যথোচিত প্রতিষ্ঠার প্রধানতম অন্তরায় হইয়াছিল।

বঙ্গদর্শনের সমালোচনায় শ্রদ্ধাস্পদ অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় বঙ্কিমের প্রধান সহযোগী হইয়াছিলেন। অক্ষয়বাবুর 'শিক্ষানবিশের পদ্য' নামক পুস্তিকাখানি উপলক্ষ করিয়া বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "অক্ষয়বাবুর ন্যায় প্রতিভাশালী গদ্যলেখক অল্পই বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।"[২] সমালোচনায় অক্ষয়বাবুর তথা বঙ্গদর্শনের কৃতিত্ব সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইবার যোগ্য—

> "একসময়ে অক্ষয়চন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের প্রধান সহায় হইয়া উঠেন। সেকালের বঙ্গদর্শনে অক্ষয়চন্দ্রের কোন কোন রচনা স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের বলিয়া সন্দেহ হইত। গ্রন্থসমালোচনার ভার অক্ষয়চন্দ্রের উপরই অর্পিত ছিল। সম্ভবতঃ কোন কোন সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'ছাপ'ও থাকিত। সেই সব সাহিত্যসমালোচনার মধ্যে তাঁহাদের মত এমন করিয়া প্রখরে মধুরে মিলাইতে এমন করুণ কঠোর কষাঘাত করিতে আর কেহ পারিতেন কি না সন্দেহ। 'মালঞ্চনিবাসিনঃ মধুসূদন সরকারস্য'কে এই ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসরেও ভুলিতে পারি নাই।......ফলতঃ বঙ্গদর্শন প্রচার বন্ধ হইয়া অবধি বাঙ্গালা সাহিত্যে সেরূপ সমালোচনার নিপুণতা আর কোথাও দেখিতে পাই না। নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় কিছুদিন সে ধারা রাখিয়াছিলেন, আর মাঝে মাঝে সাহিত্য-সম্পাদক মহাশয় সে পুরান স্মৃতিকে জাগাইয়া তুলেন। কিন্তু সচরাচর আর বাঙ্গালা সাহিত্যে সমালোচকের ধর্মাসনে এমন একটি যোগ্য ব্যক্তিকে দেখিতে পাই না। ইংরাজের আদালতে যেমন মোকদ্দমার সংখ্যা যতই বাড়িতেছে, ততই সরাসরি বিচারের পদ্ধতিটাও অযথা পরিমাণে প্রচলিত হইয়া পড়িতেছে, বাঙ্গালা সাহিত্যেও গ্রন্থকারের সংখ্যা যতই বাড়িয়া যাইতেছে, ততই সরাসরি ভাবে সমালোচনার প্রবৃত্তি ও রীতিও যেন বাড়িয়া চলিয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে এখন অনেক স্থলে

১। বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১২৮১।
২। বঙ্গদর্শন, আশ্বিন, ১২৮১।

সমালোচকের পদে মোসাহেব অধিষ্ঠিত হইয়াছে। এ অবস্থায় সাহিত্যের সম্মানরক্ষা বাস্তবিকই দায় হইয়া পড়িয়াছে। আর চারিদিকে এই অবনতি-ধারা প্রত্যক্ষ করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্র যে কাজটা একসময়ে এমন অসাধারণ কৃতিত্ব সহকারে করিতেন, তাহার মূল্য ও মর্যাদা যেন আমার চক্ষে ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে।"[১]

বিপিনবাবু কয়েকজন দক্ষ সমালোচকের নাম করিয়াছেন বলিয়া সত্যের অনুরোধে বলা আবশ্যক যে, বঙ্কিমের সমসাময়িক সাহিত্যিকগণের মধ্যে আর একজন মহারথী সমালোচনায় যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এক বঙ্কিমচন্দ্র ব্যতীত তাহার অন্য তুলনা নাই। ইনি 'বান্ধব'-সম্পাদক পরলোকগত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়। সুনিপুণ গুণগ্রাহিতায় কালীপ্রসন্ন বঙ্কিম অপেক্ষা বড় ন্যূন ছিলেন না। পলাশীর যুদ্ধ, দশমহাবিদ্যা, বৃত্রসংহার প্রভৃতির সমালোচনা ইহার দৃষ্টান্তস্থল। কিন্তু কোনও গ্রন্থের নিন্দা করিবার সময় বঙ্কিমের সমালোচনার ন্যায় তদীয় সমালোচনায় বিদ্রূপের বিষজ্বালা কদাপি উৎকট ভাব ধারণ করিত না। কালী-প্রসন্ন সাধারণভাবে দোষ প্রদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন, কখনও কখনও বা উদারতাবশে গ্রন্থকারের অজ্ঞতাকে মুদ্রাকরের প্রমাদ বলিয়াও উপেক্ষা করিতেন। অযোগ্যের প্রতি বঙ্কিমের তাদৃশ উদারতা কখনও দেখা যাইত না।

সমালোচনা অর্থে সাধারণতঃ কোনও একখানি গ্রন্থের দোষগুণ প্রদর্শনই বুঝায়। বঙ্কিমের ও কালীপ্রসন্নের সমালোচনার আদর্শ ইহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ ছিল। গ্রন্থসমালোচনা উপলক্ষ করিয়াও লোকের বুঝিবার, শিখিবার ও ভাবিবার যোগ্য কত কথার অবতারণা করা যাইতে পারে বাঙ্গালায় সেকালের বঙ্গদর্শন ও বান্ধবের সমালোচনা তাহার উদাহরণস্থল ছিল। বঙ্গদর্শন ও বান্ধবের পরে বাণীর বরপুত্র রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ও আধুনিক নানা গ্রন্থ লইয়া ঐরূপ, এমন কি স্থলে স্থলে তদপেক্ষাও উজ্জ্বলতর, সমালোচনা আমাদিগকে শুনাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য', 'লোক সাহিত্য' নামক গ্রন্থত্রয়ে ঐরূপ, কতকগুলি সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালায় সংস্কৃত গ্রন্থের সমালোচনা বিদ্যাসাগর মহাশয় হইতে আরব্ধ হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় বীটন সোসাইটিতে (Bethune Society) 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' নামক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন, উহাতেই বাঙ্গালায় সংস্কৃত-সাহিত্যের আলোচনা প্রবর্তিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আলোচনা অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত; কিন্তু সংক্ষিপ্ত হইলেও, এদেশে কাব্যসমালোচনায় প্রাচীন আলঙ্কারিক-গণের অবলম্বিত পথ পরিহারপূর্বক নূতন বা য়ুরোপীয় সমালোচকগণের অবলম্বিত পদ্ধতি সর্বপ্রথম উহাতেই অনুসৃত হয়। আমাদের দেশের আলঙ্কারিকগণের বিবেচনায় রসাত্মক বাক্যমাত্রই কাব্য ছিল। এইরূপে কাব্যকে বড় খুচরা ভাবে

১। বিপিনচন্দ্র পাল-প্রণীত 'চরিতকথা', পৃ ২১৮-২১৯

দেখিতে দেখিতে তাঁহারা সমালোচনার আদর্শ খুব সূক্ষ্ম করিলেও বড় খর্ব করিয়া ফেলিয়াছিলেন। যে প্রত্যেক লোমকূপ নিপুণভাবে পর্যবেক্ষণ করিতে চায়, সে সমস্ত দেহের সৌন্দর্য উপলব্ধি করিবার যথেষ্ট সুযোগ পায় না ; এমন কি, হয়ত ক্রমে ক্রমে তাহার সে ক্ষমতা লুপ্ত হইয়া যায়। প্রাচীন আলঙ্কারিকগণেরও সেই দোষ ঘটিয়াছিল, এবং তাঁহাদের ছন্দোনুবর্তনকারী কবিগণেরও সেই দোষ ক্রমে বড় বিকটাকার ধারণ করিয়াছিল। নৈষধচরিত ঐ বিকট-রুচির উদাহরণ। নল-দময়ন্তীর কথা মহাভারতের অন্তর্গত একটি অতি রমণীয় উপাখ্যান। নল-দময়ন্তীর পূর্বরাগ, বিবাহ, বিবাহের পরে উভয়ের রাজ্যচ্যুতি, বনবাস, নল-কর্তৃক দময়ন্তীত্যাগ, পরে পুনর্মিলন—এইরূপ উহার সকল অংশই মনোরম হইলেও বিবাহের পর হইতে পুনর্মিলন পর্যন্ত অংশটুকুই অবশ্য সর্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু শ্রীহর্ষ নল-দময়ন্তীর কথাবলম্বনে কাব্য লিখিতে বসিয়া কেবল পূর্বরাগ ও বিবাহ অংশটুকু গ্রহণ করিলেন, এবং ঐটুকু লইয়াই 'রসাত্মক বাক্য' যোজনা করিতে করিতে সুদীর্ঘ দ্বাবিংশতি সর্গ লিখিয়া ফেলিলেন। এমন অনুচিত ফেনান ফাঁপান সত্ত্বেও আমাদের দেশীয় পণ্ডিতগণের চক্ষে উহাই সর্বোৎকৃষ্ট কাব্য। "তাবদ্ ভা ভারবের্ভাতি যাবন্মাঘস্য নোদয়ঃ। উদিতে নৈষধে কাব্যে ক মাঘঃ ক চ ভারবিঃ॥" ইতালীর রিনাইসেন্সের (নবযুগের) পরবর্তী কালের শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, উহাতে there was an absence of what is big, and in its place there was excess। কালিদাস, ভবভূতির পর হইতে সংস্কৃত সাহিত্যেও বৃহৎ কিছু সৃষ্ট হয় নাই ; যাহা হইয়াছে তাহাতে আলঙ্কারিকগণ কর্তৃক প্রশংসিত কতকগুলি ধর্মের অযথা বাড়াবাড়ি দেখিতে পাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বভাবসিদ্ধ সুরুচি ও সহৃদয়তাবলে, এবং সম্ভবতঃ ইংরাজীশিক্ষার গুণে আলঙ্কারিকগণের অবলম্বিত সমালোচনপদ্ধতির সঙ্কীর্ণতা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। উত্তরচরিত সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র একটু অতিরিক্ত জেদের সহিতই আলঙ্কারিকগণকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। আলঙ্কারিকগণের রীতিতে দুই একটি দোষ থাকিলেও তাহাতে কতকগুলি গুণও আছে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র জেদ বশতঃ তাহাদের যথার্থ গুণগুলি আদৌ দেখিতে পান নাই। পাশ্চাত্য দেশে কাব্য সমালোচনায় প্লেটো হইতে এডিসন, জনসন পর্যন্ত প্রায় একই রীতি প্রচলিত ছিল। অবশ্য প্রত্যেক সমালোচকেরই নিজ নিজ কিছু বিশিষ্টতা আছে। এই রীতিতে প্রাচীন (গ্রীক) আলঙ্কারিগণের প্রভাব অধিক। জনসনের পর এক নব পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। এই যুগের সমালোচকগণ গ্রীক আলঙ্কারিকগণের প্রভাব হইতে প্রায় মুক্ত ছিলেন। কোলেরিজ, মেকলে প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। বঙ্কিমচন্দ্র জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক মেকলের সমালোচনা-পদ্ধতিই আদর্শ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তবে মেকলের মত তিনি অনুচিত অত্যুক্তিপ্রিয়তা প্রদর্শন করেন নাই। সে যাহা হউক, 'উত্তরচরিত' বা জয়দেব বা বিদ্যাপতি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা

যাহা বলিয়াছেন, তাহা সবই অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস না করিয়াও তাঁহার সুরুচি-সম্মত রসজ্ঞতা ও সূক্ষ্মদর্শিতার প্রতি আমরা চিরকাল আদরযুক্ত থাকিতে পারি।[১] এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত ও ভূদেবলিখিত রত্নাবলী-সমালোচনাও অদ্যাপি হৃদয়গ্রাহী। ইহার পর সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে ৺চন্দ্রনাথ বসু শকুন্তলার সমালোচনা করেন। কবি নবীনচন্দ্র নানাকারণে চন্দ্রনাথ বসুর প্রতি রুষ্ট ছিলেন, তাই 'আমার জীবনে' কোথাও তাহাকে 'নষ্টচন্দ্র' বলিয়াছেন, কোথাও 'নন্দী' বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন, কোথাও বা বলিয়াছেন যে চন্দ্রনাথ বসু "বঙ্কিমসূর্যের প্রতিভায় প্রতিভাত চন্দ্রমাত্র, সন্ধ্যার সময়ে বঙ্কিমবাবুর বাড়ী প্রত্যহই জুটিতেন, এবং বঙ্কিমবাবু যে সন্ধ্যায় যে বিষয়ে আলাপ ও ব্যাখ্যা করিতেন, তিনি পরদিন তাহা বিনাইয়া ফেনাইয়া প্রবন্ধ লিখিতেন"।[২] কিন্তু চন্দ্রনাথ বসুর শকুন্তলাতত্ত্ব এক সময়ে খুব আদর লাভ করিয়াছিল। অবশ্য ইহাও স্বীকার্য যে শকুন্তলাতত্ত্ব খুব দীপ্তিমতী প্রতিভা বা সুদূরব্যাপিনী সহৃদয়তার পরিচায়ক নহে, এবং সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলা' ও 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' প্রভৃতি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে উহা ম্লান ও বিস্মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে। চন্দ্রনাথ বসুর পরে প্রাচীন সাহিত্যের বহু সমালোচকের অভ্যুদয় হইয়াছে, সকলের কৃতিত্ব এ গ্রন্থে আলোচনীয় নহে। রবীন্দ্রনাথের নাম পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে; পণ্ডিতবর রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের 'কালিদাস', 'শ্রীকণ্ঠ' প্রভৃতি গ্রন্থও অনেকেরই পরিচিত। সর্বশেষ, কিন্তু কোনও কোনও হিসাবে সর্বোপরি পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। পাশ্চাত্য দেশে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে সাহিত্য সমালোচনায় 'বৈজ্ঞানিক প্রণালী' নামে যে প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে, তদনুরূপ সমালোচনা বাঙ্গালায় একরূপ মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় হইতেই আরব্ধ হইয়াছে বলা যায়। কিন্তু ইহা আরম্ভমাত্র। বিজ্ঞ ও সহৃদয় ব্যক্তিগণের হস্তে ইহার বহুল প্রসার বাঞ্ছনীয়।

---

১। বঙ্কিমচন্দ্র 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধে যে সব মত ব্যক্ত করিয়াছেন, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্. এ. মহাশয় স্বসম্পাদিত সানুবাদ গীতগোবিন্দের ভূমিকায় উহার সবিস্তর আলোচনা করিয়াছেন। জয়দেব সম্বন্ধে সতীশবাবুর মতগুলিও সর্বত্র বিনাপত্তিতে গ্রহণযোগ্য হয় নাই। বঙ্কিমের জয়দেবসম্বন্ধিনী উক্তিগুলিতে বিশেষ আপত্তিকর কিছু নাই, কিন্তু বিদ্যাপতিবিষয়ক উক্তিগুলি চণ্ডীদাসকে উপলক্ষ করিয়া বলিলেই বোধ হয় বঙ্কিমের প্রয়োজন অধিক সিদ্ধ হইত।

'বিষবৃক্ষে' হরদেব ঘোষালের পত্রে প্রসঙ্গক্রমে সংক্ষেপে কাব্যে প্রণয়ের আদর্শ আলোচিত হইয়াছে। ঐ স্থানে হরদেব ঘোষাল কালিদাস, বায়রণ ও জয়দেবকে এক শ্রেণীতে ও সেক্ষপীয়র, বাল্মীকি, ও শ্রীমদ্ভাগবতকারকে অন্য শ্রেণীতে ফেলিয়াছেন। হরদেব ঘোষালের মতে কালিদাস রূপজ মোহের কবি। এই উক্তি নিতান্তই অসমীচীন ও অযৌক্তিক।

২। 'আমার জীবন' ৫ম ভাগ, পৃ ৬০-৬৭।

## নবম পরিচ্ছেদ

## বঙ্গদর্শন : অনুবৃত্তি

বঙ্গদর্শন বাঙ্গালাসাহিত্যের সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া উহার যে পরিপুষ্টি ও প্রসাধন করিয়াছিল পূর্বপরিচ্ছেদে আমরা উহা যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্টভাবে নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এক্ষণে উহা বঙ্গীয় সমাজের কিরূপ সেবা করিয়াছিল তাহাও আলোচনা করা আবশ্যক। অবশ্য একটা কথা সহজেই সকলের বোধগম্য হইতে পারে। সংসাহিত্যের সেবামাত্রই পরোক্ষভাবে সমাজের সেবাও বটে, কেন না সংসাহিত্যপাঠে যেমন বুদ্ধিবৃত্তির সূক্ষ্মতা ও ব্যাপকতা সাধিত হয়, তেমনই সহৃদয়তারও বৃদ্ধি হয়। বস্তুতঃ সাহিত্যচর্চা দ্বারাই মনুষ্যজীবনের সর্বাঙ্গীন স্ফূর্তি ও পরিণতি ঘটে। সেই জন্যই কবি ভর্তৃহরি বলিয়াছেন, "সাহিত্যসঙ্গীতকলা-বিহীনঃ সাক্ষাৎ পশুঃ পুচ্ছবিষাণহীনঃ"। এই পরিচ্ছেদে আমরা ঐরূপ পরোক্ষ সমাজসেবার কথা বলিব না, আবশ্যক হইলে অন্যপ্রসঙ্গে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইবে। বঙ্গদর্শন বঙ্গীয় সমাজের ক্রমাভিব্যক্তির যে দশায় উহার সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছিল, তখন কেবল পূর্বোক্তরূপ গৌণভাবে সমাজসেবায় সন্তুষ্ট না থাকিয়া তাহাকে বঙ্গীয় সমাজের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আদর্শ সম্বন্ধে নানা কথাই আলোচনা করিতে হইয়াছে। এই আলোচনাগুলিই বর্তমান পরিচ্ছেদে আলোচ্য।

বঙ্গদর্শনের সমাজসেবার প্রকৃতি নির্দেশ করিতে আমরা প্রধানতঃ বঙ্গদর্শন সম্পাদকের তদানীন্তন রচনাগুলিই প্রমাণরূপে উল্লেখ করিব। সাধারণ পাঠকের চক্ষে বঙ্গদর্শন অপেক্ষা বঙ্গদর্শন-সম্পাদকের আদর অধিক—যোগ্যরূপেই অধিক। ইহা ছাড়া প্রথম পর্যায়ের বঙ্গদর্শনে সম্পাদকই যে প্রায় সব ছিলেন, দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনায় বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। বস্তুতঃ সম্পাদককে বাদ দিয়া বঙ্গদর্শনের যাহা কিছু থাকে তাহার মূল্য বড় অধিক নয়, তাহা প্রায় সর্বাংশে বঙ্কিমের নিজ ভাবেরই প্রতিধ্বনি।

বঙ্কিমের জন্মকালে বাঙ্গালার সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবেই এই গ্রন্থের সূচনায় আলোচিত হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি, পাশ্চাত্য শিক্ষা বঙ্গীয় সমাজে একটা ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল। ঐ বিপ্লবটা প্রধানতঃ তদানীন্তন ইংরাজী শিক্ষিত সমাজে আত্মপ্রকাশ করিলেও উহার প্রভাব সমাজের নিম্নতম স্তর পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। ঝড়ে নদী ও তড়াগের জলের উপরিভাগ যেমন আলোড়িত করে, নীচের জলকে তেমন আলোড়িত করে না, কিন্তু উপরিভাগের জল পুনঃ পুনঃ তটে অভিহিত হইয়া কর্দমাক্ত হইলে সে কর্দম নীচের জল পঙ্কিল না করিয়া ছাড়ে না। বাঙ্গালা সমাজেরও সেই দশা

ঘটিয়াছিল। তাই তখন সমগ্র বঙ্গসমাজই বিপ্লবগ্রস্ত বলিলে কোনও অত্যুক্তি হয় না। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল ঝড়টা যখন বাঙ্গালার ধীর-নীরব জীবন-প্রবাহকে প্রহত করে তখন ঐ প্রবাহ ভাটার অতি ক্ষীণ অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। সেই জন্য উহা এদেশে বাধাপ্রাপ্ত ত হয়ই নাই, পরন্তু অনেকে কিছুমাত্র বিচার-বিবেচনা না করিয়াই সমাজের নানা অন্তর্নিহিত শক্তির প্রভাবে উহাকে সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছিল। এই দেশ যদি পৃথিবী হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ একটা ভুবনবিশেষ হইত, তাহা হইলে হয়ত উহা পৃথিবীর অন্যান্য খণ্ড হইতে স্বতন্ত্রভাবে নিজের চিন্তা, সভ্যতা, শিক্ষা, সংস্কার লইয়া তৃপ্ত থাকিতে পারিত, হয়ত ঐ ভাবেই নিজের উত্তরোত্তর উন্নতিরও একটা না একটা ব্যবস্থা করিতে পারিত। কিন্তু এই দেশ ত জগৎ ছাড়া নহে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতের বাহিরে অর্থাৎ পাশ্চাত্য দেশসমূহে যে উন্নতির বন্যা বহিতেছিল উহারই কয়েকটি তরঙ্গ ইংরেজের রাজনৈতিক শক্তিরূপ অনুকূল পবনে উত্তালতর হইয়া এ দেশীয় সমাজের জীর্ণতট পুনঃ পুনঃ প্রহত করিতে আরম্ভ করে। সে অবস্থায় উহা একেবারে উপেক্ষা করিয়া চলা সম্ভব ছিল না। অথচ মনে রাখিতে হইবে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় সভ্যতার আদর্শ এদেশের চিরপোষিত অনেক সংস্কারের, এমন কি প্রাচ্য সভ্যতার মূলীভূত অনেক ভাবেরই বিরোধী ছিল। শুক্তির ভিতর যখন হঠাৎ দুই চারিটা বালুকণা ঢুকিয়া পড়ে তখন শুক্তি প্রথমে তাহাকে নিজ দেহ হইতে বাহির করিয়া দিবারই চেষ্টা করে ; যখন তাহা অসম্ভব দেখে, তখন তাদৃশ নিষ্ফল প্রয়াস হইতে বিরত হইয়া নিজ দেহনিঃসৃত রস দ্বারা তাহাকে মুক্তায় পরিণত করে। দেশীয় সমাজ যখন দেখিল যে পাশ্চাত্য সভ্যতা বর্জন বা উপেক্ষা করিয়া চলা একেবারেই অসম্ভব, তখন সে ধীরে ধীরে স্বীয় আদর্শের সহিত উহার সমন্বয় সাধনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিল। বলা বাহুল্য ব্যাপারটি বড় সুসাধ্য ছিল না। ক্ষুদ্রতম পুষ্পটি প্রসব করিতেও প্রকৃতি-মাতার প্রসব-যন্ত্রণা কম হয় না। বহু যন্ত্রণাভোগের পর সমাজমাতৃকা একে একে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবের মধ্যে সমন্বয়সাধনক্ষম কয়েকটি পুত্র প্রসব করিলেন। রামমোহন রায় বল, দেবেন্দ্রনাথ বল, বিদ্যাসাগর বল, ভূদেব বল, কেশব বল, বা বঙ্কিম বল, সমাজের দিক হইতে দেখিতে গেলে ইহাদের জীবন ও কার্যের সফলতা পরিমাপণ করিবার একমাত্র মানদণ্ড এই—ইহাদের মধ্যে কে কি পরিমাণে পূর্বোক্তরূপ সামঞ্জস্য বা সমন্বয় সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন ?

একহিসাবে তত্ত্ববোধিনী ও বঙ্গদর্শন-প্রভৃতির প্রকাশই এই সমন্বয় সাধনের একটা বিরাট আয়োজন। যখন বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয় তখন সামাজিক বিপ্লবের উৎকট ভাবটা কিছু মন্দ হইয়া আসিয়াছে ; কিন্তু একেবারে যায় নাই। তৎপূর্বেই ইংরাজী বাঙ্গলা নানাবিধ উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর বিদ্যালয় দেশের বহুস্থানে সংস্থাপিত হওয়ায় জাতিবর্ণনির্বিশেষে সমাজের নানাস্তরে কিয়ৎপরিমাণে জ্ঞানের বিস্তার

সাধিত হইয়াছিল, এবং তৎসঙ্গে গোঁড়া হিন্দু সমাজেও রুচির পরিবর্তন ঘটিতেছিল। অন্যদিকে যদিও ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী নব্যযুবকদল উপবীত ও উপবীতধারী আচার্যগণকে যুগপৎ বর্জন করিবার উৎসাহে ও অন্যান্য কয়েকটি কারণে 'আদি সমাজ' হইতে পৃথক্ হইয়া 'ভারতবর্ষীয়' সমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং নূতন মুখপাত্র ও মুখপত্র অবলম্বন করিয়া হিন্দুসমাজকে হিন্দু সমাজের সহিত অপেক্ষাকৃত অধিক সহানুভূতি সম্পন্ন আদি ব্রাহ্মগণকে বেশ মিঠা কড়া—যত মিঠা নয় তত কড়া—উক্তি শুনাইয়া দিতেছিলেন, এবং যদিও তাঁহাদেরই কেহ কেহ হিন্দুধর্ম অপেক্ষা খৃস্টীয় ধর্মে উন্নততর আদর্শ এবং অধিকতর সান্ত্বনার স্থল লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তথাপি ইহাও স্মরণযোগ্য যে, তাঁহারাও খৃস্ট প্রচারিত নীতির অনুরাগী হইয়াও খৃস্টানি ষোল আনা গ্রহণ করেন নাই। সমাজের নবজাগরিত আত্মাদরের ফলে তাঁহারা সর্বাংশে অন্ধভাবে পরানুকরণের পক্ষপাতী ছিলেন না। সমাজের আত্মাদর কেমন প্রবলভাবে বাড়িয়া যাইতেছিল তাহার প্রমাণরূপে বলা যাইতে পারে যে, যেমন একদিকে বহু লোক ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করিতেছিলেন, কেহ কেহ বা খৃস্টানও হইতেছিলেন তেমনই অন্যদিকে দেশের সর্বত্র বহু হিন্দুধর্মসংরক্ষিণী সভাও স্থাপিত হইতেছিল। যদিও এইগুলিতে স্বধর্মরক্ষার নামে অনেক কুসংস্কার ও কুআচারের অনুচিত প্রশংসাও চলিতেছিল, তথাপি প্রতিক্রিয়া হিসাবে ইহা দূষণীয় বলিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। তর্কস্থলে একপক্ষপাতিতা দোষাবহ নহে—গোঁড়া হিন্দুর পক্ষেও নহে, হিন্দুদ্বেষীর পক্ষেও নহে।[১] তবে তর্কের জন্য কোনও সমাজের অনুচিত নিন্দা কখনও সমর্থনযোগ্য নহে। এই সময়ে কোনও পক্ষই যে সে দোষ হইতে মুক্ত ছিলেন, তাহা নহে। বস্তুতঃ 'সংস্কারক'গণের অযথা নিন্দা বা অত্যুক্তির ফলেই হিন্দুসমাজের আত্মাদর অধিক জাগিয়াছিল। কিন্তু এই আত্মাদরেরও বিশেষত্ব ছিল। শিক্ষিতসমাজে ইহা ধীর সংস্কারের একেবারে বিরোধী ছিল না। বিদ্যাসাগরের প্রবর্তিত বিধবাবিবাহের আন্দোলন ইহার উদাহরণ। সকল হিন্দুই ইহার বিরোধী ছিল না। অনেকেরই মনোভাব এইরূপ ছিল,—'ইহা যদি শাস্ত্রসম্মত হয়, তবে চলিতে বাধা নাই'। আরও একটি উদাহরণ উল্লেখযোগ্য। বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হইবার সমকালে বা অল্পপূর্বে শ্রদ্ধাস্পদ রাজনারায়ণ বসু হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতাবিষয়ক এক বক্তৃতা করেন। রাজনারায়ণ বাবু ব্রাহ্ম হইলেও এক গোঁড়া হিন্দুসভা তাঁহাকে 'কলির ব্যাস' আখ্যা দিতে

---

১। জন স্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন,—No sober judge of human affairs will feel bound to be indignant because those who force on our notice truths which we should otherwise have overlooked, overlook some of those which we see. Rather he will think that so long as popular truth is one-sided it is more desireable than otherwise that unpopular truth should have one-sided asserters too. *Liberty*. Chap. II.

প্রবৃত্ত হইয়াছিল, আর বহু দিন ধরিয়া নব্য ব্রাহ্মগণ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কটূক্তি বর্ষণ করিতেছিলেন। রাজনারায়ণবাবুর বক্তৃতা অবশ্যই কুসংস্কার বা গোঁড়ামির সমর্থক ছিল না; কিন্তু যে ভাবে প্রায় সকল শ্রেণীর হিন্দুগণ এবং অপেক্ষাকৃত ধীরপ্রকৃতি ব্রাহ্মগণ ঐ বক্তৃতার প্রতি আদর প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে বুঝা যায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবের সমন্বয়জন্য দেশটা বিশেষ ভাবেই আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই আগ্রহকে অবলম্বন করিয়াই বঙ্গদর্শনের সমাজশিক্ষাপ্রয়াস উর্জস্বল ও সফল হইয়া উঠিয়াছিল।

অবশ্য সামাজিক সমস্যা নানাবিধ; তাহার কতকগুলি কোনও না কোনও আকারে চিরন্তন, আর কতকগুলি দেশীয় সমাজ পাশ্চাত্য সভ্যতার ও চিন্তার সংঘর্ষে আসায় অপেক্ষাকৃত নূতনতর আকারে আবির্ভূত হইয়াছিল। সমস্ত সমাজটা যখন নৈমিত্তিকপ্রলয়গ্রস্ত তখন চিরন্তন সমস্যাগুলিও কিছু উৎকট আকারে আত্মপ্রকাশ করিবে ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। সাধারণ শিক্ষা, উচ্চ-শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, সমাজে স্ত্রীগণের অধিকার, বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ, জাতিভেদ, ধর্মসংস্কার, শাস্ত্রানুগত্য, স্বাধীনচিন্তা ও স্বাধীন আচরণ, শিল্প, রাজনীতি—সকলই তখন শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রের আলোচ্য হইয়াছিল এবং সকল দিকেই আমূল পরিবর্তন আবশ্যক বলিয়া এক শ্রেণীর লোক সময়ে অসময়ে তারস্বরে ঘোষণা করিতেছিল। বঙ্গদর্শন কোনও পক্ষ অবলম্বন না করিয়া শিক্ষিত সমাজের মুখপত্ররূপে উহাদের কতকগুলি সমস্যা সমাধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। "এই পত্র আমরা কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের হস্তে এই কামনায় সমর্পণ করিলাম যে, তাঁহারা ইহাকে আপনাদের বার্তাবহ স্বরূপ ব্যবহার করুন। বাঙ্গালী সমাজে ইহা তাঁহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপি কৌশল, এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক্। তাঁহাদিগের উক্তি বহন করিয়া ইহা বঙ্গমধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক।......এই পত্র কোনও বিশেষ পক্ষের সমর্থন জন্য বা কোন সম্প্রদায় বিশেষের মঙ্গলসাধনার্থ সৃষ্ট হয় নাই।......যাহাতে এই পত্র সর্বজনপাঠ্য হয় তাহা আমাদিগের বিশেষ উদ্দেশ্য। যাহাতে সাধারণের উন্নতি নাই, তাহাতে কাহারও উন্নতি সিদ্ধ হইতে পারে না।"

রাজনীতি ও ধর্মসম্বন্ধিনী সমস্যাগুলির বিষয় পরে যথাস্থলে স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হইবে। ধর্ম ও রাজনীতি ছাড়া বঙ্গদর্শনের যুগে বঙ্গীয় সমাজের ভাবিবার যোগ্য অন্যতর বৃহৎ সমস্যা ছিল—বাঙ্গালী উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া অশনবসনে এবং আদবকায়দায় কি বাঙ্গালীই থাকিবে, না যতদূর সম্ভব সাহেব সাজিবার চেষ্টা করিবে? দুই পক্ষেই গোঁড়ার সংখ্যা প্রচুর ছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি সেকালের বাঙ্গালীর অবহেলার কথা সর্বজনবিদিত। বাঙ্গালা বহি পড়া দূরে থাকুক, শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অনেকে বাঙ্গালায় কথা বলা পর্যন্ত নিজের বিদ্যা ও রুচির অবমাননাজনক মনে করিতেন। বঙ্গদর্শনের 'পত্র সূচনা' প্রবন্ধেই বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, "এখন নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও কাজই বাঙ্গালায়

হয় না। বিদ্যালোচনা ইংরেজিতে, সাধারণের কার্য, মিটিং, লেকচার, এসে, প্রসিডিংস্ সমুদয় কার্য ইংরেজিতে। যদি উভয় পক্ষ ইংরেজি জানেন, তবে কথোপকথনও ইংরেজিতেই হয়, কখন ষোল আনা, কখন বার আনা ইংরেজি। ......পত্র লেখা কখনই বাঙ্গালায় হয় না। আমরা কখন দেখি নাই যে যেখানে উভয়পক্ষ ইংরেজির কিছু জানেন, সেখানে বাঙ্গালায় পত্র লেখা হইয়াছে। আমাদিগের এমনও ভরসা আছে যে, অগৌণে দুর্গোৎসবের মন্ত্রাদি ইংরেজিতে পঠিত হইবে।" এই দোষ আধুনিক কালে পূর্বাপেক্ষা কম হইলেও, একেবারে যায় নাই। অথচ ইংরাজী ভাষায় যাঁহার কিছু জ্ঞান আছে, তিনিই জানেন, অধিকাংশ বাঙ্গালী ইংরাজী লিখিতে বা বলিতে গিয়া ঐ ভাষার কিরূপ বিড়ম্বনা করে। এদিকে মাতৃভাষার চর্চার অভাবে বা উহার প্রতি অবহেলার প্রভাবে, তাহারা ঐ ভাষাও শুদ্ধরূপে লিখিতে ও বলিতে পারে না। এই ভাষাসমস্যা সম্বন্ধে বঙ্কিম কি সমাধান করিয়াছিলেন ?

> "আমরা ইংরেজি বা ইংরেজের দ্বেষক নহি। ইহা বলিতে পারি যে, ইংরেজ হইতে এদেশের লোকের উপকার হইয়াছে, ইংরেজি শিক্ষাই তাহার মধ্যে প্রধান। অনন্তরত্নপ্রসূতি ইংরেজি ভাষার যতই অনুশীলন হয়, ততই ভাল। আরও বলি, সমাজের মঙ্গলের জন্য কতকগুলি সামাজিক কার্য রাজপুরুষদিগের ভাষাতেই সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। আমাদিগের এমন অনেকগুলি কথা আছে, যাহা রাজপুরুষদিগকে বুঝাইতে হইবে। সে সকল কথা ইংরেজিতেই বক্তব্য। এমত অনেক কথা আছে যে তাহা কেবল বাঙ্গালীর জন্য নহে, সমস্ত ভারতবর্ষ তাহার শ্রোতা হওয়া উচিত, সে সকল কথা ইংরেজিতে না বলিলে সমগ্র ভারতবর্ষ বুঝিবে কেন ? ভারতবর্ষীয় নানাজাতি একমত এক পরামর্শী একোদ্যোগী না হইলে ভারতবর্ষের উন্নতি নাই। একমতত্ব, একপরামর্শিত্ব, একোদ্যম, কেবল ইংরেজির দ্বারা সাধনীয় ; কেন না সংস্কৃত এখন লুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রী, তৈলঙ্গী পাঞ্জাবী—ইহাদিগের সাধারণ মিলনভূমি ইংরেজি ভাষা। এই রজ্জুতে ভারতীয় ঐক্যের গ্রন্থি বাঁধাইতে হইবে।[১] অতএব যতদূর ইংরেজি চলা আবশ্যক, ততদূর চলুক, কিন্তু একেবারে ইংরেজ হইয়া বসিলে চলিবে না। বাঙ্গালী কখনও ইংরেজ হইতে পারিবে না। বাঙ্গালী অপেক্ষা ইংরেজ অনেক গুণে গুণবান্ এবং অনেক সুখে সুখী।

---

১। বঙ্কিমচন্দ্রের এই মতগুলি কংগ্রেস স্থাপিত হওয়ার পূর্বে প্রকাশিত হয়। কংগ্রেস তাঁহার মতগুলি সফল করিয়াছে। এখন কিন্তু রাজনৈতিক সভা সমিতিতেও প্রত্যেক প্রদেশেই স্থানীয় মাতৃভাষার ক্রমশঃ প্রসার হইতেছে। কেন না এখনকার আন্দোলন আর পূর্বের মত বহির্মুখ নহে—উহা একমাত্র বিদেশীয় রাজপুরুষগণের অবগতির জন্য করা হয় না। এখন উহা অনেকটা অন্তর্মুখ ; স্বদেশীয় জনগণকে শিক্ষাদানই ক্রমশঃ উহার উদ্দেশ্য হইয়া উঠিতেছে।

যদি এই তিন কোটি বাঙ্গালী হঠাৎ তিন কোটি ইংরেজ হইতে পারিত, তবে সে মন্দ ছিল না। কিন্তু তাহার কোন সম্ভাবনা নাই।[১] আমরা যত ইংরেজি পড়ি, যত ইংরেজি কহি বা যত ইংরেজি লিখি না কেন, ইংরেজি কেবল আমাদিগের মৃতসিংহের চর্ম-স্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময় ধরা পড়িব। পাঁচ সাত হাজার নকল ইংরেজ ভিন্ন তিন কোটি সাহেব কখনই হইয়া উঠিবে না। গিলটি পিতল অপেক্ষা খাঁটি রূপা ভাল। প্রস্তরময়ী সুন্দরী মূর্তি অপেক্ষা কুৎসিতা বন্যনারী জীবনযাত্রার সুসহায়। নকল ইংরাজ অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গালী স্পৃহণীয়। যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোনও সম্ভাবনা নাই।

হঠাৎ তিন কোটি বাঙ্গালী তিন কোটি ইংরেজে পরিণত হইতে পারিলেই যে বাঙ্গালীর পক্ষে সেটা একটা পরম গতি হইল তাহা বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই মনে করিতেন কি না বলা যায় না। বিশ্বসভ্যতায়, কেবল ইংরেজেরই স্থান আছে, বাঙ্গালীর কোনও স্থান নাই ইহা মনে করা অযৌক্তিক। সামাজিক উন্নতি-বিধান সম্পর্কেও যে ইংরেজ শেষ কথা বলিয়াছে বা শেষ কার্য করিয়া ফেলিয়াছে তাহাও নহে। এ কথাগুলি আধুনিক কালে আমরা ক্রমশঃ অধিক স্পষ্টরূপ বুঝিতে পারিতেছি। বঙ্কিমের সময়ে ঐ সত্য ততদূর স্পষ্ট উপলব্ধ হয় নাই। তাই উপরিলিখিত কথাগুলিতে বাঙ্গালীকে বাঙ্গালা লিখিবার বলিবার আবশ্যকতা বুঝাইতে গিয়া বঙ্কিমকে অন্যরূপ যুক্তির অবতারণা করিতে হইয়াছে। অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, বিশ্বসভ্যতায় যে বাঙ্গালীর স্থান আছে বা করিয়া লইতে হইবে এ ধারণাও বাঙ্গালীর বঙ্কিমযুগেই আরব্ধ ও উত্তরোত্তর বর্ধমান আত্মাদরের ও তৎসহকৃত আত্মপরিচয়ের ফল। ইদানীং সার জন্ উড্রফ প্রভৃতি মনীষী ব্যক্তিগণ যেরূপ যুক্তি দিয়া ভারতবাসীকে বিলাতী সভ্যতার বিনিময়ে স্বীয় সনাতনী সভ্যতা বিসর্জন দিতে নিষেধ করিতেছেন, তাহা একালেও সকলের পক্ষে সহজবোধ্য নহে; সেরূপ যুক্তি বঙ্কিমের যুগে প্রদত্ত হইলে বাঙ্গালী বুঝিত কি? কেন না তখন শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্য ও

---

১। তৃতীয়বর্ষের বঙ্গদর্শনে 'প্রাচীনা ও নবীনা' প্রবন্ধে বঙ্কিম লিখিয়াছিলেন, "আমাদিগের সমাজসংস্কারকেরা নূতন কীর্তিস্থাপনে যাদৃশ ব্যগ্র, সমাজের গতি পর্যবেক্ষণে তাদৃশ মনোযোগী নহেন। 'এই হইলে ভাল হয়, অতএব এই কর' ইহাই তাঁহাদিগের উক্তি, কি করিতে কি হইতেছে তাহা কেহ দেখেন না।......দিন কত ধূম পড়িল, স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার সংস্কার কর......পাঁচী, রামী, মাধীকে বিলাতী মেম করিয়া তুল। ইহা করিতে পারিলে যে ভাল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই; কিন্তু পাঁচী যদি কখন বিলাতী মেম হইতে পারে, তবে আমাদিগের শালতরুও একদিন ওকবৃক্ষে পরিণত হইবে, এমন ভরসা করা যাইতে পারে।"

পাশ্চাত্য জাতিসমূহের বৈষয়িক উন্নতিদর্শনে একান্ত মুগ্ধ, এবং সর্ববিষয়ে তাহাদের অনুকরণ করিতে উদ্যত। তাহারা আপনাদিগকে ত চিনেই নাই, যাহাদের অনুকরণে ব্যগ্র ছিল তাহাদের সভ্যতারও যথার্থ প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। একের পক্ষে যাহা পথ্য, তাহা যে অন্যের পক্ষে বিষ হইতে পারে, ইহা সামাজিক ব্যাপারে সহজে সকলে উপলব্ধি করে না। তাই সেকালে গরিষ্ঠ কার্যকারিতা বা বহুতম লোকের ভূয়িষ্ঠ উপকারিতা প্রভৃতি যুক্তি ছাড়া বহির্মুখ বাঙ্গালীকে অন্তর্মুখ করিবার উৎকৃষ্টতর উপায় ছিল না। বঙ্কিম সেই উপায়ই অবলম্বন করিয়াছেন, তিনি কোন্‌টা সুসাধ্য, কোন্‌টা অসাধ্য, কোন্‌টাতে উপকারিতা বহুজনব্যাপী ও কোন্‌টাতে তাহা নয় তাহাই দেখাইয়া দিয়া শিক্ষিত বাঙ্গালীকে আত্মভাবার অনুশীলন করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

আধুনিক কালে বাঙ্গালীর আত্মাদরের প্রাবল্যে আবার অনেক স্থলে ইংরেজ-বিদ্বেষ বড় অনুচিত মাত্রায় প্রকাশ পাইতেছে। বঙ্কিমের যুগেও ইংরেজবিদ্বেষ ছিল, কিন্তু তাহার প্রকৃতি অন্যরূপ ছিল। ইংরেজ ও ইংরাজীর প্রতি ঐকান্তিক বিদ্বেষ যে এদেশবাসিগণের উন্নততম স্বার্থের বিরোধী তাহা বঙ্কিম স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন, এবং তাহা কুত্রাপি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তবে এক্ষেত্রেও অন্ধ অনুরাগের ফল যে বাঙ্গালীর পক্ষে মঙ্গল্য ও শোভন নয় তাহাও তিনি স্পষ্ট ভাবে বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বাঙ্গালীর ইংরাজী পোষাক অবলম্বন ঐরূপ অন্ধ অনুরাগের চিহ্ন। ইহা বঙ্কিম কদাপি প্রীতির চক্ষে দেখেন নাই। বঙ্কিম ইহাকে মার্কটী বৃত্তি মনে করিয়া নিন্দা করিয়াছেন। "একদা প্রাতঃসূর্য্য-কিরণোদ্ভাসিত কদলীকুঞ্জে শ্রীমান্ হনুমান্ বায়ুসেবনার্থ পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। ... ... এমত সময়ে দৈবযোগে বুট, কোট, পেণ্টুলন, চেন, চস্‌মা, চুরুট, চাবুকধারী, টুপ্যাবৃতমস্তক এক নব্য বাবু তথায় উপস্থিত। হনুমান্‌চন্দ্র দূর হইতে এই অপূর্ব মূর্তি দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন, 'কে এ? আকার ইঙ্গিতে বোধ হইতেছে, নিশ্চয় কিষ্কিন্ধ্যা হইতে এ আসিতেছে। এরূপ পরানুকৃত বেশ, গমন, চাহনি প্রভৃতি অন্য কোন দেশে অসম্ভব। এ আমার স্বদেশী ও স্বজাতি অতএব ইহাকে আমি অবশ্য আদর করিব।'"[১]

বাঙ্গালীর বিদেশী পোষাক ব্যবহার-সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন। বাঙ্গালীর প্রাচীন পোষাক আধুনিক কালের পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থার উপযোগী নয়, ইহা সত্য—তাই স্ত্রীপুরুষ সকলকেই উহা আংশিক পরিমাণে সংশোধন করিয়া লইতে হইয়াছে। বাঙ্গালী পুরুষ ধুতি-চাদরের সহিত দেশী ধরনের সার্ট-কোট[২] এবং স্ত্রীলোকগণ সাড়ীর সহিত সেমিজ-জ্যাকেট পরিতেছেন।

---

১। 'লোকরহস্য', 'হনুমদ্‌বাবু সংবাদ'।

২। আফিস-আদালতে প্যাণ্টালুন ও তৎসঙ্গে চাপকান বা কোট পুরুষগণের পক্ষে

ইহার অনেকটাই আবশ্যক সংস্কার, এবং খুব একটা গুরুতর পরিবর্তন নহে। কিন্তু পুরুষের পক্ষে হ্যাট-কোট-প্যান্ট-গলাবন্ধ, স্ত্রীলোকের পক্ষে গাউন-ব্লাউজ ইত্যাদি সম্বন্ধে সেকথা বলা চলে না। এতটা পরানুকরণ তাহাদের জাতীয় আত্মসম্মানের বিরোধী ত বটেই, এমন কি সুরুচি ও সৌন্দর্যবোধেরও পরিচায়ক নহে।

পরানুকরণবৃত্তি দ্বারা বাঙ্গালীর সৌন্দর্যবোধের কিরূপ বীভৎস বিপর্যয় সাধিত হইয়াছে, তাহা ভাবিলে যেমন বিস্ময় জন্মে তেমনই হৃদয় দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। আধুনিক কালে ভারতের সর্বত্রই এই অবনতি লক্ষিত হয়। ইহার প্রকৃতি ও হেতু মহামতি হ্যাভেল, শ্রীযুক্ত কুমারস্বামী প্রভৃতি অতি স্পষ্টভাবেই নির্দেশ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, এই সকল মহাশয় ব্যক্তির ঐকান্তিক চেষ্টাতেও শিক্ষিতসমাজের রুচি পরিবর্তিত হইতেছে না। এককালে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণের মধ্যেও নিপুণ সৌন্দর্যবোধ ও শিল্পজ্ঞান দেখা যাইত; গৃহসজ্জা, তৈজসপত্র, হাঁড়িকুঁড়ির মধ্যেও বিচিত্র শিল্প দেখা যাইত। কিন্তু সমাজের উচ্চ-স্তরের লোকদিগের রুচিবিকারের ফলে নিম্নস্তরের লোকেরাও শিল্পজ্ঞান এবং তৎসঙ্গে সৌন্দর্যবোধ হারাইয়া ফেলিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীজীবনে 'সূক্ষ্মশিল্পের' অনাদর লক্ষ্য করিয়াছিলেন, এবং তাহাদের রুচিবিপর্যয়ও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া-ছিলেন। হাভেল বা কুমারস্বামী বা অবনীন্দ্রনাথ বঙ্কিমযুগের বহু পরে দেশীয় শিল্প-কলার আদর্শব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বঙ্কিমের শিল্পবিচারশক্তি ইহাদের তুল্য সমুন্নত না হইলেও ইহাদের বহু পূর্বে যে তিনি দেশীয় সমাজে শিল্পকলার অবনতি ও ও দেশীয় ব্যক্তিগণের শিল্প সম্বন্ধে অরসজ্ঞতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে কম গৌরবের বিষয় নহে। তিনি আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন—

> কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য, ভাস্কর্য, স্থাপত্য এবং চিত্র এই ছয়টি সৌন্দর্যজনিকা বিদ্যা।......এই ছয়টি বিদ্যায় মনুষ্যজীবন ভূষিত ও সুখময় করে। ভাগ্যহীন

---

অবশ্যব্যবহার্য বলিয়া বিধি আছে। যেখানে কোনওরূপ বাধ্যতা নাই তথায় ধুতি-চাদর ও সার্ট বা কোট না পরিয়া হ্যাট্-কোট পড়িয়া দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায়, 'বিদেশী বাঁদর' সাজিবার কি প্রয়োজন? বাঙ্গালী সাহেবী কোটের একটা দেশীয় সংস্করণ করিয়াছে; তাহা মন্দ নয়। ধুতির সঙ্গে ও অফিস-আদালতে প্যান্টালুনের সঙ্গে উহার অসমঞ্জস্য হয় না। কিন্তু তথাপি দেখা যায় লোকে প্যান্টালুনের সঙ্গে দেশী ধরনের কোট না পরিয়া বিলাতী ধরনের গলাকাটা কোট, গলাবন্ধ, হ্যাট ইত্যাদি পরেন। আফিসের বাহিরে কখনও কখনও দেখা যায় ধুতির সঙ্গে গলাকাটা কোট ও গলাবন্ধও (necktie) পরা হয়। মেয়েরা মেমদের সেমিজ, বডিস্ পেটিকোট নিয়াছেন, কেবল ('নেটিভ খৃস্টান' ছাড়া অন্য মেয়েরা) অদ্যাপি গাউনটা নেন নাই। ইদানীং আবার তাঁহারা জ্যাকেট বা বডিস্ ছাড়িয়া মেমসাহেবদের অনুকরণে ব্লাউজ ধরিয়াছেন। মেয়েরা যতদিন পুরাহাতা ব্লাউজ পরিতেন, ইঁহারাও ততদিন সেইরূপ ব্লাউজ পরিতেন। আবার মেয়েরা যেই হাফ-হাতা ব্লাউজ ধরিলেন, ইঁহারাও অমনি সেইরূপ ব্লাউজ পরিয়া বাহুর সৌন্দর্যবিকাশে মনোযোগিনী হইলেন। বালক-বালিকাদের ত বিদেশী পরিচ্ছদ অবশ্যপরিধেয় বলিয়া গণ্য হইয়া উঠিয়াছে। মার্কটীবৃত্তি আর কাহাকে বলে? অথচ ইহার নাম সুরুচি।

বাঙ্গালীর কপালে এ সুখ নাই। সূক্ষ্মশিল্পের সঙ্গে তাহার বড় বিরোধ। তাহাতে বাঙ্গালীর বড় অনাদর, বড় ঘৃণা। বাঙ্গালী সুখী হইতে জানে না। স্বীকার করি, সকল দোষটুকু বাঙ্গালীর নিজের নহে। কতকটা বাঙ্গালীর সামাজিক রীতির দোষ।......কতকটা বাঙ্গালীর দারিদ্র্য জন্য।.....কতকটা হিন্দুধর্মের দোষ।.........দুই-চারিজন ধনাঢ্য বাবু ইংরেজদিগের অনুকরণ করিয়া ইংরেজের ন্যায় গৃহাদির পারিপাট্য বিধান করিয়া থাকেন। বাঙ্গালী নকলনবিশ ভাল, নকলে শৈথিল্য নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের ভাস্কর্য এবং চিত্রসংগ্রহ দেখিলেই বোধ হয় যে, অনুকরণস্পৃহাতেই ঐ সকল সংগ্রহ ঘটিয়াছে—নচেৎ সৌন্দর্যে তাঁহাদিগের আন্তরিক অনুরাগ নাই। এখানে ভাল-মন্দের বিচার নাই, মহার্ঘ হইলেই হইল; সন্নিবেশের পারিপাট্য নাই, সংখ্যায় অধিক হইলেই হইল।

বঙ্গদর্শন বা বঙ্কিমচন্দ্র এই বিষয়টি যত সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, এখন মনে হয় বিষয়ের গুরুত্ব হিসাবে তাহা সমীচীন হয় নাই। তবে দেশটা তখনও এশিক্ষার জন্য প্রস্তুত হয় নাই। সুনিপুণ শিক্ষকেরও অভাব ছিল। এখনই কি দেশ সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইয়াছে? এখনই কি দেশীয় চিত্রকলা বা অন্য শিল্প বিলাতী অনুকরণের মোহ হইতে মুক্ত হইয়াছে? বিষয়টা সকলেরই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বলিয়া এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কথা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে—

আর্টস্কুলে ভর্তি হইয়াছি, কিন্তু আমাদের দেশের শিল্পকলার আদর্শ যে কি তাহা আমরা জানিই না। যদি শিক্ষার দ্বারা ইহার পরিচয় পাইতাম, তবে যথার্থ একটা শক্তিলাভ করিবার সুবিধা হইত। কারণ, এ আদর্শ দেশের মধ্যেই আছে—একবার যদি আমাদের দৃষ্টি খুলিয়া যায়, তবে ইহাকে আমাদের সমস্ত দেশের মধ্যে, থালায়, ঘটিতে, বাটিতে, ঝুড়িতে, চুপ্‌ড়িতে, মন্দিরে, মঠে, বসনে, ভূষণে, পটে, গৃহভিত্তিতে নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-পরিপূর্ণ একটি সমগ্র মূর্তিরূপে দেখিতে পাইতাম, ইহার প্রতি আমাদের সচেষ্ট চিত্তকে প্রয়োগ করিতে পারিতাম—পৈতৃক সম্পত্তি লাভ করিয়া তাহাকে ব্যবসায়ে খাটাইতে পারিতাম।

... ... ...

আমরা দেখিয়াছি, জাপানের একজন সুবিখ্যাত চিত্ররসজ্ঞ পণ্ডিত এদেশের কীটদষ্ট কয়েকটি পটের ছবি দেখিয়া বিস্ময়ে পুলকিত হইয়াছেন—তিনি একখানি পট এখান হইতে লইয়া গেছেন, সেখানি কিনিবার জন্য জাপানের অনেক গুণজ্ঞ তাঁহাকে অনেক মূল্য দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তিনি বিক্রয় করেন নাই।

আমরা ইহাও দেখিতেছি, য়ুরোপের বহুতর রসজ্ঞ ব্যক্তি আমাদের অখ্যাত দোকান-বাজার ঘাঁটিয়া মলিন ছিন্ন কাগজের চিত্রপট বহুমূল্য সম্পদের ন্যায়

সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতেছেন। সে সকল চিত্র দেখিলে আমাদের আর্টস্কুলের ছাত্রগণ নাসাকুঞ্চন করিয়া থাকেন। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই, কলাবিদ্যা যথার্থভাবে যিনি শিখিয়াছেন, তিনি বিদেশের অপরিচিত রীতির চিত্রের সৌন্দর্যও ঠিকভাবে দেখিতে পান—তাঁহার একটি শিল্পদৃষ্টি জন্মে। আর যাহারা কেবল নকল করিয়া শেখে, তাহারা নকলের বাহিরে কিছুই দেখিতে পায় না।

... ... ...

"পিয়ের লোটি" ছদ্মনামধারী বিখ্যাত ফরাসী ভ্রমণকারী ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতে আসিয়া আমাদের দেশীয় রাজনিকেতনগুলিতে বিলাতী আসবাবের ছড়াছড়ি দেখিয়া হতাশ হইয়া গেছেন। তিনি বুঝিয়াছেন যে, বিলাতী আসবাবখানার নিতান্ত ইতর শ্রেণীর সামগ্রীগুলি ঘরে সাজাইয়া আমাদের দেশের বড় বড় রাজারা নিতান্তই অশিক্ষা ও অজ্ঞাতবশতই গৌরব করিয়া থাকেন।

... ... ...

দুর্ভাগ্যক্রমে সকল দেশেরই ইতর সম্প্রদায় অশিক্ষিত। সাধারণ ইংরেজের শিল্পজ্ঞান নাই—সুতরাং তাহারা স্বদেশী সংস্কারের দ্বারা অন্ধ। তাহারা আমাদের কাছে তাহাদেরই অনুকরণ প্রত্যাশা করে। আমাদের বসিবার ঘরে তাহাদের দোকানের সামগ্রী দেখিলে তবেই আরাম বোধ করে,—তবেই মনে করে, আমরা তাহাদেরই ফরমায়েসে তৈরি সভ্য পদার্থ হইয়া উঠিয়াছি। তাহাদেরই অশিক্ষিত রুচি অনুসারে আমাদের দেশের প্রাচীন শিল্পসৌন্দর্য সুলভ ও ইতর অনুকরণকে পথ ছাড়িয়া দিতেছে। এদেশের শিল্পীরা বিদেশী টাকার লোভে বিদেশী রীতির অদ্ভুত নকল করিতে প্রবৃত্ত হইয়া চোখের মাথা খাইতে বসিয়াছে।

যেমন শিল্পে তেমনি সকল বিষয়েই। আমরা বিদেশী প্রণালীকেই একমাত্র প্রণালী বলিয়া বুঝিতেছি। কেবল বাহিরের সামগ্রীতে নহে, আমাদের মনে, এমন কি, হৃদয়ে নকলের বিষবীজ প্রবেশ করিতেছে।[১]

দেশীয় লোকে উচ্চশ্রেণীর ইংরেজের আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি ইত্যাদি অল্পই দেখে। অপেক্ষাকৃত নিম্ন বা সাধারণ শ্রেণীর সাহেব-মেমেরাই তাহাদের আদর্শ। তাই সমগ্র দেশটা কাপড়চোপড়, আসবাবপত্র, শিল্প, সঙ্গীত, কাব্য, উপন্যাস,—সর্ববিষয়ে বিলাতীর এমন হীন অনুকরণে মত্ত, ও বিপদ্‌গ্রস্ত। যে কথা আজ আমরা হাভেলের মুখে শুনিতেছি, সমাজের প্রাণের যে নিগূঢ় আস্বাদর আমাদের অবনীন্দ্রনাথের তুলিকায় এবং রবীন্দ্রনাথ ও কুমারস্বামীর লেখনীতে

১। 'স্বদেশ', 'দেশীয় রাজ্য'-শীর্ষক প্রবন্ধ।

উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, দেশীয় লোকের দুর্বুদ্ধিতে বা অজ্ঞতায়, বা মোহে তাহা এখনও সকলের প্রাণস্পর্শ করিতে পারিতেছে না।

সঙ্গীতবিদ্যা উপলক্ষ করিয়াও বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র অনেক সারকথা বলিয়াছেন। শিক্ষিত বাঙ্গালী দেশীয় সব সংস্কারকে ঘৃণা করিতেছিল—দেশীয় সঙ্গীত তাহার অন্যতম। অশিক্ষিতের মধ্যে সঙ্গীতের চর্চা ছিল, কিন্তু স্বপরিবারের বিশুদ্ধ আবেষ্টনের মধ্যে নয়—ইয়ারের দলে, বারাঙ্গনা-মহলে। সঙ্গীত সম্বন্ধে প্রাচীনগণের সূক্ষ্মদর্শিতা ও নিপুণ রসজ্ঞতা বঙ্কিমের দৃষ্টি এড়ায় নাই। সেকালে রাগরাগিণীগণের মূর্তিকল্পনা অনেকে রহস্য বা রসিকতামাত্র মনে করিত, এখনও অনেকে করেন। কেহ ভাবিয়া দেখে না ঐরূপ মূর্তিকল্পনায় দেশীয় সঙ্গীতরসজ্ঞ চিত্রশিল্পিগণের কিরূপ নিপুণ রসজ্ঞতা ও বিচারশক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে—

> দুই একটি উদাহরণ দেই। অনেকেই টৌড়ি রাগিণী শুনিয়াছেন। সহৃদয় ব্যক্তিরা তচ্ছ্রবণে যে একটি অনির্বচনীয় ভাবে অভিভূত হয়েন, তাহা সহজে বক্তব্য নহে। সচরাচর কবিরা যাহাকে 'আবেশ' বলিয়া থাকেন, তাহা ঐ ভাবের একাংশ—কিন্তু একাংশমাত্র। তাহার সঙ্গে ভোগাভিলাষ মিলিত কর। সে ভোগাভিলাষ নীচপ্রবৃত্তি নহে। যাহা কিছু নির্মল, সুখকর, অন্যজনের অসাপেক্ষ, কেবল আধ্যাত্মিক, সেই ভোগেরই অভিলাষ। কিন্তু সে ভোগাভিলাষের সীমা নাই, তৃপ্তি নাই, রোধ নাই, শাসন নাই। ভোগে এবং ভোগসুখে অভিলাষ আপনি উছলিয়া উঠিতেছে। আকাঙ্ক্ষা বাড়িতেছে। প্রাচীনেরা এই টৌড়ি রাগিণীর মূর্তি কল্পনা করিয়াছেন। সে পরমাসুন্দরী যুবতী, বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা, কিন্তু বিরহিণী। আকাঙ্ক্ষার অনিবৃত্তি-হেতুই তাহাকে বিরহিণী কল্পনা করিতে হইয়াছে। এই বিরহিণী সুন্দরী বন-বিহারিণী, বনমধ্যে নির্জনে একাকিনী বসিয়া মধুপানে উন্মাদিনী হইয়াছে, বীণা বাজাইয়া গান করিতেছে, তাহার বসন-ভূষণ সকল স্খলিত হইয়া পড়িতেছে, বন-হরিণী সকল আসিয়া তাহার সম্মুখে তটস্থভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।
>
> এই চিত্র অনির্বচনীয় সুন্দর—কিন্তু সৌন্দর্য ভিন্ন ইহার আর এক চমৎকার গুণ আছে। ইহা টৌড়ি রাগিণীর যথার্থ প্রতিমা। টৌড়ি রাগিণী শ্রবণে মনে যে ভাবের উদয় হয়, এই প্রতিমাদর্শনে ঠিক সেই ভাব জন্মিবে।

উপরিলিখিত উক্তিটি একদিকে যেমন প্রাচীনগণের সঙ্গীতরসজ্ঞতা ও বিচার-শক্তির সমর্থক তেমনই আধুনিক কালের সঙ্গীতরসিকমানী বাবুগণেরও ভাবিবার যোগ্য। ইহাদের অনেকেই আপনাদিগকে সঙ্গীতপ্রিয় বলিয়া প্রচার করেন, কিন্তু রাগিণী আলাপ শুনিলে সন্ত্রস্ত হইয়া সভাস্থল ত্যাগের উদ্যোগ করেন। ইহাদের ধারণা এই যে, সাদা সিধা একটা সুরসংযোগে গানের পদগুলিকে অধিকতর চিত্তাকর্ষণক্ষম করিয়া তোলাই সঙ্গীতের একমাত্র প্রয়োজন। রাগরাগিণীর যে গানের পদ-নিরপেক্ষ একটা মর্যাদা, একটা অর্থ, একটা

ভাবোদ্বোধিকা শক্তি আছে, ইহা অনেকে ধারণা করিতে পারে না। এই অরসজ্ঞতার সহিত পরাণুকরণ-প্রবৃত্তির মিলনের ফলে বাঙ্গালা গানের সঙ্গে অনেক-স্থলে বিলাতী যন্ত্রের অসফল সঙ্গত আরব্ধ হইয়াছে। ইহাতে সাধারণের উপভোগ্য মাঝারি রকমের সঙ্গীতের কাজ একরূপ চলিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু দেশীয় সঙ্গীতের উচ্চতম আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইতেছে। বিলাতী সঙ্গীতের প্রাণ—সঙ্গতে বা ঐক্যতানে বা harmonyতে ; আর দেশীয় সঙ্গীতের প্রাণ—স্বর হইতে স্বরের আরোহাবরোহ-প্রক্রিয়াগত বৈচিত্র্যে, বা তাহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্দায় আদায়-প্রণালীতে বা melodyতে। বিলাতী হারমোনিয়ম, অর্গ্যান, বা পিয়ানো দ্বারা তাহা আদায়যোগ্য নহে। তাই দেশীয় গানের আদর্শ কিয়ৎপরিমাণে ক্ষুণ্ণ না করিয়া উহার সহিত হারমোনিয়ম ইত্যাদি সঙ্গত-যন্ত্ররূপে ব্যবহার্য নহে। বঙ্কিম স্বয়ং দেশীয় ও বিলাতী সঙ্গীতের এই আদর্শগত প্রভেদ উপলব্ধি করিয়াছিলেন কিনা বলিতে পারি না, তিনি নিজে হারমোনিয়ম-সংযোগে সঙ্গীতের পক্ষপাতী ছিলেন, কালোয়াতি গান নাকি বড় একটা পছন্দ করিতেন না। কিন্তু তদানীন্তন শিক্ষিত সমাজেও মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি নিপুণতর সঙ্গীতরসিক বহু ব্যক্তি বরাবর হারমোনিয়মের বিরোধী ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ দ্বারাই বোধ হয় হারমোনিয়মের প্রচলন আরব্ধ হয়। কিন্তু এখন ব্রাহ্মসমাজেরই কতিপয় সুশিক্ষিতা ও যথার্থ সঙ্গীতরসিকা মহিলার চেষ্টায় হারমোনিয়মের স্থানে ধীরে ধীরে এস্রাজ বেহালা ইত্যাদি আসিতেছে। কিন্তু ইতিমধ্যে সঙ্গীতরুচিতে যে বিপ্লব ও অপকার সাধিত হইয়াছে তাহা অল্প নহে।

তবে হারমোনিয়ম এক কাজ করিয়াছে, মাঝারি রকমের সঙ্গীত বাঙ্গালার ভদ্র গৃহে গৃহে কামিনীকণ্ঠে পর্যন্ত চালাইয়া দিয়াছে।[১] পূর্বে মেয়েরা বিবাহে ও বারব্রতে যে গান গাহিতেন, অনেক স্থলেই উহাকে সঙ্গীত বলা চলিত না, উহা উৎপীড়িতা সঙ্গীতকলার আর্তনাদ মাত্র ছিল। এখন হারমোনিয়মের কৃপায় তাল বা লয়ের এবং অনেক সময়ে সুরেরও যথেষ্টরূপ শ্রাদ্ধ হয় বটে, তবু তাহা সঙ্গীতনাম-বাচ্য। তাল ও লয়ের ভঙ্গ অক্ষমতা বা অশিক্ষাকৃত ; সুতরাং সংশোধনযোগ্য।

---

১। বেহালা এস্রাজ ইত্যাদি মিলাইয়া লওয়া বড় হাঙ্গামা। হারমোনিয়ম ইত্যাদি নিত্যবাঁধা যন্ত্রে সে বালাই নাই। তাই মাঝারি সঙ্গীতের উহা উপযোগী বটে। তবলা মিলাইবার ঝঞ্ঝাট মিটানোর জন্যই প্রাচীন কালের মাঝারি সঙ্গীতওয়ালারা খোলের প্রচলন করিয়াছিল।

বেহালার সুরবাঁধার ঝঞ্ঝাট সম্পর্কে 'চন্দ্রশেখর', প্রথমখণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদে দলনীর বিড়ম্বনা এবং পরিশেষে 'কলিকাতায় ইংরেজেরা যে বাজনা বাজাইয়া গীত গায়' তাহার জন্য আবদার স্মরণযোগ্য। কৃষ্ণকান্তের উইলে দানেশ খাঁর কালোয়াতির প্রতি বঙ্কিম যে কটাক্ষ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার সমসাময়িক শিক্ষিত ব্যক্তিগণের রুচির প্রতিভাস। মেত্তারেও লালবিহারী দে কালোয়াতি গান সম্বন্ধে বলিতেন, "**It is nothing but cutting geometrical figures in one's mouth.**"—ঢাকা রিভিউ, জুলাই, ১৯১৭।

কিন্তু উচ্চ কণ্ঠধ্বনিমাত্রকেই সঙ্গীত মনে করা কুরুচির পরাকাষ্ঠা।

পরিবারমধ্যে সঙ্গীতপ্রচলনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বঙ্কিম বলিয়াছেন—

> যেমন রাজনীতি, ধর্মনীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি সকল মনুষ্যেরই জানা উচিত, তেমনি শরীরার্থ স্বাস্থ্যকর ব্যায়াম এবং চিত্তপ্রসাদার্থ মনোমোহিনী সঙ্গীতবিদ্যাও সকল ভদ্রলোকের জানা কর্তব্য। শাস্ত্রে রাজকুমার রাজকুমারীদিগের অভ্যাসোপযোগী বিদ্যামধ্যে সঙ্গীত প্রধান স্থান পাইয়াছে। বাঙ্গালীর মধ্যে ভদ্র পৌরকন্যাদিগের সঙ্গীতশিক্ষা যে নিষিদ্ধ বা নিন্দনীয় তাহা আমাদিগের অসভ্যতার চিহ্ন। কুলকামিনীরা সঙ্গীতনিপুণা হইলে গৃহমধ্যে এক অত্যন্ত বিমলানন্দের আকর স্থাপিত হয়। বাবুদের মদ্যাসক্তি এবং অন্য একটি গুরুতর দোষ অনেক অপনীত হইতে পারে।

পাঠক লক্ষ্য করিবেন পাশ্চাত্য রুচির সহিত দেশীয় রুচির সমন্বয় করিতে গিয়া বঙ্কিম প্রাচীন আচারের উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। সে যাহা হউক, শাস্ত্রে রাজকুমারীগণের পক্ষে সঙ্গীতশিক্ষার ব্যবস্থাসত্ত্বে, ভদ্র পৌরকন্যাদিগের মধ্যে সঙ্গীত যে অপ্রচলিত ও ক্রমে নিন্দনীয় হইয়াছে তাহার কারণ এই যে, এদেশে বাল্যবিবাহ ও একান্নবর্তী পরিবারপ্রথা প্রচলিত থাকায়, কন্যাগণ, বিশেষতঃ স্বল্পবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের ভদ্র কন্যাগণকে বাল্যাবধিই গৃহকর্মাদিতে ব্যস্ত থাকিতে হইত। তাঁহারা সঙ্গীতশিক্ষা ও সঙ্গীতচর্চার অবসর অল্পই পাইতেন। যাঁহারা পাইতেন তাঁহারাও অবরোধপ্রথার দরুণ উপযুক্ত শিক্ষক পাইতেন না। এখন সমাজগঠনের পরিবর্তন হইতেছে—যে কারণেই হউক মেয়েদের বিবাহ বিলম্বিত হইয়া পড়িতেছে, একান্নবর্তিতা নামে মাত্র পর্যবসিত হইয়াছে, সহরে বাস করার দরুণ গৃহকর্ম সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়াছে, রুচিরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাই ধীরে ধীরে ভদ্রকন্যাগণের নানারূপ শিল্পকার্যের প্রতি দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। গৃহে সঙ্গীতচর্চার ব্যবস্থা করিলে 'মদ্যাসক্তি ও অন্য একটি গুরুতর দোষ' অপনীত হইবে এমন আশা আমাদের নাই। তবে ইহা মানি শিল্পশিক্ষার প্রয়োজন কেবল utility নহে। সঙ্গীতে বিশেষজ্ঞতা পরিবারস্থা মহিলাগণের পক্ষে সম্ভাব্য নহে। বিলাতেও সেটা ব্যবসায়-বিশেষেরই আয়ত্ত। তবে এখনকার মত দেশীয় সঙ্গীতকলার শ্রাদ্ধ না করিয়া যদি পরিবারমধ্যে উহার চর্চার সুবিধা হয়, তবে যে সকল মেয়েদের ক্ষমতা ও অবসর আছে, তাহাদের পক্ষে সঙ্গীতচর্চা কখনই অবাঞ্ছনীয় হইতে পারে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের অনুচিত ইংরেজ-বিদ্বেষ ছিল না তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বাঙ্গালী জাতি কর্তৃক ইংরেজের অনুকরণের অনেক স্থলে নিন্দা করিলেও তিনি উহার যে একান্ত বিরোধী ছিলেন তাহা নহে। একান্ত বিরোধীর সমন্বয়চেষ্টা সঙ্গত হয় না। ১২৮১ সালের বঙ্গদর্শনে তিনি রাজনারায়ণবাবুর 'সেকাল আর একালে'র সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন—

অনুকরণ মাত্র কি দূষ্য? তাহা কদাচ হইতে পারে না।...বাঙ্গালী যে ইংরেজের অনুকরণ করিবে, ইহা সঙ্গত ও যুক্তিসিদ্ধ।...বাঙ্গালী যে ইংরেজের অনুকরণ করিতেছে, ইহাই বাঙ্গালীর ভরসা।...যাঁহারা আমাদের কৃত ইংরাজের আহার ও পরিচ্ছদের অনুকরণ দেখিয়া রাগ করেন, তাঁহারা ইংরেজকৃত ফরাসীগণের আহার-পরিচ্ছদের অনুকরণ দেখিয়া কি বলিবেন? ইহা আমরা অবশ্য স্বীকার করি যে, বাঙ্গালী যে পরিমাণে অনুকরণে প্রবৃত্ত, ততটা বাঞ্ছনীয় না হইতে পারে। বাঙ্গালীর মধ্যে প্রতিভাশূন্য অনুকারীরই বাহুল্য এবং তাহাদিগকে প্রায় গুণভাগের অনুকরণে প্রবৃত্ত না হইয়া দোষভাগের অনুকরণেই প্রবৃত্ত দেখা যায়। এইটি মহাদুঃখ। বাঙ্গালী গুণের অনুকরণে তত পটু নহে, দোষের অনুকরণে ভূমণ্ডলে অদ্বিতীয়।

প্রকৃত কথা এই যে, যখন ভারতবাসীর ন্যায় বৈষয়িক ব্যাপারে হীনাবস্থ বিজিত জাতি ইংরেজের ন্যায় সমৃদ্ধতর বিজেতৃগণের সাফল্যদর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাহাদিগের অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহাদের কোন্‌টা যে দোষ কোন্‌টা গুণ তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারে না। পদে পদে মনে হয়, 'ইহারা যে এত উন্নত ইহার হেতু বুঝি এই। আমাদিগকেও ঐরূপ না হইলে চলিবে না।' সমাজসংস্কারকগণও অনেক ক্ষেত্রেই ঐরূপ যুক্তিরই ছড়াছড়ি করেন। সামাজিক ব্যাপারসমূহে কার্যকারণ-সম্বন্ধনির্ণয় এত দুষ্কর যে, সকল যুক্তির অসঙ্গততা সকলে লক্ষ্য করেন না। তাই কেবল বিলাতীমোহগ্রস্ত ব্যক্তিগণ নহে, অনেক ধীরস্বভাব ব্যক্তিও বিদেশী আচারের অনুকরণপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছেন। সেইজন্যই শ্রদ্ধাস্পদ রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের 'সেকাল আর একাল' নামক গ্রন্থে পরানুকরণস্পৃহা পরিহারপূর্বক দেশীয় ভাবকে সমাজসংস্কারের ভিত্তি করিবার আবশ্যকতা বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। রাজনারায়ণ বাবু লিখিতেছেন—

> ইংরাজী অনুকরণের দরুণ সমাজসংস্কারের গতি বিপথগামী হইতেছে। প্রকৃত গতিতে যদি সমাজসংস্কারের স্রোত প্রবাহিত হইত, তাহা হইলে সমাজসংস্কার-কার্য এত দিনে যে কত অগ্রসর হইত তাহা বলা যায় না। আমাদের দেশের সমাজ-সংস্কারকেরা যদি স্বদেশীয় ভাবকে পত্তনভূমি করিয়া সমাজসংস্কারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে কৃতকার্য হইতে পারেন সন্দেহ নাই।[১]

ধর্ম বল, আচার বল ও সমাজসেবা বল, বঙ্কিম সর্বক্ষেত্রেই অনান্তরিকতাকে বড় ঘৃণা করিতেন। বাঙ্গালীর ইংরেজানুকরণপ্রিয়তার যে অংশটা আন্তরিকতাহীন তাহার প্রতি তিনি সর্বদা খড়্গহস্ত ছিলেন। Humbug, Sham,— প্রবঞ্চনা, ভাণ, অনান্তরিকতা ইত্যাদি তাঁহার চক্ষুশূল ছিল। তিনি 'ইংরেজির সেবক' ছিলেন না, কিন্তু ইংরেজকে ভুলাইবার জন্য ইংরেজি বুলির বাড়াবাড়ি সহ্য করিতে পারেন নাই। তাই বঙ্গদর্শনের সূচনায়ই তিনি লিখিয়াছিলেন,

১। 'সেকাল আর একাল', পৃ ৭০।

"ইংরেজিতে না বলিলে ইংরেজ বুঝে না, ইংরেজ না বুঝিলে ইংরেজের নিকট মান-মর্যাদা হয় না ; ইংরাজের কাছে মান-মর্যাদা না থাকিলে কোথাও থাকে না, বা থাকা না থাকা সমান। ইংরেজ যাহা না শুনিল সে অরণ্যে-রোদন, ইংরেজ যাহা না দেখিল তাহা ভস্মে-ঘৃত।" ইহা ইংরাজী বা ইংরেজের প্রতি দ্বেষ নহে আন্তরিকতাহীন স্বদেশপ্রীতির প্রতি কটাক্ষ। ঐ কথাই আবার 'ইংরাজ-স্তোত্রে' তীব্রতর ভাষায় উক্ত হইয়াছে—

> হে অন্তর্যামিন্! আমি যাহা কিছু করি তোমাকে ভুলাইবার জন্য। তুমি দাতা বলিবে বলিয়া আমি দান করি ; তুমি পরোপকারী বলিবে বলিয়া পরোপকার করি ; তুমি বিদ্বান্ বলিবে বলিয়া আমি লেখা পড়া করি।······ আমি তোমার ইচ্ছামত ডিস্পেন্সারি করিব, তোমার প্রীত্যর্থে স্কুল করিব, তোমার আজ্ঞামত চাঁদা দিব; তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও······হে সৌম্য! যাহা তোমার অভিমত তাহাই আমি করিব। আমি বুট-প্যাণ্টালুন পরিব, নাকে চস্‌মা দিব, কাঁটা-চামচে ধরিব, টেবিলে খাইব—তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।······আমি মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া তোমার ভাষা কহিব······ বাবু নাম ঘুচাইয়া মিস্টার লেখাইব······আমি তোমাকে প্রণাম করি।

উপরে স্থলে-স্থলে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতেই বুঝা যাইবে, সামাজিক সমস্যাসমূহ সম্বন্ধে বঙ্কিমের সব সমাধান এবং সব যুক্তিই যে অভ্রান্ত ও তত্তদ্বিষয়ে শেষ কথা ইহা মনে করা অন্যায়। বস্তুতঃ বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র সকল বিষয়ে খুব তলাইয়া দেখিবার ও বুঝিবার অবসর পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কিংবা সকল লোকেরই যেরূপ মানসিক বৃত্তিসমূহের ক্রমপরিণতি হয়, বঙ্কিমেরও তাহাই হইয়াছিল ; তাই তিনি শেষে অনেক মত বর্জন ও সংশোধন করিয়াছিলেন। বিরল অবসরে সামাজিক সমস্যাসমূহের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া যুগধর্মের ও শিক্ষার প্রভাবে তিনি অনেক অযৌক্তিক উক্তিও করিয়াছেন। তাঁহার 'সাম্য' প্রবন্ধটি ইহার একটি উত্তম উদাহরণ। এই প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনে তিন প্রস্তাবে প্রকাশিত হয়।[১] গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার সময় 'বঙ্গদেশের কৃষক'-শীর্ষক অপর একটি প্রবন্ধ হইতে দুইটি পরিচ্ছেদ উহাতে যোগ করা হয়। সে যাহা হউক বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত তিনটি প্রস্তাবের প্রথম প্রস্তাবে বঙ্কিম সাধারণভাবে সমাজে ছোট-বড়, ধনি দরিদ্র, বিজিত-বিজেতা, রাজপুরুষ ও সাধারণ প্রজা, সুন্দর-অসুন্দর, বুদ্ধিমান্-মূর্খ প্রভৃতি নানাবিধ বৈষম্যের কথা আলোচনা করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে প্রাচীন ভারতে উৎকট বর্ণবৈষম্যজনিত সামাজিক মর্যাদা ও অধিকারের তারতম্যলোপের জন্য বুদ্ধদেব কর্তৃক চেষ্টার কথাও আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রবন্ধে রুসো ও তৎ-সমসাময়িক ফরাসী সমাজের অবস্থা এবং তৃতীয় প্রস্তাবে বঙ্গীয় সমাজে স্ত্রীপুরুষে

১। শেষ প্রস্তাব চতুর্থবর্ষের বঙ্গদর্শনের কার্তিক-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 'বঙ্কিম জীবনপঞ্জী'তে এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ ভ্রম হইয়াছে।

অধিকারবৈষম্যের কথা বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল বৈষম্য প্রদর্শন করিবার সময় বঙ্কিমচন্দ্র অনেক স্থলেই সমুচিত ধীরতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষা করিতে পারেন নাই। প্রথম প্রস্তাবে তিনি মেকলের ন্যায় যেন কতকটা ভাষার বৈচিত্র্য-সৃষ্টির লোভেই স্বীয় লেখনীর নিরঙ্কুশ উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় দিয়াছেন।—

অমুক বড় লোক, পৃথিবীর যত ক্ষীর সর নবনীত সকলই তাহাকে উপহার দাও। ভাষার সাগর হইতে শব্দরত্নগুলি বাছিয়া বাছিয়া তুলিয়া হার গাঁথিয়া তাহাকে পরাও, কেন না, তিনি বড় লোক। যেখানে ক্ষুদ্র অদৃশ্যপ্রায় কণ্টকটি পথে পড়িয়া আছে, উহা যত্নসহকারে উঠাইয়া সরাইয়া রাখ—ঐ বড় লোক আসিতেছেন, কি জানি যদি তাঁহার পায়ে ফুটে। এই জীবনপথের ছায়াস্নিগ্ধ পার্শ্ব ছাড়িয়া রৌদ্রে দাঁড়াও, বড় লোক যাইতেছেন। সংসারের আনন্দকুসুম সকল সকলে মিলিয়া চয়ন করিয়া শয্যারচনা করিয়া রাখ, বড় লোক উহাতে শয়ন করুন। আর তুমি—তুমি বড় লোক নহ—তুমি সরিয়া দাঁড়াও, এ পৃথিবীর ভাল সামগ্রী কিছুই তোমার জন্য নয়। কেবল তীব্রঘাতী লোলায়মান বেত্র তোমার জন্য—বড় লোকের চিত্তরঞ্জনার্থ তোমার পৃষ্ঠের সঙ্গে মধ্যে, মধ্যে ইহার আলাপ হইবে।

বড় লোক ছোট লোক এ প্রভেদ কিসে? রাম বড় লোক যদু ছোট লোক কিসে? তাহা নিন্দক লোকে একপ্রকার বুঝাইয়া দেয়। যদু চুরি করিতে জানে না, বঞ্চনা করিতে জানে না, পরের সর্বস্ব শঠতা করিয়া গ্রহণ করিতে জানে না, সুতরাং যদু ছোট লোক; রাম চুরি করিয়া, বঞ্চনা করিয়া, শঠতা করিয়া ধনসঞ্চয় করিয়াছেন, সুতরাং রাম বড় লোক। অথবা রাম নিজে নিরীহ ভাল মানুষ, কিন্তু তাহার প্রপিতামহ চৌর্যবঞ্চনাদিতে সুদক্ষ ছিলেন, মুনিবের সর্বস্বাপহরণ করিয়া বিষয় করিয়া গিয়াছেন, রাম জুয়াচোরের প্রপৌত্র; সুতরাং সে বড় লোক। যদুর পিতামহ আপনি আনিয়া আপনার খাইয়াছে—সুতরাং সে ছোট লোক।.........

অথবা রাম সেলাম করিয়া, গালি খাইয়া, কদাচিৎ পদাঘাত সহ্য করিয়া, অথবা ততোধিক কোনও মহৎকার্য করিয়া কোন রাজপুরুষের নিকট প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছে। রাম চাপরাস গলায় বাঁধিয়াছে—চাপরাসের বলে বড় লোক হইয়াছে।.........প্রভুর নিকট কীটানুকীট, কিন্তু অন্যের কাছে ধর্মাবতার!! তুমি যে হও, দুই হাতে সেলাম কর, ইনি ধর্মাবতার! ইহার ধর্মাধর্ম জ্ঞান নাই, অধর্মেই আসক্তি,—তাহাতে ক্ষতি কি? রাজকটাক্ষে ইনি ধর্মাবতার। ইনি গণ্ডমূর্খ তুমি সর্বশাস্ত্রবিৎ—সে কথা এখন মনে করিও না, ইনি বড় লোক ইহাকে প্রণাম কর।[১]

---

১। সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত'

এইরূপে সাধারণভাবে সমাজগত নানা-বৈষম্য প্রদর্শন করিয়া বঙ্কিম হিন্দুসমাজের বর্ণ বৈষম্য আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।—

আর এক প্রকারের বড় লোক আছে। গোপাল ঠাকুর, 'কন্যাভারগ্রস্ত—কন্যাভারগ্রস্ত' বলিয়া দুই-চারি পয়সা ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে—এও বড় লোক। কেন না, গোপাল ব্রাহ্মণজাতি। তুমি শূদ্র,—যত বড় লোক হও না কেন, তোমাকে উহার পায়ের ধূলা লইতে হইবে। দুই প্রহর বেলা ঠাকুর রাগ করিয়া না যান—ভাল করিয়া আহার করাও, যাহা চাহেন, দিয়া বিদায় কর। গোপাল দরিদ্র, মূর্খ, নরাধম, পাপিষ্ঠ, কিন্তু সেও বড় লোক। ......মনুষ্যে মনুষ্যে যেমন প্রাকৃত বৈষম্য আছে (যথা,—কুমুদিনী অপেক্ষা সৌদামিনী সুন্দরী; সুতরাং সৌদামিনী জমিদারের স্ত্রী, কুমুদিনী পাট কাটে) তেমনি অপ্রাকৃত বৈষম্য আছে। ব্রাহ্মণে শূদ্রে অপ্রাকৃত বৈষম্য। ব্রাহ্মণবধে গুরুপাপ, শূদ্রবধে লঘুপাপ; ইহা প্রাকৃতিক নিয়মানুকৃত নহে। ব্রাহ্মণ অবধ্য, শূদ্র বধ্য কেন? শূদ্রই দাতা, ব্রাহ্মণই কেবল গ্রহীতা কেন?......

পৃথিবীতে যতপ্রকার সামাজিক বৈষম্যের উৎপত্তি হইয়াছে, ভারতবর্ষের পূর্বকালিক বর্ণবৈষম্যের ন্যায় গুরুতর বৈষম্য কখন কোন সমাজে প্রচলিত হয় নাই। অন্যবর্ণ অবস্থানুসারে বধ্য—কিন্তু ব্রাহ্মণ শত অপরাধেও অবধ্য। ব্রাহ্মণ তোমার সর্বপ্রকার অনিষ্ট করুক; তুমি ব্রাহ্মণের কোনও প্রকার অনিষ্ট করিতে পারিবে না। তোমরা ব্রাহ্মণের চরণে লুটাইয়া তাঁহার চরণরেণু শিরোদেশে গ্রহণ কর—কিন্তু শূদ্র অস্পৃশ্য। শূদ্রস্পৃষ্ট জল পর্যন্ত অব্যবহার্য। পৃথিবীর কোন সুখে শূদ্র অধিকারী নহে, কেবল নীচবৃত্তি তাহার অবলম্বনীয়, জীবনের জীবন যে বিদ্যা তাহাতে তাহার অধিকার নাই। সে শাস্ত্রে বদ্ধ, অথচ শাস্ত্র যে কি, তাহা তাহার স্বচক্ষে দেখিবার অধিকার নাই, তাহার নিজ পরকালও ব্রাহ্মণের হাতে। ব্রাহ্মণ যাহা বলিবেন তাহা করিলেই পরকালের গতি, নহিলে গতি নাই। ব্রাহ্মণকে দান করিলেই পরকালের গতি, কিন্তু শূদ্রের সেই দান গ্রহণ করিলেও ব্রাহ্মণ পতিত। ব্রাহ্মণের সেবা করিলেই শূদ্রের পরকালের গতি। অথচ শূদ্রও মনুষ্য, ব্রাহ্মণও মনুষ্য। প্রাচীন ইউরোপের বন্দী এবং প্রভুমধ্যে যে বৈষম্য, তাহাও এমন ভয়ানক নহে।......

প্রাচীন ভারতের বর্ণ-বৈষম্য সম্বন্ধে বঙ্কিমের উক্তিগুলি সব সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও বলিতে হইবে বঙ্কিমচন্দ্র যে ভাবে এই সত্যটি উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহাতে উহার মর্যাদা রক্ষিত হয় নাই। সদ্‌যুক্তি ও নিরপেক্ষ-বিচারের প্রতিবন্ধক রাগদ্বেষ প্রভৃতি ভাবের মধ্য দিয়া সত্যের দিঙ্‌মাত্র প্রদর্শিত হইলে সে সত্য মিথ্যা হইতে বড় দূরবর্তী হয় না। প্রাচীন ভারতে বর্ণবৈষম্য ছিল, এবং ইহাও স্বীকার

---

নামক ক্ষুদ্র আখ্যায়িকাখানিও এইরূপ গুণহীনের উন্নতি ও পদমর্যাদার প্রতি পরিহাস ও তীব্র কটাক্ষপূর্ণ।

করি উহার উৎকটতায় ব্যথিত হইয়া বুদ্ধদেব উহার বিলোপসাধন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং তাহাতে আংশিকরূপে সফলকামও হইয়াছিলেন। কিন্তু দেখা যাইতেছে তাঁহার প্রয়াসের ফলও চিরস্থায়ী হয় নাই—বরং কয়েক শত বৎসরমধ্যে বর্ণবৈষম্য আর্যসমাজে উৎকটতর আকারেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কেন হইয়াছিল? অবশ্যই ঐ 'অপ্রাকৃত' বৈষম্যের পশ্চাতেও এমন কোনও প্রাকৃত শক্তি চিরকালই কার্য করিতেছিল, যাহার আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক নিরাকরণে বুদ্ধদেবের চেষ্টাও সমর্থ হয় নাই। একজন মনস্বী ইংরেজ[১] বলিয়াছেন—

Sociology shows the existence of caste everywhere as rulers, warriors, merchants, agriculturists, servile population and so forth. These distinctions do not arise from snobbery but from the inherent needs of society and its organisation. Classes and (in a practical sense) castes exist in the west to-day. Many are of opinion that classes will always exist however much they may shift. Thus Professor Giddings, the sociologist says, "Classes, do not become blended as societies grow older; they become more sharply defined." He considers that any social reform that hopes for the blending of classes is foredoomed to failure.

অর্থাৎ, সমাজবিজ্ঞানে দেখা যায় শাসক, যুদ্ধব্যবসায়ী, বাণিজ্যব্যবসায়ী, কৃষক, দাস প্রভৃতি-রূপ জাতিভেদ সর্বত্রই আছে। ঐরূপ ভেদ ভদ্রতাভিমান হইতে জন্মে না। কিন্তু সমাজের স্বভাবানুগত অভাবসমূহ এবং উহার গঠন হইতে উৎপন্ন হয়। শ্রেণীভেদ এবং (কার্যতঃ) জাতিভেদ অদ্যও পাশ্চাত্য দেশে আছে। অনেকেরই মত এই যে, যুগে যুগে যেরূপ পরিবর্তিত আকারেই হউক, সমাজে শ্রেণীভেদ থাকিবেই। সমাজতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক গিডিংস্ও বলিয়াছেন "সমাজ পরিণত অবস্থা পাইলেও শ্রেণীভেদ লুপ্ত হয় না, বরং স্পষ্টতর হয়।" তাঁহার মতে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে মিশ্রণ (শ্রেণীভেদের লোপ) যে সমাজসংস্কার প্রয়াসের উদ্দেশ্য উহার বৈফল্য অনিবার্য।

সুতরাং দাঁড়াইতেছে এই—প্রাচীন ভারতে যে বর্ণবৈষম্য ছিল উহাকে 'অপ্রাকৃত' বৈষম্য বলা যায় না। তদানীন্তন সমাজের অভাব ও গড়ন দ্বারাই ঐ বৈষম্য নিয়মিত হইতেছিল। বিশেষতঃ শূদ্র বলিতে এখন আমরা যাহা বুঝি খুব প্রাচীন কালে ঠিক তাহাই বুঝাইত না। শূদ্রগণের অধিকারসমূহ বস্তুতঃ তাহাদের

---

১। Sir John Woodroffe—*Is India Civilised?*

অনুন্নত মানসিক ও নৈতিক অবস্থার যোগ্যই ছিল। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের যে বিশেষ বিশেষ অধিকার ছিল তাহাও সমাজের তদানীন্তন অবস্থায় একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। অবশ্য কালক্রমে যখন শূদ্রাদির অবস্থার উন্নতি ঘটিতে লাগিল, তখন ধীরে ধীরে সমাজে অসন্তোষেরও সৃষ্টি হইতে লাগিল। বুদ্ধদেবের সমাজসংস্কার-প্রয়াস ঐ অসন্তোষেরই চিহ্ন ও ফল। কিন্তু বৌদ্ধগণের সমাজসংস্কার, ধর্মসংস্কার প্রভৃতির চেষ্টায়ও যখন কিঞ্চিৎ বিকটতা আসিয়া পড়িল, তখনই তাহার প্রতিক্রিয়ায় আবার হিন্দুধর্ম ও হিন্দু-আচার সমাজে (কথঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে) পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার ফলে প্রাচীন শূদ্রজাতির অবস্থার কিছু উন্নতি হইল বটে, কিন্তু ক্ষত্রিয়াদি অন্যজাতির প্রাচীন অধিকারসমূহ খর্ব হইল। বুদ্ধদেবের পূর্বে যেখানে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র চারি বর্ণ ছিল, বৌদ্ধধর্ম লুপ্ত হইবার পর সেখানে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র দুই বর্ণমাত্র অবশিষ্ট রহিল।

অবশ্য বলা যাইতে পারে 'সাম্য'প্রবন্ধে বর্ণ বৈষম্য সম্বন্ধে সব সত্য প্রকাশ করা হয় নাই; তাহাতে কি? বর্ণবৈষম্য সমাজের স্বভাবানুগত অভাব হইতে উৎপন্ন হইলেও উহার উৎপীড়ন ত ছিল? এখনও কি নাই? যদি থাকে তবে আংশিক হইলেও, ততটুকুই সত্য কেন প্রকাশ করা হইবে না? এবং তীব্রভাবেই প্রকাশ করা হইবে না?

বর্ণবৈষম্যসম্বন্ধে কেন, কোনও বিষয়েই বিরুদ্ধমত প্রকাশের প্রতিরোধী হওয়া কাহারও পক্ষে যুক্তিসম্মত ও ন্যায়ানুমোদিত ব্যবহার নহে, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। পরমতের প্রতি অসহিষ্ণুতা কুশিক্ষা, কুসংস্কার, কুরুচির চিহ্ন। কথা এই—বঙ্গদর্শনের যুগে হিন্দুসমাজের প্রতি অযথা আক্রমণকারীর অভাব ছিল না। সামাজিক বৈষম্যের আলোচনায় অযথা তীব্রতা ও অপরিমিত গরল ঢালিয়া দেওয়ার ফলেই ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লবের উৎপত্তি। বঙ্গদেশেও একশ্রেণীর সমালোচক, অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি লেখকগণের মাত্রায় না হউক, দেশকালপাত্র-বিবেচনায় কিঞ্চিৎ অনুচিতমাত্রায়ই গরল উদ্‌গীর্ণ করিতেছিলেন। তাহাতেও যে কিছু সুফল হয় নাই তাহা বলিব না। হিন্দুসমাজ তাহাতে জাগিয়া উঠিয়াছিল। বঙ্গদর্শনের যুগে আঘাতজনিত ব্যথা অপেক্ষা সমাজের দেহ ও মন উভয়ের পুষ্টিকর ভৈষজ্যপ্রয়োগের প্রয়োজনই অধিক ছিল। হিন্দুসমাজ বলিতেছিল, "হে আমার হিতৈষিগণ, আমাকে শুধু গালি দিও না, শুধু আঘাত করিও না। আমাকে এমন সব কথা শুনাও যাহাতে আমার মন ও হৃদয় উভয়ের প্রবোধ জন্মে। আমাকে এমন কিছু উপদেশ দাও যাহাতে আমার ব্যক্তিত্ব রক্ষা করিয়া—আমার সহস্র সহস্র যুগব্যাপী সাধনার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া—যেগুলি সমাজমাত্রেরই যথার্থ গৌরবের বিষয় সেইগুলিতে নূতন যুগের সভ্যজাতিগণের সমকক্ষ হইয়া চলিতে পারি।" বঙ্কিমের মনে প্রথম হইতেই সেই সমাজচৈতন্যের স্ফূর্তি হইয়াছিল বটে, কিন্তু একেবারে সমগ্রভাবে হয় নাই। তাই 'সাম্যে' তিনি প্রকৃষ্ট সমন্বয়ের পথে যান নাই, পরে

'প্রচারে' ও 'নব জীবনে' প্রকাশিত নানা প্রবন্ধে গিয়াছিলেন।[১] 'সাম্যে' যিনি প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণের সম্মানে অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ধর্মতত্ত্বে তিনি লিখিতেছেন—

গুরু। (ব্রাহ্মণগণ) যে বর্ণশ্রেষ্ঠ ও আপামর সাধারণের বিশেষ ভক্তির পাত্র, তাহার কারণ এই যে ব্রাহ্মণেরাই ভারতবর্ষে সামাজিক শিক্ষক ছিলেন।......সমাজ ব্রাহ্মণকে এত ভক্তি করিত বলিয়াই ভারতবর্ষ এত অল্পকালে এত উন্নত হইয়াছিল। সমাজ শিক্ষাদাতাদিগের সম্পূর্ণ বশবর্তী হইয়াছিল বলিয়াই সহজে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। তাঁহারা যে আপনাদের প্রতি লোকের অচলা ভক্তি আদিষ্ট করিয়াছিলেন তাহাও স্বার্থের জন্য নহে।......পৃথিবীতে যত জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণদিগের মত প্রতিভাশালী, ক্ষমতাশালী, জ্ঞানী ও ধার্মিক কোনও জাতিই নহে।

শিষ্য। তা যাক্। এখন দেখি ত ব্রাহ্মণেরা লুচিও ভাজেন, রুটিও বেচেন, কালী খাঁড়া করিয়া কসাইয়ের ব্যবসায়ও চালান। তাঁহাদিগকেও ভক্তি করিতে হইবে?

গুরু। কদাপি না। যে গুণের জন্য ভক্তি করিব, সে গুণ যাহার নাই, তাহাকে ভক্তি করিব কেন? সেখানে ভক্তি অধর্ম। এইটুকু না বুঝাই ভারতবর্ষের অবনতির একটি গুরুতর কারণ।......এখন ফিরিতে হইবে।

শিষ্য। অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে আর ভক্তি করা হইবে না।

গুরু। ঠিক তাহা নহে। যে ব্রাহ্মণের গুণ আছে, অর্থাৎ যিনি ধার্মিক, বিদ্বান্, নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক, তাঁহাকে ভক্তি করিব; যিনি তাহা নহেন তাঁহাকে ভক্তি করিব না। তৎপরিবর্তে যে শূদ্র ব্রাহ্মণের গুণযুক্ত অর্থাৎ যিনি ধার্মিক, বিদ্বান্, নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক, তাঁহাকেও ভক্তি করিব।[২]

'সাম্যের' তৃতীয় প্রস্তাবে স্ত্রীপুরুষবৈষম্য সম্বন্ধে বঙ্কিম যাহা লিখিয়াছেন তাহার অনেক কথাই জন স্টুয়ার্ট মিলের 'Subjection of Women' নামক পুস্তকের

---

১। আধুনিক কালের মাপকাঠি দ্বারা যাহারা প্রাচীন কালের সামাজিক ব্যবস্থাসমূহের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাচীনগণকে গালাগালি দেন তাঁহাদিগকে মনীষী জন স্টুয়ার্ট মিলের ভাষায় সবিনয়ে এইটুকু মাত্র বলিব যে, সামাজিক অনেক সমস্যাই "no two ages and scarcely any two countries have decided alike and the decision of one age is a wonder to another. Yet the people of any given age and country, no more suspect any difficulty in it than if it were a subject on which mankind had always been agreed. —*Liberty*, Introduction

২। 'ধর্মতত্ত্ব', দশম অধ্যায়; মনুষ্যে ভক্তি। সমগ্র অধ্যায়টিই পাঠ করা আবশ্যক। আধুনিক সমাজে ব্রাহ্মণের স্থান নিয়া অনেক আলোচনা হইয়াছে। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'সনাতনী' গ্রন্থে 'ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব'-শীর্ষক প্রবন্ধ, রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশ'-নামক গ্রন্থে 'ব্রাহ্মণ'-শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

প্রতিধ্বনি। আমরা উহা সমগ্রভাবে আলোচনা করিব না। এই প্রবন্ধে তিনি বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ইহার কুড়ি বৎসর পূর্বে ১৮৫৬ খৃস্টাব্দে হিন্দুর পক্ষেও (হিন্দু সমাজে প্রচলিত কুমারীবিবাহের মন্ত্রাচারাদি দ্বারা সম্পাদিত) বিধবাবিবাহ আইনসম্মত বলিয়া বিধিবদ্ধ হয়। বঙ্কিমচন্দ্র বিধবাবিবাহের কতদূর পক্ষপাতী ছিলেন বলা যায় না। 'বিষবৃক্ষে' দেখিতে পাই, সূর্যমুখী কমলমণির নিকট এক পত্রে লিখিতেছে "আর একটা হাসির কথা। ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে না কি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবাবিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে?" স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ উক্তিটির জন্য বঙ্কিমকে ক্ষমা করেন নাই। ইহা ছাড়া 'ইংরাজস্তোত্রে' বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, "আমি বিধবার বিবাহ দিব, কুলীনের জাতি মারিব, জাতি ভেদ উঠাইয়া দিব—কেন না, তাহা হইলে তুমি আমার সুখ্যাতি করিবে।" এইরূপ ভাবের কথা বঙ্কিমের গ্রন্থাবলীর আরও অনেক স্থলে আছে। সে যাহা হউক বালবিধবার বিবাহ শাস্ত্রসম্মত, ইহা বঙ্গদর্শনের যুগে হিন্দুসমাজে বহু লোকেই বেশ বুঝিয়াছিল। বিদ্যাসাগর প্রভৃতিও বালবিধবাগণের বিবাহ হউক ইহাই চাহিতেন। সাতটি সন্তানের পিতা বিপত্নীক হইলে তাহার পুনর্বিবাহে অধিকার আছে বলিয়া সাত সন্তানের মাতাও বিধবা হইলে পুনর্বিবাহের অধিকারিণী হওয়া উচিত, এমন উৎকট সাম্যবোধ দ্বারা প্রণোদিত হইয়া বিদ্যাসাগর ও তাঁহার সহোদ্যোগিগণ বিধবাবিবাহ প্রচলন জন্য বদ্ধপরিকর হয়েন নাই। অন্যত্র বঙ্কিম বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে যাহাই বলুন, 'সাম্যে' কতকটা সেইরূপ অদ্ভুত যুক্তিই দিয়াছেন। "আমরা বলিব, বিধবাবিবাহ ভালও নহে মন্দও নহে; সকল বিধবার বিবাহ হওয়া কদাচ ভাল নহে, তবে বিধবাগণের ইচ্ছামত বিবাহে অধিকার থাকা ভাল।······বিধবার চিরবৈধব্য যদি সমাজের মঙ্গলকর হয়, তবে মৃতভার্য পুরুষের চিরপত্নীহীনতা বিধান কর না কে?······ তুমি বিধানকর্তা পুরুষ, তোমার সুতরাং পোয়াবারো। তোমার বাহুবল আছে, সুতরাং তুমি এ দৌরাত্ম্য করিতে পার। কিন্তু জানিয়া রাখ যে এ অতিশয় অন্যায়, গুরুতর এবং ধর্ম-বিরুদ্ধ বৈষম্য।" এইখানে বলা আবশ্যক যে, 'সাম্য' গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার সময় বঙ্কিমচন্দ্র তৃতীয় প্রস্তাবের অনেক অংশ কাটিয়া ছাটিয়া ফেলিয়াছিলেন, শেষে সমগ্র 'সাম্য' গ্রন্থখানিই বিলুপ্ত করিয়াছিলেন।[১] বহু-বিবাহ আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করিবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবর্তিত আন্দোলন সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে যে আলোচনা করেন, তাহাতে বহুবিবাহ সমাজের অনিষ্টকারক স্বীকার করিয়াও তিনি বলিয়াছেন—

> দশ সহস্র হিন্দুর মধ্যে একজনও অধিবেদনপরায়ণ কিনা সন্দেহ! এই অল্পসংখ্যকদিগের সংখ্যাও যে দিন দিন কমিতেছে, স্বতঃই কমিতেছে, তাহাও

---

১। 'বিবিধ-প্রবন্ধ', ২য় খণ্ডে 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

সকলেই জানেন। কাহারও কোন উদ্যোগ করিতে হইতেছে না—কোন রাজ্যব্যবস্থার আবশ্যক হইতেছে না, আপনা হইতে কমিতেছে। ইহা দেখিয়া অনেকেই ভরসা করেন এই কুপ্রথার যে কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহা আপনা হইতেই কমিবে। এমত অবস্থায় বহুবিবাহরূপ রাক্ষসবধের জন্য বিদ্যাসাগরের ন্যায় মহারথীকে ধৃতাস্ত্র দেখিয়া অনেকেরই ডন্ কুইক্সোটকে মনে পড়িবে।"

পাঠক লক্ষ্য করিবেন বঙ্কিম বহুবিবাহসম্পর্কে স্ত্রীপুরুষে অধিকারসাম্যের যুক্তি অবতারণা করেন নাই। পরন্তু ইতপূর্বে বিষবৃক্ষে শ্রীশচন্দ্রের নিকট নগেন্দ্রের চিঠিতে তিনি তাদৃশ সাম্যনীতির অযৌক্তিকতাই প্রদর্শন করিয়াছিলেন। নগেন্দ্র লিখিতেছেন—

তুমি বলিবে যদি এক পুরুষের দুই স্ত্রী হইতে পারে, তবে এক স্ত্রীর দুই স্বামী না হয় কেন?—উত্তর, এক স্ত্রীর দুই স্বামী হইলে অনেক অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা; এক পুরুষের দুই বিবাহে তাহার সম্ভাবনা নাই। এক স্ত্রীর দুই স্বামী হইলে সন্তানের পিতৃ নিরূপণ হয় না; পিতাই সন্তানের পালনকর্তা—তাহার অনিশ্চয়ে সামাজিক বিশৃঙ্খলতা জন্মিতে পারে, কিন্তু পুরুষের দুই বিবাহে সন্তানের অনিশ্চয়তা জন্মে না। ইত্যাদি আরও অনেক কথা বলা যাইতে পারে।

বহুবিবাহ-বিষয়ক প্রবন্ধে দেখা যায়—সুশিক্ষার বিস্তার দ্বারা ধীরে ধীরে সমাজের স্বাভাবিক গতিতে যে পরিবর্তন বা সংস্কার সাধিত হয়, বঙ্কিমচন্দ্র উহারই পক্ষপাতী; আইন প্রণয়নদ্বারা দ্রুত সমাজসংস্কারের ঘোরতর বিরোধী। এই মত যে প্রকৃষ্ট মত তাহাতে সন্দেহ নাই। যে সংস্কার ভিতর হইতে 'সাধন করা সম্ভব, তাহার জন্য রাজবিধির বাহ্শাসন আশ্রয় করা যে অত্যন্ত অযৌক্তিক তাহা বঙ্কিম উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বিধবাবিবাহ-সম্বন্ধে ঐরূপ বাহ্শাসন ছাড়া বোধ হয় গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু বহুবিবাহনিষেধের আন্দোলনেও তাদৃশ 'শ্মশান-চিকিৎসার' ব্যবস্থা করাতেই বিদ্যাসাগর বঙ্কিমের পত্রিকায় অমন তীব্রভাবে নিন্দিত হইয়াছিলেন।

শিক্ষিতে অশিক্ষিতে, ভদ্রে ও ইতরে সহানুভূতির অভাব আমাদের একটা গুরুতর অপবাদ। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও ইহার যথার্থতা অংশতঃ অঙ্গীকার করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ গৌরবের কথা এই যে, তিনি বঙ্গদর্শনে বঙ্গদেশের কৃষকগণের দুরবস্থা, জমিদারগণ ও তাঁহাদের কর্মচারিগণের হস্তে তাহাদের নিরন্তর লাঞ্ছনা, রাজবিধির, বিশেষতঃ লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে তাহাদের বিড়ম্বনা এবং ঐ বিড়ম্বনা সংশোধনের প্রতি রাজপুরুষগণের উপেক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধে অতি বিস্তৃত আলোচনা করেন। ঐ আলোচনা ফলপ্রদ হইয়াছিল। বঙ্কিম স্বয়ং বলিয়াছেন কৃষকদের অবস্থার 'এক্ষণে যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে, উহাতে তাহার প্রথম সূত্রপাত'। কৃষকগণের অবস্থাবর্ণনে বঙ্কিমচন্দ্র বোধ হয়

একটু অত্যুক্তি করিয়াছিলেন, এবং কৃষকগণের দুর্দশার প্রাকৃতিক কারণগুলি নির্দেশের সময় Buckle এর History of Civilisation হইতে কতকগুলি মত কতকটা নির্বিচারেই গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। ঐ মতগুলির প্রতিবাদ পরম শ্রদ্ধাভাজন ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'সামজিক প্রবন্ধে' কৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে অর্থশাস্ত্রঘটিত কতকগুলি কথা শেষজীবনে বঙ্কিম নিজেই অভ্রান্ত বিবেচনা করিতেন না। এই সব ত্রুটিসত্ত্বেও বলিতে হইবে ঐ প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনের অন্যতম গৌরব।

## দশম পরিচ্ছেদ

## বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত আখ্যায়িকাবলী

'বঙ্গদর্শনে'র প্রথমপর্যায়ে উহাতে বঙ্কিমচরিত ক্ষুদ্র-বৃহৎ ছয়খানি আখ্যায়িকা প্রকাশিত হয় ;—বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, চন্দ্রশেখর, রাধারাণী ও রজনী। কৃষ্ণকান্তের উইলের প্রথম নয়টি পরিচ্ছেদ মাত্র প্রথমপর্যায়ের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। একবৎসর বন্ধ থাকিবার পর সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদকতায় বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় পর্যায় আরব্ধ হইলে উহার প্রথমবর্ষমধ্যেই ঐ আখ্যায়িকা সমাপ্ত হয়। সে যাহা হউক, পূর্বোক্ত ছয়খানি আখ্যায়িকার মধ্যে ইন্দিরা প্রথমে অতি ক্ষুদ্রাবয়ব ছিল। কুড়িবৎসর পরে উহার পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং ঐ আকারেই উহা ইদানীং সকলের পরিচিত। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসসমূহের মধ্যে স্তরনির্ণয় করিতে গিয়া কেহ কেহ এইগুলিকে 'দ্বিতীয় স্তরের বা মধ্যস্তরের' উপন্যাস বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এই মতে প্রথম তিনখানি উপন্যাসে সৌন্দর্যসৃষ্টি ছাড়া বঙ্কিমের অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু 'মধ্যস্তরে উপন্যাসগুলি প্রায়ই এক একটা উদ্দেশ্য লইয়া সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে অবস্থিত।' 'মধ্যস্তরের উপন্যাসে অন্যান্য বিষয়ের (যথা "লিখনভঙ্গিমা, রসমাধুর্য, চরিত্রচিত্র' প্রভৃতির) আদর্শ উৎকৃষ্ট দেখাইলেও সৃষ্টিচাতুর্যে এবং সৌন্দর্য অবতারণায় বঙ্কিম কাব্যের আদর্শ হইতে এক সোপান নামিয়া গিয়াছেন।' এই উক্তিগুলি রায় সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিতের। তিনি আরও বলিয়াছেন, "অসাধারণ যশঃ ও সম্মানলাভের ফলে প্রতিভাবান বঙ্কিম, যেন পাঠকের মনোরঞ্জনের দিকে একটু লক্ষ্য করিলেন।—কিসে পাঠকের ভাল লাগিবে, কিসে সাময়িক সুখ্যাতি হইবে, কি উপায়ে ধর্ম, নীতি, সংসার, সমাজ প্রভৃতি বড় বড় বিষয়ে প্রবেশলাভ করিয়া

১। বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম ৯ম পরিচ্ছেদ।

লোকশিক্ষকের উচ্চাসন লইবেন—এই রকম বিষয়:যেন তিনি মনে মনে নির্বাচিত করিয়া এক একখানি উপন্যাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন।" "শেষাবস্থায় বুদ্ধিমান্ বঙ্কিম আপনার এ ভ্রম বুঝিয়াছিলেন। তাই তিনি সপ্তমে সুর চড়াইয়া আদর্শের চরম (?) পরাকাষ্ঠা দেখাইবার উদ্দেশ্যে স্বদেশভক্তি, মানবপ্রীতি ও ঈশ্বরপ্রেম—এই তিনটি পরমপদার্থকে কেন্দ্র করিয়া উপন্যাসরচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, তাহারই ফলে আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারামের সৃষ্টি হইল।"

আমরা আপাততঃ বঙ্কিমের এই শেষোক্ত তিনখানি উপন্যাস সম্বন্ধে বিশেষভাবে কিছু বলিব না। কিন্তু রায়সাহেব হারাণচন্দ্র যেগুলিকে বঙ্কিমচন্দ্রের 'মধ্যস্তরের উপন্যাস' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ঐগুলিতে 'কিসে পাঠকের ভাল লাগিবে, কিসে সাময়িক সুখ্যাতি হইবে, কিসে ধর্মনীতি, সংসার, সমাজ প্রভৃতি বড় বড় বিষয়ে প্রবেশলাভ করিয়া লোকশিক্ষকের উচ্চাসন লইবেন,' খ্যাতি বা প্রতিপত্তির প্রতি বঙ্কিমের এমন অনুচিত আগ্রহ লক্ষ্য করিতে পারি নাই। বরং দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনীর ন্যায় এগুলিতেও সৌন্দর্যসৃষ্টিই বঙ্কিমের প্রধান লক্ষ্য বলিয়া মনে হয়। আমরা আরও একটু অগ্রসর হইয়া বলিব, দেবী চৌধুরাণী, আনন্দমঠ ও সীতারাম রচনার সময় যদিই বঙ্কিমচন্দ্র লোকশিক্ষার প্রবৃত্তি কর্তৃক প্রণোদিত হইয়া থাকেন, তথাপি সৌন্দর্যসৃষ্টি দ্বারাই সে উদ্দেশ্য সাধন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কোনওটিতে হয়ত তিনি অধিক সফল হইয়াছেন, কোনওটিতে হয়ত তিনি অল্প সফল হইয়াছেন; কোনও একটা উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হওয়ার দরুন যে সাফল্যের ন্যূনতাতিরেক ঘটিয়াছে তাহা নহে। একই শিল্পী সকল প্রকার উপাদান দ্বারা একশ্রেণীর সমানসুন্দর বস্তু নির্মাণ করিতে পারে না। একই কুম্ভকার সকল প্রকার মাটি দিয়া সমান কারুকার্যযুক্ত ঘট করিতে পারে না। অবশ্য বয়োভেদে মানুষের ক্ষমতার হ্রাসবৃদ্ধি, বিবেচনার ত্রুটি ইত্যাদি দ্বারাও সাফল্যে ইতরবিশেষ হয়। কিন্তু একটু নিপুণভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, দুর্গেশনন্দিনীতে বঙ্কিম সমসাময়িক-সমাজনিরপেক্ষ ভাবে সৌন্দর্যসৃষ্টি করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। বিষবৃক্ষ ইত্যাদিতে সমসাময়িক সমাজের অবস্থা অবলম্বন করিয়া সৌন্দর্যসৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন, আর আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরাণীতে যেন একটা সম্ভাব্য ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সৌন্দর্যসৃষ্টির উদ্যোগী হইয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, হারাণবাবুর লক্ষিত তিন স্তরের মধ্যে উপাদানেরই কিছু পার্থক্য আছে; বস্তুতঃ আদর্শবিষয়ে পার্থক্য বা ভ্রম হয় নাই।

তারপর স্তরের কথা। গ্রন্থসমূহ অনেক সময়েই গ্রন্থকারের মানসিক বিবর্তনের বা রুচি ও প্রতিভার পরিণতির চিহ্ন বহন করে, ইহা আমরা অস্বীকার বা অবিশ্বাস করি না। একই লেখকের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লিখিত গ্রন্থাবলীর আদর্শ এক হয় না। এক-এক যুগে তাঁহার কল্পনা এক-একটা ভাব বা আদর্শ দ্বারা সন্দীপিত হয়।

সেই জন্য কোনও লেখকের রচনাসমূহের মধ্যে স্তরনির্ণয় অর্থাৎ তাঁহারা মানসিক বিবর্তনের ইতিবৃত্ত নিরূপণচেষ্টা অনেক সময়েই বেশ কৌতূহলোদ্দীপক ও শিক্ষাপ্রদ হয়। জার্মান সমালোচকগণ এই রীতি অবলম্বনে সেক্ষপীয়র-প্রভৃতির গ্রন্থাবলী হইতে অনেক অপূর্ব তথ্য উদ্ধার করিয়াছেন। অবশ্য ইহাতে এক শ্রেণীর দোষের সম্ভাবনাও যে না আছে তাহা নয়। কখনও কখনও দেখা যায়, স্তরনির্ণয়-চেষ্টার উৎসাহে সমালোচক হয়ত পূর্বগঠিত একটা মত বা সংস্কার অবলম্বন করিয়া পুস্তক-পাঠে প্রবৃত্ত হইয়া কেবল সেই মত বা সংস্কারের পরিপোষক প্রমাণ অনুসন্ধানেই রত থাকেন; কখনও কখনও বা সাধ্য ও সাধনের স্বাতন্ত্র্যই বিস্মৃত হইয়া যান। তখন স্তরটা তাঁহার চক্ষে যত বড় প্রতীয়মান হয়, স্তরের অন্তর্গত গ্রন্থগুলি তত বড় মনে হয় না, কাজেই তাহাদের সূক্ষ্ম বিশেষত্বগুলির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের কোনও কোনও সমালোচক যে বিষবৃক্ষ হইতে তদীয় উপন্যাসে এক নূতন স্তরের সূচনা লক্ষ্য করিয়াছেন তাহাও আমাদের মতে অপ্রচুর সমীক্ষার ফল বলিয়া মনে হয়। কপালকুণ্ডলা একখানি নির্জল নিছক কাব্য, এবং দুর্গেশনন্দিনী ও মৃণালিনী নভেল অপেক্ষা কাব্যধর্মে অধিক সমন্বিত ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। বিষবৃক্ষকে কেহ কেহ social novel বা সামাজিক উপন্যাসমাত্র মনে করিলেও বস্তুতঃ উহা ঠিক নভেল নহে, উহাও একখানি রোমান্স। যুগালাঙ্গুরীয়ও একটি ক্ষুদ্র রোমান্স। 'চন্দ্রশেখর' দুর্গেশনন্দিনী ও মৃণালিনীর সহিত সমসূত্রে স্থাপ্য। 'রজনী'তেও রোমান্সের ধর্মই বলবৎ। সুতরাং বিষবৃক্ষ হইতে বঙ্কিম যে পূর্বাবলম্বিত আদর্শ ত্যাগ করিয়া নূতন পথে চলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহা কিরূপে স্বীকার করা যায়?

তবে ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে, প্রথম তিনখানি উপন্যাস পাঠ করিবার পর বিষবৃক্ষ-পাঠে প্রবৃত্ত হইলে একটা ভিন্ন রকমের আবহাওয়ার মধ্যে আসিয়া পড়িলাম, বোধ হয়। ইহার কারণ এবারে বঙ্কিমচন্দ্র কিঞ্চিৎ নূতন প্রকারের উপাদান লইয়া আখ্যায়িকা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সে উপাদান আর কিছু নহে, তাঁহার সমসাময়িক সমাজের অবস্থা। এ সমাজে মনোরমার ন্যায় 'বিধবা'র বিবাহের জন্য পশুপতির ন্যায় ক্ষমতাশালী রাজমন্ত্রীকেও একটা রাজ্য যবনহস্তে তুলিয়া দিবার ষড়যন্ত্র করিতে হয় না; নগেন্দ্রের মত স্বসমাজে প্রতিপত্তিসম্পন্ন সাধারণ একজন ধনী লোকই অক্লেশে বিধবাবিবাহ করিয়া ফেলিতে পারে। এ সমাজে কন্যা ও পুত্রবধূকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য খৃস্টানী শিক্ষয়িত্রী (মিস্ টেম্পল্) নিযুক্ত করা হয়। এ সমাজে তারাচরণ মাস্টার-রূপ মহামহোপাধ্যায় কুক্কুটমিশ্রপাদ 'Citizen of the World' এবং 'Spectator' পড়িয়া এবং তিন 'বুক' জিওমেট্রি সমাপ্রাণ[১] করিয়া সমাজসংস্কারসম্বন্ধে প্রতি সপ্তাহে প্রবন্ধ লিখেন, এবং

১। "বিষবৃক্ষ' ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। তারাচরণের তিন 'বুক' জিওমেট্রি পর্যন্ত পঠিত থাকায়

'হে পরম কারুণিক পরমেশ্বর !' এই ভণিতায় বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া সকলকে বলেন, 'তোমরা ইটপাটকেলের পূজা ছাড়, খুড়ী-জেঠাইদের বিবাহ দাও, মেয়েদের লেখাপড়া শিখাও, তাহাদের পিঁজরায় পুরিয়া রাখ কেন ? মেয়েদের বাহির কর।' আরও একজন রিফর্মার ( দেবেন্দ্রবাবু ) কলিকাতা হইতে 'বাবুগিরিতে বিলক্ষণ সুশিক্ষিত হইয়া', 'দেবীপুরে প্রত্যাগমন করিয়া প্রথমেই এক ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত করিলেন……।' তিনি আবার মেয়েদের বাহির করা বিষয়ে 'বিশেষ কৃতকার্য হইয়াছিলেন,' কিন্তু সেটা নাকি 'বাহির করার অর্থ বিশেষে।'[১] ইহা ছাড়া বিষবৃক্ষের সমাজে বৈষ্ণবীরা ভিক্ষায় বাহির হইয়া 'বৈরাগিরঞ্জন রসকলি কাটিয়া খঞ্জনীর তালে মধুকানের কি গোবিন্দ অধিকারীর গীত'[২] গায় ; বৈষ্ণবী বাড়ীর ভিতর গেলে পৌরস্ত্রীগণ গোবিন্দ অধিকারী, গোপাল উড়ে বা দাশরথি রায়ের[৩] গান ফরমাস করে ; এক ভূম্যধিকারী বংশের দুই শাখায় পুরুষানুক্রমে মোকদ্দমার ফলে এক শাখার সর্বস্ব ডিক্রিজারিতে নষ্ট হয়, এবং অন্য শাখা তাহাদের তালুক-মুলুক সকল কিনিয়া লয়। এ সবই যেন বড় জানা, বড় চেনা, বড় realistic ব্যাপার। তথাপি একটু বিশেষ আছে। নগেন্দ্রনাথ পূর্বরাগের প্রথম আবেশে কুন্দনন্দিনী সম্বন্ধে হরদেব ঘোষালকে লিখিয়াছিলেন, "বোধ হয় যেন কুন্দনন্দিনীতে পৃথিবীছাড়া কিছু আছে, রক্তমাংসের যেন গঠন নয়, যেন চন্দ্রকর কি পুষ্পসৌরভকে শরীরী করিয়া তাহাকে গড়িয়াছে।" বিষবৃক্ষ একটা অতিপরিচিত জগতের চিত্র হইলেও উহাতেও যে কুন্দের রূপের মত জগৎছাড়া কিছু আছে, তাহা একটু নিপুণ-ভাবে নিরীক্ষণ করিলেই ধরা পড়ে। সেটুকু কবির কল্পনা-রাজ্যের আলোক, আদর্শ লোকের ছায়া, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভাষায়—

> The light that never was, on sea or land,
> The consecration, and the Poet's dream.[৪]

বস্তুতঃ বিষবৃক্ষকে আমরা সামাজিক নভেল বলিতে সম্মত নহি। উহা রোমান্স ; কিন্তু 'romance without idealism' (আদর্শলোকের ছায়াহীন কল্পনামাত্রসম্বল আখ্যায়িকা) নয়, উহার 'beauty without glory' ( গৌরবহীন সৌন্দর্য )

---

কথায় পাঠকের Goldsmith এর Village School Masterকে মনে পড়িবে। And even the story ran that he could gauze.

১। 'বিষবৃক্ষ' দশম পরিচ্ছেদ।

২। 'বিষবৃক্ষ' সপ্তম পরিচ্ছেদ। মধুকানাবা মধুসূদন কিন্নর 'বিষবৃক্ষ' প্রকাশের কয়েক বৎসর মাত্র পূর্বে ( ১৮৬৮ কি ১৮৬৯ খৃস্টাব্দে ) এবং গোবিন্দ অধিকারী মধুকানের প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্বে পরলোক গমন করেন।

৩। গোপাল উড়ের জন্ম-মৃত্যুর সন-তারিখ বিশেষ জানা যায় না। তবে তিনিও যে ইহাদের সমসাময়িক তাহার প্রমাণ আছে। দাশরথি রায় ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৪। Elegiac Stanzas suggested by a Picture of Peele Castle in a Storm,

নহে। বিষবৃক্ষের কাব্যধর্মটুকু তৃতীয় পরিচ্ছেদ হইতেই স্ফুট। ঐ পরিচ্ছেদের নাম বঙ্কিম একটা পাশ্চাত্য কবিসময় অবলম্বনে 'ছায়া পূর্বগামিনী'[১] দিয়াছেন। কুন্দের স্বপ্ন কতকটা কপালকুণ্ডলার স্বপ্নের মত।[২] কপালকুণ্ডলা একজন জটাজূট-ধারী প্রকাণ্ডকায় পুরুষ (কাপালিক) এবং ভীমকায় শ্রীময় ব্রাহ্মণবেশধারীকে (মতিবিবিকে) দেখিয়াছিল, কুন্দ নগেন্দ্রনাথ ও হীরাকে দেখিল। কপালকুণ্ডলারও যেমন ব্রাহ্মণবেশধারীর আহ্বানে গৃহের বাহিরে না যাওয়াই ভাল ছিল, কুন্দেরও সেইরূপ হীরার সংসর্গে না যাওয়াই উচিত ছিল। কপালকুণ্ডলার ন্যায় কুন্দও ক্রূর অদৃষ্টের হাতের একটা ক্রীড়াপুত্তলিকা। জীবননাট্যের শেষ অঙ্কে কপালকুণ্ডলা বন হইতে গৃহাভিমুখে চলিতে চলিতে জাগ্রদবস্থায়ই (স্বপ্নের ন্যায়) আকাশপটে ভৈরবীমূর্তি দেখিয়াছিল, এবং শুনিয়াছিল ভৈরবী তাহাকে বলিতেছেন, 'বৎসে, আমি পথ দেখাইতেছি।'[৩] কুন্দও শেষস্বপ্নে মাতার মুখে শুনিয়াছিল, 'এখন যদি সংসার-সুখে পরিতৃপ্তি জন্মিয়া থাকে, তবে আমার সঙ্গে চল।' এসবই কাব্য; উপন্যাস (নভেল) নহে।[৪] কপালকুণ্ডলার মত বিষবৃক্ষে বঙ্কিম পদে পদে নিমিত্তাদি সূচনা করেন নাই বটে, তবু দেখা যায় নগেন্দ্রের প্রতি প্রেমের সূচনায়ই প্রদোষ-কালে উদ্যানমধ্যস্থ বাপীতটে বসিয়া কুন্দ ভাবিতেছে, 'বিষ খেয়ে ত মরিতে পারি। কি বিষ খাব ?'...ইত্যাদি। আবার নিশীথে নগেন্দ্রের গৃহত্যাগকালে কুন্দ নগেন্দ্রের শয়নাগারে কাচের আবরণে বদ্ধ বর্তিকায় পতনজন্য পতঙ্গগণের নিষ্ফল প্রয়াস দেখিয়া হৃদয় মধ্যে পীড়িতা হইয়াছিল।[৫] এই সকল স্থলে কৌশলে কুন্দের প্রেমের ভাবী পরিণতি সূচিত হইয়াছে।

---

১। ইংরাজীতে বলা হয়—Coming events cast their shadows before.

২। 'কপালকুণ্ডলা' চতুর্থখণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ। বঙ্কিমচন্দ্র এই পরিচ্ছেদের শিরোদেশে বায়রণ হইতে এই পংক্তিটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—I had a dream which was not all a dream. সেক্সপীয়রের Richard III, Act I Sc. IV ক্ল্যারেন্সের স্বপ্নটি এই স্বপ্নের সঙ্গে তুলনীয়।

৩। 'কপালকুণ্ডলা' চতুর্থ খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ।

৪। কুন্দনন্দিনীর প্রথম স্বপ্নে বৃহৎ চন্দ্রমণ্ডলসদৃশ এক জ্যোতির আকাশ হইতে অবতরণ ও ক্রমে তাহাতে কুন্দের মাতার মূর্তিবিকাশের বর্ণনা কিয়ৎপরিমাণে 'শিশুপালবধে' বর্ণিত নারদের আকাশ হইতে অবতরণের তুল্য।

> চয়স্ত্বিষামিত্যবধারিতংপুরা ততঃ শরীরীতি বিভাবিতাকৃতিম্।
> বিভুর্বিভক্তাবয়বং পুমানিতি ক্রমাদমুং নারদ ইত্যবোধি সঃ॥
>
> —'শিশুপালবধ' প্রথমসর্গ, তৃতীয় শ্লোক।

৫। 'বিষবৃক্ষে'র পঞ্চম পরিচ্ছেদেও কুন্দের পিতৃগৃহ হইতে নগেন্দ্রের অনুগমনকালে বঙ্কিম বলিয়াছেন, কেহ কেহ এমন পতঙ্গবৃত্ত যে জ্বলন্ত বহ্নিরাশি দেখিয়াও তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয়।

বহ্নি-পতঙ্গ দৃষ্টান্তটি বঙ্কিমের খুব প্রিয়। পাঠক অবশ্য জানেন, 'কুমারসম্ভবের' তৃতীয় সর্গে (৬৩ সংখ্যক শ্লোকে) হরবহ্নলক্ষ কন্দর্পকে 'পতঙ্গবদ্ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ' বলা হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র একাধিক উপন্যাসে ঐ দৃষ্টান্তটি প্রয়োগ করিয়াছেন। কপালকুণ্ডলার চতুর্থ খণ্ড

সূর্যমুখী 'বিষবৃক্ষে'র গৌরব। ঐ চরিত্রটির প্রতি উহার স্রষ্টার কিরূপ সহানুভূতি ছিল তাহা আমরা কবি নবীনচন্দ্রের মুখে শুনিয়াছি।[১] বস্তুতঃ এই আখ্যায়িকার প্রায় সমস্ত idealism ঐ একটি চরিত্রে কেন্দ্রীভূত হইয়া রহিয়াছে বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। বঙ্কিম সূর্যমুখীকে কোন্ আদর্শে গড়িয়াছেন বলা কঠিন; মনে হয় সূর্যমুখীর চরিত্রসৃষ্টিকালে সত্যভামার চরিত্র-চিত্র বঙ্কিমের মনোদর্পণে প্রতিফলিত হইয়াছিল। সত্যভামার একখানি চিত্র নাকি সূর্যমুখীর শয়নগৃহে ছিল; সে চিত্রে রজত-কাঞ্চনের ওজনে স্বামীর মূল্য নির্ধারণে প্রবৃত্তা সত্যভামার বিড়ম্বনা অঙ্কিত হইয়াছিল। ঐ চিত্রের নীচে সূর্যমুখী নাকি স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, 'যেমন কর্ম তেমনি ফল। স্বামীর সঙ্গে সোণা রূপার তুলা?'[২] সূর্যমুখীকে অবশ্য আমরা সর্বত্রই স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগবতী ও স্বামীর মর্যাদা সম্বন্ধে গভীর বিশ্বাসপরায়ণা দেখি। তিনি বলেন, "পৃথিবীতে যদি আমার কোন সুখ থাকে, তবে সে স্বামী; পৃথিবীতে যদি আমার কোন কিছু সম্পত্তি থাকে তবে সে স্বামী।"[৩] এ-কথাগুলিকে আন্তরিকতাহীন বিবেচনা করিবার কোনও হেতু নাই। কিন্তু সেই সূর্যমুখী যখন স্বেচ্ছায় স্বামীর সহিত কুন্দের বিবাহ ঘটাইয়া দিবার পর স্বয়ং গৃহের বাহির হইয়া পড়িলেন, তখন তাহাতেও সত্যভামার ক্ষণিক মোহের ন্যায়, ক্ষণিক আত্মাদরের প্রাবল্য দেখিলাম। কুন্দের বিবাহের পর খিন্নমানা সূর্যমুখীকে কমলমণি যথার্থই বলিয়াছিলেন, "তোমায় পায়ে ঠেলেছেন বলে তোমার অন্তর্দাহ হতেছে। তবে কেন বল 'আমি কে?' তোমার অন্তঃকরণের আধখানা আজও 'আমি'তে ভরা, নহিলে আত্মবিসর্জন করিয়াও অনুতাপ করিবে কেন?" সূর্যমুখীকে অন্তর্দাহে দগ্ধা দেখাইয়া বঙ্কিম হয়ত তাহাকে লক্ষহীরা-কাহিনীর পতিব্রতা পত্নীর ন্যায় 'আদর্শ' রমণী করেন নাই, কিন্তু যথার্থ রক্তমাংসের একজন স্ত্রীলোক করিয়াছেন। অভিমান, ভ্রম মানুষের স্বাভাবিক; সূর্যমুখীর ন্যায় পতিপ্রাণা রমণীতেও তাহা অস্বাভাবিক বা অশোভন হয় নাই। দুই দিন পরে সেই অভিমান ও ভ্রম কাটিয়া গেলে সূর্যমুখীর চরিত্র অগ্নিদগ্ধ কাঞ্চনের ন্যায় উজ্জ্বলভাবে দীপ্তি পাইতে লাগিল। বস্তুতঃ সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ কেবল রোমান্স নয়; উহাতে ভাবিবার ও শিখিবার কথা আছে।

---

চতুর্থ পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে—মৃণ্ময়ী 'জ্বলন্ত বহ্নিশিখায় পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন।' 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রথমখণ্ড, ১৪শ পরিচ্ছেদে রোহিণী সম্পর্কে 'পতঙ্গবদ্ বহ্নিমুখঃ বিবিক্ষুঃ' এই কথাটিই আছে। 'চন্দ্রশেখর' দ্বিতীয় খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদে শৈবালিনী প্রতাপ সম্বন্ধে বলিতেছে 'সে শৈবালিনীপতঙ্গের জ্বলন্ত বহ্নি'। আবার পঞ্চমখণ্ড চতুর্থ পরিচ্ছেদে আছে, 'দলনীপতঙ্গ বহ্নিমুখবিবিক্ষু হইল'। 'কমলাকান্তে'র সমগ্র 'পতঙ্গ'-শীর্ষক প্রবন্ধ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

১। ৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২। 'বিষবৃক্ষ', ৪৩শ পরিচ্ছেদ।

৩। ঐ, ১১শ পরিচ্ছেদ।

কমলমণির সহিত ব্যবহারেও সূর্যমুখীকে দেখিয়া সত্যভামাকে মনে পড়ে। ননদ-ভ্রাতৃবধূতে এমন প্রীতি মহাভারতের পরে কোনও হিন্দু কবি দেখান নাই। শ্যামাসুন্দরী-কপালকুণ্ডলায় বঙ্কিম ইহার ছায়াপাতমাত্র করিয়াছিলেন।

সূর্যমুখীর পরে কমলমণিই বিষবৃক্ষের উজ্জ্বলতম নারীচরিত্র। সূর্যমুখী গম্ভীরা, কমল কিছু রসিকা—এ প্রভেদ যে উভয়ের বয়সের প্রভেদে ঘটিয়াছে তাহা মনে হয় না। কমলমণিতে বঙ্কিম গিরিজায়ার প্রফুল্লতাটুকু ষোল আনাই আনিয়া ফেলিয়াছেন; আনেন নাই কেবল তাহার কণ্ঠের সঙ্গীত আর হাতের ঝাঁটা। সূর্যমুখী নিঃসন্তানা; ঐ দৈবকৃত অপূর্ণতাটুকু কমলমণিতে পরিপূর্ণ করিয়া বঙ্কিম দেখাইয়াছেন মাতৃত্ব স্ত্রীলোকের পক্ষে কত সৌন্দর্যের—কত গৌরবের বস্তু। সূর্যমুখী অনুরক্তা পত্নী, ও বৃহৎ পরিবারের যোগ্যতমা গৃহিণী। কমলমণি অনুরক্তা পত্নী ও স্নেহময়ী মাতা। সন্তানের স্নেহে তাহার স্বামিপ্রেম বুঝি আরও গভীর—আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

> রথাঙ্গনাম্নোরিব ভাববন্ধনং
> বভূব যৎ প্রেম পরস্পরাশ্রয়ম্।
> বিভক্তমপ্যেকসুতেন তত্তয়োঃ
> পরস্পরস্যোপরি পর্যচীয়ত ॥[১]

সূর্যমুখী ও কমলমণি এই যুগলমূর্তিতে বঙ্গীয়া রমণীর পূর্ণতা দেখিতে পাওয়া যায়। কুন্দনন্দিনী কাব্যকাননের অফুটন্ত কুন্দ-কুসুম; বড় শুভ্র, কিন্তু ফুটিবার অবকাশ না পাওয়ায় সবটুকু সুবাস বিতরণ করিতে পারে নাই। তিলোত্তমার ন্যায় সে নীরবসহনশীলা, 'মুগ্ধা নায়িকা'; কপালকুণ্ডলার ন্যায় সে দৈবহতা। দেবেন্দ্রের লালসাবহ্নির উত্তাপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, কিন্তু দৈববিড়ম্বনায় উহা হীরার বিষবৃক্ষ মুকুলিত করিয়া কুন্দকে উপহত করিয়াছে।

কেহ কেহ বলেন বিধবাবিবাহের কুফলপ্রদর্শনই কুন্দনন্দিনীর সৃষ্টির হেতু। আমরা তাহা মনে করি না। সে শ্রেণীর মোটা রকমের সমাজশিক্ষার প্রয়োজনে কুন্দকে বিধবা করা হয় নাই, সূক্ষ্ম কাব্যকলার প্রয়োজনে করা হইয়াছে। বিষবৃক্ষ-কাব্যের যাহা শিক্ষা তাহা বঙ্কিম স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

ইংরাজীতে যাহাকে parallelism বলে, এবং একশ্রেণীর একাধিক পাত্র-পাত্রীকে সমসূত্রে স্থাপন করিয়া তাহাদের বৈশিষ্ট্যপ্রদর্শন যাহার উদ্দেশ্য, বিষবৃক্ষে বঙ্কিম সেই রীতি প্রচুর পরিমাণে অবলম্বন করিয়াছেন। প্রথমতঃ দেখিতে পাই তিনি আমাদের সম্মুখে তিনটি পরিবারের বিবরণ স্থাপন করিয়াছেন। প্রথম

---

১। 'রঘুবংশ' তৃতীয় সর্গ ২৪শ শ্লোক। চক্রবাক-চক্রবাকীর ন্যায় তাঁহাদের (দিলীপ ও সুদক্ষিণার) পরস্পরের প্রতি যে হৃদয়াকর্ষক প্রেম ছিল, একটি তনয় তাহার ভাগ গ্রহণ করিলেও, পরস্পরের প্রতি তাহা বর্দ্ধিতই হইল।

দেবেন্দ্রের পরিবার—যাহা তদীয় পত্নী হৈমবতীর 'রূপে গুণে' উৎসন্ন হইয়াছে। পাঠক শুনিয়াছেন হৈমবতীর অনেক গুণ—সে কুরূপা, মুখরা, অপ্রিয়বাদিনী, আত্ম-পরায়ণা; যখন দেবেন্দ্রের সহিত তাহার বিবাহ হয় তখন পর্যন্ত দেবেন্দ্রের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক, লেখাপড়ায় তাহার বিশেষ যত্ন ছিল, এবং প্রকৃতিও সুধীর ও সত্যনিষ্ঠ ছিল কিন্তু সেই পরিণয়ই তাহার কাল হইল। ইহার পার্শ্বে কমলমণি-শ্রীশচন্দ্রের গার্হস্থ্য-চিত্র স্থাপন কর, দেখ এ একেবারে বিপরীত কি না। স্বামি-স্ত্রীতে কেমন সম্বন্ধ! তবে শ্রীশের আফিসের কেরাণীরা বলে, শ্রীশচন্দ্র নাকি 'বড় স্ত্রৈণ'। সেটা শ্রীশ নিজে অপমানের বিষয় মনে করে না; কোন্ পাঠক করেন? এ পরিবারের নিত্য উপচীয়মান স্নেহপ্রীতি-রঙ্গরসের বালাই লইয়া মরিতে কার না ইচ্ছা হয়? কিন্তু পরিবারটি বড় ক্ষুদ্র; বহুকুটুম্বযুক্ত বাঙ্গালী পরিবার নহে—সাহেবী পরিবারের মত ক্ষুদ্র পরিবার—সহুরে চাকুরে লোকের যোগ্য। পরিবারটি ক্ষুদ্র বলিয়াই গৃহিণীর তরল আনন্দ, চপল স্ফূর্তির অবকাশ আছে। নগেন্দ্রের পরিবার অন্যবিধ; সূর্যমুখীর ন্যায় শিক্ষিতা, পতিভক্তিমতী, সুরুচিশালিনী, গম্ভীরা, দৃঢ়চিত্তা নারীই ইহার যোগ্যা গৃহিণী। এ সংসারে যে অশান্তি প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা সূর্যমুখীর বুদ্ধিদোষে নহে, অদৃষ্টের দোষে—নগেন্দ্রের চিত্তসংযমের অভাবে। নগেন্দ্র যে শ্রীশের মত স্ত্রৈণ নন, তাহা তাঁহার দুর্ভাগ্য। তাই হেলায় রতন হারাইবার পূর্বে তিনি বুঝেন নাই, সূর্যমুখী তাঁহার কি ছিল; পরে বুঝিয়াছিলেন।

> সূর্যমুখী আমার—সব। সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্যায় দাসী। আমার সূর্যমুখী—কাহার এমন ছিল? সংসারে সহায়, গৃহে লক্ষ্মী, হৃদয়ে ধর্ম, কণ্ঠে অলঙ্কার। আমার নয়নের তারা, হৃদয়ের শোণিত, দেহের জীবন, জীবনের সর্বস্ব! আমার প্রমোদে হর্ষ, বিষাদে শান্তি, চিন্তায় বুদ্ধি, কার্যে উৎসাহ! আর এমন সংসারে কি আছে? আমার দর্শনে আলোক, শ্রবণে সঙ্গীত, নিশ্বাসে বায়ু, স্পর্শে জগৎ। আমার বর্তমানের সুখ, অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতের আশা, পরলোকের পুণ্য। আমি শূকর, রত্ন চিনিব কেন?[১]

পারিবারিক চিত্রগত parallelism বা তুলনা ছাড়া ব্যক্তিগত parallelismও বিষবৃক্ষে আছে। তাহা পূর্বে কিছু দেখান গিয়াছে—আরও কিছু দেখাইব। নগেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্র ও হীরা এই তিন ব্যক্তিই স্বহস্তে স্বেচ্ছায় বিষ-বৃক্ষের বীজ বপন করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ নিতান্ত হীনচরিত্র,

---

১। নগেন্দ্রের বিলাপের সঙ্গে রঘুবংশের অজ-বিলাপের 'গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।' ইত্যাদি তুলনীয়। এই স্থলে 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' রোহিণীর মৃত্যুর পূর্বে ভ্রমর সম্পর্কে গোবিন্দলালের উক্তিও স্মরণীয়। 'রজনী'তে লবঙ্গলতার স্বামিভক্তি সম্পর্কে রজনীর কৌতুকাবহ উক্তিগুলিও তুলনা করা যাইতে পারে।

তাহার রুচি অতি নিকৃষ্টশ্রেণীর ইন্দ্রিয়সেবায়। তাহার পরিণামও অতি জঘন্য। নগেন্দ্রনাথ উন্নতরুচি, কেবল সংযমের অভাবে বিড়ম্বনাগ্রস্ত। দুঃখের কঠোর শিক্ষায় পরে তিনি চৈতন্যলাভ করিয়াছিলেন। হীরা পাপিষ্ঠা; সেও চিত্ত-সংযমের অভাবে প্রথমে আপনি মজিল,—আপনার ইহকাল পরকাল নষ্ট করিল; পরে দেবেন্দ্রের প্রতি ক্রোধে নিরপরাধা কুন্দকে বিষ দিল। পাপের পথে পতন যে কতদূর দ্রুত ও বিকট হয়, হীরা তাহার দৃষ্টান্ত। নগেন্দ্র রূপজমোহগ্রস্ত হইয়া বিধবা কুন্দকে 'বৈধ' উপায়ে পত্নীরূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু মোহ সর্বাবস্থায়ই অবৈধ—পাপ; নগেন্দ্র পাপপথে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াই সূর্যমুখীর গৃহত্যাগজনিত আঘাতে প্রবুদ্ধ হইলেন। সুরুচি, সুশিক্ষা ও সম্ভবতঃ পত্নীর পুণ্যবল তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছে। দেবেন্দ্রে এই তিনটিরই বড় অভাব। তাহার অদৃষ্টও মন্দ। নগেন্দ্র ও দেবেন্দ্র উভয়েরই সদুপদেষ্টা ছিল, দেবেন্দের দুর্ভাগ্য-বশতঃ তাঁহার উপদেষ্টা সুরেন্দ্র 'প্রত্যহ রাত্রে' (প্রায়ই দেবেন্দ্রের মত্তাবস্থায়) একবার আসিতেন। তাহার উপদেশবীজ অকালে উপ্ত হইত বলিয়া অঙ্কুরিত হয় নাই। হরদেব ঘোষালের সময়োপযোগী উপদেশগুলি নগেন্দ্রের চৈতন্যোদয়ের সহায় হইয়াছিল।

'ইন্দিরা', 'যুগলাঙ্গুরীয়' 'রাধারাণী' এই তিনটিই ছোট আখ্যায়িকা। আধুনিক কালের আদর্শে ছোটগল্পের হিসাবে ঐ তিনখানির কোনওখানিই খুব উচ্চশ্রেণীর বস্তু নহে। ছোট গল্প বিলাতী ম্যাগাজিনগুলির একটি অতিশয় চিত্তা-কর্ষক বিশেষত্ব। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনকে বিলাতী ম্যাগাজিনের বিষয়বৈচিত্র্যে সমন্বিত করিবার উদ্দেশ্যেই ঐ গল্পগুলি রচনা করেন। এগুলিতে যে তাঁহার সাফল্য অধিক হয় নাই, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। শিল্পের হিসাবে ছোট গল্প ও বড় উপন্যাস একশ্রেণীর বস্তু নহে; একটিতে দক্ষতা থাকিলেই যে অন্যটিতে দক্ষতা থাকিবে এমন নিয়ম নাই। মোঁপাসা ছোট গল্পের বোধ হয় সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী; বিশেষ বিচারক্ষম সমালোচকগণের মতে বড় উপন্যাস রচনায় তিনি তাদৃশ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। আবার ডিকেন্স থ্যাকারের ন্যায় অসামান্য প্রতিভাশালী ঔপন্যাসিকগণও ছোটগল্পে তেমন বিশিষ্টরূপ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। বস্তুতঃ ছোট গল্পের আর্ট বঙ্কিমচন্দ্রের (অন্ততঃ বঙ্গ-দর্শনের) পরবর্তী কালে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। মোঁপাসা, চেকব্, স্টিভেন্‌সন্, হথর্ণ প্রভৃতির ছোট গল্পগুলি সবই বঙ্গদর্শনের পরবর্তীকালের রচনা। টলস্টয়ের ছোট গল্পগুলি পূর্বে লিখিত হইলেও বঙ্কিম ঐগুলি তখন পাঠ করিয়াছিলেন কিনা বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথ এই সমুদয় উন্নত আদর্শের সাহায্য লাভ করিয়াই 'গল্পগুচ্ছে'র অনিন্দ্যসুন্দর গল্পগুলি রচনা করিতে পারিয়াছেন। এমনও মনে হয় তাঁহার অনন্যসামান্যা খণ্ডকাব্য-রচনা-পটীয়সী প্রতিভা ছোট গল্পেরই সমধিক উপযোগিনী বলিয়া বড় উপন্যাস অপেক্ষা ছোট গল্পে তাঁহার সাফল্য অধিক

হইয়াছে। ছোট গল্পলেখকের কৃতিত্ব যে বড় উপন্যাসলেখকের কৃতিত্ব অপেক্ষা অল্প তাহা আমাদের বক্তব্য নহে। লেখকের প্রতিভা থাকিলে দুই-ই তুল্যরূপ মনোজ্ঞ হইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে ইংরাজীতে যাহাকে largeness of design বলে তাহাই স্বাভাবিক; ছোট গল্পে তাহার সমুচিত স্ফূর্তি হয় না। ছোট আখ্যায়িকাগুলিতে কল্পনাকে স্বল্প পরিসরের মধ্যে সঙ্কুচিত করিতে গিয়া বঙ্কিম উহাদিগকে শিল্পসম্পদে হীন করিয়াছেন। তাই ছোট ইন্দিরা ও ছোট রাজসিংহকে পরে তিনি বড় করিয়াছিলেন। ইন্দিরা বড় হইয়াও সৌন্দর্যে তদনুপাতে বিশেষ গৌরবশালিনী হয় নাই। বড় 'রাজসিংহ' শিল্পসম্পদে অনবদ্য।

বিষবৃক্ষের ন্যায় ইন্দিরায়ও বঙ্কিমচন্দ্র সমসাময়িক সমাজ হইতেই আখ্যানবস্তু সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু যুগলাঙ্গুরীয়ে তিনি কল্পনাকে একেবারে সেই স্মরণাতীতপ্রায় প্রাচীন যুগে লইয়া গিয়াছেন—যখন সমুদ্রের নীল বীচিমালা তাম্রলিপ্তি নগরের প্রান্তভাগ বিধৌত করিত। সেই অর্ধালোক ও অর্ধান্ধকারাবৃত যুগের দুইটি শান্ত, ধীর, ও গুরুজনের আজ্ঞানুবর্তী প্রেমিক-প্রেমিকার বেদনাপূর্ণ অনুরাগকে নায়িকার পিতৃগুরু আনন্দ স্বামীর অদৃষ্টজ্ঞানোজ্জ্বলা কল্যাণচেষ্টা দ্বারা সকল আশঙ্কিত বিপদ অতিক্রম করাইয়া মঙ্গলময় সফলতায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন। হতভাগিনী মনোরমার আনন্দ স্বামীর ন্যায় কোনও গ্রহদোষখণ্ডনক্ষম কল্যাণকামী পিতৃগুরু ছিল না। মৃণালিনী পিতার সম্মতির প্রতীক্ষা না করিয়া হেমচন্দ্রের সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল, আর হিরণ্ময়ী বাল্য হইতে ভালবাসিয়াও পিতার অনিচ্ছায় পুরন্দরকে আত্মদান করিতে পারিতেছিল না। হেমচন্দ্র ও মৃণালিনীর তুলনায় পুরন্দর ও হিরণ্ময়ীকে যে বড় নিশ্চেষ্ট ও গুরুজনের উপর বড় নির্ভরশীল দেখায় তাহা দোষ না গুণ পাঠক স্বীয় রুচি অনুসারে তাহার বিচার করিবেন। তবে 'মৃণালিনী' গ্রন্থের প্রারম্ভেই দেখা যায় মৃণালিনী হেমচন্দ্রের পূর্বপরিণীতা পত্নী, আর হিরণ্ময়ী প্রথমে জানিত পুরন্দরের সহিত তাহার বিবাহ হইতে পারে না—পরে জানিত সে অন্যের পরিণীতা; সুতরাং মৃণালিনীর সহিত তাহার প্রভেদ খুব স্বাভাবিক। পুরন্দর বেচারাই বা এমন অবস্থায় সচেষ্ট হইয়া কি করিবে?

মাধবাচার্য অপেক্ষা অভিরাম স্বামীর সহিত আনন্দ স্বামীর বংশগত সাদৃশ্য অধিক; এবং মাধবাচার্য ও অভিরাম স্বামী উভয়ের তুলনায় তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রে অধিক পারদর্শী। 'চন্দ্রশেখর'-এ রামানন্দ স্বামী কাহারও অদৃষ্ট গণেন না, রাজনীতিরও বড় একটা ধার ধারেন না। কিন্তু তিনি স্বয়ং পরোপকারব্রত, এবং শিষ্য চন্দ্রশেখরকেও ঐ ব্রতে দীক্ষিত করিয়াছেন। অভিরাম স্বামী, মাধবাচার্য ও আনন্দ স্বামী অপেক্ষা তাঁহাকে দুইটি অধিক গুণে গুণান্বিত দেখি, প্রথম তিনি দার্শনিক, 'প্রবাদ ছিল যে, ভারতবর্ষের লুপ্ত দর্শন-বিজ্ঞান তিনি সকলই জানিতেন।'[১] তাহা ছাড়া তিনি যোগবলে বলীয়ান্।

১। 'চন্দ্রশেখর' তৃতীয় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ।

যোগবলে বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্বাস চন্দ্রশেখরেই সর্বপ্রথম স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। যাদবচন্দ্রের পুত্রের পক্ষে যোগবলে বিশ্বাস থাকা কিছুতেই আশ্চর্যের বিষয় হইতে পারে না। বিশ্বাস অত্যন্ত দৃঢ় ছিল বলিয়াই উপন্যাসে উহার অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে চন্দ্রশেখরে উহার অবতারণা করিয়াছেন তাহাতে চন্দ্রশেখরের শিল্পসম্পদ কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র প্লটের সংক্ষিপ্ততার পক্ষপাতী ছিলেন। চন্দ্রশেখরে যোগবল তাহার উপায়স্বরূপ হইয়াছে, নচেৎ শৈবলিনীর পীড়োপশম, চিত্তশুদ্ধি-সাধন, এবং তাহার দেহের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে চন্দ্রশেখরের প্রবোধ-উৎপাদন প্রভৃতি করিতে বঙ্কিমকে পুঁথি বাড়াইতে ও সঙ্গে সঙ্গে প্লটকে কিছু শিথিল ও বিক্ষিপ্ত করিতে হইত। তথাপি শিল্পের ত্রুটি ত্রুটি বলিয়া অবশ্য-স্বীকার্য। 'চন্দ্রশেখর'-খানি মনোযোগপূর্বক পাঠ করিলে মনে হয় দলনী বঙ্কিমের সহানুভূতিকে এমন ভাবে আয়ত্ত ও আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল যে, তাহার মৃত্যুর পর হইতে ঐ আখ্যায়িকাখানির প্রতি লেখকের যেন আর তেমন আদর নাই, যেন তিনি উহা তাড়াতাড়ি সমাপ্ত করিতে ব্যগ্র। যে পরিচ্ছেদে কুন্দের বিষপান ও মৃত্যু বর্ণিত হইয়াছে, উহার পর পরিচ্ছেদেই বিষবৃক্ষ সমাপ্ত হইয়াছে। চন্দ্রশেখরে দলনীকে বিষ পান করাইবার পরেই গ্রন্থ সমাপ্ত করিতে পারিলেন না বলিয়া বঙ্কিম যেন একটু অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। বস্তুতঃ ঐ স্থান ( ষষ্ঠখণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদ ) হইতেই 'চন্দ্রশেখর' শিল্পসম্পদে হীন হইয়াছে। যোগবলের প্রয়োগও এই অংশের মধ্যেই পড়িয়াছে। শেষপরিচ্ছেদের পূর্বপরিচ্ছেদে আখ্যায়িকার প্রায় সব পাত্রকে একত্র মিলিত করাও প্লটের সংক্ষিপ্ততার প্রয়োজনেই আবশ্যক হইয়াছে। গ্রন্থশেষে সব পাত্রকে একত্র করা ডিকেন্সের একটা কৌশলের মধ্যে ছিল; ঐ কৌশলটি সকলে প্রশংসা করে নাই। গোল্ডস্মিথের 'ভিকার অব্ ওয়েকৃফিল্ড্' উপন্যাসেও ঐ কৌশলটি একটু অনুচিত মাত্রায়ই আছে। চন্দ্রশেখরের শেষ অংশ পড়িতে পড়িতে গোল্ড্স্মিথের উপন্যাসের উক্ত দোষটুকু মনে পড়ে। চন্দ্রশেখরের প্রথম দুই সংস্করণে প্রকাশিত 'পরিশিষ্টে' ঐ দোষ আরও স্পষ্ট ছিল। তৃতীয় সংস্করণ হইতে ঐ 'পরিশিষ্ট' পরিত্যক্ত হয়।

পূর্বলিখিত অন্য সকল আখ্যায়িকার তুলনায় চন্দ্রশেখরে বর্ণনার বৈচিত্র্য বিশেষভাবে লক্ষ্য। ভীমা পুষ্করিণীতে যুবতীর সঙ্গে জলের ক্রীড়া,[১] শৈবলিনীর মুঙ্গেরযাত্রার পথে প্রতিকূল বায়ুমুখে বজরার ধীরগতিবর্ণনোপলক্ষে প্রভাতবাবুর স্বভাববর্ণন[২], জ্যোৎস্নালোকে আকাশে গঙ্গাতীরে ও গঙ্গাবক্ষে অনন্তের অনুভূতি, প্রতাপ-শৈবলিনীর অগাধজলে সন্তরণ[৩], শৈবলিনীর

১। 'চন্দ্রশেখর' প্রথম খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ।

২। ঐ ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

৩। ঐ তৃতীয় খণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

পর্বতারোহণোপলক্ষে জড়প্রকৃতির নির্মমতার উল্লেখ—ইহার প্রত্যেকটি এমন সুন্দর ও প্রসঙ্গানুগত ভাবব্যঞ্জক যে, একবার পড়িলেই চিত্তপটে মুদ্রিত হইয়া যায় এবং হৃদয়ে অপূর্ব আনন্দ সঞ্চার করে। কোনও কোনওটি বহিঃপ্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির সম্বন্ধ দ্যোতন[১] করিয়া কিংবা জড়প্রকৃতিতে চেতনা ও বুদ্ধিধর্ম আরোপ করিয়া পাঠকের দৃষ্টি ও সহানুভূতির সীমা প্রসারিত করে। ফস্টরের বজরায় শৈবলিনীর স্বপ্ন[২] কুন্দ ও কপালকুণ্ডলার স্বপ্নের মত অর্থপূর্ণ এবং কাব্যোচিত। শৈবলিনীর নরকদর্শন-বর্ণনা এমন শক্তিশালিতার পরিচায়ক যে, পড়িতে পড়িতে শিহরিয়া উঠিতে হয় এবং মেরী করেলীর Sorrows of Satan (১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত)-এর একটা বহুজনাদৃত ও ভীষণসৌন্দর্যপূর্ণ অংশ মনে পড়ে। বঙ্কিম মনুসংহিতা ও পুরাণ হইতে নরকের চিত্র সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন। দান্টে ও মাইকেলও অবশ্যই তাঁহার পড়া ছিল।

'যুগলাঙ্গুরীয়ে' হিরণ্ময়ী ও পুরন্দর বাল্যাবধি পরস্পরকে ভালবাসে, চন্দ্রশেখরেও শৈবলিনীও প্রতাপের ভালবাসা আবাল্যসঞ্জাত। চন্দ্রশেখরে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, বাল্যপ্রণয়ে কোনও অভিসম্পাত আছে! প্রতাপ-শৈবলিনীর বেলায় তাহা সত্য, কিন্তু হিরণ্ময়ী-পুরন্দরের বাল্যপ্রণয় একেবারে অভিসম্পাতগ্রস্ত নয়; যাহার পরিণাম ভাল, তাহার সব ভাল। কবি টেনিসন্[৩] বাল্যপ্রণয় সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "বালকবালিকার পরস্পরের প্রতি অনুরাগ কদাচিৎ প্রেমে পরিণত হয়[৪]; কেননা চারি চক্ষুর আকস্মিক মিলনে যে বিদ্যুৎ চমকিত হয়, উহাতেই প্রেমাগ্নি জ্বলিয়া উঠে।[৫] তবে যদি বাল্যপ্রণয় প্রেমে পরিণতি লাভ করে, তবে তাহার প্রভাব অপ্রতিহত।" প্রতাপ শৈবলিনীর তাহাই হইয়াছিল।

প্রতাপ ধীর স্থির সংযমী, "পাপচিত্তে আমি তাহার প্রতি অনুরক্ত নহি—আমার ভালবাসার নাম জীবনবিসর্জনের আকাঙ্ক্ষা। শিরায়-শিরায়, শোণিতে-শোণিতে. অস্থিতে-অস্থিতে, আমার এই অনুরাগ অহোরাত্র বিচরণ করিয়াছে।" শৈবলিনীর ভালবাসায় গভীরতা ও শেষ দিকে উৎকট চিত্তমোহকারিতা ছিল, কিন্তু কোনও কালেই উহাতে আত্মবিসর্জন দেখা যায় নাই। বার বৎসরের বালিকা ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল. কিন্তু শেষ মুহূর্তে তার মনে হইল 'কেন মরিব? প্রতাপ

---

১। 'চন্দ্রশেখর' প্রথমখণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। ২। চন্দ্রশেখর' দ্বিতীয়খণ্ড ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

৩। How should he Love
Whom the cross-lightnings of four chancement eyes
Flash into fiery life from nothing, follow
Such dear familiarities of dawn?
Seldom, but when he does, Master of all. —*Aylmers Field.*

৪। পাঠক স্মরণ করিবেন, ওসমানের প্রতি আয়েষার আবাল্য অনুরাগ প্রেমে পরিণত হয় নাই।

৫। তিলোত্তমা ও জগৎসিংহের প্রেম ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত।

আমার কে?' শৈবলিনীর বিবাহের পর প্রতাপ তাহাকে সর্প মনে করিয়া ভয়ে পথ ছাড়িয়া দিতেন। তাহার বিষের ভয়ে বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু শৈবলিনীর ক্ষণসুপ্ত প্রেম তাঁহাকে দেখিয়া দেখিয়া আবার উদ্দীপ্ত হইয়াছিল। তাঁহারই রূপধ্যান করিয়া শৈবলিনীর গৃহ অরণ্য হইয়াছিল। গৃহত্যাগ করিলে যদি প্রতাপকে পাওয়া যায় সেই আশায় সে গৃহত্যাগিনী হইয়াছিল। মুঙ্গেরে প্রতাপের বাসায় প্রতাপের সহিত তাহার কথোপকথনে সপ্তগ্রামে মতিবিবির গৃহে নবকুমার ও মতিবিবির কথোপকথন মনে পড়ে। তারপর সেই 'অগাধজলে সাঁতারের' পর যখন প্রতাপকে স্পর্শ করিয়া শৈবলিনী শপথ করিল, "আজি হইতেই তোমাকে ভুলিব, আজি হইতে আমি মনকে দমন করিব, আজি হইতে শৈবলিনী মরিল", তাহার পর হইতেই সে অন্য জীব—তাহার পর হইতে তাহার অন্য জন্ম, কিন্তু সে জন্মে উত্তীর্ণ হইতে তাহাকে ঘোরতর নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া যাইতে হইয়াছিল। শাস্ত্র বলেন, কর্মফলভোগের জন্য জীবের পুনঃ পুনঃ জন্ম হয় বটে, কিন্তু তাহাতেই সমস্ত কর্মফল ভুক্ত হয় না। উৎকট পাপপুণ্যের ফলভোগার্থ নরক বা স্বর্গ দর্শনও হয়। আবার অত্যুৎকট পাপপুণ্যের ফল এক জীবনমধ্যেই পাওয়া যায়। শৈবলিনীর নরক-যাতনাভোগ, শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্র ও কাব্য উভয় মতেই সঙ্গত ও অর্থপূর্ণ।

বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীকে পুনঃ পুনঃ পাপিষ্ঠা বলিয়াছেন। শৈবলিনীর সংযমের অভাব ও আত্মবিসর্জনে অক্ষমতা বা অপ্রবৃত্তিই তাহার হেতু। কিন্তু সে পাপিষ্ঠা হইলেও, কাব্যের দিক হইতে তাহার পক্ষেও দুইটি কথা বলিবার আছে। চন্দ্রশেখর তাহাকে বিবাহ করিয়া গৃহে নিয়া আপনার দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য কি যত্ন করিয়াছিলেন? তিনি নিজেই বলিতেছেন, "আমার যে বয়স, তাহাতে আমার প্রতি শৈবলিনীর অনুরাগ অসম্ভব। অথবা আমার প্রণয়ে তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা নিবারণের সম্ভাবনা নাই। বিশেষ আমি ত সর্বদা গ্রন্থ লইয়া বিব্রত। আমি শৈবলিনীর সুখ কখন্ ভাবি?" চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে যে অন্তরে অন্তরে ভালবাসিতেন তাহা তাঁহার দলনীর অদৃষ্টগণনার পর গৃহপ্রত্যাগমন-কালীন চিন্তায় ও পুস্তকদাহের বিবরণে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু শৈবলিনীর জীবনের ইতিহাস যিনি জানেন তিনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন চন্দ্রশেখরের দৈনন্দিন আচরণে শৈবলিনীর পক্ষে প্রতাপের ভালবাসা ভুলিয়া যাওয়া ও তাহাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষাকে দমন করা প্রায় অসম্ভব ছিল। ফস্টরের বজরায় সুন্দরী শৈবলিনীকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিল,—

---

১। কপালকুণ্ডলার প্রতি নবকুমারের ভালবাসা সম্বন্ধে পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা এই স্থানে স্মরণযোগ্য। অবশ্য নবকুমারের ভালবাসা হইতেও চন্দ্রশেখরের ভালবাসা বাহ্যপ্রকাশহীন। বলা বাহুল্য, আমরা শৈবলিনীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতেছি মাত্র, তাহার আচরণ সমর্থন করিতেছি না।

জানি যে, পৃথিবীতে যত পাপিষ্ঠা আছে, তোমার মত পাপিষ্ঠা আর কেহ নাই। যে স্বামীর মত স্বামী জগতে দুর্লভ, তাঁহার স্নেহে তোমার মন উঠে না। কি না বালক যেমন খেলাঘরের পুতুলকে আদর করে, তিনি স্ত্রীকে সেইরূপ আদর করিতে জানেন না। কি না বিধাতা তাঁকে সং করিয়া রাঙ্গতা দিয়া সাজান নাই—মানুষ করিয়াছেন। তিনি ধর্মাত্মা, পণ্ডিত ; তুমি পাপিষ্ঠা তাঁকে তোমার মনে ধরিবে কেন? তুমি অন্ধের অধিক অন্ধ, তাই বুঝিতে পার না যে, তোমার স্বামী তোমায় যেরূপ ভালবাসেন, নারীজন্মে সেরূপ ভালবাসা দুর্লভ। অনেক পুণ্যফলে এমন স্বামীর কাছে তুমি এমন ভালবাসা পাইয়াছিলে। তা যাক, সে সব কথা দূর হোক্—এখানকার সে কথা নয়। তিনি নাই ভালবাসুন, তবু তাঁর চরণসেবা করিয়া কাল কাটাইতে পারিলেই তোমার জীবন সার্থক।

সুন্দরীর কথাগুলি সব সত্য। কিন্তু স্বামীর ভালবাসা সম্বন্ধে তার কথাগুলি যে শৈবলিনীর প্রাণে প্রতিধ্বনি উৎপন্ন করে নাই, তাহাও সত্য। হয়ত সে অন্ধের অধিক অন্ধ ছিল, কিন্তু তাহার অন্ধতাপনয়ন জন্য যে সমুচিত চেষ্টাও হয় নাই, তাহা অবশ্য-স্বীকার্য্য।

শৈবলিনী পাপিষ্ঠা ; কিন্তু তাহার চিত্তপরিণতির ইতিহাস আলোচনাযোগ্য। কেবল পাপিষ্ঠাপবাদ দিয়া তাহাকে সরাসরি ভাবে পাঠকের চিত্ত হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া যায় না। তাহার আচরণের সহিত কাহারও সহানুভূতি না হউক, তাহার হৃদয়ের যে একটা অতিনিভৃত ও অতিকোমল স্থলে নিষ্ফল প্রেমাকাঙ্ক্ষার নিত্য-তরুণ ক্ষত চিরদিন ধরিয়া অজস্র শোণিতোদ্গার করিতেছে, তাহার দিকে তাকাইলে এই পাপিষ্ঠার প্রতিও কাহার না একটু দয়া হয়!

চন্দ্রশেখরে দুইটি স্বতন্ত্র প্রেমকাহিনী পাশাপাশি ভাবে স্থাপন করিয়া একের শুভ্রতা এবং অন্যের কালিমা বিশদভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই রীতির নামই parallelism ; বিষবৃক্ষে ইহার প্রয়োগ আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। 'চন্দ্রশেখরে'র অন্তর্গত কাহিনী দুইটি স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হয় না। প্লটের নিবিড়তা-রক্ষায় বঙ্কিম কতদূর সিদ্ধহস্ত ছিলেন, চন্দ্রশেখরে তাহা বেশ বুঝা যায়। থ্যাকারের Vanity Fair ও টলস্টয়ের Anna Karenina অন্য হিসাবে অতি রমণীয় গ্রন্থ হইয়াও ঐ গুণের অভাবে অনেকের চক্ষে নিন্দনীয় বিবেচিত হইয়াছে। তবে চন্দ্রশেখরের প্লটকে শেষ পর্যন্ত নিবিড় ও সংক্ষিপ্ত রাখিবার চেষ্টায় অন্তিম কয়েক পরিচ্ছেদে বঙ্কিম যে অনতিরমণীয় উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

শিল্পের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে দলনীর চরিত্রে অসাধারণত্ব কিছু নাই—কিন্তু কমনীয়তায় উহা এই গ্রন্থে অতুলনীয়। শৈবলিনীর সহিত এই চরিত্রের প্রভেদ কত! এইখানেই parallelism বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার

যোগ্য। দুই জনই ঘরের বাহির হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু উভয়ের উদ্দেশ্যে দিবারাত্রি প্রভেদ। একজন স্বামীর অশুভাশঙ্কায় দুঃসাহসে প্রবৃত্ত হইয়া বিপন্না; অপরা স্বামিত্যাগপূর্বক পুংশ্চলীবৃত্তি আচরণ করিতে গিয়া কলঙ্ককালিমাময়ী। একজন বিশেষভাবে দৈবোপহতা, অন্য উৎকট মোহপ্রসূত চেষ্টা দ্বারা বিড়ম্বিতা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সুন্দরী ঠাকুরঝিই কি উনবিংশ শতাব্দীতে কমলমণি হইয়াছিলেন? যদি তাহা হয়, তবে বলিতে হইবে পরজন্মে তিনি সুকৃতিবলে যোগ্যতরা ভ্রাতৃবধূ পাইয়াছিলেন। কিন্তু যে কর্মদোষে সুন্দরীজন্মে শৈবলিনীকে গৃহত্যাগ করিতে দেখিতে হয়, সেটুকু বুঝি পরজন্মেও কাটে নাই; তাই সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ-দুঃখ তাঁহাকে সহিতে হইয়াছিল। সুন্দরী শৈবলিনীকে বলিয়াছিলেন—

> ভরসা করি তুমি শীঘ্র মরিবে। দেবতার কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, যেন মরিতে তোমার সাহস হয়। মুঙ্গেরে যাইবার পূর্বেই যেন তোমার মৃত্যু হয়। ঝড়ে হোক্ তুফানে হোক, নৌকা ডুবিয়া হোক, মুঙ্গেরে পৌঁছিবার পূর্বে যেন তোমার মৃত্যু হয়।

কমলমণি সূর্যমুখীকে কি বলিয়াছিল মনে পড়ে কি?—

> স্বামীর প্রতি বিশ্বাস হারাইও না। আর যদি নিতান্তই সে বিশ্বাস না রাখিতে পার—তবে দীঘির জলে ডুবিয়া মর। আমি কমলমণি তর্কসিদ্ধান্ত ব্যবস্থা দিতেছি; তুমি দড়িকলসী লইয়া জলে ডুবিয়া মরিতে পার। স্বামীর প্রতি যাহার বিশ্বাস রহিল না—তাহার মরাই মঙ্গল।

সুন্দরীর মনোবল ও সাহস অসাধারণ। কমলমণিতে এতখানি ফুটে নাই—এতখানি ফুটিবার বয়সও তাহার হয় নাই। সুন্দরীর মনোবলের পরিচয় একটি কথায় পাওয়া যায়—যাহা এ যুগে প্রত্যেক বাঙ্গালী মেয়ের মনে রাখার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। "আমরা ব্রাহ্মণের কন্যা, ব্রাহ্মণের স্ত্রী। আমাদের মন দৃঢ় থাকিলে পৃথিবীতে আমাদের বিপদ নাই। বিপত্তিভঞ্জন মধুসূদন আমার ভরসা।" সুন্দরী শৈবলিনীর কাছে পিতা ও পতির ব্রাহ্মণত্বের গৌরব করিতেছে, ইহা স্বাভাবিক। সুন্দরীর মনোবল কেবল ব্রাহ্মণকন্যা ও ব্রাহ্মণবধূরই লভ্য নহে, হিন্দুরমণীমাত্রেই ঐটুকু লাভ করিতে পারেন—যদি তিনি হিন্দুত্বের গৌরব করিতে শিখিয়া থাকেন। রাজপুত রমণীগণ ব্রাহ্মণকন্যা, ব্রাহ্মণের স্ত্রী না হইয়াও কি মনোবলই না প্রদর্শন করিয়াছেন!

শৈবলিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাড়াতাড়ি না ছুটিলে হয়ত তাহার সাক্ষাৎ মিলিবে না ভাবিয়া সুন্দরী পথে স্বামীর আহারের আয়োজন করিতে পারেন নাই। কিন্তু স্বামী যে অভুক্ত আছেন ইহা এই বঙ্গবধূর বুকে শেলের মত বাজিয়া রহিয়াছে। ফস্টরের বজরায় সুন্দরী শৈবলিনীকে বলিতেছেন, "তুমি আর বিলম্ব করিও না—তোমার নন্দাইয়ের এখনও আহার হয় নাই, আজ হবে কিনা তাও বলিতে পারি না।"

শৈবলিনীর মনে তেমন চিন্তা ত একটিবারও হইল না। একবার,—মাত্র একবার—তাহাকে চন্দ্রশেখরের কথা ভাবিতে দেখি; সে মুঙ্গেরে প্রতাপের বাসায়। কিন্তু তথায় স্বামীর সুখসোয়াস্তির জন্ম তাহাকে উদ্বিগ্না দেখি না। শৈবলিনী ভাবিতেছে সে ত্যাগ করিয়া আসাতে চন্দ্রশেখর দুঃখ করিয়াছেন কি? তবে তিনি কেমন আছেন, কি করিতেছেন সেটুকু জানিবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু তার সঙ্গে এ জ্ঞানও আছে 'তাঁহাকে আমি কখনও ভালবাসি নাই, কখনও ভালবাসিতে পারিব না।' সুন্দরীর সঙ্গেও শৈবলিনীর এখানে একটু parallelism যেন আছে বলিয়া মনে হয়।

'চন্দ্রশেখরের' পর 'রজনী' প্রকাশিত হইতে থাকে। চন্দ্রশেখরে রামানন্দ স্বামীতে যোগবল ও অলৌকিক প্রক্রিয়ায় চিত্তবিকার আরোগ্য করিবার ক্ষমতা দেখিয়াছি, আর শুনিয়াছি তিনি নাকি ভারতবর্ষের লুপ্ত দর্শন-বিজ্ঞান সকলই জানিতেন। 'রজনীর' সন্ন্যাসী নানাবিধ ঔষধ জানেন, তিনি তান্ত্রিক যাগযজ্ঞে সুদক্ষ, আবার 'হাত দেখিয়া গণিয়া ভবিষ্যৎ বলেন, নল চালেন, চোর বলিয়া দেন'। লবঙ্গলতা বলেন সন্ন্যাসী 'বউর পিতলের টুকনি সোণা করিয়া দিয়াছিলেন। উনি না পারেন কি?' সন্ন্যাসীটি নিজে বলেন—

> তোমাদের একটি ভ্রম আছে, তোমরা মনে কর যে যাহা ইংরেজেরা জানে, তাহাই সত্য; যাহা ইংরেজে জানে না তাহাই অসত্য, তাহা মনুষ্যজ্ঞানের অতীত, তাহা অসাধ্য। বস্তুতঃ তাহা নহে। জ্ঞান অনন্ত.........কিছু ইংরেজে জানে, কিছু আমাদের পূর্বপুরুষেরা জানিতেন। ইংরেজেরা যাহা জানে ঋষিরা তাহা জানিতেন না, ঋষিরা যাহা জানিতেন ইংরেজেরা এপর্যন্ত তাহা জানিতে পারেন নাই, সেই সকল আর্যবিদ্যা প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। আমরা কেহ কেহ দুই-একটি বিদ্যা জানি। যত্নে গোপন রাখি—কাহাকেও শিখাই না।

রামানন্দ স্বামী সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে দার্শনিক বিচার করেন, এই সন্ন্যাসীটিও কম নহেন। গৌরদাস বাবাজী ও ধর্মতত্ত্বের গুরুর মুখে পরে যাহা শুনিব এই সন্ন্যাসীর মুখে যেন তাহার কিছু আভাস পাওয়া যায়।

সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে তর্ক রজনীতে একাধিক পাত্রের (বিশেষতঃ অমরনাথের) মুখে শুনা যায়। অন্ধ ফুলওয়ালীও দার্শনিকের মত, মনস্তত্ত্ববিদের মত কথা কয়। রূপ যে 'দ্রষ্টার মানসিক বিকারমাত্র—রূপবানে নাই। ......শব্দও শ্রোতার একটি মনের সুখ মাত্র' এমন সব বড় কথা পূর্বে আর কোনও আখ্যায়িকার রমণীর মুখে শুনি নাই। তবে কপালকুণ্ডলা একবার প্রায় দার্শনিকের মতই জিজ্ঞাসা করিয়াছিল বটে, 'ফুল ফুটিলে লোকের দেখে সুখ, ফুলের কি?'

'চন্দ্রশেখরের' সঙ্গে 'রজনী'র আরও একটা স্থানে সাদৃশ্য আছে। মানসিক-বিকার অবলম্বন করিয়াই শৈবলিনীর চিত্তে চন্দ্রশেখরের প্রতি অনুরাগ বদ্ধমূল

হইয়াছিল, একটা মানসিক বিকার অবলম্বন করিয়াই রজনীর প্রতি শচীন্দ্রের প্রেম প্রস্ফুটিত হইয়াছিল।

'রজনী'তে বঙ্কিম আখ্যানবস্তু-বর্ণনায় নূতন পথের পথিক হইয়াছেন। দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ ও চন্দ্রশেখরে গ্রন্থকার নিজে আখ্যায়িকার বক্তা। 'ইন্দিরা'-তে নায়িকা স্বয়ং বক্ত্রী। 'রজনী'তে আখ্যায়িকার ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন পাত্রের মুখে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম রীতিই সাধারণ রীতি, এবং সকল দিক দিয়া দেখিলে প্রকৃষ্টতম রীতি বলিয়াই বোধ হয়। দ্বিতীয় রীতিতেও অনেক অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। থ্যাকারে[১] ও ডিকেন্সের[২] সর্বোত্তম সৃষ্টি ঐ রীতির। ইহার কতকগুলি অসুবিধাও আছে; আখ্যায়িকার সকল ঘটনা কল্পিত বক্তার জ্ঞানগোচরে আনা সহজসাধ্য নহে; তাহা ছাড়া এই রীতিতে বক্তা কেবল নিজ মনোভাবই বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে পারেন, অন্য পাত্রের মনোভাব তেমন করিয়া দেখাইতে গেলে স্বাভাবিকতার হানি হয়। যেরূপ প্লটে এই দুই অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা অল্প, তথায় দ্বিতীয় রীতি বেশ মনোরম হয়। বঙ্কিম এক 'ইন্দিরা' ব্যতীত অন্যত্র এই রীতির অনুসরণ করেন নাই। তৃতীয় রীতিতে ভিন্ন ভিন্ন পাত্রের মধ্যে ভাবপ্রকাশের প্রণালীতে এবং অন্যান্য বিষয়েও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা কিছু কঠিন। রজনীতে সে ত্রুটি খুবই আছে। পড়িতে পড়িতে মনে হয়, অনেক স্থলেই গ্রন্থকার রজনী, অমরনাথ ও শচীন্দ্র তিনজনের হাতের কলম টানিয়া নিয়া লিখিতেছেন; কিংবা তিন জনেই বঙ্কিমের মুখের কথা শ্রুতলিপিব মত লিখিয়া যাইতেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে তৃতীয় রীতির গুণ এই যে, যে কথা যে পাত্রের মুখে শুনিতে ভাল লাগে সে কথা তাহার মুখে ব্যক্ত করা যায়। যদি প্রত্যেক পাত্র নিজ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া কথা বলিতে পারে তবে ইহা সত্য বটে। তৃতীয় রীতি বস্তুতঃ খুব সুন্দর হয়—যদি ঘটনাসমূহের সঙ্ঘটনকালে এবং তাহাদেব ভাবিফল জানিবার পূর্বে প্রধান পাত্রগণের মুখে তাহাদের তদানীন্তন মনোভাব যথাযথ প্রকাশ করা যায়। 'রজনী'তে সে ধর্ম নাই। কোথাও মনে হয় ঘটনাগুলি সব ঘটিবার পরে প্রধান পাত্রপাত্রীগণ একত্র বসিয়া আখ্যায়িকার ভিন্ন ভিন্ন অংশ লিখিবার ভার লইয়াছেন[৩]; কোথাও দেখি যেন এক পাত্রের লেখনী বন্ধ করিয়া অন্য পাত্র আখ্যায়িকা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন[৪]। চতুর্থখণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে অতীতকথা বর্ণনের সঙ্গে 'ধীরে, রজনি, ধীরে' ইত্যাদি উক্তি প্রলাপের স্মৃতি, না পুনঃপ্রলাপ, না কাব্য তাহা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় না। কাব্য হইলেও, ভাবটা অতীত বলিয়া উহার চমৎকারিতার একটু হানি হইয়াছে।

---

১। Henry Esmond. ২। David Copperfield.

৩। 'রজনী' তৃতীয় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদের আরম্ভ দ্রষ্টব্য।

৪। 'রজনী' চতুর্থ খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

তবে এ রীতি অবলম্বন করিয়া বঙ্কিমের কি সুবিধা হইয়াছে? বঙ্কিম বলিতেছেন ইহাতে 'এই উপন্যাসে যে সকল অনৈসর্গিক বা অপ্রাকৃত ব্যাপার আছে আমাকে তাহার দায়ী হইতে হয় নাই।' কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর সাবধান পাঠকমাত্রই জানেন, ঐসকল 'অনৈসর্গিক' বা 'অপ্রাকৃত' ব্যাপারসমূহের সম্ভাব্যতায় বঙ্কিম নিজে বিশ্বাস করিতেন। তাহা না হইলেও প্রথম রীতি অবলম্বন করিলে কি উহা শিল্পের হিসাবে দূষণীয় হইত?

'রজনী'র পাত্রপাত্রীগণের মধ্যে লবঙ্গলতা আমাদের পূর্বপরিচিতা বিমলা। দুর্গেশনন্দিনীতে তাহাকে গৃহিণীরূপে দেখি নাই—সে বীরেন্দ্র সিংহের পত্নী হইয়াও দাসীরূপে পরিচিতা, তিলোত্তমার বিমাতা হইয়াও সখীর ন্যায় ব্যবহারপরায়ণা। গৃহিণী হইয়াও পরিচারিকারূপে থাকিতে বাধ্য হওয়া নারীজন্মের একটা কম দুঃখ নহে; কিন্তু বিমলাকে তজ্জন্য কোথাও মলিনা দেখা যায় নাই। তাহার গভীর স্বামিপ্রেম ও অনাবিল উদারতা তাহাকে সর্বপ্রকার আত্মপ্রতিষ্ঠার স্পৃহা হইতে বহু উর্ধ্বে উন্নত করিয়াছে। তথাপি যাহা অন্যের পক্ষে তীব্র দুঃখের নিদান, কবি ইচ্ছা করিলেও কাব্যে তাহাকে একেবারে লুপ্ত করিয়া দিতে পারেন না। তাই বিমলার কার্যে বা কথায় কোনও খেদ প্রকাশ না পাইলেও তাহার প্রতি পাঠকের সহানুভূতির অভাব নাই। রজনীতে সে দুঃখের হেতু বা অবকাশ নাই। লবঙ্গ রামসদয় দত্তের দেড়খানা গৃহিণীর পুরা একখানা,—রজনীর ভাষায়, সে স্বামীর 'আদরের আদরিণী, গৌরবের গৌরবিণী, মানের মানিনী, নয়নের মণি', ত বটেই—এমন কি 'সিন্দুকের চাবি, বিছানার চাদর, পানের চূণ, গেলাসের জল, জ্বরে কুইনাইন, কাসিতে ইপিকাক, বাতে ফ্যালানেল এবং আরোগ্যে সুরুয়া।' লবঙ্গ বিমলার ন্যায় সপত্নীসন্তানের প্রতি কেবল স্নেহশীলা নহে, সপত্নীপুত্রের মা বলিয়া গৌরবিণী। বিমলার মতই সে চতুরা, রসিকা; বিমলার মতই তাহার বুদ্ধি অসাধারণ, মানসিক শক্তি অসাধারণ, জিদও কম নহে। বিমলার মুখে কটু কথা বড় একটা শুনিতে পাই না। লবঙ্গ, কেন জানি না, কটু কথা বলিতে পটু, প্রায়ই বলে; কিন্তু শচীন্দ্র বলে তার মনে একটুকুও কটুভাব নাই। প্রথম বয়সে অমরনাথের সঙ্গে যখন তাহার বিবাহের প্রস্তাব হয়, তখন হয়ত সে অমরনাথকে মনে মনে ভালবাসিয়াছিল। পূর্বে শুনিয়াছি বাল্যের ভালবাসায় নাকি বিধাতার অভিসম্পাত আছে; উঠন্ত যৌবনের প্রথম অনুরাগে কি নাই? কিন্তু লবঙ্গ পিতামহের তুল্যবয়স্ক স্বামী পাইয়াও তাহাকে ভালবাসিত। রজনী বলে, 'কোন নবীনা নবীন স্বামীকে সেরূপ ভালবাসে কি না সন্দেহ।' অবশ্য সে ভালবাসার আদর ও সেবায় যেমন ত্রুটি ছিল না; তেমনই বিমলার যোগ্য রসিকতাও ছিল। রামসদয় প্রাচীন বয়সে আতরের শিশি দেখিলে ভয়ে পলাইতেন—লবঙ্গলতা তাঁহাকে নিদ্রাবস্থায় সর্বাঙ্গে আতর মাখাইয়া দিত। রামসদয়ের চসমাগুলি লবঙ্গ প্রায় চুরি করিয়া ভাঙিয়া ফেলিত; সোণাটুকু লইয়া যাহার কন্যার বিবাহের সম্ভাবনা

তাহাকে দিত। রামসদয়ের নাক ডাকিলে লবঙ্গ ছয়গাছা মল বাহির করিয়া পরিয়া ঘরময় ঝম্‌ঝম্ করিয়া রামসদয়ের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিত। তবে প্রথম ভালবাসার দাগ যে তাহার হৃদয় হইতে একবারে মুছিয়া যায় নাই, তাহাও কবি তাহাকে কেমন-একটা সঙ্কটের অবস্থায় ফেলিয়া অসতর্কভাবে তাহার মুখ হইতে বাহির করিয়াছেন।[১] লবঙ্গ মানুষী ত বটে! স্টিভেন্সনের The Master of Ballantrae আখ্যায়িকার অনুরূপসঙ্কলের কৌশল ইহার সহিত তুলনীয়।

পরোপকারব্রতের কথা চন্দ্রশেখরে আছে তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। বিজ্ঞ ও সর্বশাস্ত্রপারদর্শী চন্দ্রশেখর অদৃষ্টদোষে গৃহহীন হইয়া সন্ন্যাসীর নিকট পরোপকারব্রতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। অমরনাথও স্বীয় যুগোচিত নানাবিদ্যায় পারদর্শী এবং দৈব-দোষে গৃহসুখশূন্য। তাঁহাকে কোনও সন্ন্যাসীর কাছে পরোপকারমন্ত্র গ্রহণ করিতে হয় নাই। আধুনিক আদর্শের পরোপকারের প্রতি তাঁহার বড় আস্থাও নাই। অকর্মার কাজ সমাজসংস্কারে ও রাজনীতিচর্চায়ও তাঁহার রুচি নাই। কিন্তু বিধাতা তাঁহার হাতে পরোপকারের কাজই জুটাইয়া দিলেন; সে কাজে তিনি যে সংযম, ত্যাগস্বীকার, সুবিবেচনা দেখাইলেন, তাহা তাঁহার ন্যায় শিক্ষিত ব্যক্তিরই উপযুক্ত। এমন মহামনা লোকও যে জীবনে তেমন ভাবের একটা গুরুতর ভ্রম করিয়াছিলেন, তাহা আশ্চর্যের বিষয় বটে, অসম্ভব নহে। অমরনাথও মানুষ। 'বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি।' অমরনাথ নিজ জীবনেতিহাসের ঐ কলঙ্কটুকু রজনীকে খুলিয়া বলিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার যোগ্য কাজই হইয়াছে। টলস্টয়ের 'পারিবারিক সুখ' নামক আখ্যায়িকার নায়কও তাহাই করিয়াছেন। টলস্টয় নিজেও বিবাহের পূর্বে তাহা করিয়াছিলেন।

রজনী-চরিত্রের ভিত্তি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, লর্ড লিটনের Last Days of Pompeii উপন্যাসে যে নিদিয়া নামে এক কানা ফুলওয়ালীর কাহিনী আছে, রজনী তৎস্মরণে সূচিত হয়। 'যে সকল মানসিক বা নৈতিক তত্ত্ব প্রতিপাদন করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য তাহা অন্ধ যুবতীর সাহায্যে বিশেষ স্পষ্টতা লাভ করিতে পারিবে বলিয়াই ঐরূপ ভিত্তির উপর রজনীর চরিত্র নির্মাণ করা গিয়াছে।' রজনীতে মধ্যে মধ্যেই অনেক তত্ত্বকথার আলোচনা আছে বটে, কিন্তু সেইগুলি প্রতিপাদন করা যে 'রজনী'র উদ্দেশ্য নহে তাহা বলা বাহুল্য। ঐ সকল তত্ত্বের আলোচনা বোধ হয় একটু কম হইলেও বিশেষ ক্ষতি ছিল না। লর্ড লিটনের উপন্যাসগুলিতে মাঝে মাঝে দার্শনিক তত্ত্ববিচারের বাড়াবাড়ি আছে। বঙ্কিম কি উহার সংক্রামতায় কিয়ৎপরিমাণে আক্রান্ত হইয়াছিলেন? আক্রান্ত হউন বা না হউন, ইহা সত্য যে লর্ড লিটনের উপন্যাসে যে অতিপ্রাকৃতে, ম্যাজিকে এবং মধ্যযুগের নানাবিধ সংস্কারে বিশ্বাসের পরিচয় আছে, রজনীতে সন্ন্যাসীর তান্ত্রিক মন্ত্রৌষধি প্রভৃতি প্রয়োগে যেন তাহার ছায়া দেখা যায়। চন্দ্রশেখর হইতেই উহার সূত্রপাত

১। 'রজনী' পঞ্চম খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

বটে ; চন্দ্রশেখরে যোগবল, রজনীতে মন্ত্রৌষধি-প্রয়োগ, শিভলকে রূপা করা, অন্ধকে নেত্রদান ইত্যাদি।

রজনী অন্ধ ফুলওয়ালী ; ফুল বেচা তার ব্যবসায় নহে, তাহার পিতা বা মেসোর ব্যবসায়। সে বাড়ীতে বসিয়া তাঁহার সাহায্য করে। ফুলের সংসর্গে, ফুলের স্পর্শে, ফুলের ঘ্রাণে তাহার চিত্তবৃত্তিগুলি বড় কমনীয়, বড় মধুর হইয়া ফুটিয়াছে ; রূপদর্শন নাই বটে কিন্তু অন্য জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির ক্রিয়া আছে। আরও মনে রাখিতে হইবে তার বয়স প্রায় কুড়ি, সে যুবতী। সে একটু একটু গানও গাহিতে জানে এবং গায়। তাহার হৃদয়ে যে এতদিন প্রেমসঞ্চার হয় নাই সে কেবল সমুচিত সুযোগ ও যোগ্য পাত্রের অভাবে। প্রেমের জন্ম কি কেবলই চক্ষুতে ?[১] রজনী বলে—রূপ রূপবানে নাই রূপ দর্শকের মনে। যেরূপ মন লইয়া দর্শনেন্দ্রিয়ের অভাবেও সৌন্দর্যানুভূতি সম্ভব তেমন মন তাহার ছিল ; তাই শচীন্দ্রকে না দেখিয়াও সে শচীন্দ্রের কণ্ঠস্বর[২] শুনিয়া ও স্বীয় চিবুকে তাহার হস্তস্পর্শসুখ অনুভব করিয়া প্রেমবিধুরা হইল। আবার শচীন্দ্র যখন তাহার হাত ধরিয়া উপরে নিল, তখন তাহার হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া, হয়ত তাহার দ্বিতীয় চিত্তমোহকর স্পর্শে সে তাহাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়া ফেলিল। অন্ধ ফুলবালার এই চিত্ত-পরিণতিটুকু দেখাইয়া বঙ্কিম কাব্যালোকে একটা গূঢ় মানসিকতত্ত্ব উদ্ভাসিত করিয়াছেন।

তারপর অমরনাথের সংস্পর্শে আনিয়া কবি রজনীর চিত্তকে আর একদিকে প্রসারিত করিয়াছেন। রজনী শচীন্দ্রকে ভালবাসে, মনে মনে পতি বলিয়াই জানে ; কিন্তু এমন সঙ্কট যে, যে অমরনাথ অযাচিতভাবে আসিয়া তাহার এত উপকার করিলেন,—তাহার ধর্মরক্ষা করিলেন, জীবনরক্ষা করিলেন, দারিদ্র্য হইতে টানিয়া ঐশ্বর্যের মধ্যে বসাইয়া দিলেন, সেই অমরনাথ যখন তাহার পাণিগ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন, তখন রজনীর কর্তব্য কি ? উপকারকের প্রতি কি কৃতজ্ঞতা নাই ? প্রেম কি একটা খেয়ালমাত্র ? খেয়ালের চরিতার্থতায়ই কি মনুষ্যত্বের সার্থকতা ? তাহা ত নহে। নচেৎ পাপিষ্ঠা শৈবলিনীকে তেমন করিয়া আবার

---

১। It (Love) is engendered in the eyes,
With gazing fed. —*Merchant of Venice* Act III, Sc. ii.
হিন্দু প্রেমতত্ত্ববিদেরাও বলেন "নয়নপ্রীতিঃ প্রথমং চিত্তাসঙ্গস্ততোঽথ সঙ্কল্পঃ।"

২। একজন ইংরেজ লেখক সম্প্রতি বিলাতের একটা কাগজে নারীর ভালবাসায় পুরুষের কণ্ঠস্বরের প্রভাব সম্বন্ধে বলিয়াছেন, মধুর কণ্ঠস্বরে পুরুষের প্রেম কদাচিৎ জন্মিতে দেখা যায়। পুরুষের হৃদয় জয় করিতে সুন্দর কণ্ঠস্বর অপেক্ষা সুন্দর মুখের শক্তি অধিক। সঙ্গীত দ্বারা কোর্টশিপ মরদের রীতি (male method) ; অনেক পুরুষেই নারীকণ্ঠের সঙ্গীতে অপূর্ব আনন্দানুভব করে বটে, কিন্তু সেটা artistic delight মাত্র ; অল্পসংখ্যক লোকেই কামিনীর কণ্ঠস্বর দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ভালবাসিতে আরম্ভ করে। নারীর পক্ষে কিন্তু পুরুষের কণ্ঠস্বরের আকর্ষণশক্তি অত্যন্ত অধিক। স্ত্রীলোকের লিখিত উপন্যাসে প্রেমিকার মনে প্রেমপাত্রের কণ্ঠস্বরের প্রভাব প্রায়ই উল্লিখিত দেখা যায়।

চন্দ্রশেখরের গৃহিণী করার কি প্রয়োজন ছিল? রজনী ভাবিল, অমরনাথ যদি ইহাতে সুখী হন তবে আমার তাঁহার দাসীত্বগ্রহণ অবশ্যকর্তব্য। কিন্তু সে কি কপটতা করিবে? সে কি মনের গুপ্ত প্রণয় লুকাইয়া উপকারকের সহিত প্রবঞ্চনা করিবে? তাহা ত তাহার কুসুমসংসর্গে বর্ধিত, কুসুমের মত নিষ্কলঙ্ক হৃদয়ে সহিতে পারে না। সে অকপটে অমরনাথকে শচীন্দ্রের প্রতি তাহার আন্তরিক আসক্তির কথা খুলিয়া বলিল। ভালই করিল; বিধাতার কৃপায় অকৃতজ্ঞতা-কলঙ্কে কলঙ্কিতা না হইয়াই তাহার প্রথম অনুরাগের পাত্রকেই সে পতিরূপে প্রাপ্ত হইল। রজনীর সকল চারু ও কল্যাণকরী চিত্তবৃত্তিই পূর্ণতাপ্রাপ্ত পাইয়াছে। এমন রমণীর দেহ কি অসম্পূর্ণাবয়ব থাকিবে? প্রাকৃতিক নিয়ম যাহাই হউক, কাব্য প্রকৃতির দাস নহে। কাব্যজগতে রজনীর মত নারীকে চিরান্ধা রাখা শোভা পায় না। তাই তন্ত্রমন্ত্রৌষধি-প্রয়োগে তাহার চক্ষু ফুটিল।[১]

পূর্ণ সুখের দিনেও রজনী (ও শচীন্দ্র) যে অমরনাথের প্রতি আপনাদের কৃতজ্ঞতাঋণ বিস্মৃত হয় নাই তাহা তাহার পুত্রের 'অমরপ্রসাদ' নামকরণে বুঝা যায়। মাতৃত্বগৌরব বঙ্কিমের অল্প নায়িকায়ই আছে। এপর্যন্ত এক কমলমণিতে মাতৃত্ব-সৌন্দর্য দেখিয়াছি, কিন্তু তথায়ও মাতৃত্ব-গৌরব দেখি নাই। রজনীর (ও শচীন্দ্রের) স্থিরকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন জন্যই রজনীকে বঙ্কিম মাতৃরূপে দেখাইয়াছেন, ইহার অধিক আর কোনও উদ্দেশ্য নাই। রজনীর মাতৃত্ব মাতৃত্ব-গৌরবের নিদর্শন নহে, অন্যবিধ গৌরবের নিদর্শন।

'রজনী'র আর একটি চরিত্র উল্লেখযোগ্য—সেটি 'স্বশ্চ্ ভিশ্চ্ শাৎ' পত্রিকার এডিটার 'মদে ও বিবাহে দেশের উন্নতির একজাম্পল সেট' করিতে ব্যগ্র হীরালাল। বঙ্গদর্শনের যুগে বাঙ্গালী সমাজে এই শ্রেণীর জীবের সংখ্যা কম ছিল না। হীরালাল রজনীর প্রতি স্বীয় দুরভিসন্ধিতে বিফলকাম হইয়া তাহাকে এই বলিয়া শাসাইয়াছিল যে, সে আবার খবরের কাগজ করিয়া তাহার নামে আর্টিকেল লিখিবে।[২] খবরের কাগজের এরূপ গুণ্ডামি বোধ হয় সকল দেশেই আছে; বঙ্কিমের যুগের বাঙ্গালায়ও ছিল; এখনই কি নাই? শচীশবাবু কিন্তু একটু বিশেষভাবে হীরালাল-চরিত্রের একটা মূল নির্দেশ করিয়াছেন।[৩]

'রাধারাণী'র নায়ক দেবেন্দ্রনারায়ণ অমরনাথের মত পরোপকারী ও ভবঘুরে; লবঙ্গলতার মত তিনি মুক্তহস্ত, (ইচ্ছা করিয়া ডবল পয়সার স্থলে টাকা দেন) শচীন্দ্রের মত মৃতপত্নীক। রাধারাণী রজনীর মত ফুলওয়ালী নয়, কিন্তু দুরবস্থায় পড়িয়া একদিন রথের মেলায় বনফুলের মালা বেচিতে গিয়াছিল এবং সেইখানেই

---

১। রজনী চরিত্রের একটি সুবিবেচনাপূর্ণ সমালোচনা 'নারায়ণ' পত্রিকায় (বৈশাখ ১৩২২) প্রকাশিত হইয়াছিল; উহার লেখক শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন পাল

২। 'রজনী' প্রথম খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ।

৩। 'বঙ্কিম-জীবনী', ৩০৯ পৃষ্ঠার পূর্ণ বিবরণ দ্রষ্টব্য।

সে ভাবী পতির প্রথম সঙ্গ ও প্রথম করস্পর্শ লাভ করে। এবারে কিন্তু ভালবাসাটা বোধ হয় প্রথমে ভাবী পতির প্রাণেই জাগিয়াছিল—কিন্তু তিনি ভালবাসিয়া যে আর প্রেমপাত্রীর বিশেষ খোঁজ করিলেন না, ইহা কিছু আশ্চর্যের বিষয় বটে। রাধারাণীর বয়স দশ-এগার বৎসর মাত্র; এ বয়সে প্রথম কেবল কৃতজ্ঞতাই সম্ভব বলিয়া মনে হইতে পারে; পরে হয়ত সেই কৃতজ্ঞতাই প্রেমে পরিণত হইয়াছিল। বসন্তকুমারী কিন্তু বলিতেছে, 'সে সেই রাত্রি অবধি রুক্মিণীকুমারের একটি মানসিক প্রতিমা গড়িয়া আপনার মনে তাহা স্থাপন করিয়াছে।' এটা ত প্রেমেরই মত। শৈবলিনীও বার বৎসর বয়সে প্রতাপের সঙ্গে জলে ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল। সে বয়সে যদি তাহার প্রেম জন্মিতে পারে, তবে রাধারাণীর মনোভাবকে গোড়া হইতে প্রেম বলিলে বিশেষ দোষ নাই। তবে প্রেমটা কৃতজ্ঞতাপ্রসূত, অহৈতুক খেয়ালমাত্র নয়। সে যাহা হউক, রাধারাণীর প্রেম-কাহিনী বড় মধুর ও মর্ম্মস্পর্শী। কিন্তু বঙ্কিম শেষ দিকে তাহাকে ইন্দিরার স্থায় প্রগল্‌ভা রসবতী করিয়া যেন তাহার সেই কোমল প্রেমকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন। রুক্মিণীকুমারেরও প্রেমস্বীকারের মধ্যে আর্ট বড় কম। বঙ্গদর্শনের ফর্মা পূরণ করিবার জন্ম বঙ্কিমকে বোধ হয় এই ছোট আখ্যায়িকাটি বড় তাড়াতাড়ি লিখিতে হইয়াছিল। ইহাকে শেষে একটু বড় করিয়া লিখিলে বোধ হয় ভাল হইত।

## একাদশ পরিচ্ছেদ

## জীবন-কথা।

বঙ্কিমচন্দ্রের বহরমপুর ত্যাগকালে তত্রত্য উকীল, হাকিম, জমিদার, [illegible] স্কুল কলেজের অধ্যাপকপ্রভৃতি সর্বশ্রেণীর ভদ্র ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাঁহার [illegible] বিশিষ্টরূপ আয়োজন করিয়াছিলেন। অনেক জনপ্রিয় হাকিমই একস্থান [illegible] অন্যস্থানে বদলি হইবার সময় অভিনন্দন লাভ করেন বটে, কিন্তু বঙ্কিমের সপ্তাহব্যাপী অভিনন্দন-ব্যাপার সেরূপ নহে। এক্ষেত্রে কেবল তাঁহার [illegible], বা তেজস্বিতা, সুবিচারপরায়ণতা ইত্যাদি বিচারকোচিত গুণাবলীর সম্মান করা হয় নাই, বস্তুতঃ তাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া বঙ্গবাণীর চরণোদ্দেশে বিপুলোপচার-গরীয়সী পূজারই আয়োজন করা হইয়াছিল। কেননা বঙ্কিম বাঙ্গালীর চক্ষে ন্যায়নিষ্ঠ হাকিমমাত্র ছিলেন না, বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানগরিষ্ঠ প্রথম গ্রাজুয়েটমাত্রও ছিলেন না; ছিলেন মৃণালিনী-কপালকুণ্ডলা-বিষবৃক্ষ-কমলাকান্তের লেখক—ছিলেন বঙ্গদর্শনের সম্পাদক ও বাঙ্গালা সাহিত্যমণ্ডলের রাজরাজেশ্বর।

বহরমপুর হইতে বঙ্কিম প্রথমে বারাসতে, পরে ঐ বৎসরমধ্যেই মালদহে বদলি

হন। পরবৎসরের ( ১৮৭৫ খৃস্টাব্দের ) মধ্যভাগে তিনি কয়েক মাসের ছুটি লইয়া কাঁটালপাড়া গমন করেন। বাড়ীর এত কাছে চাকরি করিতেন বলিয়া আদালতের কোনও মোকদ্দমা সম্পর্কে বাহিরে আত্মীয়-স্বজনদিগের সহিত তিনি কদাপি আলাপ, আলোচনা করিতেন না। কেহ কোনও বিষয়ে তাঁহাকে উপরোধ অনুরোধ করিতে আসিলে বঙ্কিম অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইতেন এবং সে যেই হউক তাহাকে অপমান করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এই রকম একটা ঘটনা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। শচীশবাবু বলিয়াছেন, একবার একজন আত্মীয় তাঁহার নৌকায় গঙ্গা পার হইবার সময় একটা মোকদ্দমা সম্পর্কে অনুরোধ করায় বঙ্কিম তৎক্ষণাৎ গঙ্গার চরে নৌকা লাগাইয়া তাঁহাকে নৌকা হইতে নামাইয়া দেন। বঙ্কিমবাবু বলিতেন, এতটা সতর্ক না হইলে কি বাড়ীর এত নিকটে চাকরি করা যায়? বস্তুতঃ বিচারে নিরপেক্ষতা রক্ষার প্রতি বঙ্কিমের কঠোর দৃষ্টি ছিল। ঐরূপ প্রকৃষ্ট কর্তব্যবোধের বাহ্য অভিব্যক্তি সময় সময় একটু উৎকট ও দৃষ্টিকটু হইলেও তজ্জন্য বঙ্কিমকে নিন্দা করা যায় না। উহা তাঁহার অভিমানের বা গর্বের চিহ্ন নয়। বঙ্কিম হাকিম[১] বলিয়া আপনাকে কখনও দুনিয়ার বাদশা ভাবিতেন না, ইহা পূর্বে বলিয়াছি।

হুগলিতে বঙ্কিম কেবল ডিপুটিগিরিই করেন নাই—কিছুকাল বিভাগীয় শাসনকর্তার ( কমিশনারের ) খাস সহকারীর ( পার্শন্যাল এ্যাসিস্টাণ্টের ) পদেও নিযুক্ত ছিলেন। সেকালে ঐ পদে প্রায়শঃ অধিকবয়স্ক ও অভিজ্ঞ ডিপুটিরাই নিযুক্ত হইত। বঙ্কিম অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সেই ঐ পদ পান।

আশা করা যাইতে পারিত এই সময়ে বঙ্কিমের সুখের ষোল কলা পূর্ণ হইয়াছিল; তিনি অঋণী, অপ্রবাসী, তাঁহার নব বয়ঃ, কান্ত বপুঃ, সাহিত্যক্ষেত্রে একাতপত্র প্রভুত্ব, প্রিয়া প্রিয়বাদিনী ভার্যা, অজস্র অর্থপ্রসবিনী লেখনী, এমন লোকে সুখী নয় ত সুখী কে? কিন্তু এদিকে পরিবারমধ্যে অশান্তিবহ্নি ধূমায়মান-ভাবে জ্বলিতেছিল। পরে ঐ বহ্নি কিছু উৎকটভাব ধারণ করিলে বঙ্কিমচন্দ্র বাটী ত্যাগ করিয়া সপরিবারে চুঁচুড়ায় আসিয়া পৃথক্ ভাবে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। এই গৃহত্যাগের মূলে একটু 'কৃষ্ণকান্তী ভাব' ছিল তাহা মহামহোপাধ্যায়

---

১। হাকিমি পদের কোনও মর্যাদা নাই ইহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। সকল দেশেই বিচারকের পদ খুব উচ্চ ও সম্মানার্হ বলিয়া বিবেচিত। কিন্তু ঐ সম্মান যে পদস্থ ব্যক্তির যোগ্যতা ও অন্যবিধ গুণ-নিরপেক্ষ নহে, তৎসম্বন্ধে ভ্রমবশতই লোকে নিন্দাভাজন হয়। বঙ্কিমচন্দ্র 'গর্দভ' প্রবন্ধে ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

"( হে গর্দভ! ) তুমিই বিচারাসনে উপবেশন করিয়া মহাকর্ণদ্বয় ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতেছ। তাহার অগাধ গহ্বর দেখিতে পাইয়া উকীল-নামক কবিগণ নানাবিধ কাব্যরস তন্মধ্যে ঢালিয়া দিতেছে। তখন তুমি শ্রবণতৃপ্তিসুখে অভিভূত হইয়া নিদ্রা গিয়া থাক।

হে বৃহন্মুণ্ড! তখন সেই কাব্যরসে আর্দ্রীভূত হইয়া তুমি দয়াময় হইয়া অসীম দয়ার প্রভাবে রামের সর্বস্ব শ্যামকে দাও, শ্যামের সর্বস্ব কানাইকে দেও, তোমার দয়ার পার নাই!"

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন। পাঠক জানেন, কৃষ্ণকান্তের পূর্বে বাঞ্ছারাম মিত্রও উইল করিয়া পুত্র রামসদয়কে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। স্বগৃহচরিত ভাবিতে ভাবিতে মুরারি দারুভূত হইতে পারেন, কিন্তু সাহিত্যিকেরা তদবলম্বনে অক্ষয় রসের ভাণ্ডার সৃষ্টি করেন।

কাঁটালপাড়ায় থাকিতে থাকিতেই বঙ্গদর্শনের বিলোপ হয় এবং সম্ভবতঃ কাঁটালপাড়ায় থাকিতে থাকিতেই উহার পুনঃপ্রচার (দ্বিতীয় পর্যায়) আরম্ভ হয়। পূর্বে বলা হইয়াছে সঞ্জীববাবু সম্পাদক হইলেও বঙ্কিমচন্দ্র উহার প্রকৃত কর্ণধার ছিলেন। দ্বিতীয় পর্যায়ের বঙ্গদর্শনে তাঁহার কৃষ্ণকান্তের উইল, কমলাকান্তের পত্র, রাজসিংহ (ছোট), মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত, আনন্দমঠ ও দেবীচৌধুরাণীর কিয়দংশ প্রকাশিত হয়। আমরা প্রথম পর্যায়ের বঙ্গদর্শন সম্বন্ধে সবিস্তর আলোচনা করিয়াছি; দ্বিতীয় পর্যায়ের বঙ্গদর্শন আমাদের তাদৃশ আলোচ্য নহে। তবে সম্ভবতঃ এস্থলে ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, বঙ্কিমচন্দ্র যদিও ভ্রাতৃপ্রীতিবশেই সঞ্জীবচন্দ্রকে স্বীয় পরম আদরের বঙ্গদর্শনের সম্পাদকতায় অধিষ্ঠিত করেন, তথাপি ইহা যেন কেহ মনে না করেন যে, দ্বিতীয়বারে বঙ্গদর্শন নিতান্ত অযোগ্য সম্পাদকের হাতে পড়িয়াছিল। সঞ্জীবচন্দ্রের গ্রন্থাবলী যিনি পাঠ করিয়াছেন তিনিই জানেন সঞ্জীব কিরূপ সহৃদয় প্রতিভাশালী ও রসবিস্তারপটু লেখক ছিলেন। তবে যে বাঙ্গালাসাহিত্যে তিনি স্বীয় প্রতিভার যোগ্য প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই, তাহার হেতু অন্যবিধ। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন যে, "সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভার ঐশ্বর্য ছিল; কিন্তু গৃহিণীপনা ছিল না।......তাঁহার অপেক্ষা অল্প ক্ষমতা লইয়া অনেকে যে পরিমাণ সাহিত্যের অভাব মোচন করিয়াছেন তিনি প্রচুর ক্ষমতাসত্ত্বেও তাহা পারেন নাই।" রবীন্দ্রনাথ সঞ্জীবচন্দ্রের রচনামধ্যে আলস্য ও অবহেলার ভাব লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি বলেন, "বঙ্কিমবাবুর রচনায় যেখানেই দুর্বলতার লক্ষণ আছে, সেইখানেই তিনি পাঠকগণকে চোখ রাঙ্গাইয়া দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন—সঞ্জীববাবু অনুরূপ স্থলে অপরাধ স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু সেটা কেবল পাঠকদের মুখ বন্ধ করিবার জন্য—তাহার মধ্যে অনুতাপ নাই এবং ভবিষ্যতে যে সতর্ক হইবেন কথার ভাবে তাহাও মনে হয় না।" তথাপি ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে 'সৌন্দর্যের প্রতি সঞ্জীবচন্দ্রের যে একটি অকৃত্রিম সজীব অনুরাগ ছিল এমন সচরাচর বাঙ্গালা লেখকদের মধ্যে দেখা যায় না।'[১]

চুঁচুড়ায় বঙ্কিম যে বাড়ীতে বাস করিতেন, ঈশ্বর গুপ্তের জীবনীতে তিনি তাহার বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বৈঠকখানা (যোড়া ঘাটের দক্ষিণ পার্শ্বের বাড়ী) হইতে তিনি নিত্য গঙ্গার শোভা দেখিতেন; অন্দর-বাড়ী হইতেও পত্নীকন্যাগণ-সংসর্গে জ্যোৎস্নালোকে ভাগীরথীর অপূর্ব দৃশ্য উপভোগ করিতে পারিতেন। 'চন্দ্রশেখরে' যে ময়া গঙ্গায় চাঁদের আলো দেখাইয়াছেন তাহা অবশ্য চুঁচুড়া বাসের

১। "আধুনিক সাহিত্য" পৃ ৪৬-৪৮।

পূর্বে; আর 'দেবী চৌধুরাণী'তে ত্রিস্রোতা-বক্ষে চাঁদের আলোর বিলাসলীলার বর্ণনা চুঁচুড়ায় গঙ্গাতীরে বসিয়া লিখেন নাই, বোধ হয় যাজপুরে বৈতরণীতীরে বসিয়া লিখিয়াছিলেন; হাবড়ায়ও লিখিয়া থাকিতে পারেন।

বঙ্কিম ১৮৮১ খৃস্টাব্দে প্রথমবারে হাবড়ায় বদলি হন। এই স্থানে নাকি ম্যাজিস্ট্রেট বক্‌ল্যাণ্ডের সহিত একটা মোকদ্দমার রায় লইয়া তাঁহার কিছু কঠোর বাদানুবাদ হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের দৃঢ়তায় পরে সাহেবকেই ত্রুটি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে তিনি 'আনন্দমঠে' স্বদেশপ্রীতির উদ্দীপনা সৃষ্টি করিতেছিলেন। বক্‌ল্যাণ্ডের সহিত কলহে অবশ্য স্বদেশপ্রীতির কোনও সম্বন্ধ ছিল না—তাঁহার ব্যক্তিগত অভিমানে আঘাত লাগিয়াছিল। বক্‌ল্যাণ্ড বাঙ্গালী হইলে যে বঙ্কিম ভাল ছেলের মত তাঁহার কৃত মন্তব্য সহিয়া যাইতেন, তাহা কিছুতেই মনে করা যাইতে পারে না। ইংরেজ জাতির প্রতি তাঁহার অনুচিত বিদ্বেষ ছিল না, ইহা বার বার বলিয়াছি, বরং ইংরেজকে তিনি এদেশের উদ্ধারকর্তা বলিয়াই আনন্দমঠে স্বীকার করিয়াছেন। সে যাহা হউক, বঙ্কিমের হাবড়ায় অবস্থানকালেই তদীয় পিতার লোকান্তর হয়। হাবড়া হইতে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের Financial Departmentএর সহকারী সেক্রেটারি নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় আসেন। তৎপূর্বে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মিত্র ও অন্য একজন বাঙ্গালী ডিপুটি ঐ পদে নিযুক্ত ছিলেন। রাজেন্দ্রনাথ মিত্র স্বীয় দক্ষতা ও চরিত্রবলে কর্তৃপক্ষের নিকট আদর ও সম্মান লাভ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র অস্থায়ীভাবে এ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। তিনি এই পদে চার-পাঁচ মাস কার্য করিবার পর ঐ পদটি উঠাইয়া দিয়া নূতন পদের (under-secretary) সৃষ্টি করা হয় এবং নিয়ম হয় ঐ নূতন পদে বাঙ্গালী নিযুক্ত হইতে পারিবে না। এই সময়ে এক গুজব উঠিয়াছিল বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা সরকারী গুপ্তকথাসমূহ সাধারণ্যে প্রকাশ পায় বলিয়া সরকারবাহাদুর বঙ্কিমকে ঐ পদ হইতে অবসৃত করেন ও ঐ পদ উঠাইয়া দেন। বস্তুতঃ ঐ অপবাদ যে সত্য নহে তাহা তদানীন্তন স্টেটস্‌ম্যান পত্র (সম্ভবতঃ সরকারবাহাদুরের ইঙ্গিতক্রমেই) খুব স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন। স্টেটস্‌ম্যান বঙ্কিমচন্দ্রের গুণবত্তার যথেষ্ট প্রশংসা করেন।

বঙ্কিমের এ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটারিগিরি পদলাভের সমকালেই বঙ্গদর্শনে 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' প্রকাশিত হয়। রাজপদে অনেক অযোগ্য ব্যক্তি সৌভাগ্যবলে অনুচিত সম্মান লাভ করে বটে এবং হয়ত যোগ্যতর অনেক ব্যক্তিও নানা ঘটনাচক্রে উপযুক্তরূপ সম্মান ও পদোন্নতি প্রাপ্ত হয়েন না, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র নিজ জীবনে সরকারের নিকট হইতে কখনও অনাদর পান নাই। এমত অবস্থায় মুচিরামের সৃষ্টি কেন, এ প্রশ্ন অনেকেরই মনে উঠিতে পারে। তিনি নিজ আপিসে এবং হয়ত নিজ স্টেশনেই নিজের পার্শ্বে অনেক মুচিরাম, ঘটিরাম[১] দেখিয়াছিলেন। তাহাদের ক্রিয়াকলাপ ও তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও সরকারে প্রতিপত্তি নিশ্চয়ই

১। দীনবন্ধু মিত্র-প্রণীত 'সধবার একাদশী'।

তাঁহার মনে হাস্যরসের উদ্রেক করিয়াছিল। মুচিরামে বঙ্কিম পাঠকগণকে সেই হাস্যরসের ভাগ দিয়াছেন। অবশ্য ইহাতে হাস্যের সঙ্গে যে বিদ্রূপের বিষজ্বালা মিশ্রিত আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। যাহা নিন্দার্হ ও উপহাসযোগ্য বঙ্কিম তাহারই নিন্দা ও উপহাস করিয়াছেন। মুচিরাম-ঘটিরাম ইত্যাদির সৃষ্টি এক হিসাবে প্রকৃষ্ট সমাজসেবা ;—অনেক প্রকৃত বা সম্ভাব্য মুচিরামের বা ঘটিরামের এতদ্দ্বারা চৈতন্যের এবং (চৈতন্যের অপেক্ষাও তাহাদের যাহা দুর্লভ) লজ্জার উদ্রেক হইলে সমাজের লাভ আছে। মুচিরামের জীবনচরিত ইংরাজীতে লিখিত হইলে বুঝি আরও লাভ হইত।

এ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটারির পদ উঠিয়া গেলে বঙ্কিম আলিপুরে বদলি হইলেন। এই সময়ে 'রাজসিংহ' (ছোট সংস্করণ) প্রকাশিত হইল। বঙ্কিম হুগলি হাবড়া কলিকাতা ও আলিপুরে যত দিন কাজ করিয়াছিলেন তত দিন তাঁহার বিদ্বজ্জন-সঙ্গের অভাব হইত না। চন্দ্রনাথবাবু, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিজ্ঞ-বন্ধুগণ কাঁটালপাড়া ও চুঁচুড়ায়ও গতায়াত করিতেন। ভূদেব এই সময়ে চুঁচুড়ায় ছিলেন। অন্যান্য অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিও কলিকাতা হইতে বঙ্কিমসন্দর্শনে যাইতেন। আলিপুরে ও হাবড়ায় কার্য করিবার সময় অধ্যাপক (তখন উকিল) কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মহাশয়ের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা হয়। অবশ্য পরিচয় বহুপূর্ব হইতেই ছিল। কৃষ্ণকমলবাবুর নাম বঙ্গদর্শনের বিজ্ঞাপনপত্রে উল্লিখিত হইয়াছিল ; তিনি বঙ্গদর্শনে বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। কৃষ্ণকমল কোমতের গোঁড়া ভক্ত ছিলেন ; বঙ্কিম ঐ মত ষোল আনা গ্রহণ করেন নাই। এতৎসম্পর্কে কৃষ্ণকমল বলিয়াছেন—

> বেশ মনে পড়ে, একদিন হাবড়া হইতে এক গাড়ীতেই আমরা দুজনে যোগেন্দ্রবাবুর[১] বাড়ীতে গেলাম। পথে কোঁৎ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিলাম। আমি বলিলাম, দেখুন, আমার মনে হয়, কোঁতের দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে আমাদের দেশে আলোচনা হইবার সময় বোধ হয় এখনও আইসে নাই, the time is not ripe for it. বঙ্কিমবাবু বলিলেন, কেন ? যেটা truth তার আবার সময়-অসময় কি ? অবশ্যই বঙ্কিমবাবু যে কোঁৎ ভাল করিয়া পড়িয়াছিলেন তাহা আমার মনে হয় না, কিন্তু তখন যেন বেশ মন খুলিয়াই কথাটি বলিলেন, এ ধারণা আমার হইল।[২]

বাঙ্গালা রচনারীতি সম্বন্ধেও অধ্যাপক কৃষ্ণকমলের সহিত বঙ্কিমের আলোচনা হইত। শ্রদ্ধাস্পদ অক্ষয়চন্দ্র সরকারের মতে 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' গ্রন্থ হইতে 'বঙ্কিমী' ভাষার সূত্রপাত হয়। ঐ গ্রন্থখানি কৃষ্ণকমলের লেখা। কৃষ্ণকমল বাঙ্গালায় নিরবচ্ছিন্ন সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন না। বঙ্কিমেরও ঐ মত। বঙ্কিম একদিন কৃষ্ণকমলকে বলেন, 'বিদ্যাসাগর বড় বড় কথা প্রয়োগ করিয়া বাঙ্গালা

১। ইনি কোমতের অতি গোঁড়া শিষ্য ও বঙ্কিমের বন্ধু ছিলেন।
২। বিপিনবিহারী [illegible] 'পুরাতন প্রসঙ্গ' পৃ ৭২।

ভাষার ধাতটা গোড়ায় খারাপ করিয়া গিয়াছেন।' এ মতে কৃষ্ণকমল সায় দিয়াছিলেন।[১] কৃষ্ণকমল প্রভৃতির সঙ্গে আলোচনা এবং নিজের পরিপক্ক রুচি ও অভিজ্ঞতার ফলে বাঙ্গালা রচনায় শব্দ-নির্বাচন সম্বন্ধে বঙ্কিম শেষ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন 'রাজসিংহের' চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপনে তাহা কতক ব্যক্ত হইয়াছে।

সে যাহা হউক,—যাহা বলা হইতেছিল—কলিকাতা ও তাহার নিকটবর্তী স্থানে থাকিবার সময় বঙ্কিমের বিদ্বজ্জনসঙ্গ দুর্লভ ছিল না। বিশেষতঃ কলিকাতায় অনেকে সাগ্রহেই বঙ্কিমের বাসায় জুটিতেন এবং নানা বিষয়ে ভাববিনিময় করিয়া পরস্পরে উপকৃত হইতেন। কিন্তু ১৮৮২ খৃস্টাব্দের এপ্রিলে যখন বঙ্কিম আলিপুর হইতে দ্বিতীয়বার বারাসতে এবং বারাসত হইতে যাজপুরে বদলি হইলেন তখন তাঁহার পক্ষে অভিমত বন্ধুসমাগম দুর্লভ হইয়া উঠিল। যাজপুরে তিনি আবার পরিবারও সঙ্গে করিয়া নিয়া যান নাই। যাজপুরবাস তাঁহার নিকট কতদূর ক্লেশকর অনুভূত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণরূপে ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের নিকট লিখিত তাঁহার একখানি পত্র হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিব—

সুহৃদ্বরেষু—

... ... ...

আমি যখন প্রথম এখানে আসি তখন দুই একমাসের জন্য আসিতেছি এরূপ কর্তৃপক্ষের নিকট শুনিয়াছিলাম। এজন্য একাই আসিয়াছি। বিশেষ পরিবার আনিবার স্থান এ নহে। এখন জানিলাম ইহার ভিতর অনেক চক্র আছে·········সেই মন্থরার দল আমাদের স্বদেশী স্বজাতি, আমার তুল্যপদস্থ; আমার ও আপনার বন্ধুবর্গের মধ্যে গণ্য।[২] আমি বা 'আনন্দমঠ' লিখিয়া কি করিব আর আপনি বা তাহার মূলমন্ত্র[৩] বুঝাইয়া কি করিবেন? এ ঈর্ষাপরবশ আত্মোদর-পরায়ণ জাতির উন্নতি নাই। বল 'বন্দে উদরং।'

... ... ...

আপনিও 'শাপেনাস্তংগমিতমাহমা' শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। তবে আপনি মহৎ কর্তব্যানুরোধেই এ দশাপ্রাপ্ত, কাজেই তাহা সহ্য হয়; কিন্তু আমি যে কি জন্য বৈতরণী-সৈকতে পড়িয়া ঘোড়ার ঘাস কাটি তাহা বুঝিতে পারি না। যে ব্যক্তি লিখিয়াছিল 'যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী'

---

১। 'পুরাতন প্রসঙ্গ' পৃ ৮০।

২। ইহারা কে এবং বঙ্কিমের বিরুদ্ধে কিরূপ 'চুকলিখোরি' করিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা এখন প্রায় অসাধ্য।

৩। সপ্তম বর্ষের 'বান্ধব' পত্রের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত 'আনন্দমঠের মূলমন্ত্র' শীর্ষক প্রবন্ধ এই উক্তির লক্ষ্য।

সে ব্যক্তি নিশ্চিত জানিত উড়িষ্যার বৈতরণী পারেই যমদ্বার বটে।

... ... ...

ইতি ২৩শে পৌষ। অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়[১]

'সীতারামে' বঙ্কিম উড়িষ্যার বৈতরণীর উপরে অপেক্ষাকৃত সদয় হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, 'মন্থরার দলের' চক্রান্ত বঙ্কিমকে ছয় মাসের অধিক দিন বৈতরণী-তীরে বাস করাইতে পারে নাই। ১৮৮৩ খৃস্টাব্দের প্রারম্ভেই বঙ্কিম বৈতরণীতীর হইতে পুনরায় গঙ্গাতীরে—হাবড়ায় বদলি হন। শচীশবাবু বলেন হাবড়ায় এবারেও ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে তাঁহার একটা বিচার উপলক্ষে সজ্যর্ষ হয়। বঙ্কিমই জয়ী হইয়াছিলেন। ১৮৮৪ খৃস্টাব্দের প্রারম্ভে দ্বিতীয় পর্যায়ের বঙ্গদর্শন বিলুপ্ত হয় এবং কয়েক মাস পরে তদীয় জামাতার সম্পাদকতায় 'প্রচার' পত্র প্রকাশিত হয়। প্রচারের প্রথম সংখ্যা হইতে 'সীতারাম' আরব্ধ হয়। এই সময়েই তিনি নবজীবন পত্রিকায় 'ধর্মতত্ত্ব' লিখিতে আরম্ভ করেন। প্রচার ও নবজীবনের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ-বিষয়ে আলোচনা যথাস্থানে করা যাইবে। হাবড়াতে কার্যকালে তিনি তাঁহার সার্বিসের সর্বোচ্চ শ্রেণীতে (আটশত টাকা বেতনে) উন্নীত হয়েন। হাবড়ায় দুই বৎসর থাকিবার পর তিনি ঝিনাদহে, এবং তথা হইতে প্রায় এক বৎসর পর উড়িষ্যার ভদরকে[২] বদলি হন। মাঝে কিয়দ্দিনের জন্য তিনি ছুটি লইয়া কলিকাতায় বাস করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি নাকি আর কাঁটালপাড়ার বাড়ীতে (উৎসবাদি উপলক্ষে দুই-চারি দিনের জন্য ভিন্ন) বাস করেন নাই। ভদরকে মাত্র একমাস থাকিবার পর তিনি তৃতীয়বার হাবড়ায় বদলি হন; এবং বদলি হইয়াই ছুটি লন। এই সময়ে তিনি কলিকাতায় প্রতাপ চাটুজ্জের গলিতে বাসা ক্রয় করেন এবং ঐ বাসায়ই বাস করিতে থাকেন। তৎপূর্বে তিনি সানকি-ভাঙ্গার গলিতে এক বাসায় থাকিতেন। এই সময়েই তদীয় 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ছুটিশেষে বঙ্কিম ছয় মাসের জন্য মেদিনীপুরে বদলি হন, তথা হইতে তৃতীয় বার আলিপুরে আসেন। আলিপুরেও নাকি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে বঙ্কিমের কয়েকবার সজ্যর্ষ হইয়াছে। ম্যাজিস্ট্রেটটি আর কেহ নহেন, (সার্) এডওয়ার্ড বেকার, যিনি উত্তরকালে বাঙ্গালার ছোটলাট হইয়াছিলেন। ১৮৮৮ খৃস্টাব্দের এপ্রিল হইতে রাজকার্য ছাড়িয়া অবসর-গ্রহণ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র আলিপুরেই ছিলেন।

১৮৯১ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে বঙ্কিমচন্দ্রের দাসত্বের অবসান হয়। শচীশবাবু

---

১। এই পত্রখানি ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের পৌত্র শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ, 'ঢাকা রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছেন। —ঢাকা রিভিউ, মে ও জুন, ১৯১৯।

২। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' গোবিন্দলালের উড়িয়া মালীর গৃহ ভদরকে। কিন্তু কৃষ্ণকান্তের উইল বঙ্কিমের ভদরক গমনের পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বলেন তখন বঙ্কিমচন্দ্রের বহুমূত্র ছাড়া আর কোনও রোগ ছিল না। দেখিতে তিনি সুস্থকায়, সবল, বলিষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু ৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় '১৮৯১ অব্দের শরৎকালে' বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তাঁহার কলিকাতার বাড়ীতে দেখা করিতে আসিয়া দেখেন, "অল্পদিন মাত্র তিনি পেন্সন লইয়াছিলেন, শরীর ভাল ছিল না। পূর্ণবাবু কাছে বসিয়া ছিলেন।[১] আমি বলিলাম 'আগে বলিতেন পেন্সন লইয়া খুব লিখিব—এখন?' মৃদু হাসিয়া তিনি উত্তর করিলেন—'এখন গঙ্গার চরায় হরিনাম লিখিতে পারিলেই আমার হয়। তোমরা লেখ।' বলিলেন, 'রমেশকে (শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত তখন মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট) বলেছি দিন কতক রঘুনাথ-পুরের বাঙ্গালায় বাস করব, সমুদ্রের হাওয়ায় শরীর সারতে পারে।' "[২]

সরকারি চাকরীতে ৫৫ বৎসর বয়স পূর্ণ হইলেই অবসরগ্রহণ করিতে হয়; তৎপূর্বে ৩০ বৎসর চাকরী পূর্ণ হইলে ইচ্ছামত অবসরগ্রহণ করা যায় এরূপ নিয়ম আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ৩৩ বৎসর চাকরী হইয়াছিল—তথাপি শচীশবাবু যে বলিয়াছেন তাঁহাকে পেন্সন লইতে একটু বেগ পাইতে হইয়াছিল—তাহা কেন? সে যাহা হউক, চাকরীতে অবস্থানকালে উপরিতন কর্মচারিগণের সঙ্গে মাঝে মাঝে সজ্বর্ষ হইলেও এবং তাঁহার তুল্যপদস্থ কেহ কেহ ঈর্ষ্যাবশতঃ চুকলিখোরি করিয়া তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে কিছু মনঃকষ্ট ও শারীরিক ক্লেশ দিলেও তাঁহার বেতনবৃদ্ধিতে বাধা হয় নাই। 'রত্নাবলী' নাটিকার মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের মত তিনিও জানিতেন এবং মনে মনে অনুভব করিতেন 'নিষ্পন্নপ্রায়মপি প্রভুপ্রয়োজনং, ন মে ধৃতিমাবহ-তীতি কষ্টোঽয়ং খলু ভৃত্যভাবঃ।' মুসলমান আমলের একজন অত্যুচ্চ হিন্দু রাজকর্মচারীর (রূপ বা সনাতনের) সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, তিনি একদিন রাত্রি-কালে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে রাজকার্যে গৃহের বাহির হইয়া পথিপার্শ্ববর্তী এক গৃহের বারান্দায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। সেই সময়ে তিনি শুনিয়াছিলেন, গৃহমধ্যে স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিতেছেন 'বাহির বারান্দায় এমন দুর্যোগে ও কে উঠিল? একটা কুকুর না কি?' স্বামী তদুত্তরে বলিলেন—'এমন দুর্যোগে কুকুর বাহির হয় না, ও রাজবাড়ীর কোনও কর্মচারী হইবে।' ঐ কথায় নাকি উক্ত রাজ-পুরুষের মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। সে যাহা হউক, ১৮৯১ খৃস্টাব্দের মধ্যভাগে চাকরির ক্লেশ, চুকলিখোরদিগের প্রদত্ত মনঃকষ্ট ইত্যাদি ভৃত্যভাবের সকল কষ্ট, সকল আপদ হইতে তিনি মুক্তিলাভ করেন।

চাকরীতে থাকার সময় তিনি নিজ সার্বিসের উচ্চতম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইলেও কোনও উপাধি লাভ করেন নাই। চাকরী হইতে অবসরগ্রহণের ছয়মাস পরে

---

১। বঙ্কিমচন্দ্র ছোটলাটকে অনুরোধ করিয়া পূর্ণবাবুকে কাছে আনাইয়া (আলিপুরে বদলি করাইয়া) রাখিয়াছিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি পূর্ণবাবুর সহিত সৌভ্রাত্রবন্ধন তাঁহার কখনও ছিন্ন হয় নাই।

২। 'প্রদীপ', দ্বিতীয় বর্ষ। 'মানসী', ৭ম বর্ষ প্রথম খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

১৮৯২ খৃস্টাব্দে নববর্ষের সম্মান বিতরণোপলক্ষে সরকারবাহাদুর তাঁহাকে 'রায় বাহাদুর' উপাধিতে মণ্ডিত করেন। ইহার দুই বৎসর পরে ১৮৯৪ সনের নববর্ষের দিন তিনি 'সি. আই. ই.' উপাধি লাভ করেন। উপাধি-ব্যাধি বঙ্কিমের ছিল না। "রজনী'তে দেখিতে পাই অমরনাথ বলিতেছেন—

সংসারে এমন লোক কে আছে যে, সে মানিলে সুখী হই? যে দুই-চারিজন আছে, তাহাদিগের কাছে আমার মান আছে, অন্যের কাছে মান অপমানমাত্র। রাজ দরবারে মান—সে কেবল দাসত্বের প্রাধান্যচিহ্ন বলিয়া আমি অগ্রাহ্য করি। আমি মান চাহি কেবল আপনার কাছে।

ইহা হয় ত বঙ্কিমেরই প্রাণের কথা। তথাপি আশা করা যায় সরকার বাহাদুরের প্রদত্ত ঐ সকল উপাধি পাইয়া বঙ্কিম উল্লাসে উৎফুল্ল না হইলেও আপনাকে 'দাসত্বের প্রাধান্যচিহ্নে' কলঙ্কিত জ্ঞান করেন নাই। সেরূপ জ্ঞান করিবার হেতুও ছিল না। বক্ল্যাণ্ড সাহেবের 'Bengal under the Lieutenant Governors' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে "But it was not for his services as a promiment member of the Provincial Service that Bankimchandra is to be remembered. The titles conferred upon him were gained rather by his reputation in the world of letters than in the public service"[১] অবশ্য রায় বাহাদুর ও সি. আই. ই. উপাধি বঙ্কিমের যোগ্য সম্মান হইয়াছিল কি না সেটা স্বতন্ত্র কথা। তৎসম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে। ৺দ্বিজেন্দ্র লাল 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার 'সূচনায়' লিখিয়াছিলেন, 'আমাদের শাসনকর্তারা যদি বঙ্গসাহিত্যের আদর জানিতেন তাহা হইলে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও মাইকেল Peerage পাইতেন, রবীন্দ্রনাথ Knight উপাধিতে ভূষিত হইতেন।' রবীন্দ্রনাথ নাইট্ উপাধি পাইয়াছিলেন; বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিম সি. আই. ই পর্যন্ত পান। আজকালকার উপাধির শস্তা বাজারে তাঁহারা জীবিত থাকিলে হয়ত তাঁহাদেরও নাইট্ উপাধি মিলিয়া যাইত। সাহিত্যিকের পক্ষে লর্ড উপাধি মিলিবার দিন এখনও এদেশে আসে নাই। কালক্রমে হয়ত তাহাও আসিবে। সে যাহা হউক আমাদের শাসনকর্তারা যে বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর একেবারে জানেন না ইহা বলা যায় না। বাঙ্গালী সাহিত্যিকদিগের মধ্যে উপাধিপ্রাপ্তের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে।

---

১। **Bengal under the Lieutenant Governors, by C. E. Buckland C. I. E. Vol. II, p. 1077.**

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

# কৃষ্ণকান্তের উইল ও রাজসিংহ

বঙ্গদর্শনের প্রথম পর্যায়ে 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' যে নয় পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হয়, গ্রন্থাকারে পুনঃপ্রকাশিত হইবার সময় উহার অনেক অংশ বর্জিত, পুনর্লিখিত ও সংশোধিত হইয়াছিল। এই পরিবর্তনের প্রায় সবটাই রোহিণীচরিত্র সম্পর্কে। এতৎসম্বন্ধে কয়েকবৎসর পূর্বে ভারতবর্ষ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল শাস্ত্রী একটি প্রবন্ধ লিখেন তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, বঙ্কিম রোহিণীচরিত্রে যে পরিবর্তন করিয়াছিলেন তাহাতে তাহার (রোহিণীর) কলঙ্কিত জীবনের কাহিনীও আমাদের মনে সহানুভূতি জাগাইয়া দেয়।[১] সংশোধিত 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' রোহিণী যে কাহারও চিত্তে সহানুভূতির উদ্রেক করে বর্তমান লেখকের সে ধারণা নাই, কিন্তু বঙ্গদর্শনে উহার চরিত্রে অনাবশ্যকরূপে মসীলেপন করা হইয়াছিল। পাপীকে উৎকটরূপে বীভৎস করা পুরাণের রীতি—কাব্যের রীতি নহে। বঙ্কিম যথার্থ কাব্যের রীতি অনুসরণ করিয়া পাপের যতটুকু চিত্র দেখাইলে আখ্যায়িকার প্রয়োজন সিদ্ধ হয় ততটুকু দেখাইয়াছেন—রোহিণীর মনের আবরণ যতটুকু উন্মোচন করিলে তাহার স্বরূপ বুঝা যায় এবং তাহার ব্যবহারে পূর্বাপরসামঞ্জস্য ব্যঞ্জিত হয়, তাহার অধিক উন্মোচন করেন নাই। পাপের চিত্রে পরিমাণাধিক মসী ঢালিয়া দিলে রসজ্ঞ পাঠকের চক্ষে পাপের জঘন্যতা বাড়ে না, চিত্রকরের রসবোধহীনতাই ধরা পড়ে।

কৃষ্ণকান্তের উইলের প্রধান বিশেষত্ব উহার রসানুগুণ বস্তুতন্ত্রতা। এই আখ্যায়িকার কোনও চরিত্রেই কল্পনামাত্রগম্য কোনও আদর্শলোক হইতে ধার করা আলোকচ্ছটা প্রতিফলিত করিবার চেষ্টা করা হয় নাই, তথাপি ইহা কেমন অনবদ্য! কেহ কেহ এই আখ্যায়িকাখানিকে বাঙ্গালী পরিবারের একখানি নিখুঁত ফটো বলিয়াছেন, আমরা তাহা বলি না। ফটো-মাত্র হইলে ইহাকে সুন্দর বলিতাম না। চিত্রশিল্পীরূপে ফটো যে সুন্দর বস্তু নয় পরন্তু অতি কুৎসিত বস্তু, আমাদের দেশে চিত্রকলার এই ঘোর দুর্দিনেও আশা করি ইহা অনেকেই বোঝেন। যাঁহারা realismএর বা বস্তুতন্ত্রতার দোহাই দিয়া উপন্যাসে বৈচিত্র্যহীন, রসহীন, প্রাকৃত বা গ্রাম্য বস্তুর অবতারণা করেন তাঁহাদিগের কৃতি নামতঃ বস্তুতন্ত্র হইলেও ফটোর ন্যায় প্রাণহীন, অসত্য, কুৎসিত। রসই চিত্র ও কাব্য উভয়ের প্রাণ, উভয়ের সার-সত্তা, সার-সৌন্দর্য। রসের অভাবে উভয়ই অসত্য ও কুৎসিত। কৃষ্ণকান্তের উইলের আখ্যানবস্তুতে কোনও অসাধারণ বা অলৌকিক

১। শরচ্চন্দ্র ঘোষাল শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধ শচীশবাবুর 'বঙ্কিম জীবনী'তে উদ্ধৃত হইয়াছে।

বা অতিরিক্তমাত্রায় কাল্পনিক ঘটনার সমাবেশ নাই—ওরূপ ঘটনাবলী আমাদের আশে পাশে প্রায় নিত্যই ঘটিতেছে; উহার কোনও চরিত্রে অসাধারণ গুণগ্রামের বা অসাধারণ দোষরাশির সমাবেশ করা হয় নাই, তথাপি পূর্বাপর সর্বত্র সমুন্নত স্বচ্ছতা, পরিমাণসামঞ্জস্য, ভাবব্যঞ্জকতা, রসোদ্বোধকতা-প্রভৃতি গুণের সদ্ভাবে উহা এমন অপূর্বরূপে চমৎকারজনক হইয়াছে।

বস্তুতঃ idealism ও realism সম্পর্কে সমালোচকগণের মধ্যে যে কলহ তাহা আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে নিতান্ত মূল্যহীন বলিয়া বোধ হয়। সৌন্দর্য তথাকথিত 'idealistis' বা 'realistic' কোনও পক্ষেরই একচেটিয়া নয়। সৌন্দর্যহীন আদর্শ আদর্শনামবাচ্য নহে; উহা যতই চক্‌চকে হউক ঝুটা পাথর। সুরুচিশালী পাঠকের কাছে উহার কৃত্রিমতা, অসত্যতা, সুতরাং কুৎসিততা সহজেই ধরা পড়ে। আবার realismও চমৎকারিতাবিবর্জিত হইলে অসত্য, গ্রাম্য ও অসুন্দর হয়। কাব্যে বা চিত্রে realism-এর জন্যই realism বাঞ্ছনীয় নহে; idealismও কেবল ideal-এর খাতিরে আদরণীয় নহে, সত্যে ও সৌন্দর্যে উহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা চাই। অবশ্য সৌন্দর্যসম্বন্ধে সাধারণের রুচি ও সংস্কার যুগে যুগে (পরিবর্তনশীল সমাজের সাময়িক অবস্থাদি দ্বারা অনেক পরিমাণে নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত হওয়ার দরুণ) পরিবর্তিত হয়; কিন্তু তথাপি সৎসাহিত্যের ঐকান্তিকতা, যাথার্থ্য, বৈশদ্য, ব্যাপকতা, অন্তর্দৃষ্টিনৈপুণ্য প্রভৃতি কতকগুলি চিরন্তন ধর্ম আছে যাহাদের অভাব হইলে বা রীতিবিশেষের নিষ্প্রতিভ অনুশীলনে বিকৃতি ঘটিলে, কেবল একটা সাময়িক ফ্যাসনের খাতিরে কিছুই আদরণীয় হইতে পারে না, অন্ততঃ হওয়া উচিত নয়।

যে যাহা হউক,—যাহা বলা হইতেছিল—যাহাকে আমরা পূর্বে idealism নাম দিয়া আসিয়াছি কৃষ্ণকান্তের উইলে যে তাহা নাই তাহা অবশ্যস্বীকার্য ও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। Idealism-এর পরিবর্তে কৃষ্ণকান্তের উইলে আছে intensity বা তীব্রতা—ভাবের তীব্রতা, রসের তীব্রতা, ঘটনাসমূহের সঙ্ঘটন-প্রক্রিয়ার তীব্রতা বা দ্রুততা। বঙ্কিমচন্দ্র কোনও আখ্যায়িকায়ই চরিত্রের ক্রমবিকাশপ্রদর্শন করা স্বীয় কর্তব্য মধ্যে গণনা করেন নাই; তিনি এমন কতকগুলি পাত্র নির্বাচন করিয়া লইয়াছেন যাহাদের রুচি বা চরিত্র পূর্বেই একরূপ গঠিত হইয়া গিয়াছে, তারপর তাহাদিগকে ঘটনাস্রোতের আবর্তে নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের মনুষ্যত্বের পরীক্ষা লইয়াছেন, কাহাকেও বা তলাইয়া দিয়াছেন, কাহাকেও ভাসাইয়া রাখিয়াছেন, কাহাকেও বা তলাইয়া যাইতে যাইতে উঠাইয়া লইয়াছেন, এবং প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব অতি স্বাভাবিক ও সুসঙ্গতরূপে পরিস্ফুট করিয়াছেন। সেক্ষপীয়রের নাটকগুলিতেও ঐ রীতি অবলম্বিত হইয়াছে। ম্যাক্‌বেথের চিত্তে গোড়াতেই উচ্চাকাঙ্ক্ষার বীজ অঙ্কুরিতপ্রায় দেখা যায়, লিয়রকেও গোড়া হইতেই অভিমানী, স্নেহাকাঙ্ক্ষ ও যেন কিছু স্বৈরাচারী দেখিতে পাই, রোমিও গোড়াতেই প্রেমে আত্মহারা। সে যাহা হউক, বঙ্কিম-চন্দ্রের কপালকুণ্ডলা, চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্তের উইল ও রাজসিংহে ঐ ধর্মগুলি বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করা যায়। শেষোক্ত তিনখানি উপন্যাসে আবার ঘটনাস্রোত বড়

দ্রুত ও উহার আবর্ত বড় তীব্র। তন্মধ্যে চন্দ্রশেখরে ঘটনার দ্রুততাই আছে ভাবগত দ্রুততা তেমন স্পষ্ট নহে; অন্ততঃ ভাবগত দ্রুততা বা তীব্রতা হইতে ঘটনার দ্রুততা সঙ্ঘটিত হয় নাই, বাহ্যকারণপরম্পরায় যেন হঠাৎ ঘটনার দ্রুততার সঙ্গে ভাবের দ্রুততা আসিয়াছে। শৈবলিনী প্রতাপকে বাল্য হইতে ভালবাসে, তাহার জন্য মরিতেও গিয়াছিল, তার পরও তাহাকে বহুদিন দেখিয়াছে। ফস্টরের পুরন্দরপুরত্যাগের আদেশ হঠাৎ না আসিলে হয়ত সে সহসা চন্দ্রশেখরের গৃহে ডাকাতি করিতে আসিত না, অন্য উপায়ে তাহাকে হস্তগত করিতে চেষ্টা করিত। ডাকাতি না হইলে শৈবলিনীও হয়ত প্রতাপকে পাইবার দুর্লোভে ফস্টরের সাথে ঘরের বাহির হইয়া পড়িত না। বাহ্য (রাজনৈতিক) কারণেই ফস্টরের ডাকাতি; তার পরেও যত ঘটনা সবই ঐরূপ বাহ্য (রাজনৈতিক) কারণেই ঘটিয়াছে। রাজনৈতিক ঘটনাচক্রই শৈবলিনীকে অমন তীব্রবেগে ঘুরাইয়াছে, দলনীকে নির্মমভাবে নিষ্পেষিত করিয়াছে। কৃষ্ণকান্তের উইলে হরলালের সহিত উইলচুরির পরামর্শে রোহিণীর বৈধব্যের অনুপযোগী মনোভাবের প্রথম পরিচয় পাইলাম, তৎসঙ্গে বঙ্কিম তাহার আরও কয়েকটি দোষের কথা বলিয়া দিলেন। তার পর হঠাৎ একদিন তার বারুণী-পুষ্করিণী হইতে জল আনার পথে কোকিল ডাকিল, সেই দিনই মনে ভ্রমরের প্রতি ঈর্ষা জন্মিল, সেই দিনই চোখের জল পড়িল, সেই দিনই সে গোবিন্দলালের মুখে সহানুভূতির কথা শুনিল সেই দিনই কলসীতে, আর কলসীর জলেতে, আর রোহিণীর বালাতে, আর রোহিণীর মনের মধ্যে পরস্পর কথোপকথনে স্থির সিদ্ধান্ত হইয়া গেল, 'উইল চুরি কাজটা ভাল হয় নাই।' তারপর যাহা ঘটিল, সবই বড় দ্রুত। তার মরণের চেষ্টা দ্রুত, গোবিন্দলালের মোহসঞ্চার তত দ্রুত না হইলেও কম নয়, ভ্রমরের প্রতি বিরক্তিটা খুবই দ্রুত, ভ্রমরের অবিশ্বাস দ্রুত, অভিমান দ্রুত, বড় তীব্র; বুড়া কৃষ্ণকান্তের অন্তিম উইলও বড় দ্রুত। কোন্ ঘটনা দ্রুত নয়?—রোহিণীর মরণ পর্যন্ত দ্রুত—অতি ভয়ানকরূপে দ্রুত।

(রাজসিংহে যে ভাবগত দ্রুততা তাহাও বাহ্য ঘটনা পরম্পরাদ্বারা নিয়মিত। ভাবগত তীব্রতাদ্বারা বাহ্য ঘটনাসমূহের দ্রুততা সম্পাদিত হয় নাই।) রাজসিংহের প্রতি চঞ্চলকুমারীর অনুরাগ গভীর হইলেও দ্রুত নহে, সে যাহা হউক, দাম্ভিক ও রাজপুতগণের চিরশত্রু ঔরঙ্গজেব ছলনাপূর্বক চঞ্চলকুমারীর পাণিপ্রার্থী না হইলেও চঞ্চলের অনুরাগকথা এত দ্রুত রাজসিংহের কাণে পৌঁছিত না। কিন্তু ঐ বাহ্য কারণের আঘাতে চঞ্চল দ্রুত অবলাসুলভ ব্রীড়া জয় করিয়া রাজসিংহকে চিঠি লিখিল, তারপর যত ব্যাপার তাহাও যেন বাহ্য ঘটনাচক্রের আবর্তনেই দ্রুত ঘটিতে লাগিল, রাণা দ্রুত আরাবল্লীপর্বতে গুপ্ত অভিযান করিতে বাধ্য হইলেন, নির্মল অতি দ্রুত মাণিকলালের পাছে ঘোড়ায় চাপিয়া বসিল, মবারকও দ্রুত মরিল, বাঁচিল, আবার মরিল। (বাহ্য ঘটনার আঘাতেই অত দ্রুত 'শাহজাদী ভস্ম হইল'।)

কৃষ্ণকান্তের উইলে ভাবগত তীব্রতা প্রায় সকল পাত্রেই লক্ষ্য করিবার যোগ্য।

হরলাল গোঁয়ার, দুর্দান্ত, দুর্মুখ ; সে অন্যায্য হইলেও সেই একা সমগ্র সম্পত্তির আট আনা চায়, না দিলে বিধবাবিবাহ করিবে বলিয়া পিতাকে ভয় দেখায়। পিতাটিও আবার পুত্রের উপর রাগ করিয়া তাহাকে ত সম্পত্তিতে বঞ্চিত করিলেনই, পৌত্রটিকে মাত্র এক পাই অংশ লিখিয়া দিলেন। গোবিন্দলালের চরিত্রগত কলঙ্কের কথা কৃষ্ণকান্ত পূর্বেই বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু কোনও শাসন করেন নাই, সতর্কও করেন নাই, ভ্রমরকেও পিত্রালয় হইতে আনান নাই ; হঠাৎ শেষ মুহূর্তে এমন একটা কাজ করিলেন যাহাতে তাহার অভীষ্ট ত মোটেই সিদ্ধ হইল না, পরন্তু গোবিন্দলালের মায়ের মনে ঈর্ষা জন্মিল, গোবিন্দলালের ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়া রোহিণীকে লইয়া পলাইবার একটা ছুতা জুটিয়া গেল, ভ্রমরের সাজান বাগান শুকাইল।

রোহিণীর অনেক দোষ, সে মুখরা, নির্লজ্জা, হঠকারিণী, রিপুনির্জিতা। হরলাল তাহাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত জানিয়াই সে উইল চুরি করিতে গেল, বঙ্কিম তাহার বৈধব্যের অনুপযোগী অনেকগুলি অভ্যাসের কথা বলিয়াছেন। বস্তুতঃ তাহার কুপ্রবৃত্তিগুলি তাহার মনটাকে বহু পূর্ব হইতে বারুদের ঘর করিয়া রাখিয়াছিল, তাই বারুণী পুষ্করিণীর তীরে গোবিন্দলালের একটা সহানুভূতিপূর্ণ কথার স্ফুলিঙ্গে সে বারুদের ঘর জ্বলিয়া উঠিল, কুলশীল নিঃশেষ দগ্ধ হইয়া গেল। কিন্তু কাম প্রেম নহে, তাই কাম্যজনকে আয়ত্ত করিয়াও চরিতার্থতা ঘটিল না। তাই প্রসাদপুরে অপরিচিত নিশাকরের সঙ্গে প্রথম দেখাতেই 'তাকাতাকি আঁচাআঁচি' হইয়া গেল। পাপের পথে পতনের নিম্নতম সীমা নির্দিষ্ট নাই।

> রোহিণী দেখিয়াছিল যে নিশাকর রূপবান্—পটোলচেরা চোক। রোহিণী দেখিয়াছিল যে মনুষ্যমধ্যে নিশাকর একজন, মনুষ্যত্বে প্রধান। রোহিণীর মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল যে আমি গোবিন্দলালের কাছে বিশ্বাসহন্ত্রী হইব না—কিন্তু বিশ্বাসহানি এক কথা—আর এ আর এক কথা।[১] বুঝি সেই মহাপাপিষ্ঠা মনে করিয়াছিল, অনবধান মৃগ পাইলে কোন্ ব্যাধ ব্যাধ-ব্যবসায়ী হইয়া তাহাকে না শরবিদ্ধ করিবে? ভাবিয়াছিল, নারী হইয়া জেয় পুরুষ দেখিলে কোন্ নারী তাহাকে জয় করিতে না কামনা করিবে? বাঘ গরু মারে—সকল গরু খায় না। স্ত্রীলোকও পুরুষকে জয় করে—কেবল জয়পতাকা উড়াইবার জন্য। অনেকে মাছ ধরে—কেবল মাছ ধরিবার জন্য, মাছ খায় না, বিলাইয়া দেয়। অনেকে পাখী মারে, কেবল মারিবার জন্য—মারিয়া

---

১। এইরকম যুক্তি দ্বারাই পাপপ্রবণ চিত্ত আত্মপ্রতারণা করে। প্রথমখণ্ড চতুর্দশ পরিচ্ছেদে, "হে দেবতা! হে দুর্গা—হে কালি—হে জগন্নাথ—আমায় সুমতি দাও" ইত্যাদি প্রার্থনারও কোনও মূল্য নাই, কেননা ঐ পরিচ্ছেদেই দেখা যাইতেছে চিত্তসংযম জন্য রোহিণীর বস্তুত: কোনও ইচ্ছা নাই; সে পূর্বেই সঙ্কল্প করিয়াছে যে সে কিছুতেই হরিদ্রাগ্রাম ছাড়িবে না, গোবিন্দলালকে দেখিবেই।

ফেলিয়া দেয়। শিকার কেবল শিকারের জন্য—খাইবার জন্য নহে। জানি না তাহাতে কি রস আছে। রোহিণী ভাবিয়া থাকিবে, যদি এই আয়তলোচন মৃগ এই প্রসাদপুর কাননে আসিয়া পড়িয়াছে—তবে কেন না তাহাকে শরবিদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া দেই ?[১]

নদীর ঘাটে নিশাকরের সঙ্গে রোহিণীর সংক্ষিপ্ত কিন্তু নিতান্ত নির্লজ্জ আলাপের কথা আর বিশেষভাবে উল্লেখ করিব না। কেননা সে অবস্থায় তাহার কাছ হইতে কেহ লজ্জা আশা করে না। কিন্তু মোটের উপর নির্লজ্জতায় বুঝি রোহিণী মতিবিবিকেও পশ্চাতে ফেলিয়াছে। মতির প্রাণে নবকুমারের প্রতি যথার্থ প্রেম জন্মিয়াছিল, কিন্তু রোহিণী কি গোবিন্দলালকে যথার্থ ভালবাসিয়াছে ? অবশ্য উভয়ের অবস্থার প্রভেদ আছে ; মতি বহুপুষ্পে সঞ্চরণ করিয়া ক্লান্ত হইয়া শান্তির আশায় স্বীয় স্বামীকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিরাছিল। আর গোবিন্দলাল রোহিণী-মধুকরীর প্রথম পুষ্প। সে ভাবিতেছিল আর একটা পুষ্পে নাই বা বসিলাম, কিন্তু পাখাজোড়া যখন আছে তখন তার চারিদিকে উড়িয়া বেড়াইতে দোষ কি ? মতির আগ্রা-জীবনে কোনও একটা পুষ্পের উপর অনুরাগের ভাণ দেখি না। গোবিন্দলাল যখন বাক্স হইতে পিস্তল বাহির করিয়া রোহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন, মরিতে পারিবে ?' সে ভাবিল, 'মরিব কেন ? না হয় ইনি ত্যাগ করুন।' কিন্তু ইহার পরই যখন সে ভাবিতেছে, 'ইঁহাকে কখনও ভুলিব না, ইঁহাকে যে মনে ভাবিব, দুঃখের দশায় পড়িলে যে ইঁহাকে মনে করিব সেও ত এক সুখ' তখন সে আত্মপ্রতারণা করিতেছে ; নিজের মনে মনে গোবিন্দলালকে ভালবাসার ভাণ করিতেছে। তাহার প্রাণের আসল কথা 'মরিব না, মারিও না, চরণে না রাখ বিদায় দাও,......আমার নবীন বয়স নূতন সুখ। আমি আর তোমায় দেখা দিব না......এখনই যাইতেছি।' হয়ত সে নিজের অন্তরের অন্তরে নিশাকরের সঙ্গে যাওয়ার কথাই ভাবিতেছিল।

রোহিণীর ঐ যে ভালবাসার ভাণ—যাহাকে আত্মপ্রতারণা বলিয়াছি—তাহা খুবই একটা স্বাভাবিক ভাব। অত বড় বেগবতী মনোবৃত্তিশালিনী নারীর হৃদয়েও উহাতে কেমন একটা অপূর্ব আলোক-আঁধারের মিশ্রণ ঘটাইয়াছে। আঁধারটা অবশ্য অতৃপ্ত ও অতর্পণীয় কামজ মোহের, আলোক—ছায়ামাত্রাবশিষ্ট ঔচিত্যবোধের। মতিবিবিতে এইটুকু নাই।

রোহিণীতে ও হীরাতে কতক সাদৃশ্য আছে। হীরা দাসী হইলেও ভদ্রঘরের কায়স্থকন্যা, বালবিধবা। সেও সুন্দরী,—'উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী পদ্মপলাশলোচনা'। যখন তাহাকে প্রথম দেখি তখন শুনিতে পাই সে 'অত্যন্ত মুখরা, সধবার ন্যায় বেশবিন্যাস করিত এবং বেশবিন্যাসে বিশেষ প্রীতা ছিল।' সে নাকি 'আড়ালে বসিয়া গান করিত', আর—'আতর-গোলাপ দেখিলেই চুরি' করিত। আতর-

১। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' দ্বিতীয়খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ।

গোলাপ চুরি ছাড়া অন্য সকলগুলিতেই রোহিণীর সাথে তাহার সাদৃশ্য আছে। ইহা ছাড়া রোহিণী যেমন গোবিন্দলালের প্রেমে মজিবার পূর্বেই ভ্রমরের সুখে ঈর্ষান্বিতা, হীরাকেও আমরা দেবেন্দ্রের প্রেমে মজিবার পূর্বেই সূর্যমুখীর সুখে ঈর্ষান্বিতা দেখি। তার ঐ রকম মন লইয়া যেদিন সে দেবেন্দ্রবাবুর বৈষ্ণবীরূপ-ধারণের কারণ আবিষ্কার করিতে গেল,—চোরের ন্যায় জানালার খড়খড়ি দিয়া ভিতরের ব্যাপার দেখিতে ও গুপ্তকথা শুনিতে লাগিল—সেই দিনই কিংবা বোধ হয়, তার পর দিন যেদিন মালতীর সাথে 'মনের মতন পেলে রতন যতন করি তায়' গাইতে গাইতে দেবেন্দ্রের সঙ্গে দ্বিতীয় বার দেখা করিতে গেল, সেই দিন তার নিজের ভাষায়—'বেগারের দৌলতে গঙ্গাস্নান' ঘটিল, 'পরের চোর ধরিতে গিয়া আপনার প্রাণটা চুরি গেল!'

> কি মুখখানি! কি গড়ন! কি গলা! অন্য মানুষের কি এমন আছে? আবার মিন্সে আমায় বলে, কুন্দকে এনে দে! আর বল্‌তে লোক পেলেন না! মারি মিন্সের নাকে এক কিল! আহা, তার নাকে কিল মেরেও সুখ। দূর হোক ও সব কথা যাক। ও পথেও ধর্মের কাঁটা। এ জন্মের সুখদুঃখ অনেক কাল ঠাকুরকে দিয়াছি। তাই বলিয়া কুন্দকে দেবেন্দ্রের হাতে দিতে পারিব না, সে কথা মনে হলেও গা জ্বালা করে [১]......

রোহিণীতে যেমন স্বীয় ধর্মরক্ষার বিশেষ কোনও চেষ্টা দেখি না, হীরাতেও তদ্রূপ।

গোবিন্দলাল যখন রোহিণীকে দেশত্যাগ করিয়া কলিকাতা যাইতে অনুরোধ করেন, তখন তাহার নিকট সে সম্মত হইয়া আসিয়া ঘরের মধ্যে কাঁদিতে বসিল। তার পরেই প্রতিজ্ঞা করিল—

> এ হরিদ্রাগ্রাম ছাড়িয়া আমার যাওয়া হইবে না......কৃষ্ণকান্ত রায় আমার মাথা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া দেশছাড়া করিয়া দিবে? আমি আবার আসিব। গোবিন্দলাল রাগ করিবে? করে করুক—তবু আমি তাহাকে দেখিব। আমার চক্ষু ত কাড়িয়া লইতে পারিবে না। আমি যাব না। কলিকাতায় যাব না—কোথাও যাব না। যাই ত যমের বাড়ী যাব, আর কোথাও না।

এইরূপ প্রতিজ্ঞার পর সে গোবিন্দলালের সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা করিতে যাইবার পথে বলিতে লাগিল—

> হে জগদীশ্বর, হে দীননাথ, হে দুঃখিজনের একমাত্র সহায়! আমি নিতান্ত দুঃখিনী, নিতান্ত দুঃখে পড়িয়াছি—আমায় রক্ষা কর—আমার হৃদয়ের এই অসহ্য প্রেমবহ্নি নিবাইয়া দাও—আর আমায় পোড়াইও না।......আমি বিধবা—আমার ধর্ম গেল—সুখ গেল—প্রাণ গেল—রহিল কি প্রভু?

১। 'বিষবৃক্ষ' ২০শ পরিচ্ছেদ।

রাখিব কি প্রভু? হে দেবতা! হে দুর্গা—হে কালি—হে জগন্নাথ—আমাকে সুমতি দাও…।[১]

তার এই প্রার্থনা একেবারে যদিও অনান্তরিক নয়, তথাপি ইহার পশ্চাতে ইচ্ছাশক্তির সচেষ্ট সহযোগিতা না থাকায় ইহার কোনও মূল্য নাই। চিরনিরূঢ় সংস্কার সহসা বিলুপ্ত হয় না, মাঝে মাঝে প্রবল প্রতিকূল শক্তিকে ঠেলিয়া ফেলিয়াও আত্মপ্রকাশ করে। রোহিণীর ঐ প্রার্থনা তাদৃশ সংস্কারের সত্তামাত্র সমর্থন করে, তার অধিক কিছু করে না।

হীরাতেও আমরা ঠিক এই ভাব দেখি। হীরার ঘরে দেবেন্দ্র দত্ত যেদিন প্রথম পদার্পণ করিলেন,[২] সেদিন তাহার মধুর কণ্ঠের চিত্তোন্মাদন গান শুনিয়া মোহগ্রস্তা হীরা অসতর্কভাবে মনের কথা মুখে ব্যক্ত করিয়া ফেলিল। তারপরই তার চৈতন্য হইল, সে একবার দেবেন্দ্রকে ভর্ৎসনা করিয়া লইল, তারপরে কোমলতর স্বরে স্বীয় মনের দুর্বলতা অস্বীকার না করিয়াও নিজ ধর্মরক্ষার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিল। আবার তার পরেই দেবেন্দ্রের স্বভাবের কথা, তার কামুকতা, অব্যবস্থিতচিত্ততা ও অবিশ্বাসযোগ্যতার কথা উল্লেখ করিয়া বলিল 'যেদিন আপনি আমাকে ভালবাসিবেন, সেই দিন আপনার দাসী হইয়া চরণসেবা করিব।' কোনও পতঙ্গই বুঝি একেবারে ছুটিয়া আসিয়া আগুনে পড়ে না, প্রথম আবেগে আগুনের কাছে আসিয়া পড়ে, তারপর দুই-একবার এদিকে-ওদিকে লাফাইয়া যায়, শেষে আগুনে ঝাঁপ দেয়।

হীরা দেবেন্দ্রের উপর রাগ করিয়া কুন্দকে বিষ দিয়াছে, রোহিণীতে সে পাপ নাই, ভ্রমর তাহার অযথা নিন্দা করিতেছে জানিয়া রাগে কতকগুলি কৃত্রিম গহনা দেখাইয়া তাহাকে ঈর্ষানলে দগ্ধ করিতে আসিয়াছিল। রোহিণীর চেয়েও হীরা পাপিষ্ঠা, কিন্তু দেবেন্দ্রকে ভালবাসিয়া সে অন্য-পুরুষে লুব্ধদৃষ্টি করে নাই।

রোহিণীকে মারিয়া ফেলা অনেকের মনোমত হয় নাই। বঙ্কিমবাবুর নিকটে রোহিণীর মৃত্যু সম্বন্ধে অনেকে কৈফিয়ৎ চাহিয়াছিলেন। তদুত্তরে বঙ্কিম বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছিলেন, "অনেক পাঠক আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন 'রোহিণীকে মারিলেন কেন?' অনেক সময়ই উত্তর করিতে বাধ্য হইয়াছি, 'আমার ঘাট হইয়াছে'। কাব্যগ্রন্থ মনুষ্যজীবনের কঠিন সমস্যাসকলের ব্যাখ্যামাত্র, একথা যিনি না বুঝিয়া, একথা বিস্মৃত হইয়া কেবল গল্পের অনুরোধে উপন্যাস পাঠে নিযুক্ত হয়েন, তিনি এসকল উপন্যাস পাঠ না করিলেই বাধ্য হই।" এখানে কঠিন সমস্যা রোহিণীর জীবনের নয়, ভ্রমরের ও গোবিন্দলালের। হীরাকে মারিবার প্রয়োজন হয় নাই, তাহাকে দিয়া কুন্দকে মারিবার প্রয়োজন ছিল, তাহা শেষ করিয়া বঙ্কিম তাহাকে উন্মাদগ্রস্তা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। রোহিণীকে

১। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রথমখণ্ড, ১৪শ পরিচ্ছেদ।

২। 'বিষবৃক্ষ' ২৪শ পরিচ্ছেদ।

মারিয়া গোবিন্দলালকে স্ত্রীহত্যাকারী না করিলে ভ্রমরের দুঃখের ভার কিছু উন থাকিয়া যাইত। তাহা উন রাখার চেয়ে দুনো করারই প্রয়োজন বেশি ছিল। কেননা গোবিন্দলালের গৃহত্যাগ এই আখ্যায়িকার প্রধানতম সঙ্কটভূমি (Crisis) নহে, রোহিণীর মৃত্যুই প্রধানতম সঙ্কটভূমি।

গোবিন্দলালের চরিত্রালোচনা বঙ্কিম স্বয়ংই করিয়াছেন, উহার অধিক বিশ্লেষণ অনাবশ্যক। প্রথমে বঙ্কিম গোবিন্দলালকে বারুণীর জলে ডুবাইয়া মারিয়াছিলেন। ভ্রমরের মৃত্যুর পর গোবিন্দলালের মানসিক অবস্থায় আত্মহত্যা অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নহে; হয়ত আখ্যায়িকার করুণরসোদ্বোধকতা (tragic interest) তাহাতে পরিপুষ্টই হইয়াছিল; কিন্তু তাদৃশ অভিজ্ঞতার পর চিত্তবৈরাগ্যই, বোধ হয়, বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুর পক্ষে অধিক স্বাভাবিক ও হিন্দুসমাজের অধিক আদর্শানুগত মনে করিয়াছিলেন। তাই দুঃখে ও পাপে গ্রন্থ শেষ না করিয়া শান্তিতে ও পুণ্যে তাহার উপসংহার করিয়াছেন। 'চন্দ্রশেখরে' প্রতাপকে যে কারণে মারিয়াছিলেন, 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' গোবিন্দলালকে মারিবার সে কারণ ছিল না। প্রতাপকে মারিয়া তাহার মৃত্যুকালে তিনি এই বলিয়া বিদায় দিয়াছিলেন, 'তবে যাও প্রতাপ, অনন্তধামে যাও, যেখানে ইন্দ্রিয়জয়ে কষ্ট নাই, রূপে মোহ নাই···সেই মহৈশ্বর্যময়-লোকে যাও, লক্ষ শৈবলিনী পদপ্রান্তে পাইলেও ভালবাসিতে চাহিবে না;' আর, এখন মোহমুক্ত, অনুতপ্ত গোবিন্দলালকে না মারিয়া যে প্রেম সকল প্রেমের সারভূত তাহার তত্ত্বোপদেশ করিলেন—ভ্রমরের ছায়ামূর্তি দিয়া তাহাকে বলাইলেন, 'আমাকে হারাইয়াছ, তাই মরিবে? আমার অপেক্ষাও প্রিয় কেহ আছেন।' গোবিন্দলাল 'ভগবৎপাদপদ্মে মনঃস্থাপন' করিয়া বুঝিয়াছিলেন, 'তিনিই এখন আমার ভ্রমরাধিক ভ্রমর।'

ভ্রমরকে যখন প্রথম দেখি তাহার কিছু পূর্বে তাহার একটি পুত্র হইয়া সূতিকাগারে নষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু তখনও সে বালিকা—প্রায় সতের বৎসরেও বালিকা; ফুলটি, পুতুলটি, পাখীটি, স্বামীটিতে তার মন। সে স্বামীর আদরে আদরিণী, হাসিতে যত পটু শাসনে তত পটু নহে। রোহিণী কৃষ্ণকান্তের ঘরে চুরি করিতে আসিয়াছিল ইহা প্রথমে গোবিন্দলালের বিশ্বাস হয় নাই বলিয়াই ভ্রমরেরও বিশ্বাস হয় নাই। চাকরাণীরা রোহিণীর চুরি সম্বন্ধে যাহাই বলুক না কেন, তাহাতে ভ্রমরের বিশ্বাস নাই; গোবিন্দলালের মতই ভ্রমরের মত। তার যে একটি পুত্র হইয়া মারা গিয়াছে তজ্জনিত কোনও দুঃখ তখন তাহার দেখি না। পুত্রের জন্য কি পুত্র প্রিয়? স্বামীর জন্য পুত্র প্রিয়। তাই যেদিন গোবিন্দলাল ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়া গেলেন, সেইদিন তার পুত্রকে মনে পড়িয়াছিল। স্বামী তাহার প্রতি বড় অনুসক্ত বলিয়া তাহাতে যে কিছু গৌরবের ভাব, গর্বের ভাব না দেখি তাহা নহে, ঐ গর্বটুকু না থাকিলে বুঝি তার অভিমান এত উৎকট হইত না। অথচ সূর্যমুখী হইতে তাহার স্বামীর মর্যাদাবোধ

কম বলিয়া বোধ হয় না, ভ্রমর যখন প্রথম শুনিল রোহিণী গোবিন্দলালকে ভালবাসে, তখন সে ক্ষীরীচাকরাণী দ্বারা তাহাকে কলসী গলায় দিয়ে মরিতে বলিয়া পাঠাইল। শুনিয়া গোবিন্দলাল বলিলেন, 'ছিঃ ভোমরা!' ভোমরা বলিল, 'ভাবিও না; সে মরিবে না। যে তোমায় দেখিয়া মজিয়াছে, সে কি মরিতে পারে?'

এপর্যন্ত স্বামীতে তার বিন্দুমাত্রও অবিশ্বাস দেখি না। অবিশ্বাসের প্রথম সূত্রপাত হইল যখন তার হিতৈষিণীগণের মুখে প্রথম শুনিল গোবিন্দলাল রোহিণীকে গহনা ইত্যাদি দিয়াছেন, আর যখন পাপিষ্ঠা রোহিণী স্বয়ং আসিয়া তাহাকে কতকগুলি গহনা ও কাপড় গোবিন্দলালের প্রদত্ত বলিয়া দেখাইয়া গেল। পূর্বে অবিশ্বাস মোটে ছিল না, এখন প্রমাণ পাইয়া বড়ই বুঝি অবিশ্বাস জন্মিল—অন্ততঃ বড় রাগ হইল। রাগের মত শত্রু মানুষের আর নাই। রাগের মাথায় ভ্রমর আপনার পায়ে আপনি কুড়াল মারিল। সে গোবিন্দলালকে লিখিল—

> তুমি মনে জান বোধ হয় যে, তোমার প্রতি আমার ভক্তি অচলা—তোমার উপর আমার বিশ্বাস অনন্ত। আমিও তাহা জানিতাম; কিন্তু এখন বুঝিলাম যে, তাহা নহে। যত দিন তুমি ভক্তির যোগ্য তত দিন আমারও ভক্তি; যতদিন তুমি বিশ্বাসী তত দিন আমারও বিশ্বাস। এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই। তোমার দর্শনে আমার আর সুখ নাই।

ভ্রমর রাগের মাথায় যাহা বলিয়াছিল, ঐ কথাটিকে মূলসূত্র করিয়া একজন বর্ষীয়সী স্বামীপুত্র-সুখে সুখিনী হিন্দুমহিলাকে পর্যন্ত গ্রন্থ লিখিয়া বাহবা লইতে দেখিয়াছি। কে বলে এদেশে individualism বা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ প্রচার করিবার দিন আসে নাই? সে যাহা হউক, ভ্রমরের ঐ কথাটি যে তাহার প্রাণের কথা নহে, রাগের কথা তাহার নিদর্শন আখ্যায়িকার ভিতরেই আছে। গোবিন্দলাল যখন তাহাকে ত্যাগ করিয়া কাশী যাইতে উদ্যত, তখন যে ভ্রমর পূর্বে লিখিয়াছিল 'তোমার উপর আমার ভক্তি নাই,' সেই বলিতেছে, 'দেবতা সাক্ষী! যদি কায়মনোবাক্যে তোমার পায় আমার ভক্তি থাকে তবে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হইবে। আমি সেই আশায় প্রাণ রাখিব।'

ভ্রমর-চরিত্রে বঙ্কিম একটিমাত্র দোষ সৃষ্টি করিয়াছেন, ভ্রমর বড় অভিমানী। অভিমান সতীর স্বাভাবিক ধর্ম হইতে পারে, অধৈর্য নহে; আর যেরূপ অভিমান সতীর স্বাভাবিক ধর্ম, তাহার উপযুক্ত প্রকাশ-স্থল এ নহে; যখন সতীর সতীধর্মে বা সতীত্ব-গৌরবে আঘাত আশঙ্কা হয়, তখনই অভিমান প্রদর্শনের যোগ্যস্থল। ভ্রমরের অভিমান যেভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে উহা খুবই স্বাভাবিক হইলেও অনুচিত সন্দেহ নাই। অনুচিত বলিয়া সে স্বয়ং তজ্জন্য পরে অনুতাপও করিয়াছে। ভ্রমর স্বামীকে এত বিশ্বাস করিত, আর তাহার মুখ হইতে একটা কৈফিয়ৎ শুনিবার অপেক্ষা করিল না! ধৈর্য সব সময়ে রাখা কঠিন বলিয়া অধৈর্য নিন্দনীয় নহে, তাহা কে বলিবে? তাই ভ্রমরের তাদৃশ উৎকট উগ্র অভিমান অনুচিত মনে করি।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদিগণ আমাকে ক্ষমা করিবেন। স্ত্রীপুরুষ-সাম্যবাদিগণও অসহিষ্ণু হইবেন না, আমি গোবিন্দলালের আচরণ সমর্থন করিতেছি না। কিন্তু ভ্রমরের অবিমৃষ্যকারিতা না থাকিলে, হয়ত তাহাকে এত বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইত না। কেননা গোবিন্দলাল তখনও চিত্তসংযম একেবারে হারান নাই। ভ্রমর আদর্শ-রমণী কিনা সে সম্বন্ধে বহু তর্ক, বাদ, বিতণ্ডা হইয়াছে। যে সকল পাঠক 'হাসির গানে'র কবির ন্যায় চাহেন—

স্ত্রী হয় রূপে গুণে অগ্রগণ্যা
অথচ সাত চড় মার্‌লেও কথা কয় না।

তাঁহারা অবশ্যই বহু পূর্বেই বুঝিয়াছেন, ভ্রমরকে আদর্শ-রমণী প্রতিপাদন করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি এইমাত্র বলি, আদর্শসৃষ্টি করা বঙ্কিমের উদ্দেশ্য ছিল না। বঙ্কিম idealism দূরে রাখিয়া বিশ্ব-বঙ্গবধূর স্বামিপ্রেম ও অভিমান একত্র সংগৃহীত করিয়া ভ্রমরকে সৃষ্টি করিয়াছেন। শচীশবাবু ভ্রমর-সম্বন্ধে বলিয়াছেন, ভ্রমরের স্বামিভক্তি westernised আমরা তাহা মনে করি না। ভ্রমর বঙ্গবধূ intensified.

সূর্যমুখীকে বিড়ম্বিত করিয়া বঙ্কিম প্রেমে আত্মাদর-বিসর্জনের শিক্ষা দিয়াছেন —সূর্যমুখী সেই শিক্ষার ফলে মেঘমুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় দীপ্তিলাভ করিয়াছেন। নগেন্দ্রনাথে ও গোবিন্দলালে প্রভেদ আছে বলিয়া ভ্রমরের অদৃষ্টে দুঃখের পর সুখ ঘটিল না। নগেন্দ্রনাথের মোহ রূপজ মোহ হইলেও তাহাতে অবৈধতার কলঙ্ক নাই; সূর্যমুখীর গৃহত্যাগে তাহার সে মোহও ভাঙ্গিয়া গেল। গোবিন্দলালের প্রণয় অবৈধ, কলঙ্ক-কালিমাযুক্ত; তারপর যখন তাহার মোহ ভাঙ্গিতেছে, সেই মুহূর্তে তিনি সাময়িক উত্তেজনাবশে স্ত্রীহত্যা করিলেন। তিনি নিজেও বুঝিলেন আর ভ্রমরের সঙ্গে দেখা করা চলে না, আর ভ্রমর যদিও এই সময়ে অভিমান দমিত করিয়া স্বামীর আগমনের প্রতীক্ষায় হরিদ্রাগ্রামে আসিয়া বাস করিতে লাগিল, সেও বুঝিল যে, যেদিন গোবিন্দলালের সঙ্গে তার দেখা হইবে সেদিন তার একটা 'বিপদের দিন!' কিন্তু ভ্রমর হিন্দুবধূ ত বটে, তাই ভাবিল—

> যদি এখানে আসিলে তাঁহার মঙ্গল হয়, তবে দেবতার কাছে আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তিনি আসুন। যদি না আসিলে তাঁহার মঙ্গল হয়, তবে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, আর ইহজন্মে তাঁহার হরিদ্রাগ্রামে না আসা হয়। যাহাতে তিনি নিরাপদ্ থাকেন, ঈশ্বর তাঁহাকে সেই মতি দিন।

কিন্তু গোবিন্দলাল যখন খুনের দায় হইতে মুক্ত হইয়া ভ্রমরের কাছে চিঠিতে সাহায্যভিক্ষা করিলেন, তখন আবার তাহার সমস্ত অভিমান এবং হয়ত স্বামীর কলঙ্কবোধ জাগিয়া উঠিল। তাহার উত্তর বড় কঠোর। তাহার দিন তখন ফুরাইয়া আসিতেছিল—নৈরাশ্য, অভিমান ও স্বামীর কলঙ্কবোধ তাহার জীবন-শক্তিকে ক্ষীণতর করিয়া ফেলিল। অবশেষে শেষদিনে সে অভিমানকে জয় করিয়া যামিনীকে বলিয়াছিল—

আজিকার দিনে—মরিবার দিনে দিদি! যদি একবার দেখিতে পাইতাম!
এক দিনে, দিদি, সাত বৎসরের দুঃখ ভুলিতাম।

সতী দেবতা সাক্ষী করিয়া শপথ করিয়াছিল, তাহা মিথ্যা হইবে কেন? গোবিন্দলালের সঙ্গে তাই তার আবার সাক্ষাৎ হইল। সূর্যমুখী মৃতা সপত্নীর প্রতি চাহিয়া বলিয়াছিলেন, 'ভাগ্যবতি! তোমার মত প্রসন্ন অদৃষ্ট আমার হউক। আমি যেন এইরূপে স্বামীর চরণে মাথা রাখিয়া প্রাণত্যাগ করি।' ভ্রমর মৃত্যুকালে স্বামীর পদরেণু মাথায় লইয়া সকল অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া নিঃশব্দে প্রাণত্যাগ করিল।

ভ্রমর আদর্শবঙ্গনারী হউক বা না হউক, জিজ্ঞাসা করি, তাহার প্রতি কোন্ পাঠকের সহানুভূতি নাই? কোন্ হৃদয়বান্ ব্যক্তি তাহার দুঃখে না অশ্রুপাত করিয়াছেন? উপন্যাসে যতদূর যাথার্থ্য ও স্বাভাবিকতার সমাবেশ সম্ভব বঙ্কিম এই চিত্রে তাহা করিয়াছেন। তাহার পতিভক্তি westernised হইলে তাহার প্রতি এত সহানুভূতি হইত না। তাহার দোষগুণ সকলই বাঙ্গালার গৃহে গৃহে নিত্য দৃশ্যমান; বঙ্কিম সেইগুলি কিঞ্চিৎ বৃহৎ কিঞ্চিৎ উগ্র করিয়া, অথচ উভয়ের মধ্যে পরিমাণসামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, প্রচুর ঐকান্তিকতা বৈশদ্য, শক্তিমত্তা ও অন্তর্দৃষ্টি সহকারে দেখাইতে পারিয়াছেন বলিয়া তাহা এমন চিরন্তন সৌন্দর্যের আধার হইয়াছে—তাই ভ্রমরের সহিত পাঠকের এত সহানুভূতি হয়, তাই মনে হয় সে চরিত্র বুঝি আদর্শ চরিত্র। চরিত্রটি অনুকরণের জন্য আদর্শস্থানীয় নয়; শিল্পরচনারূপে উপভোগ করিবার জন্য ইহা একটি আদর্শ চিত্র বটে।[১]

'কৃষ্ণকান্তের উইল' বঙ্গদর্শনে সমাপ্ত হইবার পরই ঐ পত্রিকায় 'রাজসিংহ' প্রকাশিত হইতে থাকে। বাঙ্গালা ১২৮৮ সনে (ইংরাজি ১৮৮১-৮২) উহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ঐ পুস্তকের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—

> রাজসিংহ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইতে হইতে অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই বন্ধ হইয়াছিল। এক্ষণে অল্প পরিবর্তন করিয়া উহা পুনর্মুদ্রিত করা গেল। এক্ষণে গ্রন্থ সম্পূর্ণ।
>
> এ অবস্থাতে গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত করাতে অনেকেই আমার উপর রাগ করিবেন ······তাঁহাদিগের রাগ না হয়, এমন একটা সহজ উপায় আছে। তাঁহারা গ্রন্থখানি না পড়িলেই হইল।

১। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' দুইবার নিমিত্ত-সূচনা করা হইয়াছে। একবার প্রথম খণ্ড ষোড়শ পরিচ্ছেদে। গোবিন্দলাল জলমগ্ন রোহিণীর নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পাদনার্থ যখন তাহার মুখে ফুৎকার দিলেন সেই সময়ে ভ্রমর এক বিড়াল মারিতে যাইতেছিল, লাঠি বিড়ালকে না লাগিয়া ভ্রমরের কপালে লাগিল। দ্বিতীয় বার দ্বিতীয় খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদে। নিশাকর যখন গোবিন্দলালের প্রসাদপুরের অট্টালিকাপ্রাঙ্গণে প্রথম পা দিলেন, সেই সময়ে 'অকস্মাৎ রোহিণীর তবলা বেসুরা বলিল। ওস্তাদজির তাম্বুরার তাঁর ছিঁড়িল, তাঁর গলায় বিষম লাগিল, গীত বন্ধ হইল, গোবিন্দলালের হাতের নবেল পড়িয়া গেল।'

'রাজসিংহ' প্রথম সংস্করণে অতি ক্ষুদ্রাবয়ব ছিল। বার বৎসর পরে (পুস্তকের চতুর্থ সংস্করণে) বঙ্কিম উহাকে পরিবর্ধিত করিয়া প্রকাশিত করেন। প্রথম সংস্করণে বঙ্কিম টডের 'রাজস্থানে' রূপনগরের রাজকুমারীর বৃত্তান্ত যতটুকু[১] পাইয়াছিলেন, কেবল ততটুকু অবলম্বনেই গল্প রচনা করিয়াছিলেন। তস্বীরে পদাঘাতসংক্রান্ত বৃত্তান্তটুকু অবশ্য ছিল, উহা তাঁহার কল্পনাপ্রসূত। প্রথম সংস্করণে তস্বীর-বিক্রেত্রী বুড়া প্রথমে তাহার পুত্রের নিকট চঞ্চলকুমারীর দুঃসাহস বিষয়ে গল্প করে। পুত্র মহোদয়ের একটি উপপত্নী ছিল, তিনি আবার তাঁর প্রিয়সখীর নিকট গল্প করেন, প্রিয়সখী কিছুদিন পরে বাদশাহের রঙ্গমহলে বাঁদী হন, তিনি অন্য পরিচারিকাগণের নিকট ঐ বৃত্তান্ত বর্ণন করেন, ক্রমে উহা বেগমদিগের ও ঔরঙ্গজেবের কর্ণগোচর হয়। ঔরঙ্গজেব 'যোধপুরেশ্বরকুমারী'র (চতুর্থ সংস্করণে ইহাকে যোধপুরী বেগম বলা হইয়াছে) সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করেন 'রূপনগরের রাজকুমারী দিল্লীর রাজপুরে আসিয়া বাঁদীদিগের তামাকু সাজিবে।' যোধপুরেশ্বর-কুমারী স্বামীর প্রতিজ্ঞা শুনিয়া শিহরিলেন এবং স্বামীকে বলিলেন এক সামান্যা বালিকা কি তাঁহার ক্রোধের যোগ্য? এই বৃত্তান্তগুলি বর্ধিত সংস্করণে কিরূপ পরিবর্তিত হইয়াছে সকল পাঠকই তাহা জানেন। প্রথম সংস্করণে উদিপুরী বেগম নাই জেবউন্নিসা নাই; যোধপুরী বেগমও চঞ্চলকে সাবধান করিবার জন্য স্বীয় পাঞ্জাসহ কোনও দাসী প্রেরণ করেন নাই। মবারক আছে বটে, কিন্তু সে কাহারও পতি বা উপপতি নয়। নির্মল আছে, মাণিকলালও আছে তাহাদের ত্বরিত-বিবাহবৃত্তান্ত আছে কিন্তু উহার ত্বরিততা প্রথম সংস্করণে আখ্যায়িকার সহিত খাপ খায় নাই। প্রথম সংস্করণে অনন্ত মিশ্রও আছেন; মাণিকলাল ও নির্মলের মত ইনি একেবারে বঙ্কিমের কল্পনাপ্রসূত পাত্র নহেন। 'রাজস্থানে' রূপনগর-রাজকুমারীর পত্র তাঁহার কুলপুরোহিত ও গুরুকর্তৃক বাহিত হওয়ার কথা আছে কিন্তু তাঁহার নাম নাই। টড্ বলেন রূপনগর-রাজকুমারীর পত্র রাজসিংহের রাজত্ব বিবরণের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। চঞ্চলকুমারীর পত্রের 'রাজহংসী হইয়া কেমন করিয়া বকসহচরী হইব?……রাজকুমারী হইয়া কি প্রকারে তুরকী বর্বরের আজ্ঞাকারিণী হইব?' এই উক্তি রাজস্থানেও উল্লিখিত আছে—Is the swan to be the mate of the stork : a Rajpootni, pure in blood, to be the wife of the monkeyfaced barbarian ?[২] রাজসিংহ আরাবল্লীপর্বতে গুপ্ত-অভিযান করিয়া বাদশাহের দুই হাজার অশ্বারোহীকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া পরাজিত করেন একথা 'রাজস্থানে' আছে। ঐ ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মাণিকলালের চতুরতা ও চঞ্চলের সাহস ও মবারকের সহিত কথোপ-

---

১। Rajsthan Vol. I. Chap. XIII

২। পাঠক লক্ষ্য করিবেন বঙ্কিম monkeyfaced কথাটির অনুবাদ করেন নাই।

কথন, মবারকের মহত্ত্ব প্রভৃতি বঙ্কিমের কল্পিত। ইহা প্রথম সংস্করণে ও চতুর্থ সংস্করণে তুল্যরূপ।

চতুর্থ সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র উদিপুরীর বৃত্তান্ত অর্মের (Robert Orme) মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাস (Historical Fragments of the Mogul Empire) হইতে গ্রহণ করেন। কিন্তু অর্ম উদিপুরীর লাঞ্ছনার কথা উল্লেখ করে নাই; বরং বলিয়াছেন, উদিপুরী সসম্মানে রাজসিংহের অন্তঃপুরে প্রেরিতা ও আদর-আপ্যায়নে অভ্যর্থিতা হইয়াছিলেন। বঙ্কিম জেবউন্নিসাকে ঐভাবে আদৃতা ও অভ্যর্থিতা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাদশাহ ও রাজসিংহ উভয়ের যুদ্ধপ্রণালী ও সেনাবিভাগ সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছেন অর্মের গ্রন্থেও ঠিক ঐরূপ আছে। ঔরঙ্গজেবের পরাজয় ও অসত্যসন্ধতা সম্বন্ধে অর্মের বৃত্তান্তের উপর বঙ্কিম এক বর্ণও অতিরঞ্জিত করেন নাই। জেবউন্নিসা ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে রাজপুতনায় আসিয়াছিলেন বা তাঁহার চরিত্র মন্দ ছিল, ইত্যাদি কথা অর্মে নাই। বার্ণিয়ার রৌশিনারার অসচ্চরিত্রতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, এবং ইহাও বলিয়াছেন, রৌশিনারার অনুগৃহীত দুই ব্যক্তি দুইবার বাদশাহের অন্তঃপুরে ধরা পড়ে। জেবউন্নিসা-মবারক-সম্পৃক্ত প্রেমকাহিনী ঐরূপ বৃত্তান্ত অবলম্বনেই কল্পিত হইয়াছে। বার্ণিয়ারের গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদক (Archibald Constable) উদিপুরী সম্পর্কে ভুল করিয়াছেন। তিনি উদিপুরীকে উদয়পুরের রাজকুমারী ভাবিয়া বলিয়াছেন, 'উদয়পুরের রাজবংশ যে গর্ব করেন যে, তাঁহারা মুসলমানের সঙ্গে কখনও বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন করেন নাই, সে গর্বের মূল্য কি?' উক্ত অনুবাদক মহোদয় বোধ হয় অর্মের গ্রন্থখানিও দেখেন নাই। অর্ম উদিপুরীকে (Udepurri) the favourite and Circassian wife of Aurangzeb বলিয়াছেন।

[ 'রাজসিংহ' বঙ্কিমের প্রথম ও একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস, একথা বঙ্কিম বলিয়াছেন।] সেই জন্য তাঁহার বর্ণিত ঘটনাবলীর কোন্ কোন্‌গুলি ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা সমর্থনীয় ও কোন্‌গুলি কাল্পনিক তৎসম্বন্ধে তিনি উক্ত গ্রন্থের (চতুর্থ সংস্করণের) বিজ্ঞাপনে আলোচনা করিয়াছেন। হিন্দুগণের বাহুবলের অভাব যে ভারতের অধঃপতনের কারণ নয়, ইহা বঙ্কিমের স্থির বিশ্বাস ছিল। [বঙ্কিম বলিয়াছেন, হিন্দুর বাহুবল প্রতিপাদন করাই 'রাজসিংহ' উপন্যাস রচনায় প্রয়োজন।] সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার হাত পাকা ছিল, তাই অমন একটা সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্য লইয়া লিখিত হইলেও রাজসিংহ (কেবলমাত্র উপন্যাসের হিসাবেও) বাঙ্গালা সাহিত্যে একখানি অতুলনীয় গ্রন্থ হইয়াছে। হিন্দুর বাহুবল ও রণকৌশল প্রতিপাদন করা রাজসিংহের অর্ধভাগের উদ্দেশ্য। প্রথম সংস্করণের 'রাজসিংহ' দ্বারাও তাহা প্রায় সাধিত হইতেছিল, অন্ততঃ [কেবল ঐ এক উদ্দেশ্যের জন্য 'রাজসিংহ' গ্রন্থখানিকে এত বড় না করিলেও চলিত। কিন্তু ঐ ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য ছাড়া রাজসিংহে আর যাহা আছে অর্থাৎ মানব-জীবনের যে সকল বৃহৎ ও কঠিন সমস্যা ইহাতে সমাহিত

হইয়াছে তাহাই বস্তুতঃ এই গ্রন্থের স্থায়ী গৌরব। হীরার আংটিতে যে সোনাটুকু থাকে হীরার সৌন্দর্য-বিকাশে সহায়তা করাই উহার কার্য। 'রাজসিংহে'র ঐতিহাসিক অংশ উহার ঔপন্যাসিক অংশের সৌন্দর্য-প্রতিপাদনে সহায় বলিয়াই উহার মর্যাদা ; নচেৎ উহার মূল্য কত ? বিশ্বাস করি, ঔরঙ্গজেব জার-রাক্ষসের ন্যায় বিপুল বাহিনী লইয়া, গ্রীস-রাষ্ট্রগুলির মতই ক্ষুদ্র ও আপাতদৃষ্টিতে নগণ্য রাজপুত-রাজসঙ্ঘের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া যেরূপ বিড়ম্বিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন ইহা রাজসিংহের—রাজপুত জাতির—হিন্দুর একটি চিরন্তন গৌরবস্থল। ইহাও বিশ্বাস করি, ঔরঙ্গজেবের ঐ লাঞ্ছনায় ও পরাজয়ে রাষ্ট্রনীতি-অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের ভাবিবার যোগ্য অনেক তত্ত্ব আছে। ইহাও বোধ হয় ঠিক যে ইতিহাসের ঐ শিক্ষা হিন্দুর বাহুবল ও রণকৌশলের ঐ গৌরব, সাধারণ ছাত্রপাঠ্য ইতিহাস গ্রন্থ অপেক্ষা 'রাজসিংহে' অনেক বিশদ ও মনোজ্ঞভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা কি অনুমানযোগ্য নয় যে কালক্রমে কোনও ঐতিহাসিক অভিনব গবেষণাবলে সুস্পষ্ট প্রতিপাদিত করিয়া দিবেন যে রূপনগর-রাজকুমারীর চিঠিখানি প্রকৃতপক্ষে রাজপুত-চারণগণের কল্পনামাত্র, উদিপুরীর রাজপুতহস্তে পতন, এমন কি রাজপুতনায় ঔরঙ্গজেবের পরাজয় পর্যন্ত সম্পূর্ণ কাল্পনিক বৃত্তান্ত, অথবা ঐ পরাজয়কথা সত্য হইলেও হিন্দুর বাহুবল বা রণকৌশল উহার কারণ নহে, কিংবা ঐ সকল ঘটনার মূলে অন্য এমন কারণ ছিল যাহা রাজসিংহের বা হিন্দুদিগের পক্ষে বিশেষ শ্লাঘার বিষয় নহে ?[১] তখন 'রাজসিংহের' ঐতিহাসিক অংশের মূল্য কি থাকিবে ? ঐতিহাসিকগণ কি এখনই টডের রাজস্থানকে কাব্যমাত্র বলিতে আরম্ভ করেন নাই ? আর অধিক দূর যাইবার প্রয়োজন কি ? শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকারের 'ঔরঙ্গজীব' নামক ইংরাজী গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে রাজপুতগণের সহিত ঔরঙ্গজেবের যুদ্ধের যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা টড্ বা অর্ম কাহারও প্রদত্ত বিবরণের সঙ্গে মিলে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কোন্ ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক গবেষণা গর্বিতা জেবউন্নিসার অশ্রুধৌত বেদনাকাহিনীর যাথার্থ্যকে অযথা প্রতিপন্ন করিতে পারে ? জিজ্ঞাসা করি, কোন্ তত্ত্ববিচার-পদ্ধতি বীরবালা চঞ্চলকুমারীর বীরানুরাগ ও স্বাজাত্যাভিমান, দস্যু মাণিকলালের কৃতজ্ঞতা রূপমোহার্ত মবারকের শলভবৃত্তিতা, দরিয়ার মর্মভেদিনী জ্বালা, বিক্রম সোলাঙ্কির অভিমান ও বৈষয়িক বিচক্ষণতার অন্তিম পরিণতি, এমন কি ঔরঙ্গজেবের কূটনীতিদগ্ধ হৃদয়েরও স্পষ্টবাদিনী নির্মলের প্রতি পক্ষপাতকে অযথার্থ বলিতে পারে ? ঐতিহাসিক সত্য অপেক্ষা কাব্যের সত্য স্থিরতর, গভীরতর ও ব্যাপকতর ; সেই জন্য বঙ্কিম যাহাই বলুন, 'রাজসিংহে' উপন্যাস দ্বারা ইতিহাসের পরিচর্যা হয় নাই, ইতিহাসকেই উপন্যাসের বা কাব্যের পরিচর্যায় নিয়োগ করা হইয়াছে।

---

১। বস্তুতঃ গ্রন্থকারের কতকগুলি অনুমান ঐতিহাসিকের গবেষণায় সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ প্রকাশিত 'রাজসিংহ' গ্রন্থে যদুনাথ সরকার-লিখিত ভূমিকা।—স.

সিংহে'ও 'চন্দ্রশেখরে'র মত দুইটি স্বতন্ত্র রোমান্সকে সুকৌশলে একসূত্রে করা হইয়াছে। রূপনগরের রাজকুমারীর বীরহস্তে আত্মদানকাহিনী মিবারের ইতিহাসের অঙ্গীভূত হইলেও উহাও রোমান্সের মতই শুনায়[১]। বিলাসিনী জেবউন্নিসার প্রেমকাহিনী রোমান্স বই আর কি? এই দুইটি রোমান্সের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রধান-অপ্রধান যাবতীয় পাত্র-পাত্রীকে বাহ্য (রাজনৈতিক) ঘটনাস্রোতের দ্রুত ঘূর্ণায়মান আবর্তমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া বঙ্কিম প্রত্যেকের মানুষধর্মগুলি অভিব্যক্ত করিয়াছেন। ঘটনার দ্রুততায় ভাবের বিশ্লেষণের প্রতি তাদৃশ মনোযোগ করা হয় নাই।[২] বাহিরের ঘটনার চাপে ভাবের ও চেষ্টার দ্রুততা সম্পাদিত হইয়াছে। কৃষ্ণকান্তের উইলে আমরা ইহার বিপরীত ব্যাপার দেখি। কৃষ্ণকান্তের উইলে ভাবের তীব্রতা প্রধানভাবে প্রতীয়মান আর রাজসিংহে ঘটনার দ্রুততাই প্রধান। শৈবলিনীর ভাবের তীব্রতা যেমন গল্পের মাঝামাঝি হঠাৎ ঘটিয়াছিল, জেবউন্নিসারও তাহাই। তবে জেবউন্নিসায় ঘটনার দ্রুততা দ্বারা ভাব যেমন জমাট হইয়া উঠিয়াছে, শৈবলিনীতে সেরূপ জমাটভাব নাই; আবার শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত শৈবলিনী-চরিত্রকে শেষদিকে যেমন জটিল করিয়াছে জেবউন্নিসায় সে জটিলতা নাই।

শৈবলিনীতে দুর্দমনীয় প্রেমমোহের অবসানে ধীরা শান্তিময়ী কর্তব্যবুদ্ধির বিকাশ, আর জেবউন্নিসায় গর্ব ও বিলাসজনিত মোহের অবসানে প্রেমের বিকাশ। মোহাবসানে শৈবলিনী প্রতাপকে বলিতেছে, "যতদিন তুমি এ পৃথিবীতে থাকিবে আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করিও না। স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার, কত দিন বশে থাকিবে জানি না।[৩] এজন্যে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না।" আর

১। টডও বলিয়াছেন The haughty Rajpootni...justified by brilliant precedents in the *romantic* history of her nation, entrusted her cause to the arm of the chief of the Rajpoot race, offering herself as the reward of the proetction.

২। ১৩০০ সনের সাধনা পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ 'রাজসিংহে'র এক অতি উজ্জ্বল সমালোচনা করিয়াছিলেন। ঐ প্রবন্ধটি পরে তাঁহার 'আধুনিক সাহিত্য' নামক গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। উহাতে রবীন্দ্রনাথ রাজসিংহের কেবল ঘটনাবলীর দ্রুততাই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি বলেন "রাজসিংহ প্রথম পড়িতে পড়িতে মনে হয় সহসা এই উপন্যাস-জগৎ হইতে মাধ্যাকর্ষণশক্তির প্রভাব যেন অনেকটা হ্রাস হইয়া গিয়াছে। আমাদিগকে যেখানে কষ্টে চলিতে হয় এই উপন্যাসের লোকেরা সেখানে লাফাইয়া চলিতে পারে। সংসারে আমরা চিন্তা-শঙ্কা-সংশয়ভারে ভারাক্রান্ত, কার্যক্ষেত্রে সর্বদাই দ্বিধাপরায়ণ মনের বোঝাটা বহিয়া বেড়াইতে হয়, কিন্তু রাজসিংহ-জগতে অধিকাংশ লোকের যেন আপনার ভার নাই।' এই ভার না থাকিবার কারণ কি তাহাও রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু 'রাজসিংহকে' স্বতন্ত্রভাবে না দেখিয়া বঙ্কিমের অন্য উপন্যাসের সহিত উহার তুলনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় আরও ভাল হইত।

৩। কেবল স্ত্রীলোকের চিত্তই অসার নয়; পুরুষের চিত্তও কম অসার নহে। দরিয়া তাহা জানিত। মবারকের চিত্ত অসার না হইলে তার এত দুর্দশা কেন?

মোহাবসানে শাহজাদী ভাবিতেছে, "মানুষী কালভুজঙ্গী কিঙ্করিণী, কালভুজঙ্গীর দংশনে মরিবে না? হায় মবারক! মবারক। তুমি একবার সশরীরে দেখা দিয়া কালভুজঙ্গী দিয়া আমায় একবার দংশন করাও, আমি মরি কি না দেখি।" কালভুজঙ্গীর প্রয়োজন হইল না, আর্তির দুরন্ত দাহনে শাহজাদী ভস্ম হইয়া গেল—তারপর যে রহিল সে বিশুদ্ধা প্রেমিকা।

মবারকের মৃত্যুর পর বঙ্কিম একবারমাত্র জেবউন্নিসার মূর্তি দেখাইয়াছেন, অবশ্য কেবল মূর্তি দেখান মাত্র, কেননা এ আখ্যায়িকায় তখন তাহার জীবন-সমস্যার শেষ সমাধান হইয়া গিয়াছে। এই দৃশ্যে সে কন্দর্পবিরহিতা রতির মত—

বসুধালিঙ্গনধূসরস্তনী
বিললাপ বিকীর্ণমূর্ধজা।

তাহার এই শেষ বিরহবেদনা কত তীব্র তাহা সহানুভূতিমাত্রগম্য। একবার 'হয় সাপ, না হয় মবারক' এইরূপ আকুল সান্তাপ আকাঙ্ক্ষা দ্বারা সে দেবগণকে সন্তুষ্ট করিয়া যেন কতকটা লেওডামায়ার মত ক্ষণিক প্রিয়সঙ্গ লাভ করিয়াছিল। মবারকের দ্বিতীয়বার মৃত্যুর পরে কি দেবতাদের সহানুভূতির উৎস একেবারেই শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল? এবার কি মবারক প্রোটিসিলেয়াসের মত অন্ততঃ তিন ঘণ্টা কালের জন্য দেখা দিয়া জেবউন্নিসাকে এই শিক্ষা দিয়া যাইতে পারেন নাই—

Be taught, O faithful consort, to control
Rebellious passion ; for the gods approve
The depth, and not the tumult of the soul,
A fervent, not ungovernable, love.

রাজসিংহ উপন্যাসে ঔরঙ্গজেবের স্থান ভাবিবার যোগ্য। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, রাজসিংহের ঐতিহাসিক অংশের নায়ক ঔরঙ্গজেব, রাজসিংহ এবং বিধাতাপুরুষ—উপন্যাস অংশের নায়ক আছে কি না জানি না, নায়িকা জেবউন্নিসা। বিধাতাপুরুষকে বোধ হয় গণনার বাহিরে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে, কেননা যদিও ইহাতে ভবিতব্যতার দোহাই একাধিক বার আছে, তথাপি এই উপন্যাসের ঘটনাচক্র যে বিধাতাই ঘুরাইতেছেন তাহা (কপালকুণ্ডলার ন্যায়) তেমন স্পষ্ট বুঝা যায় না। অবশ্য ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির চক্ষে বিধাতার কর্তৃত্ব সর্বত্রই আছে।

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া॥[১]

ঐতিহাসিক ঘটনাচক্র—যাহাকে রবীন্দ্রনাথ 'ঘন বর্ষার কালরাত্রে পশ্চাৎ হইতে মৃত্যুর আকস্মিক দোলা' বলিয়াছেন—তাহার গতি কি বিধাতা ভিন্ন আর কাহারও ইচ্ছায় নিয়মিত হয়? কিন্তু 'রাজসিংহ' ত ইতিহাস নয়—তথাকথিত ঐতিহাসিক

১। 'গীতা' অষ্টাদশ অধ্যায় ৬১ শ্লোক।

অংশও নয়—কাব্য ;[১] ইহার বিচারকালে দেখিতে হইবে বিধাতার কর্তৃত্ব প্রতিপাদন করা লেখকের অভিপ্রায় কি না—কিংবা ঐরূপ কর্তৃত্ব উহা দ্বারা যথার্থই প্রতিপাদিত হইতেছে কি না। রাজসিংহে তাহা হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। ঔরঙ্গজেবই নিজ কূটনীতি ও দুষ্ট অভিসন্ধি বশতঃ ইহার ঘটনাচক্র চালাইয়া দিয়াছেন, এবং যদিও উহার আবর্তনে তিনি নিজেও কিঞ্চিৎ বিড়ম্বিত হইয়াছেন, তথাপি তাঁহাকে অদৃষ্টের হাতের অবশ ক্রীড়াপুত্তলিকা বলা চলে না; আবার তিনি ঘটনাচক্রের চালক হইলেও তাঁহাকে গ্রন্থের অন্তর্গত দুই রোমান্সের কোনটিরই যথার্থ নায়ক বলাও সমীচীন বোধ হয় না। প্রথম রোমান্সে নায়ক রাজসিংহ ও নায়িকা চঞ্চলকুমারী। দ্বিতীয় রোমান্সে নায়ক কেহ নাই, নায়িকা জেবউন্নিসা। প্রথমটাতে ঔরঙ্গজেব নায়কের প্রতিদ্বন্দ্বী কিন্তু প্রতিনায়ক নহেন, নায়িকার প্রতি তাঁহার লোলুপ দৃষ্টি নাই; তিনি নায়িকার গর্ব খর্ব করিবার জন্য ব্যগ্র ও তাহাতে অসফলকাম। তিনি নায়ক-নায়িকা উভয়ের শত্রু—পরাজিত, লাঞ্ছিত, বিপর্যস্ত; তিনি কাহারও সহানুভূতি উদ্রেক করেন না। দ্বিতীয় রোমান্সে তিনি নায়িকার পিতা ও তাহার প্রেমপাত্রের শত্রু। (প্রথমে তিনি খণ্ডিতা জেবউন্নিসার ঈর্ষাপ্রসূত প্ররোচনায় 'কুকুর মারিলেন কিন্তু হাঁড়ি ফেলিলেন না'। তার পর যখন সেই মরা কুকুর বাঁচিয়া আসিয়া জামাতৃরূপে তাঁহার অন্তঃপুরে বাসরশয্যা পাতিল, তখন তিনি নিজের আহত বাদশাহী মর্যাদার প্ররোচনায় কৌশলে তাঁহাকে জগতীতল হইতে বিলুপ্ত করিয়া দিলেন। কন্যার অনুচিত প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী হইলে পিতাকে সব সময়ে দোষ দেওয়া যায় না বটে[২], কিন্তু মবারকের প্রতি ঔরঙ্গজেবের আচরণে সমর্থনযোগ্য কোনও ধর্ম নাই)

১। [যদি রাজসিংহের ঐতিহাসিকতার প্রতি কেহ জোর দিতে চান, তবে এইমাত্র বলিব যে, ইতিহাস আর ঐতিহাসিক উপন্যাস বা ঐতিহাসিক কাব্য এক বস্তু নহে।] শেষোক্ত স্থলদ্বয়ে ইতিহাসের ধর্ম গৌণতাপ্রাপ্ত।

২। কাব্য ও রোমান্সপ্রিয় যুবক হয়ত এইখানে বর্তমান গ্রন্থকারকে টেনিসনের এই বিখ্যাত কয়েক পংক্তি স্মরণ করাইয়া দিবেন—

Cursed be the social want that sin
against the strength of youth !
Cursed be the social lies that warp
us from the living truth !
Cursed be the sickly forms that err
from honest Nature's rule !
Cursed be the gold that gilds
the straiten'd forehead of the fool !

*'Locksley Hall'*

## ত্র য়ো দ শ   প রি চ্ছে দ

# আনন্দমঠ

স্বদেশপ্রীতি বা দেশাত্মবোধ বলিতে যাহা বুঝায় ঐ ভাবটি আমাদের দেশে খুব প্রাচীন নহে; উহা আমরা ইংরাজীশিক্ষার শুভফলস্বরূপে পাশ্চাত্যদেশ হইতে লাভ করিয়াছি। 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' এই উক্তিটি খুব প্রাচীন হইলেও, উহাকে দেশাত্মবোধের নিদর্শন বলা যায় না; পাশ্চাত্য সাহিত্য-ইতিহাস প্রভৃতি পাঠ করিয়া বাঙ্গালী যখন পলিটিকাল পেট্রিয়টিজম শিক্ষা করিল তখন ঐ রচনাটি কিঞ্চিৎ ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হইয়া ঐ ভাবের দৃঢ়ীকরণ ও দেশ-মধ্যে বিস্তারের সহায় হইয়াছিল। দেশাত্মবোধ ভাবটিই যে কেবল পাশ্চাত্য তাহা নহে; ঐ ভাব-প্রকাশক ভাষায়ও পাশ্চাত্যপ্রভাব সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। ইংরাজীতে স্বদেশকে motherland বা mother country বলে, আমরাও ঐ দৃষ্টান্তবলে স্বদেশকে 'মাতৃভূমি' বলি। ইংরাজীতে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশবাচক নামগুলিও সব স্ত্রীলিঙ্গ। সেই দৃষ্টান্তে বঙ্গ, ভারত প্রভৃতি শব্দ মূলতঃ স্ত্রীলিঙ্গ না হইলেও 'বঙ্গজননী' 'ভারতমাতা' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিতে মনে কোনরূপ দ্বিধা বোধ করি না; এমন কি, 'জননী ভারতবর্ষ' পর্যন্ত চলিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে।[১] সংস্কৃতে বসুন্ধরাকে বহুস্থলে জননী সম্বোধন করা হইয়াছে বলিয়া স্বদেশকে মাতৃরূপে কল্পনা ও বর্ণনা হিন্দুর কাছে অস্বাভাবিক বোধ হয় না। যাহা কিছু আপত্তি তাহা অবশ্য ব্যাকরণমূলক। সে যাহা হউক, স্বদেশের প্রতি প্রীতি একটি সর্বজনীন ভাব হইলেও প্রাচীন যুগে পাশ্চাত্য আদর্শের স্বদেশপ্রীতি বা দেশাত্মবোধ এদেশে নানা কারণেই পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে নাই। ইংরেজ-রাজত্বে ইংরাজী-শিক্ষার ফলে ঐ ভাবটির উৎপত্তি হইলে উহার সর্বজনীন ধর্মপ্রভাবেই উহা অত্যল্প কালমধ্যে দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল শ্রেণীতে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। এই সময়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ পাশ্চাত্য দেশসমূহের সহিত যতই স্বদেশের তুলনা করিতে লাগিলেন, ততই তাহার দুরবস্থার কথা ভাবিয়া ব্যথিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা কবি ছিলেন, তাঁহারা কাব্যে ও সঙ্গীতে অনল্পমাত্রায় করুণরসের ছড়াছড়ি করিতে লাগিলেন—কেহ কেহ আবার রাজস্থান প্রভৃতি পাঠ করিয়া রাজপুতগণের স্বাধীনতাপ্রিয়তা ও মুসলমানবিদ্বেষ প্রভৃতিকে জাতীয়ভাবরূপে

---

১। ভারতবর্ষ শব্দটি সংস্কৃতে ক্লীবলিঙ্গ। জননী ভারতভূমি বলিলে সংস্কৃতে দোষ হয় না। কেননা ভূমি শব্দ ও ভূমিবাচক সকল শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। কিন্তু সংস্কৃতে দেশবাচক নাম স্ত্রীলিঙ্গে অল্পই আছে। 'দেশ' শব্দটি পুংলিঙ্গ সুতরাং 'সুজলা সুফলা বঙ্গদেশ' প্রভৃতি প্রয়োগ ব্যাকারণদুষ্ট। 'ক্ষীণা দুর্বলা বঙ্গ' 'গৌরবমণ্ডিতা ভারত' প্রভৃতিও তাহাই। কিন্তু স্কুল কলেজের ছাত্রগণ এবং অনেক গ্রন্থলেখকও বাঙ্গালা লিখিতে মনে মনে ইংরাজীর তরজমা করিয়া যান বলিয়া অনেক সময়ে ঐরূপ প্রয়োগের দুষ্টতা লক্ষ্য করেন না।

গ্রহণপূর্বক তদবলম্বনে প্রচুর বীররসপূর্ণ কাব্য লিখিতে লাগিলেন। এই সকল কবি স্বদেশ বলিতে সমগ্র ভারতবর্ষকেই বুঝিতেন। এই যুগের জাতীয়-কাব্য বা জাতীয়-সঙ্গীতগুলিতে প্রাদেশিকী প্রীতির ভাব বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। তখনকার 'জাতীয়' কবিরা ভারতের কথাই বলিতেন, ভারতের দুঃখে অশ্রুপাত করিতেন, ভারতের জয়গান করিতেন, ভারতের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য অমিত উৎসাহ প্রদর্শন করিতেন। তাঁহাদের নবসঞ্জাত স্বদেশ-প্রীতি প্রাদেশিক জাতীয়ভাবকে বড় একটা আমল দিতে চাহিত না—উহাকে বোধ হয় বড় ক্ষুদ্র, বড় তুচ্ছ জ্ঞান করিত, তাঁহারা গাহিতেন—

কত কাল পরে বল ভারত রে
দুখসাগর সাঁতারি পার হবে ;

অথবা

মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি
রাত্রি দিবা ঝরিছে লোচন বারি ;

অথবা

দিনের দিন সবে দীন ভারত হয়ে পরাধীন
অন্নাভাবে শীর্ণ চিন্তাজ্বরে জীর্ণ
অনশনে তনু ক্ষীণ ;

অথবা

প্রাণ কাঁদে বলিতে ভারতের বিবরণ
ভূমণ্ডলে নাহি মেলে দ্বিতীয় আর এমন ;

অথবা

নীরব ভারতে কেন ভারতীর বীণা
সোণার প্রতিমা আজি শোকেতে মলিনা ;

অথবা

হবে কি ভারতে পুনঃ এমন সুদিন
ভারতসন্তান কি রে হইবে স্বাধীন ?

অথবা

মিলে সবে ভারত সন্তান
একতান মন প্রাণ
গাও ভারতের যশোগান ;

অথবা

বাজ রে শিঙ্গা বাজ এই রবে
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয় ;

অথবা

ভারতীয় আর্যনাম এখনো ধরায় ?
আর্যের শোণিত আজো আছে কি শিরায় ?

এইরূপ আরও বহু গান এবং কবিতা উদ্ধৃত করা যাইত। এইগুলিই বাঙ্গালার প্রাচীনতম জাতীয়-সঙ্গীত। পাঠক লক্ষ্য করিবেন এগুলির কুত্রাপি বাঙ্গালার কথা নাই। সর্বত্রই কেবল ভারতের কথা। অথচ মনে রাখিতে হইবে যে তখন পর্যন্ত সমগ্র ভারতের মধ্যে রাজনৈতিক ভাবের আদান-প্রদান বিশেষভাবে আরম্ভ হয় নাই।[১] জিজ্ঞাস্য হইতে পারে এমন অবস্থায় এমনটা কি করিয়া হইল ?

---

১। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়। উহার উৎপত্তির ইতিহাস এইরূপ ; ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে ভারতবন্ধু এ. ও. হিউম মহোদয়ের মনে হয় যে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যে সকল দেশীয় প্রধান ব্যক্তিগণ রাজনীতি-চর্চা করেন, তাঁহারা বৎসরে একবার মিলিত হইয়া সামাজিক নানাপ্রসঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যেও বন্ধুতা জন্মিতে পারে এবং দেশের পক্ষেও ঐরূপ আলোচনা দ্বারা ( সামাজিক ) মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। এইরূপ সম্মিলনে রাজনীতি আলোচিত হয়, ইহা হিউম মহোদয়ের কল্পনামধ্যে ছিল না, কেননা বিভিন্ন প্রদেশে সরকারের অনুমত ও আদৃত যে সকল রাজনৈতিক সমিতি ( ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতি ) ছিল, উহাতে তাহাদের প্রয়োজনীয়তা ও গৌরব ক্ষুণ্ণ হইতে পারে বলিয়া তিনি আশঙ্কা করিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে রাজনীতি-চর্চাকারিগণের ঐরূপ সামাজিক সম্মিলনে প্রাদেশিক শাসনকর্তা সভাপতিত্ব করিবেন, তাহাতে রাজপুরুষগণের সহিত তাঁহাদের সৌহৃদ্য বর্ধিত হইবে। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে লর্ড ডফরিণ ভারতের রাজপ্রতিনিধি হইলে, হিউম তাঁহার সহিত উক্তবিষয়ে আলাপ করেন। ডফরিণ সামাজিক সম্মিলনের উপকারিতাসম্বন্ধে সন্দিহান হয়েন। তিনি বলেন বিলাতের পার্লামেণ্টে একদল আছেন যাঁহারা মন্ত্রিসভার কার্যাবলীতে ত্রুটি দেখিলে তাহা প্রদর্শন করেন এবং তৎসম্বন্ধে আন্দোলন আলোচনা ইত্যাদি করেন। এদেশে রাজপুরুষগণের কার্যাবলীর আলোচনা রীতিমত ভাবে হয় না। কেননা যদিও সংবাদপত্রসমূহ ঐরূপ আলোচনা করে বটে, তথাপি তাহাদের মত যে কতদূর জনসাধারণের অনুমত, রাজপুরুষগণের পক্ষে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। কাজেই দেশের বিভিন্ন প্রদেশের রাজনীতি-চর্চাকারিগণ বৎসরে একবার মিলিত হইয়া গবর্ণমেণ্টের কার্যাবলী ও শাসননীতির আলোচনা করিলে রাজপুরুষগণ বুঝিতে পারেন, তাঁহাদের কার্য-সম্বন্ধে দেশের লোকের যথার্থ মত কি। লর্ড ডফরিণ আরও বলেন, এরূপ সম্মিলনে প্রাদেশিক শাসনকর্তার উপস্থিতি বাঞ্ছনীয় নহে ; কেননা তাঁহার সমক্ষে দেশীয় নেতৃগণ সকল কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত না করিতেও পারেন। হিউম লর্ড ডফরিণের মতের যুক্তিযুক্ততা অনুভব করিয়া তাঁহার নিজ মত ও রাজপ্রতিনিধি বাহাদুরের মত কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানের নেতৃগণের নিকট স্পষ্টভাবে জ্ঞাপন করিলে দেশীয় নেতৃগণ লর্ড ডফরিণের মতই গ্রহণ করিয়া বার্ষিক সম্মিলনের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সম্মিলনের নামই ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। এই সময় হইতেই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে রাজনৈতিক মতাবলীর আদানপ্রদান যথার্থভাবে আরম্ভ হয়। ইহার কয়েক বৎসর পূর্বে ভারতসচিব লর্ড সলস্‌বেরি সিবিল সার্বিশ পরীক্ষার উচ্চতম বয়স ২১ হইতে কমাইয়া ১৯ নির্ধারণ করেন ; তৎসম্বন্ধে কলিকাতার ইণ্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েশন ভারতব্যাপী আন্দোলন উপস্থিত করিবার জন্ত শ্রীযুক্তসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে উত্তর ভারত ও মাদ্রাজে প্রেরণ করেন। অনেকেরই ধারণা এই যে, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের ঐ কার্যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্থাপনের পথ কতকটা প্রস্তুত হইয়াছিল।

তীর্থস্থানগুলির মাহাত্ম্যে বহুপ্রাচীন কাল হইতেই ভারতের বিভিন্নপ্রদেশের মধ্যে তীর্থযাত্রীগণের যাতায়াত ছিল এবং সংস্কৃত সাহিত্য ও পুরাণ প্রভৃতি সমগ্র ভারতের হিন্দুসমাজের মধ্যে একটা ভাবগত একতা ও আন্তর্জাতিক সহানুভূতির ভাব চিরকাল জাগাইয়া রাখিয়াছিল। ইংরেজরাজত্বে সমগ্র ভারত একই রাজশক্তির অধীন হওয়ায় ঐরূপ ঐক্যবোধ ও সহানুভূতির ভাব হইতেই ভারতব্যাপী দেশাত্মবোধের উদ্ভব হইয়াছিল।

দেশের তদানীন্তন অবস্থায় বাঙ্গালা সাহিত্যে দেশের জন্য খেদ, আক্ষেপ, অশ্রুপাত যতটা স্বাভাবিক মনে হইতে পারে, উৎসাহ, উল্লম্ফন, স্বাধীনতা-পুনঃপ্রাপ্তির স্বপ্ন হয়ত ততটা নয়। আর স্বাভাবিক হইলেও উহা নিরাপদ ত কখনই ছিল না। কিন্তু কবির কল্পনা কোনও কালেই কোনও বাধা মানিয়া চলিতে চায় না। গুরুতর বাধার মধ্যেও একটা না একটা পথ করিয়া লয়। এই সময়ে মধ্য-য়ুরোপে বিসমার্ক-প্রভৃতির চেষ্টায় জাতিগঠন ক্রিয়া বড দ্রুত ও বড় তীব্র ভাবে চলিতেছিল; এবং ফ্রাঙ্কোপ্রাসিয়ান যুদ্ধের (১৮৭০—৭১ খ্রীস্টাব্দ) পর সমগ্র য়ুরোপে 'সাজ, সাজ, অস্ত্র সংগ্রহ কর, সৈনিকদিগকে শিক্ষা দেও, রণতরী সজ্জিত কর' এইরূপ একটা রব পড়িয়া গিয়াছিল। বাঙ্গালী কবিগণের মধ্যে অনেকে ঐরূপ বিদেশীয় উত্তেজনায় সংক্রামিত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু রাজশক্তি যেখানে বিদেশীয়, সেখানে ঐরূপ উত্তেজনার বাহ্য প্রকাশে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। তাই এদেশীয় জাতীয় কবিগণ হিন্দু-মুসলমানের অতীত দ্বন্দ্বের ইতিহাস হইতে তাহাদের কাব্যের বস্তু—প্লট বা situation—আহরণ করিয়া তাঁহাদের নব জাগরিত দেশাত্মবোধ ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। অধিক উদাহরণের প্রয়োজন নাই। সকলেই জানেন, হেমচন্দ্রের 'বাজ রে শিঙ্গা বাজ এই রবে' এই গুরুতর উত্তেজনাপূর্ণ কবিতা বা গানটিও ঐরূপে একটা কৃত্রিম situationএর ভূমিকা মাথায় লইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল।

ফলকথা এই, কবিগণ সমাজের নবোদ্বুদ্ধ রাষ্ট্রীয় চৈতন্যকে একটা ধরিবার ছুঁইবার যোগ্য আকার দান করিয়া দেশমধ্যে একটা জাতীয় ভাবের বন্যা বহাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কবির কল্পনা অশরীরী হইলেও শক্তিহীন নহে। তাই তাঁহাদের কল্পিত situationগুলি কৃত্রিম হইলেও তাহাদের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। সুদূর পল্লীগ্রামের শান্তশীতল বকুল ছায়ায় বসিয়া বৃদ্ধগণ বাদলের কীর্তিকাহিনী স্মরণ করিয়া পুলকিত হইতেন; হয়ত কেহ কেহ সেই ঐতিহাসিক অভিমন্যুর জন্য দুই চারি ফোঁটা চক্ষের জলও ফেলিতেন। বয়ঃসুলভ উৎসাহসহকারে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ক্রীড়ার মাঠে 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে?' প্রভৃতি আবৃত্তি করিত। এমন কি নব স্ত্রীশিক্ষার সুফলাপ্রাপ্তা কিশোরী ও যুবতীগণ পর্যন্ত পদ্মিনী বা প্রমীলার ন্যায় বীরনারী সাজিবার যোগ্যতা মনে মনে অনুভব করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিতেন।

শিথিলকচ্ছ বাঙ্গালী মনে মনে রাজপুত সাজিত, কুসুমপেলবা বাঙ্গালিনীরা কল্পনায় রণরঙ্গিণীলীলা অভিনয় করিতেন। দেশের প্রকৃত ইতিহাস ছিল না। বাঙ্গালী বাঙ্গালিনীর প্রাচীন কীর্তিকাহিনী অতি অল্প লোকেই জানিত; উদয়াদিত্যের নাম লোকে জানিত না বলিয়াই বাদলকে জাতীয় বালকবীর করিয়া লইয়াছিল। বাঙ্গালিনীরাও যে চিরকালই ভয়শীলা ও আধুনিক কালের ন্যায় শিথিলবসনা ও গৃহপিঞ্জরে একান্ত আবদ্ধা ছিল না, পরন্তু এককালে দক্ষিণী ধরনের কাপড় পড়িত, এবং নির্ভয়ে ডাকাতের সম্মুখীন হইত; এমন কি অধ্যাপনা, পরগণা-শাসন, ডাকাতি পর্যন্ত করিত ইহা জানা ছিল না বলিয়া, বীরনারীর দৃষ্টান্তের জন্য এই যুগের বাঙ্গালীরা রাজপুতনার দিকে চাহিয়া থাকিত। বস্তুতঃ প্রাদেশিক ইতিহাসে অজ্ঞতাহেতুই দেশের প্রথম রাজনৈতিক কবিগণ অত বড় ভারতবর্ষটাকেই স্বদেশভক্তির প্রথম আলম্বন করিয়াছিল।

এই গেল কবিগণের কথা। কবিব্যতীত এই সময়ে একদল রাজনীতি-চর্চাকারীরাও আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহারা দেখিয়াছিলেন, স্বাধীনতার স্বপ্ন চিরকাল স্বপ্ন থাকিতেই বাধ্য, ইংরেজরাজত্ব এদেশে লুপ্ত হইবার বিশেষ কোনও সম্ভাবনা দেখা যায় না—ইংরেজ না হইলে দেশে শান্তিও থাকে না, অরাজকতায় দেশ উৎসন্ন হয়, বর্গী, ঠগ, পিণ্ডারী, চোর, ডাকাত, ছেলেধরা মাথা তোলে। ইহারা ইংরেজের মুখ হইতে যে সকল সাম্যতত্ত্ব, উন্নত রাজনীতি, পরধর্ম ও পরকীয় আচারের প্রতি শ্রদ্ধার কথা শুনিয়াছিলেন, এমন কথা অন্যত্র শুনেন নাই। বার্ক, ব্রাড্‌ল, (এবং কিছুকাল পরে) ব্রাইট্‌কে ইহারা দেবতার অধিক জ্ঞান করিতেন। কবিগণ নিজ প্রাণের কথা ভীমসিংহ, বাদল বা পৃথ্বীরাজের মুখে বসাইতেন, ইহারা বার্ক, ব্রাড্‌ল বা ব্রাইটের মুখ হইতে শ্রুত কথা নিজেদের প্রাণে প্রাণে গাঁথিয়া লইলেন; তাঁহাদের প্রকাশিত মতাবলী উদ্ধৃত করিয়া নিজেদের অভাব-অভিযোগ ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। উঁহাদের কল্পনা বড় সুদূরস্পর্শী ছিল না, ভারতের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার শেষ সীমা কি তাহা ইহারা চিন্তাও করিতেন না। সিপাহী বিদ্রোহের অন্তে মহারাণী ভিক্টোরিয়া যে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন, উহার নীতিগুলি যাহাতে কার্যে পরিণত হয়, তদ্বিষয়ে ইংলণ্ডের ও ভারতের রাজপুরুষগণের মনোযোগ আকর্ষণ ইহাদের লক্ষ্য ছিল; তাহার বাহিরে ইহাদের দৃষ্টি চলিত না। বাঙ্গালাদেশে বসিয়া ইংরেজ রাজপ্রতিনিধি সমগ্র ভারতের জন্য বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতেন বলিয়া ইহাদেরও দৃষ্টি প্রথম হইতেই সমগ্র ভারতের প্রতি পতিত হইয়াছিল। অবশ্য ইহারা স্থানীয় অভাব অভিযোগ লইয়াও আন্দোলন, আবেদন-নিবেদন ইত্যাদি করিতেন; কিন্তু সমগ্র ভারতে একটা মিলিত সংহত জাতির সৃষ্টি ইহাদের আকাঙ্ক্ষিত ছিল। মুসলমানের প্রতি ইহাদের বিদ্বেষবোধ বড় একটা ছিল না—কেননা কবিগণের মত কৃত্রিম অবস্থার কল্পনা ইহাদের পক্ষে আবশ্যক ছিল

না। কবিগণের মুসলমানবিদ্বেষটাও বস্তুতঃ পরজাতির প্রভুত্বে অসহিষ্ণুতার আবরণমাত্র ছিল, উহা আন্তরিক ছিল না। তবে ইহা সত্য যে এই যুগের কবিগণ ভারতের স্বাধীনতা অর্থে হিন্দুজাতির প্রাধান্যই বুঝিতেন। সে যাহা হউক, মুসলমানেরা তখন ভারতে আর রাজা নহে; বিদেশীয়ও নহে; তাহারাও ভারতবাসী ও ইংরেজের অধীন প্রজা, সুতরাং রাজনৈতিক আন্দোলনকারীগণের তাহাদিগকে বিদ্বেষ করিবার হেতু এবং হিন্দু-মুসলমানে ভেদবোধ করিবার প্রয়োজন ছিল না। বরং ইঁহারা হিন্দু-মুসলমানে একতাই আকাঙ্ক্ষা করিতেন। কবিগণের ন্যায় এই রাজনীতিচর্চাকারিগণ বীররসের কথা না বলিলেও, ভারতের সীমান্তে রুশিয়ার কুঅভিসন্ধি প্রভৃতির কথা শুনিয়া যেমন রাজপুরুষগণ চিন্তিত ও উত্তেজিত হইয়াছিলেন, ইঁহারাও সেইরূপ উত্তেজনা প্রকাশ করিতেন এবং ইংরেজ রাজত্ব রক্ষার জন্য ভারতবাসিগণের প্রাণ দিবার ব্যগ্রতা, তাহাদের সামরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতির কথা খুব বলিতেন। আনন্দমঠ লিখিত হওয়ার সময়ে দেশে যুদ্ধবিগ্রহ যে দিলীপের রাজ্যে তস্করতার ন্যায় জনশ্রুতিতে পর্যবসিত হইয়াছিল তাহা নহে, এক বৎসর পূর্বেই (দ্বিতীয়) আফগান যুদ্ধ হয়। দেশেও বোধ হয় একটা চাঞ্চল্য ছিল; কেননা আফগান যুদ্ধের সমকালেই লর্ড লিটন দেশে বিদ্রোহের বা অশান্তির আশঙ্কায় দেশীয় ভাষায় প্রচলিত সংবাদপত্র-সমূহের মুখ বন্ধ করিবার জন্য আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এদিকে ভারতের পূর্বসীমান্তে ও ব্রহ্মদেশেও গোলযোগের আশঙ্কা সর্বদাই ছিল এবং কয়েক বৎসর পরে ব্রহ্মদেশে সত্য সত্যই ভারত সরকারের যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে আমরা জাতীয় কবি ও রাজনৈতিক কর্মী উভয় ভাবের সম্মিলন দেখিতে পাই। তিনি কবিত্বের প্রভাবে ইংরেজ-রাজত্বের কল্যাণকরত্ব বিস্মৃত হন নাই, পরন্তু কায়মনোবাক্যে উহার স্থায়িত্ব কামনা করিতেন, আবার সমসাময়িক রাজনৈতিক কর্মীদিগের ন্যায় কবি বঙ্কিম বর্তমানের মধ্যে নিজের দৃষ্টি ও কল্পনাকে আবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই।

ভারতকলঙ্ক প্রবন্ধে বঙ্কিম লিখিয়াছিলেন—

"ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী। ইংরেজ আমাদিগকে নূতন কথা শিখাইতেছে। যাহা আমরা কখনও জানিতাম না, তাহা জানাইতেছে। যাহা কখনও দেখি নাই, শুনি নাই, বুঝি নাই, তাহা দেখাইতেছে, শুনাইতেছে, বুঝাইতেছে; যে পথে কখন চলি নাই সে পথে কেমন করিয়া চলিতে হয় তাহা দেখাইয়া দিতেছে। সেই সকল শিক্ষার মধ্যে অনেক শিক্ষা অমূল্য। যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরেজের চিত্তভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি তাহার মধ্যে দুইটি আমরা এ প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম—স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তা এবং জাতিপ্রতিষ্ঠা। ইহা কাহাকে বলে তাহা হিন্দু জানিত না।" [১]

১। 'বিবিধ প্রবন্ধ' ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

ইহা ছাড়া 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা' প্রবন্ধে ভারতের অতীত রাজনৈতিক অবস্থার সহিত তাহার সমসাময়িক অবস্থার তুলনা করিয়া তিনি দেখাইয়াছিলেন, "আধুনিক ভারতের জাতি-প্রাধান্যের স্থানে প্রাচীন ভারতে বর্ণপ্রাধান্য ছিল। অধিকাংশ লোকের পক্ষে উভয়ই সমান।" ইংরেজশাসিত ভারতে ইংরেজজাতি যে স্থান অধিকার করিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে হিন্দুশাসিত ভারতে ব্রাহ্মণেরা সেই স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। অবশ্য বিদেশীয় জাতিকর্তৃক শাসনের দুই একটি অনিবার্য অসুবিধা বঙ্কিমচন্দ্রের চক্ষে পড়ে নাই, তাহা বলা যায় না। কিন্তু তৎ সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে যে, সুবিধা হইয়াছে তাহাও তিনি বিস্মৃত হন নাই। যাঁহারা ইংরেজদ্বেষী, অথচ বঙ্কিমচন্দ্রকে আপনাদের শিক্ষাগুরু মনে করেন, তাঁহাদের ইহা ভাবিবার বিষয়। বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন—

"তবে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, পরাধীন ভারতবর্ষে উচ্চ-শ্রেণীস্থ লোকে স্বীয় বুদ্ধি, শিক্ষা, বংশ এবং মর্যাদানুসারে প্রাধান্যলাভ করিতে পারেন না।...... প্রাচীন ভারতে বর্ণবৈষম্য গুণে তাহাও ছিল, কিন্তু এ পরিমাণে ছিল না। আর এক্ষণে রাজকার্যাদি সকল ইংরেজের হস্তে—আমরা পরহস্তরক্ষিত বলিয়া নিজে কোন কার্য করিতে পারিতেছি না। তাহাতে আমাদিগের রাজ্যরক্ষা ও রাজ্যপালন বিদ্যা শিক্ষা হইতেছে না—জাতীয় গুণের স্ফূর্তি হইতেছে না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, পরাধীনতা এদিকে উন্নতিরোধক। তেমন আমরা ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানে শিক্ষালাভ করিতেছি। ইউরোপীয় জাতির অধীন না হইলে আমাদিগের কপালে এ সুখ ঘটিত না। অতএব আমাদিগের পরাধীনতায় যেমন এক দিকে ক্ষতি, তেমন আর এক দিকে উন্নতি হইতেছে।

অতএব ইহাই বুঝা যায় যে, আধুনিকাপেক্ষা প্রাচীন ভারতবর্ষে উচ্চ-শ্রেণীর লোকের স্বাধীনতাজনিত কিছু সুখ ছিল, কিন্তু অধিকাংশ লোকের পক্ষে প্রায় দুই তুল্য, বরং আধুনিক ভারতবর্ষ ভাল।"

ইংরেজজাতি ও ইংরেজ শাসনের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র কি ভাব পোষণ করিতেন, তৎসম্বন্ধে পূর্বেও কিছু উল্লিখিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র এখন বাঁচিয়া থাকিলে দেখিতেন, ইংরেজ-শাসনের ক্রমবিস্তারশীল উন্নতিধারায় ভারতবাসী এখন রাজ্যরক্ষা ও রাজ্যপালন-বিদ্যাও শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে যাহা হউক, বঙ্কিমচন্দ্রের উল্লিখিত মতগুলিতে কবি অপেক্ষা তদানীন্তন রাজনৈতিক নেতৃগণের সহিতই অধিক সাদৃশ্য অনুভূত হইবে। কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃগণ যেমন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রের বাহিরে আপনাদিগের পর্দানশিন কল্পনাকে যাইতে দিতে সঙ্কুচিত হইতেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহা করেন নাই, তিনি পর্দা ভেদ করিয়া দূর হইতে প্রভাত-রবিকরোদ্ভাসিত কাঞ্চনজঙ্ঘার ভাস্বর মূর্তির ন্যায় স্বদেশের ভাবী গৌরব প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রে আমরা কবি ও কর্মী উভয় ভাবের সম্মিলন দেখিলেও

কবি ও কর্মী উভয় হইতে তাঁহাকে সমসাময়িক সমাজের পূর্ণতর ও যথার্থতর প্রতিনিধি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

'বন্দে মাতরম্' গানে ও কমলাকান্তের ধ্যানে বঙ্কিমের কবিপ্রতিভার বা রাজনৈতিক ঋষিত্বের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। 'বন্দে মাতরম্' গান সকলেরই বিদিত; কমলাকান্তের ধ্যানের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইতেছে—

"কোথা মা? কই আমার মা? কোথায় কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমি! এ ঘোর কালসমুদ্রে কোথায় তুমি? সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল —দিঙ্‌মণ্ডলে প্রভাতারুণোদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল—স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল; সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে দূরপ্রান্তে দেখিলাম— সুবর্ণমণ্ডিতা এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা! জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। এই কি মা? হাঁ, এই মা। চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি, এই মৃণ্ময়ী মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্নভূষিতা—এক্ষণে কাল-গর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভুজ—দশ দিকে প্রসারিত; তাহাতে নানা আয়ুধ-রূপে নানাশক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু বিমর্দিত—পদাশ্রিত বীরজনকেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত। এ মূর্তি কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—এখন দেখিব না—আজি দেখিব না—কাল দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব— দিগ্‌ভুজা, নানাপ্রহারিণী শত্রু-মর্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্য-রূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্তিময়ী। সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোতোমধ্যে দেখিলাম এই সুবর্ণময়ী প্রতিমা।"

'বন্দে মাতরম্' গানটি আনন্দমঠে প্রথম প্রকাশিত হইলেও আনন্দমঠ-রচনার কয়েক বৎসর পূর্বেই রচিত হইয়াছিল। কমলাকান্তের মাতৃমূর্তিদর্শনও সত্যানন্দ ঠাকুরের মঠে মাতৃমূর্তি-প্রতিষ্ঠার পূর্বে। পাঠক লক্ষ্য করিবেন 'বন্দে মাতরম্' গানে ও কমলাকান্তের ধ্যানে দেশ-মাতার চিরন্তন সৌন্দর্য ও ভাবী গৌরব-দর্শন জনিত আনন্দই আছে, তদানীন্তন বীররসবহুল কাব্যের কবিগণের ন্যায় অনুচিত উত্তেজনা নাই। বঙ্কিম মায়ের সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা মূর্তি প্রত্যক্ষ করিয়া পুলকিত হইতেছেন—ভবিষ্যতে মায়ের বীর্য, ঐশ্বর্য, বিদ্যা, বল, সিদ্ধির মোহিনী প্রতিমা কল্পনানেত্রে দেখিয়া বিস্ময়ে মুগ্ধ ও উৎসাহে স্ফীত হইয়া উঠিতেছেন। সত্যানন্দ ঠাকুরও ঐরূপ মূর্তি দেখিয়াছিলেন। তিনি আবার জগদ্ধাত্রী, কালী ও দুর্গা এই তিন প্রতিমায় বঙ্গের ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মূর্তি দেখিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণায় জগদ্ধাত্রী-মূর্তি বঙ্গের সুদূর অতীত অবস্থার চিত্র। অরণ্যময় প্রদেশে হিন্দু ঔপনিবেশিকগণের প্রথম বসতি তৎ সঙ্গে সঙ্গে দেশের স্বাভাবিক শস্য-সম্পদের প্রাচুর্যহেতু তাহাদের আর্থিক উন্নতির প্রতিমা সন্তানগণ, তথা বঙ্কিমচন্দ্র, জগদ্ধাত্রী-মূর্তিতে দেখিয়াছিলেন। তৎপরে মুসলমান-রাজত্বের অন্তিম-দশায় দেশের অবস্থার প্রতিরূপ তিনি কালীমূর্তিতে দেখিয়াছেন। আর পুনরুন্নত ও সমৃদ্ধ বঙ্গের প্রতিকৃতি

তিনি দুর্গাপ্রতিমায় দেখিয়াছেন। আর্থিক উন্নতি, জ্ঞানের উন্নতি, প্রতাপ, সিদ্ধি ও জগদ্ব্যাপিনী প্রতিষ্ঠা ইহাই বঙ্কিমের স্বপ্নে দেশের ভবিষ্যৎ। সে ভবিষ্যৎ কতদূর? সত্যানন্দ বলিয়াছেন, 'যবে মার সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ডাকিবে' অর্থাৎ যখন দেশের সকল লোকের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগিয়া উঠিবে।

সত্যানন্দ আর অধিক দূর যান নাই, কিন্তু বঙ্কিম পাঠককে আরও একটু অধিক দূরে নিতে চাহিয়াছেন। কেবল সকল সন্তান মা বলিয়া ডাকিতে শিখিলেই মায়ের কাজ হইল না। অজ্ঞতাপ্রসূত উৎসাহ সাত্ত্বিকী বৃত্ত নয়। 'মার্, কাট্, গুলি কর্, লুট কর্' এসব তমোমিশ্রা রজোবৃত্তি। প্রকৃষ্ট সেবা সেরূপ নয়, সে সেবায় চাই শুদ্ধা ভক্তি। জীবন-বিসর্জন করিলেই কাজ হইল না। আত্মদান ভাল বটে, কিন্তু অজ্ঞানে আত্মদান বিভ্রমগ্রস্তের কার্য। তাই আনন্দমঠের উপসংহারে সত্যানন্দের বীররসকে বঙ্কিম শান্তরসে পরিণত করিয়াছেন। শেষ দৃশ্যে সত্যানন্দ যখন ক্ষোভমিশ্র উৎসাহের প্ররোচনায় বলিতেছেন, 'শত্রুশোণিতে সিক্ত করিয়া মাতাকে শস্যশালিনী করিব...... শক্তি না থাকে এইখানে এই মাতৃ-প্রতিমা-সম্মুখে দেহত্যাগ করিব' তখন ভারতের ভাগ্যদ্রষ্টা মহাপুরুষ বলিলেন, 'অজ্ঞানে? চল, জ্ঞানলাভ করিবে চল।' তাই আনন্দমঠের উপক্রমণিকায় দৈববাণী ও সাধকের আকাঙ্ক্ষার উত্তর-প্রত্যুত্তরে শুনিতে পাই, দৈববাণী বলিতেছে—

> তোমার পণ কি?
> প্রত্যুত্তরে বলিল, 'পণ আমার জীবন সর্বস্ব।'
> প্রতিশব্দ হইল, 'জীবন তুচ্ছ, সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।'
> 'আর কি আছে? আর কি দিব?'
> তখন উত্তর হইল—'**ভক্তি**।'

এই ভক্তিই আনন্দমঠের মূলমন্ত্র। বঙ্কিম সমসাময়িক সমাজে ঐ বস্তুটির খাঁটিরূপ কতদূর দেখিয়াছিলেন বলা যায় না। সেকালের পেট্রিয়টগণ অনেকেই খেতাব চাহিতেন, খেলাত চাহিতেন, অন্ততঃ লোকের কাছে যশ চাহিতেন, হয়ত স্বদেশের নামে অর্থসঞ্চয়েরও পথ খুঁজিতেন। কেহবা প্রজার স্বার্থ নষ্ট করিয়া জমিদারের স্বার্থ দেখিতেন, কেহবা সকলের স্বার্থ বিসর্জন দিয়া নিজ স্বার্থটুকু সাধন করিতেন। ইহারা গর্জন করিতেন, উল্লম্ফন করিতেন, আবার আবেদন-নিবেদন কান্নাকাটিও করিতেন; কিন্তু দেশকে ভাল করিয়া জানিবার চেষ্টা বিশেষ করিতেন না। অধিকাংশ লোকেই স্বদেশ-সম্বন্ধে অল্পই ভাবিতেন; যাঁহারা ভাবিতেন তাঁহাদের মধ্যে অল্প লোকেই ত্যাগ-স্বীকার করিতেন। সমাজের এইরূপ দুরবস্থায় আনন্দমঠ এদেশে স্বদেশ-ভক্তির একটা মনোরম আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।

এই গ্রন্থের অপেক্ষাকৃত তরুণবয়স্ক পাঠকগণের প্রবোধার্থ এইস্থানে আর একটি বিষয় উত্থাপিত করা হয়ত নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না; কেননা এই বিষয়টি সম্বন্ধে কাহারও কাহারও ভ্রান্ত ধারণা আছে। স্বদেশী আন্দোলনের তীব্রতায়

সময় যাঁহারা আইনের বিরুদ্ধাচরণ বা নামে আইনের গণ্ডীতে থাকিয়াও আইনকে ফাঁকি দিয়া নানারূপ উচ্ছৃঙ্খলতাচরণ করিতেছিলেন, 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি তাঁহাদের মুখে সর্বদাই লাগিয়া থাকিত। জাতিগত-বিদ্বেষ, রাজ্যশাসনের প্রতি বিদ্বেষ, রক্তপাত ও নরহত্যার উত্তেজনা-প্রভৃতিও 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনির সহিত এক নিঃশ্বাসে প্রচারিত হইত। সাক্ষাদ্‌ভাবে হউক্, পরোক্ষভাবে হউক ইংরেজজাতি ও ইংরেজের আইনের বিরুদ্ধাচরণে বদ্ধপরিকর ভ্রান্ত অথচ দুর্দান্ত যুবকবৃন্দ আপনাদিগকে 'সন্তান' বলিয়া পরিচয় দিত। 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র এইরূপে দেশের সেবায় প্রযুক্ত না হইয়া দেশের অকল্যাণের হেতু হইয়া উঠিয়াছিল। কত নিরীহ বালক সৎপথভ্রষ্ট হইয়া এইরূপ কুকর্মকারীর দলে প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহা কে গণনা করিবে? গুপ্ত আক্রমণ উপাংশু-হত্যা প্রভৃতি অপরাধে কত পরিবার উৎসন্ন হইয়াছে তাহা মনে করিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। এইরূপ দেশসেবার নামে চিত্তের নানারূপ জঘন্য-বৃত্তির অনুশীলন ও পুণ্যের নামে পাপের আচরণ কি বঙ্কিম-চন্দ্রের শিক্ষা? আনন্দমঠে কি বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশবাসিগণকে আততায়ীর কার্য করিতে উপদেশ দিয়াছেন? দেখা যাক্ এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কি বলিতেছেন।

আফিমের মাত্রা চড়াইয়াও কমলাকান্তের স্থূলে ভুল হয় নাই। মাতৃপূজার আয়োজন যে নরহত্যা লুণ্ঠনাদি পাপ দিয়া হইতে পারে এরূপ ভাব নেশার ঝোঁকেও তাঁহার মনে আসে নাই। কমলাকান্ত বলিতেছেন—

> "তখন যুক্ত করে সজলনয়নে ভাবিতে লাগিলাম; উঠ মা হিরণ্ময়ি বঙ্গভূমি! উঠ মা! এবার সুসন্তান হইব, সৎসঙ্গে চলিব—তোমার মুখ রাখিব।······এবার আপনা ভুলিব, ভ্রাতৃবৎসল হইব—পরের মঙ্গল সাধিব; অধর্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব—উঠ মা।"

চতুর তার্কিক বলিবেন, কমলাকান্তের কথায় নানা প্যাঁচ আছে। ইহাতে এ কথা বুঝায় না যে ইংরেজকে এদেশ হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা অধর্ম। আচ্ছা তবে আসুন আনন্দমঠেই প্রবেশ করা যাক। সত্যানন্দ রণক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া বিষ্ণুমণ্ডপমধ্যে বসিয়া ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। এমন সময় তাঁহার গুরু তথায় আসিয়া উপস্থিত। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর—

> "চিকিৎসক বলিলেন, সত্যানন্দ কাতর হইও না। তুমি বুদ্ধির ভ্রমক্রমে দস্যুবৃত্তি দ্বারা ধনসংগ্রহ করিয়া রণজয় করিয়াছ। পাপের কখনও পবিত্র ফল হয় না। অতএব তোমরা দেশ উদ্ধার করিতে পারিবে না। আর যাহা হইবে, তাহা ভালই হইবে। ইংরেজ রাজা না হইলে সনাতনধর্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই! মহাপুরুষেরা যেরূপ বুঝিয়াছেন, একথা আমি তোমাকে সেইরূপ বুঝাই। মনোযোগ দিয়া শুন। তেত্রিশকোটি দেবতার পূজা সনাতন ধর্ম নহে, সে একটা লৌকিক অপকৃষ্ট ধর্ম; তাহার প্রভাবে প্রকৃত সনাতন ধর্ম—ম্লেচ্ছেরা যাহাকে হিন্দুধর্ম বলে—তাহা লোপ পাইয়াছে।

প্রকৃত হিন্দুধর্ম জ্ঞানাত্মক, কর্মাত্মক নহে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার; বহির্বিষয়ক ও অন্তর্বিষয়ক। সেই অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান সনাতন ধর্মের প্রধান ভাগ। কিন্তু বহির্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। স্থূল কি তাহা না জানিলে সূক্ষ্ম কি তাহা জানা যায় না। এখন এ দেশে অনেক দিন হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছে কাজেই প্রকৃত সনাতন ধর্মও লোপ পাইয়াছে, সনাতন ধর্মের পুনরুদ্ধার করিতে গেলে, আগে বহির্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার করা আবশ্যক। এখন এদেশে বহির্বিষয়ক জ্ঞান নাই। শিখায় এমন লোক নাই, আমরা লোকশিক্ষায় পটু নহি; অতএব ভিন্ন দেশ হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে। ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব। ইংরেজি শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে। তখন প্রকৃত ধর্ম আপনা আপনি পুনরুদ্দীপ্ত হইবে। যত দিন না হিন্দু আবার জ্ঞানবান্, গুণবান্ আর বলবান্ হয়, ততদিন ইংরেজরাজ্য অক্ষয় থাকিবে; ইংরেজরাজ্যে প্রজা সুখী হইবে, নিষ্কণ্টকে ধর্মাচরণ করিবে। অতএব হে বুদ্ধিমান্, ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া আমার অনুসরণ কর।"

ইহা কি বিপ্লববাদীর উক্তি? সুচতুর তার্কিক হয়ত আবার বলিবেন, ইহা এক মত মাত্র, বঙ্কিমের নিজ মত নয়। সত্যানন্দের ভবিষ্যৎ স্বপ্ন যদি বঙ্কিমের স্বপ্ন হয় তবে 'চিকিৎসকের' এই উক্তি বঙ্কিমের নিজ উক্তি কিরূপে বলা যায়? একথার উত্তর এই যে, কবি বঙ্কিম, ভাবুক বঙ্কিম, ঋষি বঙ্কিম, স্বদেশের ভবিষ্যৎ চিত্র ভাবপ্রবণ সত্যানন্দের চক্ষে দেখিয়াছিলেন। আর জ্ঞানী বঙ্কিম, কার্যকারণসম্বন্ধজ্ঞ বঙ্কিম, ভগবানের ব্যবস্থায় স্থির আস্থাসম্পন্ন বঙ্কিম 'চিকিৎসকে'র মস্তিষ্ক দ্বারা বিচার করিয়া বুঝিয়াছিলেন, এদেশে ইংরেজজাতির আগমন ও প্রভুত্ববিস্তার বিধাতারই কল্যাণেচ্ছায় সম্পন্ন হইয়াছে। ইংরেজরাজত্বে দেশের মঙ্গল এমন কি সনাতন হিন্দুধর্মেরও মঙ্গল। ইংরেজরাজত্বে লোকের শান্তি, সুখ, জ্ঞানের বৃদ্ধি হইবার কথা। যখন এদেশবাসিগণ কেবল 'মাকে মা বলিয়া ডাকিতে' শিখিবে না, কিন্তু 'জ্ঞানবান্, গুণবান্ আর বলবান্' হইবে তখনই আবার রাজশ্রী তাহারা ফিরিয়া পাইবে। দেশের সেবা কেবল একাগ্রতা বা ত্যাগসাপেক্ষ নহে, জ্ঞানসাপেক্ষও বটে। একাজে কেবল উত্তেজনায় ফল লাভ হয় না, ধর্মের উজ্জ্বল ও সুস্নিগ্ধ আলোকে প্রতি পদক্ষেপে কর্মপ্রণালীর বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করিয়া লওয়া আবশ্যক। বঙ্কিম আনন্দমঠের ভূমিকায়ও স্পষ্ট বলিয়াছেন, 'সমাজবিপ্লব অনেক-সময়েই আত্মপীড়নমাত্র, বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী'।

'বন্দে মাতরম্' গান, কমলাকান্তের ধ্যান ও সত্যানন্দ ঠাকুরের সাধনা—সর্বত্রই দেখা যায় বঙ্কিম স্বদেশ বলিতে বঙ্গদেশকে বুঝিয়াছেন। সত্য বটে

কংগ্রেস-সৃষ্টির বহুপূর্বে বঙ্গদর্শনের সূচনায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, 'ভারতবর্ষীয় নানাজাতি একমত, একপরামর্শী ও একোদ্যোগী না হইলে ভারতবর্ষের উন্নতি নাই;' তথাপি ইহা সত্য যে বঙ্কিমের স্বদেশপ্রীতি কখনও তীব্রভাবে ও যথার্থভাবে সমগ্র ভারতবর্ষকে আলিঙ্গন করে নাই। কমলাকান্তের ন্যায় আফিমের মাত্রাই হউক, আর সত্যানন্দের ন্যায় ভাবের মাত্রাই হউক, যখনই মাত্রা চড়িয়াছে তখনই স্বদেশভক্ত বঙ্কিম বঙ্গের কথা কহিয়াছেন। বঙ্কিম বুঝিয়াছিলেন, বাঙ্গালী আগে বাঙ্গালী হউক, আগে আপনাকে চিনিয়া লউক, আপনাদের জাতীয়ত্ব ফুটাইয়া তুলুক, তারপর যদি সমগ্র ভারতবর্ষের চিন্তা করিতে যায়, বা সমগ্র ভারতবর্ষকে সেবা করিতে চায়, তবেই তাহার চিন্তা বা সেবা ফলপ্রদ হইবে।

বঙ্কিম কেবল স্বদেশকে ভক্তি করিবার শিক্ষা দেন নাই, বা ইংরাজী বাক্‌পদ্ধতি অবলম্বনে দেশকে মাতা বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই, তিনি ভক্তিবিহ্বল চিত্তে দেশমাতৃকাকে দেবত্বে আরোহিত করিয়াছেন,—বাঙ্গালী হিন্দুর চিরারাধ্যা দুর্গাপ্রতিমার সহিত তাহার ঐক্য সঙ্ঘটন করিয়াছেন। বঙ্কিম বিশ্বাস করিতেন যে, দেবতা না হইলে ভক্তির গাঢ়তা জন্মে না, মূর্তি না হইলে সাধকের কল্পনা স্থিরতা লাভ করে না। তাই বঙ্কিম দেশমাতৃকাকে সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যা সর্বার্থ-সাধিকা, শরণ্যা, ত্র্যম্বকা গৌরী নারায়ণী জগন্মাতার সহিত এক করিয়া দিয়াছেন। তিনি জানিতেন হিন্দুর পক্ষে দেশকে দেবতারূপে গ্রহণ ও আরাধনা করিতে কষ্ট হইবে না, কেননা হিন্দু বৃক্ষ, লতা, ক্ষেত্র, সরিৎ, চন্দ্র, সূর্য, জল, স্থল, আকাশ—যেখানে যাহা কিছু বিভূতিমৎ, শ্রীমৎ, বা উর্জিত দেখে তাহাই ভগবানের বিশেষ প্রকাশস্থল ভাবিয়া তাহাতে তাঁহার আরাধনা করে। নানা মঙ্গলপ্রসূতি জন্মভূমিকে দেবী বলিয়া—জগন্মাতার বিভূতি বলিয়া—গ্রহণ করিতে তাহার কি আপত্তি হইতে পারে? আবার তিনি ইহাও জানিতেন যে, যাঁহারা মূর্তি পূজায় আস্থাবান নহেন, তাঁহারাও ঐ মূর্তিকে symbolism মাত্র মনে করিয়া দেশের প্রতীকরূপে বরণ করিয়া লইতে আপত্তি করিবেন না।

আখ্যায়িকার হিসাবে আনন্দমঠ যে খুব উচ্চশ্রেণীর শিল্পগৌরবসমন্বিত বস্তু ইহা বলা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও বলিয়াছেন, 'উহাতে আর্ট বড় কম।'[১] কেহ কেহ মনে করেন উদ্দেশ্যসমন্বিত বলিয়া আনন্দমঠ শিল্পগৌরবে হীন হইয়াছে।

---

১। ললিতচন্দ্র মিত্র একবার বঙ্কিমকে জিজ্ঞাসা করেন 'আপনার উপন্যাসগুলির মধ্যে কোনখানিকে আপনি শ্রেষ্ঠ মনে করেন?' তদুত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র নাকি কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষ ও রাজসিংহের নাম করেন। আনন্দমঠের নাম না করায় ললিতবাবু কিছু বিস্মিত হইয়া বলেন As a patriotic work আনন্দমঠ অতুলনীয়। তদুত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র নাকি বলেন, 'ও senseএ খুব ভাল বটে, কিন্তু উহাতে আর্ট কম।' (সাহিত্য অগ্রহায়ণ ১৩১৮) তথাপি আনন্দমঠ প্রকাশিত হইতে না হইতে উহা পাঠক সমাজে খুব আদৃত হইয়াছিল। আনন্দমঠের দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপনে তাহার প্রথম বিজ্ঞাপনের 'টীকাস্বরূপ কোন বিজ্ঞ সমালোচকের মত'

উদ্দেশ্য সমন্বিত হইলেই যে কাব্য বা উপন্যাস নিন্দনীয় হইল তাহা নহে, কাব্যে উপন্যাসে উদ্দেশ্যের প্রাধান্যই দোষাবহ। কতকগুলি মনোরম, সুসম্বদ্ধ ও সুব্যবস্থাপিত ঘটনাসংযোজনা দ্বারা যদি গৌণভাবে কোনও সত্য বা মতাবশেষ সমর্থিত হয়, তবে তাদৃশ উপন্যাসকে উদ্দেশ্যমূলক বলিয়া নিন্দা করিবার হেতু নাই। আনন্দমঠের উদ্দেশ্য কি? বঙ্কিমচন্দ্র আখ্যায়িকার ভূমিকায় যে তিনটি কথা ঐ গ্রন্থে বুঝান হইয়াছে বলিয়াছেন, সেগুলিকে উহার উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিলেই যত গোলযোগ হয়। বস্তুতঃ আনন্দমঠের 'বিজ্ঞাপন'টি বঙ্কিম কি ভাবিয়া যোগ করিয়াছিলেন তাহা বলা কঠিন। আনন্দমঠের আর সব একরূপ বুঝা যায়, কিন্তু ঐ বিজ্ঞাপনটি বুঝা যায় না। কেননা ঐ বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত 'উদ্দেশ্য'গুলির একটিও প্লটদ্বারা যথার্থতঃ প্রতিপাদিত হয় নাই। 'বাঙ্গালীর স্ত্রী অনেক অবস্থাতেই বাঙ্গালীর প্রধান সহায়, অনেক সময়ে নয়' ইহা যথার্থই প্রতিপাদিত হইয়াছে কি? বিজ্ঞাপনের দ্বিতীয় কথাটি 'সমাজ বিপ্লব অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র, বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী।' বঙ্কিমের সুবিবেচিত মত ও বিশ্বাস বটে, কিন্তু এ উদ্দেশ্যটি উপন্যাসের কোথায় কি ভাবে প্রতিপাদিত হইল? তৃতীয় কথা 'ইংরেজেরা বাঙ্গালা দেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন'। ইহাও আখ্যায়িকার ঘটনাসঙ্গতিদ্বারা প্রতিপাদিত হয় নাই, ইহা পাত্রের কথায় উল্লিখিত হইয়াছে মাত্র।

তথাপি আনন্দমঠ যে উদ্দেশ্যমূলক তাহা অস্বীকার করি না। উহার উদ্দেশ্য স্বদেশপ্রেম ও স্বদেশসেবার একটা আদর্শস্থাপন। সে প্রেমের আদর্শ—শুদ্ধা জ্ঞানোজ্জ্বলা ভক্তি, সে সেবার প্রকার—ত্যাগ ও ইন্দ্রিয়জয়। বঙ্কিম কাব্যের রীতিতে সৌন্দর্যসৃষ্টিদ্বারাই আদর্শস্থাপন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন বটে, কিন্তু সেই সৌন্দর্যসৃষ্টিতে শিল্পের ত্রুটি ঘটিয়াছে। সে ত্রুটি কোথায়?—না ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানকে একাধারে সম্মিলিত করিবার চেষ্টায়। আনন্দমঠের শিল্পী তিনযুগের তিনরকম উপাদান একত্র মিলাইয়া একটি অপূর্ববস্তু নির্মাণ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ উপাদানগুলির তদনুগুণ মিলনযোগ্যতা না থাকায়, নির্মিত বস্তুটি শিল্পের হিসাবে তেমন মনোজ্ঞ হয় নাই। তিনি ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বর্তমানের কতকগুলি সংস্কারকে অতীতে আরোপ করিয়াছেন। তাঁহার সন্তান সম্প্রদায়

---

উদ্ধৃত হইয়াছে। পাঠক দেখিবেন ঐ 'বজ্র সমালোচক আনন্দমঠকে 'a novel powerfully conceived and wisely executed' বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মধ্যে কোন্‌খানি শ্রেষ্ঠ তদ্বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মত বলিয়া নানাব্যক্তি নানাকথা প্রকাশ করিয়াছেন। ৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে নাকি বঙ্কিম বলিয়াছিলেন তাঁহার ও চন্দ্রনাথ বসু উভয়ের মতে নূতন সংস্করণের রাজসিংহই শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, কিন্তু সাধারণে তাহা বুঝিতেছে না। ('প্রদীপ' দ্বিতীয় ভাগ, 'মানসী' চৈত্র ১৩২১ আবার স্বর্গীয় কবি অক্ষয় বড়ালকে নাকি বঙ্কিম কোন সময়ে বলিয়াছিলেন, 'দেবীচৌধুরাণী'ই তাঁহার মতে শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ('সাহিত্য' অগ্রহায়ণ, ১৩১৮)। অন্য একজনকে তিনি কমলাকান্তের দপ্তরকে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়াছে। 'কৃষ্ণ কেমন? যার মন যেমন।'

ইতিহাসের চক্ষে নিতান্ত অসাময়িক তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, ধর্ম, কর্ম সবই আধুনিককালোচিত। ইংরাজী কাব্য উপন্যাসাদিতে Robin Hood, Rob Roy প্রভৃতি outlaw বা দস্যুদিগের জীবনের যে আদর্শ পাওয়া যায় বঙ্কিমের কল্পনা তদ্দ্বারাও কতকটা সন্দীপিত ও প্রভাবিত হইয়াছিল বলিয়া বোধহয়, এবং সেইজন্য সন্তানসম্প্রদায়ের গঠনে যেন কিছু বিদেশীয়ানার ছাপও লাগিয়া রহিয়াছে। কিন্তু ইহাও স্বীকার্য যে বিদেশীয় আদর্শ বঙ্কিম অন্ধভাবে অবিকল গ্রহণ করেন নাই। পূর্বেই বলিয়াছি স্বদেশপ্রীতি এদেশের লোকের স্বভাবসিদ্ধ ভাব নহে, ঐতিহাসিক সন্ন্যাসিবিদ্রোহের সময়ে উহা এদেশে জন্মলাভই করে নাই; বঙ্কিমের সমসাময়িক রাজনৈতিক কর্মিগণ স্বদেশকে চিনিতে আরম্ভ করিলেও ত্যাগের আদর্শ দ্বারা, ভক্তির আদর্শ দ্বারা নিষ্কাম কর্মের আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন নাই। বঙ্কিম দেখাইলেন, স্বদেশের কাজের জন্য ত্যাগী কর্মী চাই; কিন্তু তাহাদিগকে জীবানন্দের ন্যায় গৃহসুখাকাঙ্ক্ষায় নিত্যপীড়িত হইলে চলিবে না, ভবানন্দের ন্যায় রূপমোহে উদ্‌ভ্রান্ত হইলেও চলিবে না, সত্যানন্দের ন্যায় অপার ভক্তি ও জ্বলন্ত উৎসাহসত্ত্বেও পুণ্যে ও পাপে, শত্রু ও মিত্রে ভ্রম করিলে চলিবে না। স্বদেশের কাজ বীরধর্মের রজোগুণের কার্য বটে, কিন্তু সেই বীরধর্ম জ্ঞানোজ্জ্বল হইবে, সুনীতিসন্দীপিত হইবে, সেই রজোগুণ সত্ত্বোজ্জ্বল হইবে। বিদেশীয়ানার উপরে এইটুকু হিন্দুয়ানির প্রলেপ। সন্তানসম্প্রদায়ের আদর্শ ভবিষ্যতের, তাহাদের দুর্বলতা বর্তমানের বা চিরকালের, ভিত্তি ঐতিহাসিক অতীতের।

শান্তিকে অনেক সমালোচকই উৎকট, উদ্ভট, অস্বাভাবিক চরিত্র বলিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন 'এ বাঙ্গালীর মেয়েই নয়'; কেহ বলিয়াছেন, 'বাঙ্গালিনী নয় বটে, কিন্তু ইহার উপরে এমন একটা বাঙ্গালীয়ানা মাখান আছে, যাহার মোহ এড়ান যায় না।' বস্তুতঃ শান্তি একালেরও নয়, সেকালেরও নয়; ভবিষ্যতের স্বদেশসেবাব্রতা বাঙ্গালী নারী অথবা ভবিষ্যতের ত্যাগী স্বদেশসেবীর যোগ্যা সহধর্মিণী। পত্নী যদি কেবলই পতিকে গৃহসুখের দিকে টানিতে থাকে, তবে সে দেশের সেবা কখন করিবে? শান্তি পত্নী হইয়া পতিকে ব্রহ্মচর্যে অবিচলিত থাকিবার উৎসাহ দিতেছে। এমন কি স্বয়ং তাহার ব্রতের উদ্‌যাপনে সাহায্য করিতেছে। তাহার তথাকথিত অস্বাভাবিকতাকে স্বাভাবিক প্রায় করিবার জন্যই তাহার বাল্যজীবনের ইতিহাস এত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। ঐটুকুই তাহাতে আধুনিক বাঙ্গালীয়ানার প্রলেপ। ঐটুকুই তাহার চরিত্রে ভবিষ্যতার উপর বর্তমানতার ছায়া।

কেহ কেহ বলিয়াছেন শান্তিকে বাদ দিলেও আনন্দমঠের প্লট নষ্ট হইত না। কিন্তু প্লটের বৈচিত্র্য থাকিত কি? জীবানন্দ যদি আনন্দমঠে অনাবশ্যক চরিত্র না হইয়া থাকে তবে শান্তিও অনাবশ্যক নয়। উপন্যাসে চরিত্রবিশেষের আবশ্যকতা বা অনাবশ্যকতা নির্ণয় করিবার উপায়—উহার নায়ক নায়িকার

চরিত্র উন্মেষের বা আখ্যানবস্তুর স্বাভাবিক পরিণতির সহিত উহার যোগ আছে কি না তাহা বিচার করা। ইহা ছাড়া ঔপন্যাসিকগণ বৈচিত্র্যের জন্যও অনেক পাত্র অবতারণ করেন। 'আনন্দমঠে'র নায়ক নায়িকা কেহ নাই—উহার প্লটটা বহুপাত্র-তন্ত্র; সকলেই যার যার ভাবে মায়ের সেবা করিতেছে; সত্যানন্দ যেন উহাদের পরস্পরের বন্ধনরজ্জু। একটা রজ্জু না থাকিলে কার্যের সমলক্ষ্যতা থাকে না। এরূপ প্লটে কোন্ পাত্র আবশ্যক, কে অনাবশ্যক তাহা বলা যায় না। বঙ্কিম যদি আরও দুই-চারিটা পাত্র ও দুই চারিটা episode বাড়াইতেন তাহাতেও ক্ষতি হইত না। পাত্রগুলির মধ্যে ঐরূপ কতকটা স্বাতন্ত্র্য আছে বলিয়া কখনও এপাত্রকে কখনও ওপাত্রকে কেন্দ্রচরিত্র মনে হয়। কখনও মনে হয়, সত্যানন্দ কেন্দ্রচরিত্র, কখনও মনে হয় মহেন্দ্র-কল্যাণী কেন্দ্রচরিত্র। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তি-জীবানন্দকেই কেন্দ্রচরিত্র বলিয়াছেন।[১] এখন দেখুন শান্তি কি আনন্দমঠের পক্ষে নিতান্ত অনাবশ্যক পাত্রী?

কল্যাণীতেও ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান তিন রকম উপাদান আছে, কিন্তু তাহা অতিস্পষ্ট নহে; তাই তাহার স্বাভাবিকতা নষ্ট হয় নাই। কল্যাণীর মাতৃত্ব কল্যাণীচরিত্রের গৌরবের মূল। সন্তানের শোক তাহাকে স্বামীর সন্তান-ধর্ম অবলম্বনের শেষ বাধা দূর করিতে সাহস দিয়াছিল। কল্যাণীতে তাহার মাতৃত্ব গৌরবের নিদান, নিমাইতে তাহা সৌন্দর্যের উপাদান। ভ্রমরের মত নিমাই মৃতবৎসা; ভ্রমরে মাতৃধর্ম ফুটিবার সুযোগ পায় নাই, কিন্তু পরের মেয়েকে অবলম্বন করিয়াও নিমাইয়ের মাতৃহৃদয় সুষমাবিকাশ করিয়াছে।

জীবানন্দ ভবানন্দকে মোহগ্রস্ত দুর্বল করিলেও বঙ্কিম স্বদেশভক্তিতে দৃঢ় করিয়াছেন—ক্ষণিক দুর্বলতায় বিচলিত হইলেও ইহাদের ধর্মজ্ঞান এত দৃঢ় যে প্রায়শ্চত্তের আবশ্যকতায় অর্থাৎ জীবনত্যাগের অবশ্যকর্তব্যতায় ইহাদের কখনও সন্দেহ নাই, অনিচ্ছা নাই, ভয় নাই। কল্যাণী ভবানন্দকে 'বিবাহ' করিলেও সে নিশ্চিত প্রায়শ্চিত্ত করিত—Brain de Bois-Gilbert-এর রেবেকাকে লইয়া সুদূরদেশে পলাইয়া যাইবার মত আকাঙ্ক্ষা তার মনে হয় নাই। তবু জীবানন্দ-ভবানন্দ দুর্বল। তাই তাহাদের উভয়ের মৃত্যু হইল—শান্তির পুণ্যে জীবানন্দ বাঁচিয়াছে, ভবানন্দকে বাঁচাইবার পথ হয় নাই। শিকলের দুর্বলতম আংটির জোর যতটুকু সমস্ত শিকলের জোরও ততটুকু। যে শিকল দিয়া সত্যানন্দ স্বদেশকে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, জীবানন্দ-ভবানন্দ উহার অতি দুইটি দুর্বল আংটি। ভবিষ্যতের সত্যানন্দ যেন ঐ রূপ দুইটি আংটি দেখিলে বদলাইয়া বা পুনরায় গড়িয়া লন। আংটি দুইটির ধাতু ভাল; গড়িয়া পিটিয়া লইলে দুইটিই হয়ত ভাল হইতে পারিত। একটিকে গড়িবার জন্য শান্তির প্রয়োজন হইয়াছে। অপরটি বর্জন করাই সঙ্গত বিবেচিত হইয়াছে।

১। 'নারায়ণ' বৈশাখ ১৩২২, 'বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী' প্রবন্ধ।

সন্তানগণের মধ্যে মহেন্দ্রসিংহ অতি সুন্দর স্বাভাবিক সৃষ্টি। তিনি সন্ন্যাসী না হইয়াও দৈবকৃত সংসারবন্ধনের অভাবে যথার্থ কর্মী। তাঁর মুখে বাজে বক্তৃতা নাই, গীতগোবিন্দ গান নাই, চটুল রসিকতা নাই, আর (ব্রতভঙ্গ হয় নাই বলিয়া), মরণে অত্যাগ্রহও নাই। জীবানন্দের ঐরূপ আগ্রহ তিনি বুঝিতে পারেন নাই। তিনি বলেন 'মরিলে যদি রণজয় হইত তবে মরিতাম, বৃথা মৃত্যু বীরের ধর্ম নহে।' তিনি বড় তাড়াতাড়ি সন্তানসম্প্রদায়ে মিশেন নাই। মিশিয়াও ব্রতভঙ্গ করেন নাই। প্রথমে যখন সন্তানদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, তখন তাহারা তাঁহার উদ্ধারকর্তা হইলেও ডাকাত ভাবিয়া তাহাদের সাহায্য করিতে অগ্রসর হন নাই। মাতৃমূর্তি দেখিয়া ও সত্যানন্দের মুখে তাহাদের ব্রতের কথা শুনিয়া তিনি সন্তানধর্মগ্রহণে আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কল্যাণী না মরিলে কি করিতেন বলা যায় না। তিনি খাঁটি মানুষ। কল্যাণীর ন্যায় মহেন্দ্রেও ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান অনেকটা খাপ খাইয়াছে।

সত্যানন্দকে স্থানে স্থানে একটু ছায়াময় বা মায়াময় পুরুষ বলিয়া মনে হয়। তিনি যবনের সহিত যুদ্ধের জন্য অস্ত্রসংগ্রহে ব্যগ্র হইয়া তীর্থদর্শনে গেলেন, তারপর কখন মঠে ফিরিলেন তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। ভবানন্দের এবং অন্যান্য বহু সন্তানের অগোচরে তিনি আনন্দমঠেরই কাছে কোথাও লুকাইয়া তাহাদের কার্যকলাপ হাবভাব দেখিতেছিলেন বলিয়া বোধ হয়, কেননা ভবানন্দের সহিত কল্যাণীর শেষ দেখার দিন তিনি যে কল্যাণীকে গীতা পড়াইতেছিলেন তাহা জানা যায়, অথচ আনন্দমঠে তাঁহাকে তৎপূর্বে দেখা যায় নাই। সম্মুখে শত্রুর সহিত আসন্ন যুদ্ধের সম্ভাবনা জানিয়াও তিনি মঠে আসিয়া সন্তানদিগকে লইয়া মন্ত্রণা ইত্যাদি গুরুতর ব্যাপারে লিপ্ত না হইয়া যে নিশ্চিন্ত মনে কল্যাণীকে গীতা পড়াইতে প্রবৃত্ত হইলেন ইহা কিছু আশ্চর্যের বিষয় বলিয়াই মনে হইতে পারে। হয়ত তিনি কোন মন্ত্রণা আবশ্যক মনে করেন নাই। কিংবা যে যে আয়োজন আবশ্যক বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন, তাহা সকল সন্তানের কাছে আত্মপ্রকাশ না করিয়াও করিতে পারিতেছিলেন এবং কল্যাণীকে গৃহী সন্তান মহেন্দ্রের যোগ্যা পত্নী না করিতে পারিলে তাঁহার বৃহত্তম আয়োজন নষ্ট হইতে পারে বলিয়া তিনি সময় থাকিতে সে দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। তীর্থযাত্রায় গমনের পূর্বে তিনি কিভাবে জীবানন্দ ও ভবানন্দের গুপ্ত অপরাধ জানিয়াছিলেন তাহা বঙ্কিম বলেন নাই। হয়ত তাঁহার বহু চর ছিল। জেলে গিয়া আশু মুক্তির সম্ভাবনাও বোধ হয় তিনি চরমুখে জানিয়াছিলেন বা যোগবলে বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্কিম তাঁহাকে স্পষ্টতঃ যোগবলসম্পন্ন পুরুষ করিয়া সৃষ্টি করেন নাই; কেননা ভবানন্দের সহিত কল্যাণীর আলাপ তিনি লুকাইয়া শুনিয়াছিলেন এবং ধীরানন্দ দ্বারা তাহার মাতৃভক্তির পরীক্ষা লইয়াছিলেন। অবশ্য যোগবলসম্পন্ন পুরুষদিগকে যে সবই যোগবলে জানিতে হইবে এমন নহে।

চন্দ্রশেখরে রমানন্দ স্বামীও তাহা করেন নাই; তিনিও অলক্ষিতভাবে নিকটে থাকিয়া প্রতাপ-শৈবলিনীর সন্তরণ দেখিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের কথোপকথন শুনিয়াছিলেন। ধীরানন্দকৃত পরীক্ষার পর ভবানন্দ যখন বনের এক অতি নির্জন স্থানে বসিয়া স্বীয় অপরাধের কথা ভাবিতেছেন, তখনও সত্যানন্দকে নিকটে কোথাও লুকাইয়া ভবানন্দের অলক্ষিতভাবে তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতে দেখি। রমানন্দ স্বামীও ঐ ভাবে লুকাইয়া শৈবলিনীকে প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ দেন। ভবানন্দ লজ্জায় ও ক্ষোভে একটা কিছু হঠাৎ না করিয়া বসেন সেই জন্য বোধ হয় তিনি তাহার পশ্চাতে থাকিয়া তাহার কার্যপ্রণালী লক্ষ্য করিতেছিলেন। সত্যানন্দ সম্যক্ ভবিষ্যদ্দর্শী নহেন; তাঁহার অনেক বিষয়ে ভ্রমও হয়, সত্যানন্দের গুরু তাঁহাকে বলিয়াছেন, তিনি 'বুদ্ধির ভ্রমক্রমে দস্যুবৃত্তি দ্বারা ধন সংগ্রহ করিয়া' মাতৃসেবায় রত হইয়াছিলেন; পাপপথে ধর্মরাজ্যস্থাপনের প্রয়াসী হইয়াছিলেন। অথচ তাঁহাতে যে অসাধারণত্ব ছিল তাহা নিশ্চিত, নচেৎ এতবড় একটা সন্তান-সম্প্রদায় তেমন ভাবে তাঁহার আদেশ শিরোধার্য করিয়া লইবে কেন? এই অসাধারণত্বের মূল কি তাহা স্পষ্ট ব্যক্ত হয় নাই বলিয়াই সত্যানন্দকে কতকটা ছায়াময়ী বা মায়াময়ী সৃষ্টি মনে হয়।

এক জায়গায় শান্তির কাছে জীবানন্দের ন্যায় সত্যানন্দকেও যেন বড় খাটো দেখা যায়। যখন সত্যানন্দ জীবানন্দের প্রাণরক্ষার্থ শান্তিকে অনুরোধ করিতে গিয়াছিলেন, সেখানে মনে হয় সত্যানন্দ যেন একটু সুবিধাবাদী, কিন্তু শান্তি সন্তান-ধর্মের কঠোরতম আদর্শপালনে অপরাঙ্মুখী। অথচ মনে রাখিতে হইবে শান্তির পক্ষে ঐরূপ সত্যনিষ্ঠার অপর নাম অচিরবৈধব্য এবং হয়ত সহমরণ। অবশ্য সত্যানন্দের পক্ষেও বলা যায় যে, জীবানন্দের অপরাধ আনন্দমঠের নিয়মের অক্ষরার্থ মতে সত্য হইতে পারে, কিন্তু নিয়মের উদ্দেশ্যের দিক দিয়া দেখিলে ওরূপ অপরাধ অমার্জনীয় নহে। কিন্তু মার্জনাটা বুঝি আনন্দমঠের নিয়মাবলীর মধ্যে মোটেই নাই, কিংবা জীবানন্দ নিজ অপরাধকে গুরুতরই মনে করিয়া প্রায়শ্চিত্তে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছিলেন, তাই সত্যানন্দ শান্তির দ্বারা তাহার প্রাণরক্ষায় সচেষ্ট হইয়াছিলেন। জীবানন্দ সত্যানন্দাদির পার্শ্বে শান্তির দৃঢ়তর কর্তব্য জ্ঞানের ছবি দেখিয়া রুশ ঔপন্যাসিক টুর্গেনিভের 'রুডিন' উপন্যাসের নেটালিয়ার চরিত্র মনে পড়ে।

সত্যানন্দের গুরুটি কি থিওসফিস্ট সম্প্রদায়ের স্বীকৃত 'মহাত্মা'দিগের একজন? তাঁর ভাবভঙ্গী সবই যেন সেইরূপ।

আনন্দমঠের প্লটে বঙ্কিম তাঁহার সমসাময়িক কবিদিগের ন্যায় বীররসকে আখ্যানবস্তুর ভিত্তি করিয়া লইয়াছেন বটে, কিন্তু কাব্যের আদর্শ ও দেশের বর্তমান অবস্থার সহিত সঙ্গতিরক্ষার জন্য পরিণামে দেখাইয়াছেন, এখন স্বদেশ-সেবায় সেরূপ বীরত্বের অবসর কম, ত্যাগে, জ্ঞান-চর্চায়, ধর্মে ঐকান্তিকনিষ্ঠা প্রদর্শনই

প্রধান প্রয়োজন। জ্ঞানবল, ত্যাগবল, ধর্মবল ছাড়া রাজ্য পাইবার উপায় নাই, আর পাইলেও তাহা রক্ষা করা যাইবে না। সমসাময়িক কবিদিগের ন্যায় তিনি মুসলমানকে দেশের শত্রু ধরিয়া লইয়াছেন—কিন্তু বিধর্মী বলিয়া নয় বা বিদেশীয় শাসনকর্তৃগণের প্রতি প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষের আবরণরূপেও নয়। বস্তুতঃ মুসলমানমাত্রকে তিনি দেশশত্রু বলিয়া কুত্রাপি ঘৃণা করেন নাই। চন্দ্রশেখরে মীর কাশেমকে 'বাঙ্গালার শেষ রাজা' বলা হইয়াছে। 'শেষ রাজা কেননা মীর কাশেমের পর যাঁহারা বাঙ্গালার নবাবনাম ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহ রাজত্ব করেন নাই'।[১] তিনি ইচ্ছা করিয়া প্লটের সময় মীরকাশেমের রাজত্বের অবসানে ফেলিয়াছিলেন যখন দেশে রাজা ছিল না—কিন্তু রাজস্ব আদায়ের জন্য অত্যাচার ছিল। ঐ সময়ে ইংরেজবণিকগণ বাঙ্গালার যথার্থ প্রভু, কিন্তু তাঁহারা শাসনের দায়িত্ব ও ব্যয় বহন করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। সে অবস্থায় যাহারা কর আদায়ের জন্য প্রজাবর্গের উপর উৎপীড়নের ভার লইয়াছিল তাহাদিগকে দেশ-শত্রু বিবেচনা অন্যায় হয় নাই।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর দিয়া আরম্ভ করারও বোধ হয় গূঢ় অর্থ আছে। ঐতিহাসিক সন্ন্যাসি বিদ্রোহ ঐ সময়েই ঘটে; তাহা ছাড়া সেকালে হিন্দুগণের বিশ্বাস ছিল রাজার পাপে দুর্ভিক্ষ হয়। সন্ন্যাসিগণের চির সংস্কার বশতঃ যে তাহারা দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে মুসলমান রাজপুরুষগণের প্রতি অধিক বিরক্ত হইবে ইহা স্বাভাবিক।[২]

---

১। মুসলমানগণের মধ্যে কেহ কেহ বঙ্কিমকে মুসলমান-বিদ্বেষী বলিয়াছেন এবং উদাহরণ-রূপে রাজসিংহ উপন্যাসকে বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্কিম বর্ধিত রাজসিংহের উপসংহারে স্পষ্টই বলিয়াছেন হিন্দু-মুসলমানের কোনওরূপ তারতম্য নির্দেশ করা ঐ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। হিন্দু হইলেই ভাল হয় না ব। মন্দ হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না বা ভাল হয় না। যাহার অন্যান্য গুণের সহিত ধর্ম আছে তিনি হিন্দু হউন মুসলমান হউন ভাল; অন্যান্য গুণ থাকিতেও যাহার ধর্ম নাই, তিনি হিন্দু হউন মুসলমান হউন মন্দ। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরকালীন নবাবগণ ধর্মবর্জিত ছিলেন, ক্ষমতাবর্জিত ছিলেন, সাহসবর্জিত ছিলেন। সুতরাং আনন্দমঠে এরূপ শাসনকর্তৃগণকে (তাঁহাদের সমাজকে নয়) দেশের শত্রু বলা দোষের হয় নাই।

২। এখানে উল্লেখযোগ্য বঙ্কিমচন্দ্র উত্তরবঙ্গে সন্ন্যাসি-বিদ্রোহ সম্পর্কিত যে-সকল ঐতিহাসিক বিবরণ পরিশিষ্টে সংযুক্ত করিয়াছেন আনন্দমঠের প্রথম সংস্করণে তাহা কিছুই ছিল না। বস্তুতঃ যে-ঘটনা বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে কল্পনা করিয়াছেন তাহার সংঘটনস্থল ছিল বীরভূম। বীরভূমকে ঘটনাস্থল কল্পনা করিবার কারণ এই যে, তখন বীরভূম ছিল স্বাধীন মুসলমান নবাবের শাসনাধীন। নবাব মন্বন্তর-নিবারণে অক্ষম, প্রজাপালনে অসমর্থ বলিয়াই সন্তানেরা বিদ্রোহাচরণ করিয়াছে। নবাবও নিরুপায় হইয়া ইংরাজের সাহায্য চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। পরবর্তী সংস্করণে বঙ্কিম ঘটনাস্থল পরিবর্তিত করিয়া উত্তরবঙ্গে সন্ন্যাসীদিগের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু সন্ন্যাসীরা নামেই সন্ন্যাসী বস্তুতঃ তাহারা ছিল লুঠেরা নাগা। এ বিষয়ে রায়সাহেব যামিনী মোহন ঘোষ প্রণীত Sanayasi and fakir Rebellion of Bengal বইখানি দ্রষ্টব্য। —স.

আনন্দমঠের প্লটের আরম্ভ ভীষণ দুর্ভিক্ষে;[১] কিন্তু কয়েক পরিচ্ছেদ পার হইয়া গেলে আর দুর্ভিক্ষের করালচ্ছায়া বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। সন্ন্যাসীরা একটা রাজ্য চূর্ণ করিয়া আর একটা রাজ্যস্থাপনে নিরত, তাহাদের কত শোণিতশোষিণী চিন্তা, কত নিদ্রাহীন যামিনীযাপন, কত আয়াসবহুল আয়োজন, কত উদ্যমভঙ্গকারিণী নিষ্ফলতা, কত মহামূল্য প্রাণক্ষয়, কত অপদার্থ জীবনের আত্মরক্ষার্থ ব্যগ্রতাই না আনন্দমঠ প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের সহিত জড়িত থাকিবার কথা। কিন্তু বঙ্কিম সে ইতিহাসের পৃষ্ঠা উদ্‌ঘাটন করেন নাই; সবই পাঠকের অনুমানগোচর করিয়া রাখিয়াছেন। বিজয়ী সত্যানন্দের হিমালয়-প্রস্থানের পর আনন্দমঠের কি হইল তদ্বিষয়েও পাঠককে কৌতূহলের অবসর দেওয়া হয় নাই; বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল—এই পর্যন্ত। স্থাপন ও ধ্বংসের, অথবা প্রতিষ্ঠা ও বিসর্জনের মধ্যে আনন্দমঠের যে খবরটুকু পাই, তাহাতে আখ্যায়িকার প্রথম কয় পরিচ্ছেদের গাঢ় কালিমা নাই। সন্ন্যাসীরা বড় বড় কাজ বড় অক্লেশে করে, হাসিতে হাসিতে, রসিকতা করিতে করিতে, একে অন্যের গা টেপাটেপি করিতে করিতে, গান গাহিতে গাহিতে মানুষ মারে ও আপনারা মরে। মৃত্যু স্বীকার করিয়া যাহারা ব্রত নিয়াছে তাহারা মৃত্যুর ভয় লোকালয়ে রাখিয়া আনন্দমঠের আনন্দ-কাননে প্রবেশ করিয়াছে। তাই বুঝি লোকালয়ে যে মৃত্যুর ছায়া দেখি, মরণোন্মুখ সন্ন্যাসিগণের মিলন-মন্দিরে তাহা দেখি না।[২]

আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনৈতিক আদর্শমাত্র ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি practical politics-এর ধার বড় ধারিতেন না। তিনি সরকারী কর্মচারী ছিলেন; চাকরীর নিয়ম অনুসারে সাময়িক কোনও রাজবিধি বা প্রস্তাব সম্বন্ধে

---

১। বঙ্কিমচন্দ্র ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের বর্ণনা হাণ্টার সাহেবের Annals of Rural Bengal হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষের উৎপাত বোধ হয় অন্য কারণেও তাঁহারও মনে জাগরূক ছিল। আনন্দমঠ রচনার কয়েক বৎসর পূর্বে এদেশে উপর্যুপরি কয়েকটা দুর্ভিক্ষ হয়। ১৮৬৬ খৃস্টাব্দে উড়িষ্যাতে যে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হয়, ইহাতে কুড়ি লক্ষ লোক প্রাণত্যাগ করে। ১৮৭৪ খৃস্টাব্দে বাঙ্গালার সর্বত্র অজন্মা হয়; সরকার বাহাদুর এই দুর্ভিক্ষ দমনকার্যে আট কোটি টাকা ব্যয় করেন। দেশের বহু ধনীও বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। তথাপি বহু লোক অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করে। আবার ১৮৭৭ খৃস্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে অতি ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। এবারেও অন্ন-কষ্ট নিবারণ কল্পে গবর্ণমেন্টের বিপুল চেষ্টাসত্ত্বেও প্রায় ৫০ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

২। আনন্দমঠের বহু সমালোচনা হইয়াছে। তন্মধ্যে বান্ধবে কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের 'আনন্দমঠের মূল মন্ত্র' শীর্ষক প্রবন্ধ, নব্যভারতে বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সমালোচনা, নারায়ণের বঙ্কিম সংখ্যায় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী' প্রবন্ধ এবং সবুজ পত্রে (১৩২৬) কিরণশঙ্কর রায়ের 'আনন্দমঠ' প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহোদয় আনন্দমঠের চরিত্রাবলীর বিশেষ বিশ্লেষণ করেন নাই, উহার কেন্দ্রগত ভাব (ভক্তি) টুকুমাত্র দেখাইয়াছেন। বিষ্ণুবাবুর প্রবন্ধ শচীশবাবুর 'বঙ্কিমজীবনী'তে মুদ্রিত হইয়াছে। উঁহার সকল মত গ্রাহ্য নহে, কিন্তু প্রবন্ধটি চিন্তার উদ্দীপক। শচীশবাবু স্বয়ং আনন্দমঠকে

প্রকাশ্যভাবে মত দেওয়া তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। তথাপি তাঁহার সমসাময়িক দুইটি প্রধান রাজনৈতিক আন্দোলন সম্বন্ধে তিনি কৌশলে স্বীয় মত ব্যক্ত করিয়াছেন। এই দুইটি আন্দোলনই আনন্দমঠ-রচনার পরে ঘটে। একটির উপলক্ষ লর্ড রিপণের শাসন-পরিষদের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-বিষয়ক নির্ধারণ (১৮৮২ খৃঃ); এবং দ্বিতীয়টির উপলক্ষ ১৮৮৩ খৃস্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারি ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত এবং ইলবার্ট বিল নামে পরিচিত ফৌজদারী কার্যবিধি-সংশোধনার্থ প্রস্তাব। উভয় বিষয় লইয়াই দেশে যথেষ্ট আন্দোলন হইয়াছিল, দেশীয় নেতৃগণ উহাদের উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন, আর ভারতবাসী ইংরেজগণ উভয় প্রস্তাবেরই ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। স্বায়ত্ত-শাসন নির্ধারণ উপলক্ষে দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায় যে উল্লাস প্রকাশ করিতেছিলেন, বঙ্কিম তাহাতে সর্বান্তঃকরণে সায় দিতে পারেন নাই। তিনি দেখিয়াছিলেন শিক্ষিত সম্প্রদায় দেশকে চিনেন না, দেশের বেশ, ভূষা, ভাষা ঘৃণা করেন। ইঁহারা নিজেরা আত্মশাসনহীন, কিরূপে ইঁহারা স্থানীয় শাসনভার গ্রহণ করিবেন? বঙ্কিম বুঝিয়াছিলেন, 'রাত্রি দিন ঘ্যান্ ঘ্যান্ প্যান্ প্যান্ করিয়া প্রভুগণকে জ্বালাতন' করাই ইঁহাদের পলিটিক্স্। ইঁহাদের হাতে স্থানীয় শাসনভার ছাড়িয়া দিয়া প্রভুরা যদি আপনাদিগকে দায়িত্বমুক্ত জ্ঞান করেন, তবে সেটা সমাজের পক্ষে খুব মঙ্গলকর হইবে বলিয়া, বোধ হয়, বঙ্কিম বিবেচনা করিতেন না। এই মতগুলি কতক রূপকরূপে কতক স্পষ্টভাবে 'হনুমদ্বাবু-সংবাদ' প্রবন্ধে ব্যক্ত হইয়াছে। বঙ্কিম idialist বা কাল্পনিক চরমোৎকার্যানুরাগী ছিলেন বলিয়া তাঁহার মত কার্যক্ষেত্রে আদৃত হয় নাই; কিন্তু উহা তদানীন্তন রাজনৈতিক আন্দোলনকারিগণের ভাবিবার যোগ্য ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

---

একখানি তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাস বলিয়া সরাসরি ভাবে বিচার নিষ্পন্ন করিয়াছেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী ও সীতারাম একসঙ্গে আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 'এই তিনখানি উপন্যাসে বাঙ্গালার প্রকৃতির আধারে বঙ্কিমচন্দ্র সমষ্টি ব্যষ্টি এবং সমন্বয়ের অনুশীলন-পদ্ধতি পরিস্ফুট করিয়াছেন। আনন্দমঠে সমষ্টির বা সমাজের ক্রিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, দেবীচৌধুরাণীতে ব্যক্তিগত সাধনার উন্মেষ প্রকরণ বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন, সীতারামে সমাজ ও সাধক সম্মিলিত হইলে কেমন করিয়া একটা state বা স্বতন্ত্র-শাসন সৃষ্ট হইতে পারে তাহার পর্যায় দেখাইয়াছেন। বাঙ্গালীর প্রকৃতিগত, জাতিগত এবং সংস্কারগত দোষ বা চ্যুতির ফলে কেমন করিয়া আদর্শ সৃষ্ট হইল না তাহাও তিনি অপূর্ব চরিত্রোন্মেষ সাহায্যে দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই।' পাঁচকড়িবাবু এই তিনখানি উপন্যাসেরই পাত্রগণের Mentality বা মানস উন্মেষ আধুনিকতা দোষে দুষ্ট বলিয়াছেন। কেন এইরূপ হইয়াছে তাহা আমরা উপরে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। পাঁচকড়িবাবুর প্রবন্ধে আলোচনা-যোগ্য বহু কথা আছে, কিন্তু এ গ্রন্থে তাঁহার মতাবলীর বিচার অস্থান-প্রযত্ন হইবে। কিরণশঙ্কর রায় আনন্দমঠে যথার্থ ও অযথার্থ বহু ত্রুটি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহার প্রবন্ধটি সুপাঠ্য, কিন্তু স্থলে স্থলে অসঙ্গত সিদ্ধান্ত ও অনুচিত পরিহাস-রসিকতা দোষে দুষ্ট তাঁহার কোনও কোনও মতের উত্তর উপরে দেওয়া হইয়াছে।

ইলবার্ট বিল উপলক্ষে ভারতবাসী ইংরেজ ও ফিরিঙ্গি-সম্প্রদায় যে আন্দোলন-আস্ফালন তর্জন-গর্জন করিতেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র তাহার কৃত্রিমতা ও অনুচিত তীব্রতা সুকৌশলে Bransonism শীর্ষক প্রবন্ধে প্রদর্শন করিয়াছেন। মিঃ ব্র্যান্‌সন কলিকাতায় ব্যারিস্টার ছিলেন, তিনি ইলবার্ট বিল উপলক্ষ করিয়া ঘোরতর তীব্র ভাষায় দেশীয় লোকদিগকে গালি দেন, এমন কি দেশীয় মহিলাগণের চরিত্র-সম্বন্ধে গুরুতর কুৎসাপূর্ণ উক্তি করেন।[১] ঐরূপ বিদ্বেষপূর্ণ অত্যুক্তির নাম বঙ্কিম ব্র্যান্‌সনিজম্ দিয়াছেন। ব্র্যান্‌সনিজম্ প্রবন্ধে বঙ্কিম জন ডিকসন্ নামক এক বাগ্‌দি-জাতীয় নেটিভ্ খৃস্টানের চৌর্যাপরাধের (কল্পিত) বিচার উপলক্ষ করিয়া ইংরাজী খবরের কাগজওয়ালাদিগের প্রবর্তিত তীব্র আন্দোলনের কৃত্রিমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে দেশীয় আন্দোলনকারীদিগকেও বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, তোমরা যে দেশীয় হাকিম দ্বারা সাহেবদিগকে বিচার করাইতে চাও, তোমরা কি ভাব তাহাতেই নিরপেক্ষ বিচার হইবে? ঐ দেখ তোমাদের দেশীয় হাকিম জলধর গাঙ্গুলী স্বার্থসিদ্ধির জন্য কেমন করিয়া অম্লান-বদনে নিজ দেশ ও জাতির মুখে পদাঘাত করিতে পারে। বঙ্কিম বলিতেছেন, তোমরা আগে মণ্ডপের আবর্জনা দূর কর, পরে প্রতিমা আনিয়া স্থাপন করিও। এক্ষেত্রেও বঙ্কিমের উপদেশ কাল্পনিক চরমোৎকর্ষানুরাগীর উপদেশ বলিয়া আন্দোলনকারীদিগের নিকট আদৃত হয় নাই, কিন্তু উহাও যে দেশীয় লোকদিগের প্রণিধানযোগ্য ছিল এবং এখনও আছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

## চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

## "দেবীচৌধুরাণী" ও "সীতারাম"

আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী ও সীতারাম এই তিনখানি গ্রন্থের প্রত্যেকটিই এক-একটা অতি সঙ্কীর্ণ ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর রচিত হইয়াছে। 'আনন্দমঠে' বঙ্কিমের বলীয়সী কল্পনা ঐতিহাসিক ভিত্তির দুর্বলতাকে তুচ্ছ করিয়া কতদূর ঊর্ধ্বে স্বীয় মস্তক উন্নীত করিয়াছে তাহা ঐ গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রদত্ত ইংরাজী অংশটুকু পাঠ করিলে সকলেরই বোধগম্য হইতে পারে। 'দেবীচৌধুরাণী' ও 'সীতারামে' বঙ্কিম ঐরূপ কোনও প্রমাণ উদ্ধৃত করেন নাই; হাণ্টার, ওয়েস্টল্যাণ্ড ও স্টুয়ার্ট ইত্যাদির উপর বরাত দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থগুলি সর্বত্র সুলভ নহে বলিয়া

১। ১৮৮৩ খৃঃ ২৯শে মার্চ ঢাকা নগরে জনসাধারণের এক সভায় মিঃ লালমোহন ঘোষ মিঃ ব্র্যান্‌সনের বক্তৃতার একটা সুতীব্র উত্তর দিয়াছিলেন। সেকালের অনেক ছাত্র ও ভদ্রলোকই ঐ বক্তৃতাটি মুখস্থ করিয়াছিলেন।

পাঠকের কুতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য ঐ দুই আখ্যায়িকার ঐতিহাসিক ভিত্তিটুকু প্রথমে প্রদর্শিত হইতেছে।

১৮৭৩ খৃস্টাব্দে রঙ্গপুরের কালেক্টর গ্লেজিয়ার সাহেব (Mr. Glazier) ঐ জিলার যে বিবরণ প্রকাশ করেন তাহাতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে রঙ্গপুরে ডাকাইতের উৎপাতাধিক্য উল্লেখ করিয়া তিনি বলিতেছেন, রঙ্গপুর ও দিনাজপুর সহরের দক্ষিণ ও বর্তমান বগুড়া জেলার পশ্চিম এবং গঙ্গার (পদ্মার) সন্নিহিত অঞ্চলটাতেই ডাকাতদিগের আড্ডা ছিল। ১৭৮৭ খৃস্টাব্দে লেফ্‌টেনাণ্ট ব্রেনান এই অঞ্চলের ভবানী পাঠক নামক এক বিখ্যাত দস্যুকে দমন করিবার জন্য প্রেরিত হন। তিনি ২৪ জন সিপাহীসহ একজন দেশীয় কর্মচারীকে ডাকাত অনুসন্ধান করিতে পাঠান। এই লোকটি ভবানী পাঠককে ৬০ জন অনুচরসহ নৌকার মধ্যে হঠাৎ আক্রমণ করেন। এই লড়াইয়ে ভবানী পাঠক স্বয়ং ও তাহার তিনজন সহযোগী নিহত হয়, তদ্ভিন্ন আটজন ডাকাত আহত ও বিয়াল্লিশজন বন্দী হয়। ভবানী পাঠকের বাড়ী বাজপুরে ছিল। মজনু শা নামক অন্য একজন বিখ্যাত ডাকাতের সহিত ভবানী পাঠকের যোগ ছিল। এই লোকটা গঙ্গার দক্ষিণ হইতে আসিয়া বৎসর বৎসর লুটপাট করিত। লেফ্‌টেনাণ্ট ব্রেনানের বিবরণী হইতে একজন স্ত্রীলোক ডাকাতের সম্বন্ধেও কিছু খবর পাওয়া যায়। ইহার নাম দেবীচৌধুরাণী। ইহারও ভবানী পাঠকের সহিত যোগ ছিল। দেবীচৌধুরাণী নৌকাতেই থাকিত। তাহার বহু বেতনভোগী বরকন্দাজ ছিল। দেবীচৌধুরাণী নিজে ত ডাকাতী করিতই, ভবানী পাঠকের লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির ভাগও পাইত। 'চৌধুরাণী' উপাধি হইতে মনে হয় দেবীচৌধুরাণী হয়ত জমীদার ছিল ; তবে সম্ভবতঃ তাহার জমীদারী বৃহৎ ছিল না, কেননা তাহা হইলে ধরা পড়ার ভয়ে সে নৌকাতে নৌকাতে থাকিবে কেন? এই সময়ে প্রধান প্রধান জমীদারেরা সকলেই লুঠতরাজের উদ্দেশ্যে বরকন্দাজ রাখিত। ১৭৮৯ খৃস্টাব্দে বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে কতকগুলি ডাকাত সমবেত হইয়াছিল। এই জঙ্গলের পথ ডাকাতগণ ছাড়া অন্যে জানিত না। কালেক্টর দুইশত বরকন্দাজ নিয়া এই জঙ্গলে প্রবেশের পথ সব আটকাইয়া রাখেন। মাঝে মাঝে দুই-একটা ছোট যুদ্ধ হইয়াছিল—কয়েকমাস মধ্যে কতক ডাকাত নেপাল-ভুটানের দিকে পলাইয়া যায়। কতক অনাহারে মরে, অধিকাংশ গ্রেপ্তার হয়।[১]

সীতারাম সম্বন্ধে হাণ্টারের যশোহরের বিবরণীতে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মহম্মদপুর স্থাপিত হয়। ভূষণার জমীদার সীতারাম রায় উহার স্থাপয়িতা বলিয়া বিখ্যাত। এক প্রবাদ অনুসারে মধুমতীর বামতীরে হরিহর নগরে সীতারাম রায়ের এক তালুক ছিল এবং বর্তমান মহম্মদপুরের অতি নিকটে শ্যামনগরেও ভূসম্পত্তি ছিল। একদিন সম্পত্তি পরিদর্শনকালে তাঁহার

১। W. W. Hunter-প্রণীত A Statistical Account of Bengal Vol. VII 158-159.

ঘোড়ার খুর কর্দমে আটকাইয়া যায়। তিনি কতকগুলি লোক ডাকিয়া তাহাদিগকে মাটি খুঁড়িয়া ঘোড়ার পা উঠাইবার জন্য নিযুক্ত করেন। এইরূপ করিতে করিতে ভূগর্ভে এক ত্রিশূল দেখা দেয়, আরও গভীর গর্ত করাতে এক মন্দির ও তন্মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণ শালগ্রাম আবিষ্কৃত হইল। ইহাতে সীতারাম রায় আপনাকে দেবানুগৃহীত বলিয়া প্রচারপূর্বক স্বসমাজের (উত্তর-রাঢ়ী) কায়স্থগণকে সমবেত করিয়া প্রতিবেশী জমীদারদিগকে আক্রমণ করিলেন, এবং এইরূপে সমগ্র ভূষণা দখল করিয়া তিনি বাঙ্গলার সুবাদারকে রাজস্ব দিতে অস্বীকৃত হইলেন। অপর (এবং সম্ভবতঃ অধিক সত্যমূলক) এক প্রবাদ এই যে, সীতারাম সুন্দরবনের ভূঁইয়াদিগকে রাজস্ব দিতে বাধ্য করিবার জন্য দিল্লীর বাদশাহ কর্তৃক প্রেরিত হন। তিনি বারজন ভূম্যধিকারীকে স্বাধিকারচ্যুত করিয়া এবং তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি স্বয়ং দখল করিয়া সম্রাটের আজ্ঞা পালন করিলেন। তিনি বাঙ্গলার নবাবকে রাজস্ব দিতে অস্বীকৃত হইয়া বলিলেন যে, তিনি বাদশাহ হইতে সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন, সুতরাং বাদশাহকেই কর দিবেন। ইহাতে ভূষণার ফৌজদার সীতারামের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। কিন্তু সীতারামের স্বজাতীয় মেনাহাতী[১] নামক অসীম পরাক্রমশালী বীরের হস্তে নিহত হন। ইহার পর নবাব এক বৃহৎ সৈন্যদল প্রেরণ করিলেন। এ সৈন্যদলের অধিনায়কের হস্তে মেনাহাতী বন্দী ও নিহত হইলে সীতারাম আত্মসমর্পণ করেন এবং বন্দিভাবে মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হন। এই স্থানে কারাগারে (১৭১২ বা ১৭১৪ খৃস্টাব্দে) তিনি বিষভক্ষণ দ্বারা আত্মহত্যা করেন। মহম্মদপুরের সন্নিহিত বহু উদ্যানবাটী এবং দীর্ঘিকা হইতে সীতারামের বিপুল ঐশ্বর্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার মৃত্যুর পর নাটোরের (রাজসাহী) রাজাদিগকে তাঁহার সম্পত্তি দেওয়া হয়। সীতারামের পুত্র প্রেমনারায়ণ রায় দারিদ্র্য দুঃখে জীবনযাপন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।[২]

পাঠক এখন দেখিবেন আনন্দমঠের ন্যায় 'দেবীচৌধুরাণী' ও 'সীতারামে' ঐতিহাসিক ভিত্তিও কত সঙ্কীর্ণ। এইরূপ সঙ্কীর্ণ ভিত্তির উপরে যে 'ঐতিহাসিক

১। সীতারাম উপন্যাসে ইহার নাম মৃণ্ময়। বঙ্কিম মৃণ্ময়ের বল ও সাহসের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

২। W. W. Hunter-প্রণীত *A Statistical Account of Bengal* Vol. II Pp 2-3-216.

স্টুয়ার্টের ইতিহাসে সীতারামকে অবাধ্য জমিদার ও একদল ডাকাতের অধিনায়ক বলা হইয়াছে। সীতারাম নাকি ঐ সকল ডাকাত দ্বারা রাজপথে ও নদীতে ডাকাতি করিতেন। এই গ্রন্থে আরও কথিত হইয়াছে যে, সীতারামের ডাকাতের দল ভূষণার ফৌজদারকে ভ্রমক্রমে নিহত করায় মুর্শিদকুলি খাঁ অন্য ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া ও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য জমিদারদিগকে ভয়-প্রদর্শনে বাধ্য করিয়া সীতারামকে সপরিবারে বন্দী করেন। সীতারাম ও তাঁহার ডাকাতগণ বধদণ্ডে দণ্ডিত এবং তাঁহার পুত্রগণ দাসরূপে বিক্রীত হন। [রাজা সীতারাম রায়ের ইতিহাস পরবর্তীকালে সতীশচন্দ্র মিত্র 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' নামক নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।—স.]

উপন্যাস'-প্রাসাদ নির্মাণ করা যায় না তাহা নহে, বঙ্কিম ইচ্ছা করিয়াই সে পথে যান নাই। ঐতিহাসিক উপন্যাসে লেখকের দৃষ্টি থাকে অতীতের দিকে, এই তিনখানি আখ্যায়িকায় বঙ্কিমের দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে। তাই ঐতিহাসিক সকল তথ্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলা সম্ভব হয় নাই। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখা যখন বঙ্কিমের উদ্দেশ্য নয়, তখন 'বিষবৃক্ষ' 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ইত্যাদির ন্যায় ইতিহাসের সহিত কোনও যোগ না রাখিয়া প্লট কল্পনা করা হইল না কেন? ইতিহাসের সহিত নামতঃ যোগ রাখায় অধিক কি লাভ হইল? লাভ হইয়াছে এই—সন্ন্যাসিবিদ্রোহ ইতিহাসের একটা জ্ঞাত ঘটনা। গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীরাও বিদ্রোহ করিয়াছিল, একথা জানা থাকায় সন্তানগণের সৃষ্টি একেবারে উদ্ভট হয় নাই। সন্ন্যাসীরা পেটের দায়ে কি অন্য কোনও কারণে ডাকাতি বা বিদ্রোহ করিত বলা যায় না, কিন্তু বঙ্কিম তাহাদের কায অবলম্বন করিয়া স্বদেশভক্তির এমন এক আদর্শ স্থাপন করিলেন, যাহা ইতিহাসের হিসাবে অলীক প্রতিপন্ন হইলেও কাব্যের হিসাবে অলীক অর্থাৎ সম্ভাব্যতার সীমাতিক্রান্ত হইল না। আবার বাঙ্গালী মেয়েরা যে কেবল অন্তঃপুরেই চিররুদ্ধা থাকিত তাহা নহে, তাহাদের কেহ কেহ পৌরুষধর্মেও বিশেষ অগ্রসরতা প্রদর্শন করিয়াছে; গ্লেজিয়ারের উল্লিখিত দেবীচৌধুরাণী-নাম্নী দস্যুরমণী ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণ।[১] বাঙ্গালীর মেয়ে ডাকাতি করিত, ইহা বাঙ্গালীর গৌরব নহে; আর সাধারণ ডাকাত হইলেই বা তার এত প্রতিপত্তি কেন হইবে? তাই বঙ্কিম তাহার দস্যুতাকে একটা নূতন বর্ণে রঞ্জিত করিয়া ও তাহার অনিন্দনীয় পৌরুষকে অনুশীলনধর্মের উদাহরণরূপে গ্রহণ করিয়া সংসারযাত্রায় নারীজীবনের একটা নূতন আদর্শ স্থাপন করিলেন। এবারেও তাঁহার দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে। তিনি যেন বলিতেছেন, "তোমরা রাষ্ট্র গঠন করিবে? জ্ঞানে গুণে বলে ঐশ্বর্যে সিদ্ধিতে উন্নত হইবে? কিন্তু রাষ্ট্র যে পরিবারের সমষ্টি তাহা ভুলিও না—আদর্শ রাষ্ট্র গড়িবে, আদর্শ পরিবার আগে গড়িয়াছ কি? আধুনিক বাঙ্গালীর স্ত্রীকন্যারা না বড় সঙ্কীর্ণদৃষ্টি সঙ্কীর্ণমাঃ সঙ্কীর্ণশক্তি? তাহা কি তাহাদের দোষ না দুর্ভাগ্য? দেখ, এক বঙ্গললনা শত বরকন্দাজ পরিচালনা করিয়া ইংরাজের সিপাহীর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল। সুতরাং অনুশীলন করিলে, সাহস লোকনেতৃত্ব ইত্যাদি গুণ যে বঙ্গললনার হইতে পারে না তাহা নহে। পাতিব্রত্য স্নেহ মায়া দয়া দাক্ষিণ্যে বাঙ্গালী নারীরা চিরদিনই মহিমান্বিতা; বাঙ্গলার ঘরে ঘরে তার প্রমাণ ছিল। এখনই কি নাই? এ ধাতু দিয়া কি না গড়া যায়? তোমরা কেবলই বাঁদরী গড়িবে, দেবী কি গড়া যায় না? দেখ আমি দেবী গড়িয়া দিতেছি—ডাকাত দেবীচৌধুরাণীর দেবীসংজ্ঞা অন্বর্থ করিয়া দিতেছি। কিন্তু সাবধান! সাধ্যসাধনে গোল করিও না। নিষ্কাম

---

১। তবু কোনও কোনও সমালোচক বলেন এদেশে 'শান্তি'চরিত্রের কোনও স্বাভাবিক ভিত্তি নাই, উহা অলীক উদ্ভট অস্বাভাবিক।

কর্ম, ভগবানে আত্মসমর্পণ ইত্যাদি কথাগুলি বড বেশি জটিল। কোনও ধর্মই সম্যক্ না বুঝিয়া অন্ধভাবে অনুশীলনীয় নয়। ইহারও একটা দৃষ্টান্ত দিব। হয়ত সে বৃত্তান্তটা প্রচলিত ইতিহাস সম্মত নয় কিন্তু কাব্যসম্মত। সীতারামের এত বড় রাজ্যটা তাসের ঘরের মত ফুৎকারে উড়িয়া গেল কেন তাহা কেহ নিশ্চিত জানে না। কিন্তু ঐ ঐতিহাসিক ঘটনাটা অবলম্বন করিয়া তোমার জাতীয় চরিত্রের একটা মজ্জাগত দোষ, আর আমার উপদেশেরও একটা সম্ভাব্য কুফল সম্বন্ধে তোমাদিগকে সাবধান করিয়া দিতে পারি। দেখ তোমার বাঙ্গলা দেশটায় পঞ্চশরের প্রভাব বড বেশি, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব দুই-দুইটা মহোজ্জ্বল ধর্ম ঐ এক নম্বরের রিপুটার প্রভাবের কাছে নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। তাই ভবানন্দের মত অমন অকৃত্রিম দেশভক্ত বীরেরও পদস্খলন দেখাইতে হইয়াছে। জীবানন্দও টলিতে টলিতে শান্তির পুণ্যে বাঁচিয়া গিয়াছে। সীতারামের শক্তিও যে ঐ উৎকটতম অন্তঃশত্রুর উৎপাতে প্রথমে অন্তঃসারশূন্য হইয়াছিল বলিয়াই মুসলমান ফৌজদারের সামান্য আঘাতে ধূলিসাৎ হয় নাই, তাহা কি নিশ্চয় করিয়া বলা যায়? সীতারাম যে প্রথমেই অগ্নিবর্ণ ছিলেন না, তাহা নিশ্চয়। অগ্নিবর্ণ পূর্বপুরুষের তৈয়ারি রাজ্য হাতে পাইয়াছিলেন, সীতারাম তাঁহার রাজ্য নিজ হাতে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এমন একটা লোক বাহিরের প্রলোভনে প্রথমেই পডে না। তার গৃহসুখে বাধা না পডিলে কখনই হয়ত পডে না। তাই শ্রী ও রমার কল্পনা করিতে হইতেছে। কর্মসন্ন্যাস ও কর্মযোগ যে এক নহে, কর্মসন্ন্যাসের শিক্ষা লইয়া গৃহে আসিলে যে গৃহ ও সন্ন্যাস উভয়ই নষ্ট হয়, শ্রী তাহার দৃষ্টান্ত। রমাতেও রাজরাণীর যোগ্য শিক্ষা নাই। রমা বাঙ্গালী কেরানীর হৃদয়রাণী হইবার যোগ্য। শ্রীতে দেখিতে পাইবে প্রফুল্লের বিপরীত শিক্ষা অর্থাৎ আদর্শের বিপর্যয়; রমাতে দেখিতে পাইবে শান্তির বিপরীত ভাব অর্থাৎ স্বামীর আদর্শের অনুপযুক্তা।" বস্তুতঃ, 'আনন্দমঠ' ও 'দেবীচৌধুরাণী'তে যাহা ভাবরূপে দেখিতে পাই, 'সীতারামে' তাহা অভাবরূপে পরিস্ফুট। 'আনন্দমঠ' ও 'দেবীচৌধুরাণী' অন্বয়, 'সীতারামে' ব্যতিরেক। যদিও 'আনন্দমঠে'র উপসংহারে বলা হইয়াছে, বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের এই শেষ তিনখানি উপন্যাস তুলনা করিলে মনে হয়, 'আনন্দমঠে' ও 'দেবীচৌধুরাণী'তে প্রতিষ্ঠাই আছে, বিসর্জনের চিত্র 'সীতারামে' দেওয়া হইয়াছে। সত্যানন্দ যখন গুরুর সঙ্গে হিমালয়ে গেলেন, তখন তিনি জয়ী। হিন্দুরাজ্য স্থাপিত না হউক, অরাজকতা দূর হইয়াছে। তাহার পরে বন-মধ্যবর্তী আনন্দমঠ আবার বনে পরিণত হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু সমস্ত বাঙ্গালা দেশব্যাপী সুবৃহৎ আনন্দ-মঠের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। দেবীচৌধুরাণীতেও মনে হইতে পারে প্রফুল্ল গৃহসুখের মোহে বুঝি একটা মহাধর্ম বিসর্জন দিয়া গেল—কাপ্তান ব্রেনানের পরাজয়ে যে গৌরব-প্রতিমার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, গৃহিণীপনার অনতিপ্রশস্ত ও অনতিগভীর পল্বলে বুঝি তাহার বিসর্জন হইল। বস্তুতঃ কিন্তু তাহা নহে, এখানেও

প্রতিষ্ঠা,—গৃহধর্মের প্রতিষ্ঠা—নারীর কৃত্রিম রাজত্বের অবসানে যথার্থ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা। 'সীতারামে'ই কেবল বিসর্জন—বিসর্জন—বিসর্জন!

'আনন্দমঠে' বঙ্কিম যাহা গড়িতে চাহিয়াছেন তাহা এদেশের পক্ষে একটা নূতন বস্তু; রাষ্ট্রীয় জীবনের একটা আদর্শ তিনি বিদেশ হইতে আনিয়া তাহাকে ভারতীয় ত্যাগের আদর্শের সহিত যেভাবে মিলাইয়া দিয়াছেন, তাহা খুব বিস্ময়কর সন্দেহ নাই, কিন্তু সে মিলনের ক্ষেত্রটা যেন সুজলা সুফলা বঙ্গভূমির কোনও অংশে নয়; যেন কল্পনারাজ্যের অন্তর্গত কোনও একটা তেপান্তর মাঠের মাঝখানে। তথাকার শস্যশ্যামলা শোভা, জ্যোৎস্নাপুলকিতা যামিনী, ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদল আমাদের চক্ষে পড়ে না, তাহার নির্মল আকাশের স্নিগ্ধ বায়ু আমাদের গায়ে লাগে না, যদিও অবশ্য উহা আমাদের কল্পনানেত্রের সম্মুখে একটা স্বপ্নরাজ্যের সৃষ্টি করে, আমাদের নব আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপিত হৃদয়ে নূতন পুলক জাগাইয়া দেয়। ইহার কারণ যাহা তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। এদেশে রাষ্ট্র ছিল না। কিন্তু দেবীচৌধুরাণীতে সত্যে ও কল্পনায় কোনরূপ অসামঞ্জস্য নাই, কেন না এদেশে চিরকালই পরিবার ছিল। 'দেবী-চৌধুরাণী'র আখ্যানবস্তুর আশ্রয় সেই পরিবার। আনন্দমঠটা বিদেশীয় মালমসলায় নির্মিত হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু হরবল্লভের বাড়ীটা নিতান্তই দেশীয় উপাদানে প্রস্তুত। হরবল্লভের পরিবার যে বস্তুতঃ একটি খাঁটি বাঙ্গালী পরিবার তাহাতে কি কাহারও সন্দেহ হইতে পারে? হরবল্লভ নিজে খাঁটি বাঙ্গালী কর্তা; তাহার কর্তব্যবোধ বাঙ্গালী ধরনের কাঁচা, কিন্তু বিষয়বুদ্ধিটি বাঙ্গালী ধরনেরই অতিপাকা! তাই পুত্রবধূকে ত্যাগ করায় বা তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়ায় কিংবা উপকারিণী দেবীরাণীকে সিপাহীর হাতে ধরাইয়া দিবার চেষ্টায় তাহার উপর ঘৃণা হয় বটে, কিন্তু পর বলিয়া মনে হয় না। হরবল্লভের গৃহিণীটিও খাঁটি বাঙ্গালী গৃহিণী, তাঁর নাকের নথ, হাতের পাঁয়া, আর (ছিন্নসম্বন্ধা বৈবাহিকার সঙ্গে আলাপের সময়) রসনাখানিও ঠিক বাঙ্গালী ধরনেই নড়ে; যে পর্যন্ত নিজের চাঁদপানা ছেলেটি দুধে-ঘিয়ে, তেলে-ঝোলে শুক্লপক্ষের চাঁদের মত বাড়িতে থাকে সে পর্যন্ত একটা বৌ বাড়ীতেই আশ্রয় পা'ক বা মায়ের কাছে থাকিয়া অনাহারে মরুক তাহাতে গিন্নীর বড় কিছু একটা আসে যায় না। কিন্তু যখন বুঝিলেন পুত্রটি সেই বধূর জন্য মরিতে বসিয়াছিল তখন গিন্নী সে বৌয়ের জন্য কর্তার কাছে কেবল নখনাড়া দিয়া সন্তুষ্ট নন, গলায় দড়ি দিয়া মরিতে প্রস্তুত। ব্রহ্মঠাকুরাণীর মত ঠাকুরমা সেকালে কেন, বোধ হয় পল্লীগ্রামে অনেক সঙ্গতিসম্পন্ন ভদ্রঘরে একালেও আছেন, তবে রান্নাটা, বোধ হয়, এখন তাঁর হাতে নাই, শ্রীজগন্নাথদেবের ছাপ্পান্ন-ভোগরন্ধনকারীদের জাতের অক্ষম হস্তে গিয়াছে। নয়নতারার মত অনেক তারা এখনও বাঙ্গালার গৃহাকাশে ফুটে; এখন সপত্নীর জ্বালা বড় একটা নাই, তবু নয়নতারার দল যে পূর্বাপেক্ষা কম উজ্জ্বল ভাবে ফুটে তাহা নয়—

Fair as a star, when only one
Is shining in the sky,

সাগর বৌ ও নয়ান বৌর পরস্পরের প্রতি ভাবে আর যাহাই থাকুক idealism নিশ্চয়ই নাই। নয়ান অবস্থান্তরে বিষবৃক্ষের দেবেন্দ্রের বধূ হইতে পারিত, সাগরও অবস্থান্তরে কমলমণি হইতে পারিত। ব্রজেশ্বর বড় লোকের ছেলে হইয়াও বাইশ বৎসর পর্যন্তও যে কুষ্মাণ্ড হইতে পারে নাই, তাহা সেকালে অসম্ভব ছিল না। তার পিতৃভক্তিটি 'সেকেলে' হইলেও বঙ্কিমের সময়েও বাঙ্গালায় অদৃশ্য হয় নাই। এই বৃহৎ ও অতিসত্য বাঙ্গালী পরিবারটাকে একধা মনোমোহন আদর্শের আলোকে সুন্দরতর করিবার জন্যই ঐতিহাসিক দেবীচৌধুরাণীর কলঙ্কময় পৌরুষধর্মকে ত্রিস্রোতার পুণ্যসলিলে ধুইয়া লইয়া, কাব্যের রত্নসিংহাসনে স্থাপন করা হইয়াছে। প্রফুল্ল চরিত্রের ভিত্তি অতীত ও বর্তমান, উভয়ত্র ; উহার অনেকগুলি ধর্ম বাঙ্গালী ললনার চিরন্তন ধর্ম। নিষ্কামধর্ম গীতার শিক্ষা ; অনুশীলন ধর্মকেও বঙ্কিম হিন্দুর চতুরাশ্রমধর্মের শিক্ষা বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু প্রফুল্ল-চরিত্রে একত্র এই সবগুলি ধর্মের যে সমন্বয়সাধন করা হইয়াছে, তাহা অতীতেরও নয়, বর্তমানেরও নয়, ভবিষ্যতের। 'আনন্দমঠ' লিখিবার পর রাষ্ট্রের সহিত পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্মরণ করিয়া বঙ্কিম বলিলেন, "এবারে খাঁটি বাঙ্গলার মাটি বাঙ্গলার জল দিয়া একটা এমন মূর্তি গড়িব যাহা অতীতে ও বর্তমানে সত্য না হউক, ভবিষ্যতে সত্য হইবে। আনন্দমঠের অধিষ্ঠাত্রী দেশমাতৃকা মহাবিষ্ণুর ক্রোড়ে বসিয়া বলিলেন 'শিবম্'। মহাবিষ্ণু বলিলেন, 'বাঢ়ম্'। এখন বাঙ্গালী তোমরা বল, 'সত্যম্' এবং উহাকে গৃহে গৃহে সত্য করিবার জন্য, আদর্শকে বস্তুতন্ত্রতা দান করিবার জন্য ব্রতী হও।"

গৃহধর্মটা 'আনন্দমঠে' নাই, কিন্তু গৃহসুখাকাঙ্ক্ষা সন্তানগণের মধ্যে বেশ প্রবল। তাহাদের সকলেরই আশা ব্রতোদ্‌যাপন করিয়া স্ত্রী লইয়া গৃহী হইবেন। কিন্তু ঐ আখ্যায়িকার প্রধান দুইটি স্ত্রীচরিত্রেই গৃহসুখাকাঙ্ক্ষার প্রভাব যে কারণেই হউক কম। অথচ সাধারণের সংস্কার এই যে, গৃহসুখের মোহ পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরই অধিক। বঙ্কিম শান্তিতে ঐ আকাঙ্ক্ষাটি ফুটিবার সুযোগই দেন নাই, কেননা সে বাল্যবধি পুরুষ সাজিয়া পৌরুষধর্মেরই চর্চা করিয়াছে। ভরা যৌবনে সে কয়েক দিনের জন্য গৃহিণী হইয়া গৃহসুখে অভ্যস্ত হইতে না হইতেই সন্তানধর্ম জীবানন্দকে আহ্বান করিল, আর শান্তিও ঘটনাচক্রে আবার গৃহধর্মে জলাঞ্জলি দিয়া ব্রতভঙ্গাপরাধী স্বামীর জীবনে-মরণে সহধর্মচারিণী হইবার জন্য নবীনানন্দ সাজিয়া গৃহের বাহির হইয়া পড়িল। কল্যাণীতে গৃহসুখাকাঙ্ক্ষা থাকিলেও কৌশলে উহাকে বেশ দমন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রফুল্লে কিন্তু নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও গৃহসুখের স্পৃহাটা বেশ বলবতী করিয়াই রাখা হইয়াছে, নচেৎ সন্ন্যাসিনীকে গৃহে ফিরান কঠিন হইত, ফিরাইলেও সে শ্রীর মত ব্রজেশ্বরের গৃহ শ্রীহীন করিত। প্রফুল্লের মনে সংসারসুখের মোহ ( মোহই বলি ;

কেননা অনেক বিজ্ঞ সমালোচক তাহাই বলিয়াছেন) ছিল বলিয়াই তাহার শিক্ষা তাহাকে আদর্শ গৃহিণীতে পরিণত করিয়াছে—তাহার মোহকে মোক্ষসাধনে পরিণত করিয়াছে। প্রফুল্লের কথা শুন—

প্রফুল্ল সাগরকে সব বুঝাইয়া বলিল। শুনিয়া সাগর জিজ্ঞাসা করিল, "এখন গৃহস্থালীতে কি মন টিকিবে? রূপার সিংহাসনে বসিয়া হীরার মুকুট পরিয়া রাণীগিরির পর কি বাসনমাজা ঘর ঝাঁট দেওয়া ভাল লাগিবে? যোগশাস্ত্রের পর কি ব্রহ্মঠাকুরাণীর রূপকথা ভাল লাগিবে? যার হুকুমে তুই হাজার লোক খাটিত, এখন হারির মা পারির মার হুকুমদারি কি তার ভাল লাগিবে?

প্রফুল্ল। ভাল লাগিবে বলিয়াই আসিয়াছি। এই ধর্মই স্ত্রীলোকের ধর্ম। রাজত্ব স্ত্রীলোকের ধর্ম নয়। কঠিন ধর্মও এই সংসার ধর্ম, ইহার অপেক্ষা কোনও যোগই কঠিন নয়। দেখ কতকগুলি নিরর্থক স্বার্থপর অনভিজ্ঞ লোক লইয়া আমাদের নিত্য ব্যবহার করিতে হয়। ইহাদের কাহারও কোনও কষ্ট না হয়, সকলে সুখী হয় সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। এর চেয়ে কোন্ সন্ন্যাস কঠিন? এর চেয়ে কোন্ পুণ্য বড় পুণ্য? আমি এই সন্ন্যাস করিব।

শ্রীর এ শিক্ষা হয় নাই। না হওয়ারও কারণ আছে, তার মনে মনে ভয়, স্বামীকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিলে তার প্রাণহন্ত্রী হইতে হইবে। সে 'ভালবাসার ফাঁদে পড়িতে' অনিচ্ছুক। মূর্খা শ্রী বুঝে নাই, তার প্রাণহন্ত্রী হইবার ভয়ে তার গৃহিণী না হওয়া—তার কাছ হইতে ছুটিয়া দূরে যাওয়াও ভালবাসাই। ভালবাসা কি কেবলই ভোগে—ত্যাগে নয়? উপন্যাসে জ্যোতিষবচনের মর্যাদা রক্ষিত হইয়াছে কিনা জানি না। ভ্রাতা ভগিনীর প্রিয়, স্বামী কি শ্রীর প্রিয় ছিল না? স্বামীর সহিত আলাপ-পরিচয়ের পূর্বে শ্রী যে মনে মনে স্বামীকে দেবতার মত পূজা করিত তাহা ত বঙ্কিমই বলিয়াছেন। সেই মনোরম প্রীতিবন্ধনকে শ্রী উচ্ছিন্ন করিতে চাহিয়াছিল। কেন? প্রীতিরই প্ররোচনায়। শ্রী প্রিয় ভ্রাতার প্রাণহন্ত্রী হইয়াছে, বঙ্কিম বুঝি পাঠককে বুঝাইতে চান, শাস্ত্রের মর্যাদা রক্ষা হইয়াছে, জ্যোতিষ বাক্যের অক্ষরার্থ ফলিয়াছে। কিন্তু স্বামী ত সতী স্ত্রীর কেবল প্রিয় নহে, প্রিয়তম; শ্রী প্রিয়তমের প্রাণহন্ত্রী হয় নাই বটে, কিন্তু প্রাণ অপেক্ষাও যাহা বড় তাহা হনন করিয়াছে—তার কীর্তিনাশ করিয়াছে, তার ধর্মনাশের কারণ হইয়াছে; একটা যথার্থ মনুষ্যত্বশালী পুরুষকে পশুতে পরিণত করিয়াছে। কেন এমন হইল? দৈব ও দুর্বুদ্ধি উভয়ই বুঝি তার হেতু। দৈব শ্রীতে মূর্খতাকে এবং সীতারামে উৎকট রূপমোহ বা কামবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া কার্য করিয়াছে। সন্ন্যাসিনী শ্রী স্বামীর কাছে আসিয়া বলিতেছে "তুমি স্বামী, আর তুমি রাজা, তা ছাড়া তুমি উপকারী, আমি উপকৃত। অতএব তুমি যাইতে না দিলে আমি যাইতে পারিব

না।" সন্ন্যাসিনীর আবার স্বামী কি? রাজা কি? স্বামী, রাজা ও উপকারীর প্রতি কর্তব্যজ্ঞান আছে, কিন্তু স্বামী, রাজা ও উপকারীর যথার্থ উপকারে অর্থাৎ গৃহধর্মচর্চায় সম্মতি নাই। কেন না সে সন্ন্যাসিনী! স্বামী, রাজা ও উপকারীর গৌরব যশ ধর্ম সকল রসাতলে যাইতেছে দেখিয়াও সে সন্ন্যাসের কথা ভুলে না—রাজধানী ছাড়িয়াও পলায় না। তখনও শ্রী নিজ সন্ন্যাসধর্মের কথাই ভাবিতেছে, অথচ যথার্থ সন্ন্যাস কোথায়? সীতারামের মুখে প্রেমালাপ শুনিতে শুনিতে সে ভাবে 'ইনি আমার পতি, আমি ইহার গৃহিণী।' তবে সে গৃহধর্মে ফিরিয়া যায় না কেন? তার উত্তর,—"মহিষীর ধর্ম ত শিখি নাই; সন্ন্যাসিনীর ধর্ম শিখাইয়াছ। যাহা জানি না, যাহা পারি না, সেই ধর্ম গ্রহণ করিয়া সব গোল করিব। সন্ন্যাসিনী মহিষী হইলে কি মঙ্গল হইবে?" প্রফুল্লে কুত্রাপি এরূপ আত্মপ্রতারণা নাই। সে যে ভবানী পাঠকের নিকট সকল রকমের শিক্ষা আগ্রহের সহিত লইয়াছে তাহা স্বামীর বিরহজনিত উৎকট খেদকে ভুলিবার জন্য বটে, কিন্তু সে স্বামিপ্রেমকে কখনও ভয়ের চক্ষে দেখে নাই। স্বামী তাহার কাছে দেবতা। ভবানী পাঠক এইটা বুঝেন নাই—তাঁর 'একটা বড় ভুল হইয়াছিল, প্রফুল্ল একাদশীর দিন জোর করিয়া মাছ খাইত, এ কথাটা আর একটু তলাইয়া বুঝিলে ভাল হইত।' সে যাহা হউক প্রফুল্লের সৌভাগ্যক্রমে ভবানী পাঠক তাহাকে কর্মসন্ন্যাস শিক্ষা দেন নাই—তাহা দেওয়া তাঁর স্বার্থানুমতও ছিল না—কর্মযোগ শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাই প্রফুল্লের স্বামিপ্রেম নিষ্কাম গৃহধর্মে পরিণত হইতে পারিয়াছিল। কোনও কোনও সমালোচক ইহাকে একটা tragedy মনে করিয়াছেন। 'এমন একটা গুণবতী রাণী কি না সতীন লইয়া গৃহধর্ম করিতে গেল! প্রফুল্লের জবাব উপরে উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রফুল্লের চরিত্রের গাঁথুনি বড় ভাল ছিল, তাই তাহাকে এত বড় করা সম্ভব হইয়াছে। প্রথমাবধি তাহাকে বেশ দৃঢ়চিত্তা দেখিতে পাই—তাহার বুদ্ধিও অসাধারণ। বাঙ্গালীর মেয়েতে কি ইহা নাই? আছে বই কি! দুঃখেই মানুষ যথার্থ মনুষ্যত্ব লাভ করে। অবশ্য সুকৃতিও চাই। শ্বশুরালয়ে প্রথম দিনে শাশুরীর সহিত, সাগরের সহিত, স্বামীর সহিত কথাবার্তায় ও আচরণে সর্বত্রই প্রফুল্লের সমুন্নতা বুদ্ধি ও উর্জ্জস্বলা সুরুচি (ইহাকেই আমরা সুকৃতির ফল বলি) দেখিতে পাই। যে শ্বশুর তাহার সকল দুঃখের নিদান তাঁহার প্রতিও কোনও অবস্থায়ই তাহার বিদ্বেষ নাই—বরং প্রথম দিনেই সে স্বামীকে বলিয়াছে, "আমার মত দুঃখিনীর জন্য বাপের সঙ্গে তুমি বিবাদ করিও না, তাতে আমি সুখী হইব না।" তার সাহস ও মনোবল কত অধিক, তাহা তাহার হরণবৃত্তান্তে ও ভবানী ঠাকুরের সহিত পরিচয়ে জানিতে পারি।

নন্দা চরিত্রেরও ভিত্তি ভাল। 'সীতারাম' আখ্যায়িকায় যদি কোনও নারীচিত্র মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে তবে সে নন্দা। নন্দা ও সূর্যমুখী এক ছাচের মূর্তি।

সে প্রাণপাত করিয়া পতিসেবায় নিযুক্তা। 'মাতার মত স্নেহ, কন্যার মত ভক্তি, দাসীর মত সেবা, সীতারাম সকলই নন্দার কাছে পাইতেছিলেন।' তবু যে তিনি ভাবিতেছিলেন, 'সহধর্মিণী কই?...বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী ভাল কিন্তু সমরে সিংহবাহিনী কই?' তাহা লক্ষ্মীছাড়ার যোগ্য ভাবনা। নন্দাকে তিনি যেমন ইচ্ছা তেমনই উচ্চভাবের সঙ্গিনী উন্নতজীবনের অধিকারিণী করিয়া লইতে পারিতেন। বস্তুতঃ 'সহধর্মিণীর অভাব' সীতারামের আত্মপ্রতারণা মাত্র। তাঁহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে নবপরিচিতা শ্রীর সৌন্দর্য-মোহাগ্নিশিখা ধীরে ধীরে সর্বকর্মনাশিনী সর্বধর্মসংহারিণী জ্বালা বিস্তার করিতেছিল। ব্রজেশ্বরের প্রফুল্লের রূপগুণের প্রতি মোহ সত্ত্বেও ধর্মবোধ এতই প্রবল ছিল যে, পিতাকে তার মৃত্যুর হেতু ভাবিয়াও, এমন কি, উপকারিণী প্রফুল্লকে ধরাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে গোয়েন্দাগিরি করিতে দেখিয়াও তাঁহার প্রতি ক্রোধ বা অশ্রদ্ধা জন্মে নাই। যখনই তাঁহার মনে ঐ সকল ভাবের ছায়ামাত্রও পতিত হইয়াছে তখনই সে 'পিতা স্বর্গঃ' প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্য স্মরণ করিয়া তাহা দমন করিয়াছে। আর সীতারাম? সীতারাম শ্রীর মোহে রাজধর্মে বিসর্জন দিয়াছে, গুরু ও পরমশুভানুধ্যায়ী চন্দ্রচূড় ঠাকুরকে অপমানে ব্যথিত করিয়া নির্বাসিত করিয়াছে, তার পর যে জয়ন্তী একদিন তাহার রাজধানী রক্ষা করিয়াছিল, আর একদিন তার নিজ কুলমর্যাদা, তার ধর্মপত্নীর মান রক্ষা করিয়াছিল, তাঁহাকে—বলিতে ঘৃণা বোধ হয়—কি অপমানেই না অপমানিত করিয়াছে? এইখানে আবার নন্দার কার্য স্মরণ কর, দেখিবে নন্দায় মহারাজাধিরাজের মহিষীর অনুরূপ গুণ, তাহার সহধর্মিণী হইবার যোগ্যতা আছে কি না! বুঝিবে যথার্থই সীতারাম লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়া সিংহবাহিনীর নামে মোহময়ী রতির জন্য উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল কি না। সিংহবাহিনী তাহার ঘরেই নন্দারূপে বিরাজ করিতেছিল। মহম্মদপুরে মুসলমান ফৌজদারের শেষ আক্রমণের দিন মনে কর আর শুন নন্দা কি বলিতেছে—

নন্দা। মহারাজ! শরীরধারণে মৃত্যু আছেই। সে জন্য দুঃখ করি না। তবে তুমি লক্ষ যোদ্ধার নায়ক হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে মরিবে, আমি তোমার অনুগামিনী হইব তাহা অদৃষ্টে ঘটিল না কেন?

... ... ...

রাজা। নন্দা! এত লোক পলাইল, তুমি পলাইলে না কেন? তাহা হইলে ইহারা রক্ষা পাইত।

নন্দা। তোমার মহিষী হইয়া আমি কার সঙ্গে পলাইব মহারাজ? তোমার পুত্র-কন্যা আমি তোমাকে না বলিয়া কাহার হাতে দিব? পুত্র বল, কন্যা বল, সকলই ধর্মের জন্য; আমার ধর্ম তুমি। আমি তোমাকে ফেলিয়া পুত্রকন্যা লইয়া কোথায় যাইব?

রাজা। কিন্তু এখন উপায় ?

নন্দা। এখন আর উপায় নাই। রাজার ঔরসে ইহাদের জন্ম। রাজকুলের সম্পদ্-বিপদ্ উভয় আছে, তজ্জন্য আমার তেমন চিন্তা নাই। পাছে তোমায় কেহ কাপুরুষ বলে আমার সেই ভাবনা।

হতভাগ্য কামমোহোদ্‌ভ্রান্ত সীতারাম এমন পত্নীকে শেষে চিনিতে পারিয়াও শ্রীর মোহ কাটাইতে পারে নাই।

শ্রী। এই তোমার পায়ে হাত দিয়া বলিতেছি আমি আর সন্ন্যাসিনী নই। আমার অপরাধ ক্ষমা করিবে ? আমায় আবারও গ্রহণ করিবে ?

সীতারাম। তোমায় ত বড় আদরেই গ্রহণ করিয়াছিলাম ; এখন ত আর গ্রহণের সময় নাই।

শ্রী। সময় আছে ; আমার মরিবার সময় যথেষ্ট আছে।

সী। তুমি আমার মহিষী।

সীতারাম রাগিতেও পারিল না, একবার একটু অভিমান করিয়া বলিয়াছিল "আমার সঙ্গে নন্দা যাইবে, প্রস্তুত হইয়াছে ; তুমি সন্ন্যাস ধর্ম পালন কর।" এই পর্যন্ত। অভিমান না করিয়া সীতারাম যদি ধীর ভাবে বলিতে পারিত, "আমার ধর্ম আমি অবশেষে পালন করিতে চলিলাম, তোমার ধর্ম তুমি দেখ" তবু বুঝিতাম অগ্নিবর্ণলীলার পরও তাহার মধ্যে একটু পদার্থ আছে।

সীতারামের চরিত্র নীতির দিক দিয়াই আমরা এ পর্যন্ত বিচার করিয়াছি এবং ঐ হিসাবেই তাহা ব্রজেশ্বরের চরিত্র অপেক্ষা হীন বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। শিল্পের দিক হইতে দেখিতে গেলে বঙ্কিমচন্দ্র সীতারামকে প্রথম যেরূপ অসাধারণ নৈতিক মাহাত্ম্যে গৌরবান্বিত এবং বৈষয়িক উন্নতির সপ্তম স্বর্গে উন্নীত করিয়া ধীরে ধীরে, কিন্তু দৃঢ় নির্দয় হস্তে, তাহার নৈতিক বল অপহরণ ও ঐশ্বর্য বিলোপ করিয়া নরকের দিকে ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছেন তাহা প্রাচীন রোমান্টিক রীতির অনুযায়ী একটু sensational একটু melo dramatic হইলেও তাহাতে ব্রজেশ্বরের চরিত্রচিত্রের তুলনায় অধিকতর বৈচিত্র্য প্রদর্শিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। অবশ্য সীতারামের চরিত্রটাকে আরও একটু জটিল করিবার এবং তার পতনের মধ্যে আরও একটু মানুষধর্ম সংযোগ করিবার যথেষ্ট অবকাশ ছিল। সীতারাম মানুষের মত পতিত হয় নাই, একটা দৈত্য-দানবের মত পতিত হইয়াছে। সীতারামের পতনে মহচ্চরিত্রের যোগ্য struggle—মহামোহের সঙ্গে মহাপ্রাণতার লড়াই—নাই। একটা প্রাচীন প্রাসাদ যেমন জীর্ণ হইতে হইতে শেষে একদিন শ্রাবণের ধারাপাতে হঠাৎ ধ্বসিয়া পড়ে, সীতারামের পতন কতকটা সেইরূপ। শ্রীর জন্য মোহ ঐ চরিত্রের মহত্ত্ব জীর্ণ করিয়া দিয়াছিল, তার পর জয়ন্তীর বেত্রদণ্ডাজ্ঞার পরই তাহা নিকৃষ্টতম কামপ্রবৃত্তির উৎকট ধারাসম্পাতে ভূমিসাৎ

হইল। সীতারামের পূর্বজীবনে দিলীপের আত্মবিসর্জন-মহত্ত্ব, আর পরজীবনে অগ্নিবর্ণের কামুকতা-কলঙ্ক দুই-ই মিলিয়া গিয়াছে।

শ্রীতে আদর্শের বিপর্যয়-জনিত একটা স্বাভাবিক 'অস্বাভাবিকতা' ছাড়া আর কিছু লক্ষ্য করিবার নাই। তাহাতে শিল্পকৌশলও বিশেষ নাই। শ্রী জয়ন্তীর একটা ছায়ামাত্র, ছায়ার মূলের সজীবতা নাই। জয়ন্তীর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, উদ্যমের প্রখরতা, ধর্মবোধের ঐকান্তিকতা কিছুই শ্রীতে ফুটে নাই। শ্রীর চরিত্র প্রফুল্লের তুলনায় জটিল বটে, কিন্তু সেরূপ জটিলতার শিল্পগত মর্যাদা অধিক নহে। প্রফুল্ল-চরিত্র শিল্পগৌরবে গৌরবান্বিত না হইলেও মনোহর; শ্রীতে শিল্পও তেমন নাই, চরিত্রের স্বাভাবিক ঔন্নত্য-জনিত মাধুর্যও নাই।

শ্রীর সহিত প্রফুল্লের দুই স্থলে সাদৃশ্য আছে। প্রথমতঃ, উভয়েই নবযৌবনে স্বামিসুখে বঞ্চিতা। দ্বিতীয়তঃ, তথাপি উভয়েই স্বামীকে দেবতার অধিক ভক্তি করে ও ভালবাসে। প্রফুল্লের ভক্তি ও ভালবাসায় কোনও বাধা আসে নাই; কিন্তু শ্রী যখন বুঝিল স্বামীকে ভালবাসিলেই তাঁহার অনিষ্ট হইবে, তখন হইতে সে ভালবাসা দমন করিবার জন্য সন্ন্যাস অভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইল।

জয়ন্তীর আদর্শ ও নিশির আদর্শ ঠিক এক নহে। জয়ন্তী কেবল সন্ন্যাসিনী, নিশি বৈষ্ণবী। নিশির রূপ, যৌবন, প্রাণ—সর্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত—

> প্রফুল্ল।—তিনি তোমার স্বামী?
>
> নিশি।—হাঁ। কেননা 'যিনি সম্পূর্ণরূপে আমাতে অধিকারী, তিনিই আমার স্বামী।
>
> নিশি—শ্রীকৃষ্ণে সকল মেয়েরই মন উঠিতে পারে, কেন না তাঁর রূপ অনন্ত, যৌবন অনন্ত, ঐশ্বর্য অনন্ত, গুণ অনন্ত।

নিশি বৈষ্ণবী, তাই সে সর্বদা প্রফুল্লা, তাহার রসিকতা তাহার সন্ন্যাসকে—শ্রীকৃষ্ণার্পিত সর্বস্ব জীবনকে বড় মধুময়ী আভায় মণ্ডিত করিয়াছে। তাহার চতুরতা ও রসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় হরবল্লভের সহিত তাহার আলাপে ও তাহার 'ভগিনীর' বিবাহ-প্রস্তাবে। দেবী বলিয়াছিলেন "নিশি ঠাকুরাণি! তোমার মন প্রাণ জীবন যৌবন সর্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়াছ—কেবল জুয়াচুরিটুকু নয়। সেটুকু নিজের ব্যবহারের জন্য রহিয়াছে।" এই যে 'জুয়াচুরিটুকু', ইহা দ্বারাই তাহার আমাদের পূর্বপরিচিতা বিমলার সহিত বংশগত সাদৃশ্য ধরা পড়ে।

জয়ন্তীতে রসিকতা নাই, সে সন্ন্যাসিনী ও সন্ন্যাসিনীর যোগ্য গম্ভীরতাশালিনী—কিন্তু তাহার উদ্যম উৎসাহের তুলনা নাই। সে নিশির ন্যায় সুখ-দুঃখ শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করে নাই; সে সুখদুঃখে জলাঞ্জলি দিয়াছে।[১] তাহার মনের ভাব—

---

১। জয়ন্তীর মুখে একবার 'অনন্ত সুন্দর কৃষ্ণপাদপদ্মে মন স্থির' করার কথা আছে বটে; শ্রীকৃষ্ণকে আত্মদানের কথা তার বা তার শিষ্যার মুখে শুনি নাই।

"যখন আমার সুখও নাই দুঃখও নাই, তখন আবার লজ্জা কি ? ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের যখন কোনও সম্বন্ধ নাই তখন আমার আর বিবস্ত্র-সবস্ত্র কি ? পাপই লজ্জা, আবার কিসে লজ্জা করিবে ?"···ইত্যাদি। এই সকল কথায় বুঝা যায় সন্ন্যাস করিয়াও তাহার আত্মবোধ (self-consciousness) টুকু বেশ আছে। ভগবান্ তাই তাহাকে বিষম পরীক্ষায় ফেলিয়া তাহার ঐ বোধটুকু, ঐ দর্পটুকু চূর্ণ করিয়াছেন, দর্প চূর্ণ করিয়া তাহার সন্ন্যাস-মাহাত্ম্যকে উজ্জ্বলতর করিয়াছেন। মনে পড়ে সীতারামের সূচিব্যূহ রচনাকালে শ্রী যখন বলিয়াছিল, "মহারাজ! রাজাদিগের অপেক্ষা কি সন্ন্যাসীদিগের মরণে ভয় বেশী ?" তখন জয়ন্তী কিছু বলে নাই ? কেন না 'জয়ন্তী আর সন্ন্যাসের দর্প করে না।'

ব্রজেশ্বরের তিন পত্নীর ন্যায় সীতারামেরও তিন পত্নী। ভবানী পাঠকের হাতে না পড়িয়া ব্রজেশ্বরের গৃহে আশ্রয় পাইলে প্রফুল্ল যাহা হইতে পারিত, নন্দা তাহাই।[১] ভবানী পাঠকের শিক্ষার আদর্শে বিপর্যয় ঘটিলে—রাণীর ( অর্থাৎ রাজ্যরূপ বৃহৎ পরিবারের গৃহিণীর ) যোগ্য শিক্ষা না পাইয়া সন্ন্যাসিনীর যোগ্য শিক্ষা পাইলে প্রফুল্ল যাহা হইতে পারিত শ্রী তাহাই। সুতরাং সীতারামের দুই পত্নী, ব্রজেশ্বরের এক পত্নীরই উল্টা পিঠের মত। সাগর আর নয়নতারা সীতারামকে কোনও আকারে আসিয়া অনুগ্রহ করে নাই। তাহারা যেমন ব্রজেশ্বরের নিজস্ব, রমা তেমনি সীতারামের নিজস্ব। শিল্পের হিসাবে রমা ও ভ্রমর এক শ্রেণীর সৃষ্টি। অর্থাৎ ভ্রমরে যেমন বঙ্গললনার কয়েকটি ধর্ম উগ্রতর করিয়া দেখান হইয়াছে, রমাতেও সেইরূপ। ভ্রমরে পাই বিশ্ববঙ্গবধূর পতিপ্রেম ও অভিমান, রমাতে পতিপ্রেমের সঙ্গে পাই তাহাদের অপত্যস্নেহ ও ভীরুতা। ভ্রমরের ন্যায় রমাও বঙ্গবধূ intensified. যে ধাতুকে পুড়িয়া পিটিয়া প্রফুল্লের ন্যায় দেবীপ্রতিমা গড়িয়া ভবিষ্যতের বঙ্গসংসারে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, রমা ( ও ভ্রমর উভয়েই ) তাহাই।

রমা পতিপ্রাণা, পুত্রবৎসলা—সে যে মুসলমানকে ভয় করে তাহা নিজের জীবনের জন্য যতটা না হউক, পতিপুত্রের জীবনের জন্যই অধিক। যখন পতি দিল্লী গেলেন, তখন পুত্রস্নেহেই সে নিজের সর্বনাশ করিল, সীতারামের সর্বনাশ করিল, যে মহম্মদপুর ছারখারে যাওয়ার জন্য সে নিত্য ঠাকুর-দেবতার কাছে প্রার্থনা করিত[২] সে-ই মহম্মদপুরকে সত্যসত্যই ছারখারে দিল। রমা স্বভাবভীরু।

১। প্রফুল্লের গৃহধর্মের প্রধান গুণ যে সপত্নীর প্রতি নিরপেক্ষতা, তাহার বীজও নন্দায় আছে। মুসলমান মহম্মদপুর আক্রমণ করিতে আসিতেছে শুনিয়া রমা যখন বার বার মূর্চ্ছা যাইতেছে, তখন নন্দা যদিও একবার ভাবিল, 'সতীনটা মরিলেই বাঁচি,' তখনই আবার ভাবিল, 'প্রভু যখন আমাকে অন্তঃপুরের ভার দিয়া গিয়াছেন', তখন আমাকে আপনার প্রাণ দিয়াও সতীনকে বাঁচাইতে হইবে। তার পর রমার কলঙ্ক শুনিয়া সে যে ভাবে তাহার সহিত সহানুভূতি দেখাইয়াছে তাহা বাস্তবিকই অত্যন্ত উন্নতহৃদয়ের পরিচায়ক।

২। সীতারাম, প্রথম খণ্ড ১০ম পরিচ্ছেদ।

রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের মিনির মা'র মত সে 'অত্যন্ত শঙ্কিত স্বভাবের লোক'। রাস্তায় একটা শব্দ শুনিলেই মিনির মা'র মনে হইত, 'পৃথিবীর সমস্ত মাতাল আমাদের বাড়ীটাই বিশেষ লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। এই পৃথিবীটা যে সর্বত্রই চোর ডাকাত মাতাল সাপ বাঘ ম্যালেরিয়া শুঁয়াপোকা আরসোলা এবং গোরার দ্বারা পূর্ণ, এতদিন (খুব বেশি দিন নহে) পৃথিবীতে বাস করিয়াও সে বিভীষিকা তাঁহার মনে হইতে যায় নাই।' রমার কল্পনায় গোরার পরিবর্তে 'অসংখ্য মুসলমানের দন্তশ্রেণীপ্রভাসিত বিশাল শ্মশ্রুল বদনমণ্ডল রাত্রিদিন' বিরাজ করিত। এই যে 'চোর ডাকাত মাতাল সাপ বাঘ ম্যালেরিয়া শুঁয়াপোকা আরসোলা গোরা' ইত্যাদির ভয় ইহা অধিকাংশ বঙ্গনারীর মজ্জাগত। বঙ্কিমের উপন্যাসে আমরা এ শ্রেণীর রমণীর সাক্ষাৎ এক রমা ভিন্ন পাই না। বঙ্কিম রমাকে বড় দুঃখের, বড় কলঙ্কের দাগা দিয়া সোজা করিয়া লইয়াছিলেন। যে বাঁশ কিছু বাঁকা হইয়া জন্মে, আগুনের তাপে তাহাকে সোজা করা যায় বটে, কিন্তু যেটা বড় বেশি বাঁকা, তাহাকে সোজা করিতে গেলে সেটা ভাঙ্গিয়াই যায়। রমাও তাহাই, সোজা হইতে গিয়া ভাঙ্গিয়া গেল।

'রমা বড় ছোট মেয়েটি, জলে ধোয়া যূঁই ফুলের মত বড় কোমলপ্রকৃতি' গ্রন্থকার-প্রদত্ত এই বিবরণে তিলোত্তমা ও (বিশেষতঃ) কুন্দকে মনে পড়ে। কিন্তু তিলোত্তমা বা কুন্দ এমন 'ঘ্যান্ ঘ্যান্ প্যান্ প্যান্' করে না। কুন্দ একবার সাহস করিয়া ঘরের বাহির হইয়াছিল, রমার সে রকম সাহস নাই; কিন্তু সে গঙ্গারামকে রাত্রিযোগে গৃহে আনিবার জন্য যেরূপ অবিমৃষ্যকারিতা প্রদর্শন করিয়াছিল তাহা বোধ হয় কুন্দ করিতে পারিত না; কেননা কুন্দ ত মা নহে। মাতৃত্ব ভীরুকে সাহস দেয়, দুর্বলাকে বলযুক্তা করে, বোবাকে বাগ্মিনী সাজায়, পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করায়—কেবল নির্বুদ্ধিকে বুদ্ধিমতী করিতে পারে না। তাই রমার কপালে মাতৃত্বগৌরব কলঙ্কের নিদান হইয়াছিল। অবশ্য আবার উহাই তাহার কলঙ্কক্ষালনেরও হেতু ও উপায় হইয়াছিল। রামায়ণের উত্তরকাণ্ড বাল্মীকির রচিত কি কার রচিত জানি না, কিন্তু সে কবি সতীকুলশিরোমণি সীতার দ্বিতীয়বার সতীত্বপরীক্ষার যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় তিনি একজন যে-সে ক্ষুদে কবি নহেন। অগ্নিপরীক্ষোত্তীর্ণা সীতা যে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দিতে স্বীকৃতা হইয়াছিলেন, তাহা কি নিজের কলঙ্কক্ষালন জন্য না পুত্রদ্বয়ের মুখ চাহিয়া? সীতার কলঙ্কিনী অপবাদ যতদিন ক্ষালিত না হইত, ততদিন রামরাজ্যের প্রজাগণের চক্ষে লবকুশ অসতীপুত্র থাকিয়া যাইতেন। তাই সীতা সভাসমক্ষে সতীত্বসম্বন্ধে শপথ করিতে সম্মতা হইয়াছেন। কিন্তু সতীর পক্ষে ঐ কার্য যে কিরূপ বেদনাজনক, কতদূর অপমানকর তাহা উত্তরকাণ্ডের কবি জানিতেন, তাই সীতাকে শপথ করাইতে করাইতে পাতালে প্রবেশ করাইয়াছেন—বসুধার দুহিতাকে বসুধায় লয় করিয়া দিয়াছেন। সে যাহা হউক, উত্তরকাণ্ডের কবি মাতৃহৃদয়ের ব্যথা বুঝিয়াও

সে ব্যথাটুকু স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করেন নাই। কালিদাস উহা বুঝিয়াছিলেন, তাই উত্তরকাণ্ডে যেখানে দেখিতে পাই সীতা একাকিনী মহর্ষি বাল্মীকির পশ্চাৎ পশ্চাৎ সভায় আসিতেছেন,[১] তৎস্থলে রঘুবংশে দেখিতে পাই তিনি বাল্মীকির সঙ্গে সভায় আসিবার সময় পুত্রদ্বয়কেও সাথে করিয়া আনিয়াছেন।[২] কালিদাস বিশেষভাবে বুঝিয়াছিলেন কেবল পুত্রগণের সান্নিধ্যই, সীতার ন্যায় সতীকে তাদৃশ অপমান ও বেদনাজনক কার্যে চিত্তে বল দিতে সমর্থ। বঙ্কিম রমাকে কোন উদ্দেশ্যে—আত্মদোষক্ষালন বা পুত্রের অসতীপুত্রাপবাদ দূরীকরণোদ্দেশ্যে—সর্বসমক্ষে সাক্ষ্য দিতে প্রবৃত্ত করাইয়াছেন তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। কিন্তু ইহা স্পষ্টই দেখা যায় যে, তিনি কালিদাসের কৌশলের মর্মটুকু বুঝিয়াছিলেন। রমার সাক্ষ্য দিবার পূর্বে বাতায়ন হইতে সভার সমারোহ দেখাইয়া নন্দা যখন রমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

'কেমন এই সমারোহের মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া বলিতে পারিবে? সাহস হইতেছে?'

তখন রমা কি বলিতেছে শুন,—

রমা। যদি আমার স্বামীর পদে ভক্তি থাকে তবে নিশ্চয় পারিব।

নন্দা। আমরা কেহ সঙ্গে যাইব? বল ত আমি যাই।

রমা। তুমি কেন আমার সঙ্গে এ অসম্ভ্রমের সমুদ্রে ঝাঁপ দিবে? কাহাকেও যাইতে হইবে না; কেবল একটা কাজ করিও। যখন আমার কথা কহিবার সময় হইবে, তখন যেন আমার ছেলেকে কেহ লইয়া গিয়া আমার নিকট দাঁড়ায়। তাহার মুখ দেখিলে আমার সাহস হইবে।

ইহারই নাম মাতৃত্বগৌরব। মাতৃত্ব নারীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম, মাতৃত্ব নারীর শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য, মাতৃত্ব নারীর শ্রেষ্ঠ গৌরব। বঙ্কিম মাতৃত্বমহিমা তাঁহার উপন্যাসগুলিতে বড় বেশি দেখান নাই; দেখাইলে সমাজের কল্যাণ হইত, সন্দেহ নাই।

ফস্টরের বিচারের সহিত গঙ্গারামের বিচার তুলনাযোগ্য। লরেন্স ফস্টর বিচারকালে পূর্বাপর সত্য কথাই বলিতেছিল, কেবল শৈবলিনী সম্বন্ধে কোনও কথার উত্তর দিতে চায় নাই। রমানন্দ স্বামীর যোগবলে বা Psychic force-এ মুগ্ধ হইয়া শেষে তৎসম্বন্ধে সকল কথা যথাযথ ব্যক্ত করিয়াছিল। গঙ্গারাম কিন্তু পূর্বাপর মিথ্যাই বলিতেছিল, সে ইংরেজ আমলের উকিলের পরামর্শপ্রাপ্ত আসামীর

১। তমৃষিং পৃষ্ঠতঃ সীতা অন্বগচ্ছদবাঙ্‌মুখী।
কৃতাঞ্জলির্বাষ্পাকুলা কৃত্বা রামং মনোগতম্॥
—'রামায়ণ' উত্তর কাণ্ড ১০৯ সর্গ, ১০ শ্লোক।

২। স্বরসংস্কারবত্যাসৌ পুত্রাভ্যামথ সীতয়া।
ঋচেবোদর্চিষং সূর্যং রামং মুনিরুপস্থিতঃ॥
—'রঘুবংশ' ১৫ সর্গ, ৭৬ শ্লোক।

ন্যায় ধর্মশাস্ত্রসঙ্গত ( এখনকার কালের আইনসঙ্গত ) প্রমাণ ভিন্ন অন্যবিধ প্রমাণ দ্বারা যাহাতে তাহার দণ্ড না হয়, তজ্জন্য প্রার্থনা করিয়াছিল। তার উত্তর-প্রত্যুত্তর সবই চিরপাপাভ্যস্ত আসামীর hardened criminal-এর মত। পুলিশের চাকরিতে বোধ হয় তাহার এই গুণ জন্মিয়াছিল। এমন পাপিষ্ঠও যে সত্যকথা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল সে কেবল জয়ন্তীর মন্ত্রপূত ত্রিশূলের মহিমায়। ইহাও যোগবল ছাড়া আর কি ?

এই গঙ্গারামের পরিণতি কি ভয়ঙ্কর! নগরপালরূপে যখন তাহাকে প্রথম দেখি, তখন সে কেমন কর্তব্যপরায়ণ, উদ্যমশীল, প্রভুভক্ত। কিন্তু শেষে সে রূপজমোহের বশবর্তী হইয়া কি অধঃপাতেই না গিয়াছে। সে রমার লোভে তাহার জীবনদাতা সীতারামের কাছে বিশ্বাসঘাতক সাজিয়াছে, আবার প্রাণভয়ে নিরপরাধা রমাকে কুলকলঙ্কিনী প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছে—সর্বশেষ ছদ্মবেশে গোলন্দাজ সাজিয়া ছলনা দ্বারা রমাকে হস্তগত করিবার জন্য আসিয়াছিল। কামের এমন উৎকট ও স্থায়ী মোহও কতকটা বিষবৃক্ষের দেবেন্দ্র দত্ত ছাড়া বঙ্কিমের অন্য কোন পাত্রে নাই, তবে দেবেন্দ্র দত্ত কামুক ও মাতাল উভয়ই, তাহার প্রবৃত্তি অতি জঘন্য। সেও 'সধবার একাদশী'র নিমে দত্তের মত চিৎ হইয়া শুইয়া বলিতে পারিত—

> "রে পাপাত্মা, রে দুরাশয়, রে ধর্মলজ্জামানমর্যাদাপরিপন্থী মদ্যপায়ী মাতাল! রে নিমচাঁদ! তুমি একবার নয়ন নিমীলন করে ভাব দেখি তুমি কি ছিলে কি হয়েছ? তুমি স্কুল হতে বেরুলে একটি দেবতা, এখন হয়েছ একটি ভূত, যতদূর অধঃপাতে যেতে হয় তা গিয়েছ। হা জগদীশ্বর! আমি কি অপরাধ করেছি আমাকে অধর্মাকর মদিরার হস্তে নিপাতিত কল্লে?"

নিমে দত্তে মদ্যাসক্তিই আছে, কামবৃত্তি তেমন প্রবল নহে, বরং তাহাতে ও বিষয়ে যেন একটু ভদ্রাত্মাভিমানই আছে। দেবেন্দ্রের দুইটাই আছে সে বহুরমণীর ধর্মনাশ করিয়াছে। গঙ্গারামে মদ্যাসক্তি নাই, রমাকে দেখিবার পূর্বে কর্তব্যজ্ঞানও বেশ ছিল, পরনারীলোভও দেখা যায় নাই, যদিও নগরপালরূপে তাহার সুযোগের অভাব ছিল না। এক রমাকে দেখিবার পর সে ধীরে ধীরে 'ধর্মলজ্জামানমর্যাদা-পরিপন্থী' কামুক হইয়াছে। দেবীচৌধুরাণী আখ্যায়িকায় পঞ্চশরের প্রসার প্রদর্শিত হয় নাই। ফুলমণি দুর্লভচন্দ্রকে একবার মুহূর্তের জন্য দেখাইয়াই বঙ্কিম তাহাদিগকে বিদায় দিয়াছেন। মাতৃহীনা, শ্বশুরকর্তৃক পরিত্যক্ত প্রফুল্লকে নিঃসঙ্গ জীবনের নীরব নিশ্চেষ্টতা হইতে বৃহত্তর কর্মের আবর্তমধ্যে আনিয়া ফেলিবার জন্য ফুলমণি দুর্লভের প্রয়োজন ছিল। সে প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়াই বঙ্কিম আর তাহাদের সংবাদ দেওয়া আবশ্যক মনে করেন নাই। প্রফুল্লের হরণবৃত্তান্ত পড়িতে পড়িতে শৈবলিনীর হরণবৃত্তান্ত মনে পড়ে। প্রভেদ এই শৈবলিনী প্রতাপের জন্য মোহবশে স্বেচ্ছায় ফস্টরের সঙ্গে গিয়াছিল, প্রফুল্ল বলপূর্বক অপহৃতা হইয়াছিল।

দেবীচৌধুরাণীর ভবানী পাঠক মাধবাচার্যের উন্নত সংস্করণ। ঐতিহাসিক ভবানী পাঠক যুদ্ধে মরিয়াছিলেন, কবিকল্পিত ভবানী প্রফুল্লের উপদেশে সদুদ্দেশ্যে ডাকাতিও অধর্ম বুঝিয়া সম্ভবতঃ ধর্মশাস্ত্রকারগণ-কথিত রাজদণ্ডের পাপক্ষালনত্ব স্মরণ করিয়া ইংরেজের হস্তে ধরা দিয়াছিলেন। চন্দ্রচূড় ঠাকুর ভবানী পাঠকের মত নিষ্কামকর্মের মর্যাদা কতদূর বুঝিয়াছিলেন, জানি না। তিনি চাণক্যের স্বজাতি, চাণক্যের মত রাজধর্ম বুঝিতেন। তাঁহার সাম্রাজ্যগঠন ও সাম্রাজ্যরক্ষার ক্ষমতা অসাধারণ। ফৌজদারের সহিত তাঁহার ছলনামূলক গুপ্তসন্ধি চাণক্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। যতদিন সীতারামকে সংশোধন করিবার বিন্দুমাত্র আশা ছিল, ততদিন তিনি রাজ্য ছাড়েন নাই। কিন্তু যখন দেখিলেন পুরীলক্ষ্মীরূপা জয়ন্তী অপমানিতা হইলেন, মোহোন্মত্ত সীতারাম রাজ্যের সকল সুন্দরীকে চিত্তবিশ্রামে আনিতে লাগিলেন, তখন তিনি ভাবিলেন, 'আর না'। কাহাকেও কিছু না বলিয়া তল্পী বাঁধিয়া মুটের মাথায় দিয়া তীর্থযাত্রা করিলেন। এই স্থানে চাঁদ শাহ ফকিরের কার্যও স্মরণীয়। তিনিও সীতারামের একজন পরমহিতৈষী, সীতারামের মত আশ্রিতবৎসল উন্নতহৃদয় লোকদ্বারাই যথার্থ ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব জানিয়া তাঁহার সহায়। তিনিও সহসা সীতারামকে ত্যাগ করেন নাই। চন্দ্রচূড়ের মতই তিনি হতভাগ্য দুর্মতি সীতারামের নানা পাপকার্যে ব্যথিত হইয়া অবশেষে মহম্মদপুর ত্যাগপূর্বক একেবারে মক্কা চলিয়া যান। চাঁদ শাহেরই পরামর্শে সীতারাম রাজধানীর নাম মহম্মদপুর রাখেন। হিন্দু-মুসলমানে সম্প্রীতি না হইলে যে ভবিষ্যতের ভারতীয় রাষ্ট্র গঠিত হইবার নহে, বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্র এখানে সেইরূপ ইঙ্গিত করিতেছেন। সীতারামের দুর্নীতিপরায়ণতায় চাঁদ শাহের মনে যে কি গভীর পরিতাপ হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। তাই মক্কার পথে কাশীযাত্রী চন্দ্রচূড়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তিনি বড় দুঃখেই বলিয়াছিলেন, 'যে দেশে হিন্দু আছে সে দেশে আর থাকিব না ; এই কথা সীতারাম শিখাইয়াছে।' বাস্তবিক শেষ জীবনে সীতারাম হিন্দুনামে কলঙ্ক অর্পণ করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক সীতারাম কি ছিলেন জানি না ; উপন্যাসে তাদৃশ একজন শক্তিশালী হিন্দু রাজার শোচনীয় পরিণতি কোনও কোনও ঐতিহাসিক সমালোচক সহ্য করিতে পারেন নাই। আমরা ইতিহাস নিয়া তত ব্যস্ত নহি। ভবিষ্যতের রাজনৈতিক উন্নতিকামী হিন্দু যদি ঔপন্যাসিক সীতারামের পরিণতিদর্শনে সুশিক্ষা পান তবে বঙ্কিমের সীতারাম রচনা নিষ্ফল হইবে না।

দেবীচৌধুরাণীর রঙ্গরাজ ও চন্দ্রশেখরের রামচরণ, এক শ্রেণীর পাত্র। উভয়েই সাহসী, প্রভুভক্ত, ক্ষিপ্রহস্ত। রামচরণে সাহসের সঙ্গে এক শ্রেণীর রসিকতা আছে, রঙ্গরাজে ততখানি না থাকিলেও ব্রজেশ্বরের নৌকা চড়াও করার সময়ে একটু রসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। রঙ্গরাজ অপেক্ষা রামচরণ চতুর, কিন্তু রামচরণ অপেক্ষা রঙ্গরাজের প্রভুভক্তি অধিক মর্মস্পর্শী, তাহার কারণ দেবীরাণীকে রঙ্গরাজ

মায়ের মত দেখে। ব্রজেশ্বরের সহিত আলাপে দেবীরাণীর রূপের কথায় রঙ্গরাজ বলিয়াছিল, 'আমাদের মা ভগবতীর তুল্য'; বয়সের কথায় বলিয়াছিল, 'সন্তান মা'র বয়সের হিসাব রাখে না।' রঙ্গরাজ দেবীকে মা বলে, মা'র মত জ্ঞান করে, আবার স্বীয় বয়োজ্যেষ্ঠতা হেতু আশীর্বাদও করে। দেবীকে রক্ষা করিবার জন্য সে শরীরপাত করিতে কৃতসঙ্কল্প। দেবী যখন দেবীগিরি বিসর্জন দিয়া গার্হস্থ্যধর্ম পালন করিতে যাইতেছেন, তখন এই মহাসাহসী মহাপ্রাণ বীর কাঁদিয়া আকুল। সীতারামে রঙ্গরাজ বা রামচরণের তুল্য পাত্র গঙ্গারাম, যতদিন তাহার রমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই। রমার সহিত সাক্ষাতের পর সে রঙ্গরাজের ত নহেই, রামচরণেরও পদস্পর্শ করিবার যোগ্য নহে।

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

## ধর্মব্যাখ্যা

বঙ্গদর্শনে 'আনন্দমঠ' শেষ হইবার পরেই বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্মের সমর্থকরূপে এক বৃহৎ মসীসংগ্রামে ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেন। খৃস্টান মিশনারীদিগের পরধর্মাসহিষ্ণুতা ইদানীং সর্বত্রই বিদিত; এদেশে তাঁহারা পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচলনে এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিপুষ্টি বিষয়ে নানা সাহায্য করিলেও, এ দেশে ধর্ম ও আচারের প্রতি তাঁহাদের পুনঃ পুনঃ অন্যায় ও বিদ্বেষপূর্ণ আক্রমণ হেতু তাঁহারা দেশীয় সমাজের স্থায়ী কৃতজ্ঞতা অর্জন করিতে সমর্থ হন নাই। রাজা রামমোহন রায়ের কাল হইতে দেশের শিক্ষিত সমাজের নেতৃস্থানীয় অনেককেই মিশনারীদিগের সহিত কখনও বাগ্‌যুদ্ধে কখনও মসীযুদ্ধে ব্যাপৃত হইতে হইয়াছে। মিশনারীদিগের সহিত সংগ্রামের জন্যই রামমোহনের 'ব্রাহ্মণসেবধির' জন্ম। ব্রাহ্মণসেবধির ভূমিকায় রাজা রামমোহন লিখিয়াছিলেন—

> শতার্ধ বৎসর হইতে অধিককাল এদেশে ইংরেজের অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে তাহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বারা ইহা সর্বত্র বিখ্যাত ছিল যে তাহাদের নিয়ম এই যে কাহারো ধর্মের সহিত বিপক্ষতাচরণ করেন না ও আপনার আপনার ধর্ম সকলে করুক ইহাই তাঁহাদের যথার্থ বাসনা পরে পরে অধিকারের ও বলের আধিক্য পরমেশ্বর ক্রমে ক্রমে করিতেছেন। কিন্তু ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাঁহারা মিসনরি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে ব্যক্তরূপে তাহাদের ধর্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খৃস্টান করিবার যত্ন নানাপ্রকারে করিতেছেন। প্রথম প্রকার এই যে নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক সকল রচনা

ও ছাপা করিয়া যথেষ্ট প্রদান করেন যাহা হিন্দুর ও মোছলমানের ধর্মের নিন্দা ও হিন্দুর দেবতার ও ঋষির জুগুপ্সা ও কুৎসাতে পরিপূর্ণ হয়।........

ব্রাহ্মণসেবধির পর 'তত্ত্ববোধিনী' খৃস্টান মিশনারীদিগের আক্রমণ হইতে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করিবার যত্ন করেন। তত্ত্ববোধিনীর এক প্রবন্ধে ৺অক্ষয়কুমার দত্ত লিখিয়াছিলেন—

> ধর্ম যে এককালীন নষ্ট হইল এ দেশ যে উচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল এবং আমাদিগের হিন্দু নাম যে চিরকালের মত লুপ্ত হইবার সম্ভব হইল।...... অতএব যদি আপনার মঙ্গল প্রার্থনা কর, পরিবারের হিত অভিলাষ কর, দেশের উন্নতি প্রতীক্ষা কর, এবং সত্যের প্রতি প্রীতি কর, তবে মিশনারীদিগের সংশ্রব হইতে বালকগণকে দূরে রাখ।

তাহার পর 'নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা' 'ধর্মরাজ' প্রভৃতি বহু মাসিক পত্র মিশনারীদিগের সহিত অল্পাধিক লড়াই করিয়াছে। আচার্য কেশবচন্দ্র সেনও মিশনারীগণের সহিত বাগযুদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে নহে, খৃস্টধর্মের তাঁহার স্বপ্রদত্ত ব্যাখ্যা সম্বন্ধে। সে যাহা হউক ১৮৮২ খৃস্টাব্দে জেনারেল এ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন নামক মিশনারী কলেজের[১] অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড মিঃ হেস্টি শোভাবাজার রাজ-পরিবারের একটা শ্রাদ্ধ উপলক্ষে হিন্দুসমাজের প্রতিমাপূজা ও দেবদেবীগণের উপর এক বীভৎসরুচিপূর্ণ আক্রমণ করেন। হেস্টি সাহেবের চিঠি স্টেটস্‌ম্যান্ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সাহেবের বোধ হয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা করিয়া হাতে যথেষ্ট সময় থাকিত, এবং তাঁহার উৎসাহও অপরিমিত ছিল। যে কারণেই হউক, পূর্বতন বহু মিশনারীর কীর্তিক্ষেত্র সুপ্রাচীন হিন্দু সমাজের শৈলেয়নদ্ধ শিলাতটে এই অধ্যাপকপুঙ্গবের বপ্রক্রীড়া করিবার সখ অত্যন্ত বলবৎ হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি নিজের শৃঙ্গের দৃঢ়তা যতটা অপরিমেয় মনে করিয়াছিলেন, কার্যতঃ দেখিলেন ততটা নয়। শৃঙ্গাঘাত করিয়াই তিনি বুঝিয়াছিলেন, শৈলেয়ের নিম্নে নরম মাটি বড় কম—সবই নিরেট শিলা। তাহাতে আহত হইয়া তাঁহার শৃঙ্গ ভগ্ন হইবার উপক্রম হইল।

হেস্টি সাহেবের কৃত হিন্দুধর্মগ্লানির প্রত্যুত্তরে অনেকেই স্টেটস্‌ম্যানে চিঠি পাঠান। বঙ্কিমচন্দ্রও একখানি পাঠাইয়াছিলেন। ঐ পত্রে তিনি স্বীয় নাম গোপন করিয়া 'রামচন্দ্র' এই নাম ধারণ করেন। হেস্টি 'রামচন্দ্রের' চিঠিখানিরই জবাব দেওয়া আবশ্যক মনে করিলেন। তদুত্তরে রামচন্দ্রও আর একখানি লিখিলেন। এইরূপে হেস্টি বোধ হয় মোট ছয়খানি এবং রামচন্দ্র মোট চারিখানি পত্র লিখেন। 'রামচন্দ্রে'র প্রথম তিনখানি চিঠি হেস্টির প্রথম চারিপত্রের জবাব, চতুর্থখানি তাঁহার স্বকীয় তৃতীয় পত্রের সুবিখ্যাত রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত

১। ১৯০৮ খৃস্টাব্দে এই কলেজ ও ফ্রি চর্চ অব্ স্কটল্যাণ্ডস্ ইনস্টিটিউশন ও ডফ্ কলেজ নামক অন্য এক মিশনারী কলেজ মিলিত হইয়া স্কটিশ্ চার্চেস্ কলেজ নামধারণ করিয়াছে।

এক সমালোচনার উত্তর। এই পত্রগুলিতে অনেক তর্ক বাদ-বিতণ্ডা, অনেক কথা-কাটাকাটি আছে। তৎসমুদয় আমাদের আলোচ্য নহে। বেদ ও হিন্দুর অন্যান্য ধর্মশাস্ত্র, এবং সংস্কৃত কাব্যাদির মর্ম দেশীয় পণ্ডিতগণই ভাল বুঝেন কি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভাল বুঝেন ইহা এই তর্কের একটা প্রধান বিষয় ছিল। এই তর্কোপলক্ষে 'রামচন্দ্র'কে আধুনিক হিন্দুধর্মের একটা ইতিহাস ও বৈদিকধর্মের সহিত উহার সম্বন্ধাদি সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিতে হইয়াছিল। উহা পাঠকের জানার প্রয়োজন আছে। রামচন্দ্র লিখিলেন[১]—

> প্রত্যেক সর্বাঙ্গপূর্ণ ধর্মেরই তিনটা অঙ্গ আছে। প্রথম—মূলসূত্রাবলী বা তত্ত্বসমূহ—যাহার উপর ঐ ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয়—উপাসনাপদ্ধতি। তৃতীয়—চারিত্রনীতি, যাহা প্রথমোক্ত মূলসূত্রাবলীর সহিত অল্লাধিক পরিমাণে সংশ্লিষ্ট।
>
> হিন্দুধর্মের প্রথম অঙ্গের আবার দুই ভাগ। প্রথম ভাগ—দর্শন; দ্বিতীয়—পুরাণ-কাহিনী। পুরাণের মর্যাদা দর্শনের তুলনায় কম। হিন্দুর দর্শন বহু—বস্তুতঃ প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই স্ব স্ব দর্শনশাস্ত্র আছে; কিন্তু কতকগুলি সিদ্ধান্ত সকল দর্শনের মধ্যে সাধারণ। এই দর্শনশাস্ত্রগুলি সবই সম্ভবতঃ বৈদিকযুগের পরবর্তী, এবং বৈদিকধর্ম হইতে আধুনিক কালের হিন্দুধর্মগুলির পার্থক্যসাধক। হিন্দুদর্শনগুলির সকল সিদ্ধান্তের মধ্যে একটি সিদ্ধান্তই প্রধান, ভারতের ভাগ্যগঠনে উহার প্রভাব অসীম। ঐ সিদ্ধান্তটি কপিলের। উহার নাম প্রকৃতিপুরুষ-বিবেক। আধুনিক হিন্দুধর্মের গঠনকর্তৃগণ সকল দর্শনের সিদ্ধান্তই যথাযোগ্য গ্রহণ করিলেও, ঐ প্রকৃতিপুরুষতত্ত্বটি তাঁহাদের সকলের সৃষ্টির মেরুদণ্ডরূপ। প্রকৃতির প্রকাশ হয় শক্তিতে, তাই হিন্দুগণ প্রকৃতিকে শক্তিরূপে পূজা করে। কালী ও দুর্গা প্রাকৃতিকী শক্তিরই প্রকারভেদ—কালী সংহারিণী শক্তি; তাই ভয়ঙ্করী; দুর্গা সংগঠনী শক্তি; তাই উজ্জ্বলা। পুরুষও সাত্ত্বিকী, রাজসিকী ও তামসী এই তিন অবস্থায় বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্র এই তিন নামে পূজিত হন। এই নামগুলি বৈদিক—কিন্তু বৈদিক দেবতার সহিত আধুনিক হিন্দুধর্মের দেবতাগণের স্বভাবগত পার্থক্য আছে। বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুদর্শন উভয়ই বৈদিক ধর্মকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলে, তাহার পর যে ধর্মের উদ্ভব হয়, তাহার মাল মসলা প্রাচীন, কিন্তু ভিত্তি নূতন হইলেও বৃহত্তর ও দৃঢ়তর। সর্বব্রহ্মবাদ, ও বহুদেববাদ, তর্ক ও অপরোক্ষানুভূতি সকল মিলাইয়া হিন্দুধর্মের গঠন হইয়াছে—ইহা অপৌরুষেয় নয়, কিন্তু মানুষী বিচক্ষণতার পরাকাষ্ঠা।
>
> সাংখ্যের প্রকৃতিপুরুষই বৈষ্ণবের রাধাকৃষ্ণ। প্রকৃতি হইতে পুরুষের

---

১। বলা বাহুল্য রামচন্দ্রের সকল চিঠিই ইংরাজীতে লিখিতে হইয়াছিল। এস্থলে তাহার মর্মানুবাদ মাত্র প্রদত্ত হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরাজীরচনায় কিরূপ দক্ষতা ছিল ঐ পত্রগুলি তাহার প্রমাণ। হেস্টিও এক চিঠিতে বঙ্কিমের ইংরাজীতে দখলের প্রশংসা করিয়াছিলেন।

বিবিক্ততানুভূতিই মোক্ষের হেতু বলিয়া সাংখ্যদর্শনের নির্দেশ। সাংখ্য বলেন প্রকৃতির সহিত পুরুষের যে মিলন উহা অবৈধ। এই অবৈধ মিলনই রাধাকৃষ্ণ প্রেম-কাহিনীতে রূপকাকারে ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু সাংখ্যে যে তথ্য দুঃখবাদের প্রভাবে অমনোজ্ঞ, রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনীতে তাহা পরা সুষমা, পরম আনন্দ ও চরম জ্ঞানের উৎস! য়ুরোপীয় সমালোচক ইহা বুঝে নাই বলিয়া রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলাকে দুর্নীতির পরাকাষ্ঠা মনে করে।

শিব ও উমার পরিণয় যাহা কালিদাস কুমারসম্ভবে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাও সাংখ্য তত্ত্বেরই উপর প্রতিষ্ঠিত। কবি এখানে দার্শনিকের অনেক উর্ধ্বে উঠিয়াছেন। কুমারসম্ভবের অপূর্ব শিক্ষা কোন্ পাশ্চাত্য কাব্যে আছে? য়ুরোপীয় সমালোচকগণ ও দুর্ভাগ্যক্রমে আধুনিক অনেক দেশীয় লোকও উহার মর্ম বুঝে নাই।

হিন্দুর উপাসনাপদ্ধতির মধ্যে অনেক আচারই ইদানীং প্রাণহীন ও অর্থহীন বলিয়া হিন্দুরাও স্বীকার করেন। মিশনারীরা প্রতিমাপূজাকে হিন্দুধর্মের সর্বস্ব বলিয়া মনে করে, বস্তুতঃ তাহা নহে, তাহার অতি ক্ষুদ্র অংশ। প্রতিমাপূজা হিন্দুমতে অবশ্যকর্তব্য নয়। হিন্দুর নিত্যকর্ম সন্ধ্যা ও আহ্নিকে প্রতিমাপূজা নাই। স্বধর্মনিষ্ঠ হিন্দু শিব ও বিষ্ণুকে প্রত্যহ পূজা করিতে বাধ্য বটে, কিন্তু তাঁহাদের প্রতিমাপূজা করিতে বাধ্য নহে। অধিকাংশ ব্রাহ্মণই প্রতিমার সাহায্যব্যতিরেকেই নিত্যোপাসনা করেন।

তবে প্রতিমাপূজার মূল কি? দেবপ্রতিমা বস্তুতঃ বালকের খেলনক নয়। মানুষ মনে মনে যে আদর্শ পোষণ করে, প্রত্যক্ষ জগতে তাহার প্রতিরূপ দেখিতে চায়। মানুষ সহজাত প্রেরণাবশেই কবি ও শিল্পী। আদর্শ শক্তি, আদর্শ সৌন্দর্য ও আদর্শ পবিত্রতার প্রতি মানবের হৃদয়ের যে প্রবল আকর্ষণ ও ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা তাহা প্রত্যক্ষরূপ আশ্রয় করিয়া ব্যক্ত হইতে চায়। কাব্য ও শিল্পমাত্রেরই উৎপত্তির প্রকৃত হেতু ইহাই। ঐরূপে মানুষের মনে ভগবদাদর্শও একটা আকার ধারণ করে, ঐ আকার প্রতিমারূপে ব্যক্ত হয়। হ্যামলেট নাটক বা প্রোমিথিউসের কাহিনীমূলক কাব্যের সৃষ্টি যদি অসমর্থনীয় না হয়, তবে প্রতিমার সৃষ্টিও অসমর্থনীয় নয়! হ্যামলেট বা প্রোমিথিউসের যে আদর উহাকে intellectual worship বলা যায়, উহা যেমন সমর্থনীয় —দেবপ্রতিমার religious worshipও তেমনই সমর্থনীয়।

প্রতিমা ও দেবতা কোনও উপাসকই এক মনে করে না। প্রতিমাকে প্রত্যক্ষ অবলম্বনমাত্র করিয়া অপ্রত্যক্ষ ভগবানের উদ্দেশে হিন্দু ভক্তি-অর্ঘ দান করে। প্রতিমামাত্রের কোনও মর্যাদা নাই। চিত্তশুদ্ধির জন্য উপাসক উহাকে উপায়রূপে গ্রহণ করে বলিয়া উহা পবিত্র হয়। এ যেন তাহার নিজের চিত্তের সহিত একটা বোঝাপড়ামাত্র। যতক্ষণ উহাকে ভগবদুপাসনার অঙ্গরূপে

ব্যবহার করা হয়, ততক্ষণই তাহার চিত্ত উহার নিকট ভক্তিবিনম্র হয়; উপাসনার প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে সে আর ভক্তি করে না, জলে নিক্ষেপ করে।

হিন্দুদেবতার মূর্তিকে অনেকে বড় বীভৎস, বড় কুৎসিত দেখে। বস্তুতঃ হিন্দুর দেবতার মূর্তি প্রস্তরে বা মৃত্তিকায় এ পর্যন্ত যথোপযুক্ত নৈপুণ্যসহকারে নির্মিত হয় নাই; ভারতে ভাস্কর্যবিদ্যা উন্নতিলাভ করে নাই বলিয়াই এই দশা হইয়াছে। বাঙ্গালায় যে প্রতিমা নির্মিত হয়, উহা শিল্পের হিসাবে একবারে জঘন্য। সঙ্গতিশালী হিন্দুদের য়ুরোপ হইতে রাধাকৃষ্ণমূর্তি নির্মাণ করিয়া আনা উচিত।[১]

হিন্দুধর্মের তৃতীয় অঙ্গ হিন্দুর চারিত্রনীতি জগতের যে কোন ধর্ম-সম্প্রদায়ের সমস্ত চারিত্রনীতি অপেক্ষা মহৎ ও মনোজ্ঞ। হিন্দুর সমাজনীতি আরও মহৎ আরও সুন্দর। কিন্তু এ কথা যেন কেহ বিস্মৃত না হন যে, ঐ চারিত্রনীতি ও সমাজনীতির মধ্যে এমন অনেক বিষয় আছে যাহা বস্তুতঃ হিন্দুধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ নহে। চারিত্রনীতির অনেকটাই ধর্মনীতির বাহিরে; উহা pure Ethics। সমাজনীতিতেও জাতিভেদ প্রভৃতির সহিত ধর্মনীতির সম্বন্ধ নাই। একাধিক হিন্দুধর্ম-সম্প্রদায় জাতিভেদ মানে না।

হেস্টি বলিতে পারেন হিন্দুধর্ম হইতে প্রতিমাপূজা ও অন্যান্য আচার এবং জাতিভেদ বাদ দিলে উহার থাকে কি? উত্তর, ধানের তুষ বাদ দিলে যাহা থাকে তাহাই—অর্থাৎ প্রকৃত শস্য।

হেস্টির সহিত মসীসংগ্রামেই হিন্দুধর্মসম্বন্ধে বঙ্কিমের মত প্রথম স্পষ্টভাবে ব্যক্ত

১। এইখানে বঙ্কিমের যুগোচিত শিল্পজ্ঞানের ও শিল্পসংক্রান্ত রুচির সঙ্কীর্ণতা লক্ষ্য করিবার যোগ্য। ভাস্কর্যবিদ্যা এ দেশে উন্নতি লাভ করে নাই ইহা নূতন কথা বটে! তবে বঙ্কিম নিজের ভ্রম অল্পকাল মধ্যেই বুঝিয়াছিলেন ও সংশোধন করিয়াছিলেন। সীতারামে তিনি ললিতগিরির বর্ণনাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "এখন শোভার মধ্যে শিখর দেশে চন্দন বৃক্ষ, আর মৃত্তিকাপ্রোথিত ভগ্নগৃহাবশিষ্ট প্রস্তর, ইষ্টক, বা মনোমুগ্ধকর প্রস্তরগঠিত মূর্তিরাশি। তাহার দুই-চারিটা কলিকাতার বড় বড় ইমারতের ভিতর থাকিলে কলিকাতার শোভা হইত। হায়! এখন কিনা হিন্দুকে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্কুলে পুতুল গড়া শিখিতে হয়। কুমারসম্ভব ছাড়িয়া সুইন্‌বরণ্ পড়ি, গীতা ছাড়িয়া মিল পড়ি, আর উড়িষ্যার প্রস্তরশিল্প ছাড়িয়া সাহেবদের চীনের পুতুল হাঁ করিয়া দেখি। আরও কপালে কি আছে বলিতে পারি না।" —সীতারাম ২য় খণ্ড, ১৩শ পরিচ্ছেদ

বঙ্কিম রাধাকৃষ্ণমূর্তি য়ুরোপ হইতে গড়াইয়া আনিবার উপদেশ দিয়াছেন। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ হিন্দুভাবের ভাবুক নন বলিয়া তাঁহাদের কৃত হিন্দুশাস্ত্রব্যাখ্যা কখনই অভ্রান্ত ও সুন্দর হইতে পারে না ইহা যিনি স্বীকার করেন, তিনি রাধাকৃষ্ণলীলার মর্মানভিজ্ঞ ও উহার প্রকৃত মর্মগ্রহণে প্রায় অসমর্থ বিদেশীয় শিল্পীদিগের দ্বারা রাধাকৃষ্ণমূর্তি যে চারুতর রূপে নির্মিত হইবে ইহা কিরূপে বিশ্বাস করিলেন? সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রথম নিদান বা ঐকান্তিকী তদ্ভাবভাবিততা। তাহা যেখানে অসম্ভব তথায় সুন্দর মূর্তি কিরূপে গঠিত হইবে? বস্তুতঃ বঙ্কিম হিন্দু আর্টের তৎকালপ্রচলিত য়ুরোপীয় সমালোচনা পাঠ করিয়া কিঞ্চিৎ বিভ্রান্ত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

হয়। তৎপূর্বে বঙ্গদর্শনে দুই-একটি প্রবন্ধে তৎসম্বন্ধে সামান্য আভাস মাত্র পাওয়া যায়।[১] হিন্দু সমাজনীতির সমর্থন তাঁহার নানা উপন্যাসে আছে। সে যাহা হউক, হের্বাটের সহিত বিচারে বঙ্কিম যে সকল মত ব্যক্ত করিয়াছেন উহার সম্যক আলোচনা এ গ্রন্থে সম্ভব নহে। কেবলই যে দর্শনশাস্ত্র বা বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে আধুনিক হিন্দুধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে ইহা ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বসম্মত মত নহে। উপনিষদ্ বৈদিক ধর্মকে একেবারে দূর করেন নাই। উন্নততর অধ্যাত্মজ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্মও বৈদিকধর্মেরই এক সন্তান। বৈদিক ঈশ্বরতত্ত্বের ক্রমাভিব্যক্তি বা সংস্কারক্রমে ঔপনিষদ ঈশ্বরতত্ত্ব এবং উহারই পরিণতি-বিশেষ-ক্রমে বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব হয়। বৈদিকধর্ম এদেশে এককালে কখনই লুপ্ত হয় নাই—ভারতের নানা প্রদেশে পূর্বপ্রচলিত নানা ধর্ম ও আচার ক্রমশঃ জীর্ণ করিতে করিতে ইহা বর্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। হিন্দুধর্মের বিশেষত্ব—ইহার জীর্ণ করিবার ক্ষমতা অসীম। ইহার দর্শনশাস্ত্র ইহাকে এই ক্ষমতা দান করিয়াছে। হিন্দু Theology বা ঈশ্বরতত্ত্ব অতি ব্যাপক। বহুত্বের মধ্যে একত্বের স্থাপন হিন্দুধর্মতত্ত্বের মূলসূত্র। ঐ মূলসূত্রই ইহার ব্যাপকত্বের মূল। ইসলাম বা খৃস্টান ধর্ম পরধর্মাসহিষ্ণু বিদেশীয় বিজেতৃগণের ধর্ম না হইয়া বিজিতগণের ধর্ম হইলে তাহারা হিন্দুধর্মের বিশাল উদরে স্থান পাইতে পারিত। হিন্দুধর্ম স্বীয় বিজয়যাত্রার পথে লৌকিক আচার ও স্থানীয় সংস্কারসমূহ কতক স্বীকার ও কতক সংস্কার করিয়া নিজ সমুন্নত ধর্মনীতি, সমাজনীতি ও চারিত্রনীতির দ্বারা ঐগুলিকে এমন ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে যে, তাহারা ক্রমশঃ উহার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। রোম যেরূপ বিদেশীয় রাষ্ট্রগুলিকে স্বীয় নাগরিকত্ব সম্মান দান করিয়া স্বীয় অঙ্গীভূত করিয়া লইত, হিন্দুধর্মের প্রসারও কতকটা সেই রীতিতে হইয়াছে। যুগে যুগে এইরূপে নানাধর্ম ও নানা আচারকে জীর্ণ করিবার প্রক্রিয়ায় হিন্দুধর্মের প্রাচীন অর্থাৎ বৈদিক যুগের সংস্কার ও আচারগুলিও অনেকাংশে পরিবর্তিত হইয়াছে। কোনও দেবতার হয়ত নামমাত্র আছে, স্বভাব পরিবর্তিত হইয়াছে; কোনও কোনও আধুনিক দেবতাকে হয়ত প্রাচীন নাম নিতে হইয়াছে; যে আচারের মূলে যে অর্থ ছিল না, হয়ত সে আচার সে অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছে। ধর্মমতের বিকাশ ও পরিপুষ্টি এইরূপেই হয়। ইহা হিন্দুধর্মে যত স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়, অন্যত্র তত নহে, কারণ অন্য ধর্মের এত পুষ্টি হয় নাই।

সে যাহা হউক, হের্বাটের আক্রমণের দুইটি লক্ষ্যস্থল ছিল। একটি পৌত্তলিকতা, দ্বিতীয়টি দেবতত্ত্ব। বঙ্কিম তদুত্তরে বলিয়াছেন, পৌত্তলিকতা হিন্দুধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়, ইহা ছাড়িলেও হিন্দু হিন্দুই থাকে, তৎসঙ্গে তিনি প্রতিমাপূজার নিদানভূত মনস্তত্ত্বও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মত যে অনেকাংশে শাস্ত্রসম্মত তাহাতে

১। 'ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে?' 'মনুষ্যত্ব কি?' ইত্যাদি প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। 'বঙ্গদর্শনে কৃষ্ণচরিত্রও সমালোচিত হইয়াছিল।

সন্দেহ নাই। কিন্তু শাস্ত্রের মত ছাড়াও ইহাতে লক্ষ্য করিবার ও জানিবার বিষয় এই যে, তদানীন্তন বহু শিক্ষিত হিন্দুরই মত কতকটা ঐরূপ আকার ধারণ করিতেছিল। দেবতত্ত্ব সম্বন্ধে বঙ্কিম যাহা বলিয়াছেন তাহা অনেকাংশে শাস্ত্রমত হইলেও শাস্ত্র রাধাকৃষ্ণলীলাকে বা শিবপার্বতীকে কেবলই রূপক মনে করেন না। শাস্ত্রে প্রকৃতিপুরুষের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ বা হরগৌরীকে মিলাইয়া দেওয়া হইলেও প্রকৃতিপুরুষতত্ত্বের উদাহরণরূপে যে কৃষ্ণোপাসনা বা শিবশক্তির উপাসনা হিন্দু-সমাজে প্রথম আরব্ধ হইয়াছিল তাহাও মনে হয় না। বঙ্কিম অন্যত্রও রাধাকৃষ্ণ-লীলাকে রূপক বলিয়াছেন। য়ুরোপে ধর্মসম্বন্ধে স্বাধীন চিন্তার প্রসার আরব্ধ হইলে কতক কতক লোকে যেমন রূপকরূপে খৃস্টান শাস্ত্রগুলির ব্যাখ্যা করিত, বঙ্কিমের যুগেও অনেকে ঐরূপ আরম্ভ করিয়াছিলেন। 'প্রচারে' বঙ্কিমের প্রকাশিত 'গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি'তে আমরা ঐ প্রভাব স্পষ্ট দেখিতে পাইব। ইংরাজীশিক্ষা এদেশে যুক্তির প্রাধান্য ঘোষণা করিয়াছিল—দেশীয় শাস্ত্রও কোনও কালে উহা অস্বীকার করে নাই, তবে যুক্তিকে একেবারে নিরঙ্কুশ ও শাস্ত্রনিরপেক্ষ হইতে দেয় নাই। শিক্ষিত হিন্দুযুবক ও প্রৌঢ়গণের মনে যেমন ধীরে ধীরে আত্মাদর বাড়িতেছিল, তেমনই যুক্তির আলোকে তাহারা হিন্দুধর্মমত ও হিন্দু-আচারগুলিকে পরীক্ষা করিয়া লইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। এমন কি এই ব্যগ্রতার দরুন অনেক সময়ে তাহাদের অনেকেই যে-কোনো রূপ যুক্তি পাইলেই সন্তুষ্ট হইতেছিল। ইহাতে যে যথার্থ হিন্দুয়ানি বাড়িতেছিল তাহা নহে, তবে হিন্দু-ধর্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্মাবলম্বনের উৎসাহ ও প্রবৃত্তি মন্দীভূত হইয়াছিল। তবে উহা হেতু বা ফল, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না।

১৮৮২ খৃস্টাব্দের শেষ পাদে (অক্টোবর-নবেম্বরে) হেস্টির সহিত বঙ্কিমের মসীযুদ্ধ হয়। হেস্টির আক্রমণে নূতনত্ব কিছু নাই, তাঁহার পূর্ববর্তী অনেক মিশনারী অনেক বার ঐরূপ আক্রমণ করিয়াছেন, এমত অবস্থায় একটা সামান্য ছুতা অবলম্বন করিয়া (সে ছুতাটিও আবার বড় সুরুচিসঙ্গত নহে) হেস্টির ন্যায় শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে হিন্দুসমাজকে নূতন করিয়া আক্রমণ করিবার কি হেতু হইতে পারে, এ প্রশ্ন হয়ত অনেকেরই মনে উঠিবে। হেস্টি হয়ত অত্যন্ত উৎসাহী ও পরধর্মাসহিষ্ণু খৃস্টান ছিলেন। অধিকাংশ মিশনারীর ন্যায় তিনিও হয়ত ভাবিতেন তাঁহার ঈশ্বর বড় jealous (ঈর্ষাপরতন্ত্র) দেবতা। দ্বিতীয় হেতু এই যে, এই সময়ে হিন্দু সমাজের পূর্বকথিত আত্মাদরের প্রাবল্যে কলিকাতায় ও মফঃস্বলে হিন্দুধর্মের ঢোল বড় জোরতোড়ে বাজিতেছিল। সে কালের সাময়িক পত্রিকাগুলিতে কেবলই হিন্দুধর্মের আলোচনা ও হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতার বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ শাস্ত্রাপেক্ষ যুক্তি দ্বারা, কেহ বা শাস্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তি দ্বারা, কেহ বা তথাকথিত বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারা হিন্দুধর্ম সমর্থন করিতেছিলেন। বিরোধী ধর্ম-সম্প্রদায়গণ ইহা কিঞ্চিৎ বিচলিত ভাবে লক্ষ্য করিতেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজেও কেশববাবুর দল

আবার পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছিল—তাঁহার সমাজে ধ্বজস্থাপন, আরতি, হোম প্রভৃতি কয়েকটি হিন্দুধর্মসম্মত আচার নবভাবে এবং কতকটা নূতনতর ব্যাখ্যাসংযোগে প্রচুর উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে আচরিত হইতেছিল। অবশ্য তিনি ঐরূপ নূতন ভাবে খৃস্টান 'বাপ্তিস্মা' সংস্কারেরও অভিনয় করিতেছিলেন। সে যাহা হউক, তাঁহার প্রতিপক্ষগণ তাঁহাকে হিন্দুভাবাপন্ন বা পৌত্তলিক ভাবাপন্ন মনে করিয়া গালি দিতেছিলেন। এ দিকে দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবও অনাড়ম্বর ঐকান্তিকতার সহিত নিত্য নিত্য শিক্ষিত অশিক্ষিত বহু যুবক প্রৌঢ় ব্যক্তিদিগকে হিন্দু ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে অতি সরল ও উজ্জ্বল ভাবে গভীর তত্ত্বোপদেশ করিতেছিলেন। হিন্দুধর্মের এই পুনরভ্যুত্থানের লক্ষণ দেখিয়া হেস্টি ও তাঁহার সম্প্রদায় বিচলিত হইয়াছিলেন। তাই তিনি অনর্থক ঐরূপ অসঙ্গত ভাবে হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করেন, এবং তাই বঙ্কিমচন্দ্রও স্বীয় যুগোচিত ধারণা অবলম্বনে হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হন।

হেস্টির সহিত তর্কের এক বৎসর পরে (১৮৮৩ খৃস্টাব্দে) যখন বঙ্কিম যাজপুর হইতে হাওড়ায় বদলি হইয়া কলিকাতার সানকিভাঙ্গার বাসায় আসিয়া সাহিত্যিক চাঁদের হাট মিলাইলেন তখন তাঁহার বৈঠকখানায় ধর্মসম্বন্ধেও নিত্য খুব আলোচনা হইতে লাগিল। বঙ্কিমের হাতে ইহার কিছুকাল পূর্ব হইতে দেবীচৌধুরাণী অবয়বপ্রাপ্ত হইতেছিল। বঙ্কিম দেবীচৌধুরাণীতে হিন্দুধর্মের একটু ব্যাখ্যা জুড়িয়া দিলেন, অনুশীলনতত্ত্বকেও একটু একটু করিয়া আকার দিতে আরম্ভ করিলেন। দেবীচৌধুরাণীতে অনুশীলনতত্ত্বের বিশ্লেষণ নাই, কিন্তু ঐ তত্ত্বকে একটা মনোরম আকার দানের চেষ্টা আছে। এই তত্ত্ববিশ্লেষণ তিনি 'নবজীবনে' করিয়াছিলেন। উহার কথা এখনই আলোচনা করা যাইবে। পাঠকের মনে থাকিতে পারে, বঙ্কিম নিজে বলিয়াছেন, প্রথম বয়সে তিনি নাস্তিক ছিলেন, পরে তাঁহার হিন্দুধর্মে আস্থা জন্মে, এবং ভগবদ্ভক্তি তাঁহার মন হইতে সমস্ত নাস্তিকতা ও অপ্রতিষ্ঠ কুতর্কজাল দূর করিয়া দেয়। তথাপি ইহা বিশেষভাবে স্মরণীয় যে, তিনি যাহাকে প্রচলিত হিন্দুধর্ম বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তাহা কখনও সর্বাংশে গ্রহণ করিতে পারেন নাই[১]। তিনি পূর্বজন্মার্জিত সুকৃতিবলে ভগবদ্ভক্তিলাভ করেন এবং এজন্মে পিতার দৃষ্টান্তে ও তাঁহার নিকট প্রাপ্ত শিক্ষার[২] প্রভাবে গীতার নিষ্কাম কর্মতত্ত্বকে শ্রেষ্ঠনীতি বলিয়া বুঝেন। ঐ ভক্তিতত্ত্ব ও কর্মনীতিকে তিনি য়ুরোপীয় দর্শন ও চারিত্রনীতি-শাস্ত্রের আলোকে বিচার করিয়া অনুশীলনতত্ত্বে উপনীত হন। ঐ তত্ত্বের মূল ভক্তি—তাহা স্বদেশীয়, যদিও কিছু পাশ্চাত্য ভাবযুক্ত; উহার উপরে যে কর্মনীতির সৌধ নির্মাণ করা হইয়াছে, তাহা য়ুরোপীয় চারিত্রনীতি-

১। ধর্মতত্ত্ব সপ্তম অধ্যায়ে 'গুরু' ভূমিকাধারী বঙ্কিম বলিয়াছেন—"হিন্দুধর্ম মানি, হিন্দুধর্মের 'বকামি'গুলা মানি না। আমার শিষ্যদিগকেও মানিতে নিষেধ করি।"

২। দেবীচৌধুরাণীর উৎসর্গ পত্রে পিতাকে লক্ষ্য করিয়া বঙ্কিম লিখিয়াছিলেন "যাঁহার কাছে প্রথম নিষ্কাম ধর্ম শুনিয়াছিলাম, যিনি স্বয়ং নিষ্কামধর্মই ব্রত করিয়াছিলেন" ইত্যাদি।

শাস্ত্রের perfection তত্ত্বের পুনরুক্তি—যে তত্ত্ব য়ুরোপে বোধ হয় স্পিনোজা সর্বপ্রথম সূত্রাকারে প্রকাশ করেন, যাহা জার্মানির শ্রেষ্ঠ কবি ও চিন্তাশীল লেখক গ্যেটে নিজ জীবনে উপলব্ধি করিবার ও নিজ কাব্যে বিবৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। য়ুরোপীয়দিগের নিকট বঙ্কিম শিখিয়াছিলেন দৈহিক ও মানসিক সর্ববিধ বৃত্তির সুসমঞ্জস পরিণতিসাধনই মনুষ্যত্ব। উহার সহিত হিন্দুশাস্ত্র হইতে শিক্ষিত ভক্তি ও নিষ্কাম কর্মতত্ত্বের সমন্বয় করিয়া তিনি শিখাইয়াছেন—সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্তিতাই ভক্তি, এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই। সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্তিতার উপরও যে শুদ্ধতরা সাত্ত্বিকতরা ভক্তি আছে যাহা শ্রীগৌরাঙ্গদেব স্বয়ং আচরণ করিয়া পরকে শিখাইয়াছিলেন, বঙ্কিম সে পর্যন্ত পৌঁছিতে পারেন নাই। বৈষ্ণবগণের ভাষায় তিনি বড় জোর শান্তরস পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিলেন—তার উর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই। বঙ্কিমের প্রচারিত ভক্তির অনেকটাই যেন বুদ্ধিবৃত্তির ক্রিয়া—a function of the intellect মনে হয়। এরূপ মত যদিও কতকটা ব্যক্তিগত রুচি ও সামর্থ্যের বা পূর্বজন্মার্জিত যোগ্যতার ফল, তথাপি কতকটা বোধ করি যুগধর্মও বটে। তদানীন্তন শিক্ষিত সমাজে বৈষ্ণবগণের ব্যাকুলা ভক্তির আদর ছিল না, ব্রাহ্মসমাজে এক কেশবচন্দ্র ব্যতীত যে কয়জন যথার্থ ঈশ্বরভক্ত ছিলেন তাঁহারাও বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে শুষ্কা নীরসা ভক্তির চর্চা করিতেন।

যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে
মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্য-গীত-গানে,

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথে সে ভক্তির প্রকাশ হয় নাই; মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীতে হইয়াছিল, কিন্তু তাহা কিছুকাল পরে। প্রথম জীবনের নীরসারাধনার প্রভাব না থাকিলে বোধ হয় বিজয়কৃষ্ণে চৈতন্যদেবের শিক্ষা ষোল আনাই প্রতিফলিত দেখা যাইত। মোটের উপর বঙ্কিমের যুগ যুক্তিতর্কের যুগ—ভাবের যুগ নহে। সে যাহা হউক, বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন তত্ত্বলাভের ইতিহাস ধর্মতত্ত্বে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে—

> অতি তরুণ অবস্থা হইতে আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, "এ জীবন লইয়া কি করিব? লইয়া কি করিতে হয়? সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোকপ্রচলিত উত্তর পাইয়াছি, তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ জন্য অনেক ভোগ ভুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি, যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি, অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছি, এবং কার্যক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশী বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি। জীবনের সার্থকতা সম্পাদন জন্য প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিয়াছি। এই পরিশ্রম, এই কষ্টভোগের ফলে এটুকু শিখিয়াছি যে

সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্তিতাই ভক্তি। এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই। জীবন লইয়া কি করিব? এ প্রশ্নের এই উত্তর পাইয়াছি। ইহাই যথার্থ উত্তর আর সকল উত্তর অযথার্থ।.........

আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির এমন কি শক্তি থাকিবার সম্ভাবনা যে, যাহা আর্য ঋষিগণ জানিতেন না—আমি তাহা আবিষ্কৃত করিতে পারি? আমি যাহা বলিতেছিলাম তাহার তাৎপর্য এই যে, সমস্ত জীবন চেষ্টা করিয়া তাঁহাদিগের শিক্ষার মর্ম গ্রহণ করিয়াছি। তবে আমি যে ভাষায় তোমাদিগকে ভক্তি বুঝাইলাম, সে ভাষায় সে কথায় তাঁহারা ভক্তিতত্ত্ব বুঝান নাই। তোমরা উনবিংশ শতাব্দীর লোক, উনবিংশ শতাব্দীর ভাষাতেই তোমাদিগকে বুঝাইতে হয়। ভাষার প্রভেদ হইতেছে বটে কিন্তু সত্য নিত্য।

১৮৮৪ খৃস্টাব্দের মধ্যভাগে 'নবজীবনে' বঙ্কিমের অনুশীলনতত্ত্বব্যাখ্যা প্রকাশিত হইতে থাকে। শ্রদ্ধাস্পদ অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় ঐ পত্রের সম্পাদক ছিলেন। 'নবজীবন' প্রচারের ইতিহাস অক্ষয়বাবু এইরূপ দিয়াছেন—

সেই সময়ে কলিকাতার কলুটোলায় বঙ্গ সাহিত্যের সম্রাটরূপে বঙ্কিমবাবু বিরাজমান। শশধর তর্কচূড়ামণি মুঙ্গের হইতে আসিয়া পথিমধ্যে বর্ধমান বিজয় করিয়া কলিকাতায় শিবির স্থাপন করিতেছেন। বঙ্কিমবাবুর বৈঠকখানায় প্রতি রবিবারে সাহিত্যসঙ্গীত হয়।...... চূড়ামণি মহাশয়ও এক এক দিন থাকিতেন। সাহিত্য সেবার সভায় ধর্মের কাহিনী উঠিল। চূড়ামণি মহাশয় আলবার্ট হলে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। শাস্ত্রসঙ্গত ধর্মব্যাখ্যার সঙ্গে তিনি বিজ্ঞানের দোহাই জাঁকাইয়া দিতে লাগিলেন। ধর্ম বিজ্ঞানের উপর দাঁড়াইবে কথাটা নিতান্ত উল্টা কথা বলিয়াই আমার বোধ হয়। 'সাধারণীতে' এই মতের প্রতিবাদ করিলাম। ধর্মই সকলের আশ্রয়, ধর্মই সকলের অবলম্বন, ধর্ম আবার বিজ্ঞানের আশ্রয় লইবে কেন? এই সকল কথার আলোচনার ফলে নবজীবন প্রকাশিত হইল।[১]

অক্ষয়বাবু সম্পাদক হইলেও নবজীবনের প্রচারে বঙ্কিমচন্দ্রের উৎসাহ ও সহোদ্যোগিতা ছিল। নবজীবনের প্রথম সংখ্যা হইতেই বঙ্কিমচন্দ্র উহাতে 'ধর্মতত্ত্ব' প্রবন্ধাবলী প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বিজ্ঞানের উপর ধর্মের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্রের মত একই ছিল। বিশেষতঃ শ্রদ্ধাস্পদ শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় যে পন্থা অবলম্বন করিয়া হিন্দুধর্মের ও হিন্দু আচারের সমর্থন করিতেছিলেন তাহা যে নিতান্ত পিচ্ছল পন্থা ইহা উপলব্ধি করা কোনও চিন্তাশীল লোকের পক্ষেই দুঃসাধ্য ছিল না। দেহের electric point বলিয়া টিকির মাহাত্ম্য, কুশাসন non-conductor of electricity বলিয়া উহা উৎকৃষ্ট আসন ইত্যাদি

১। "বঙ্গভাষার লেখক"—'পিতাপুত্র' প্রবন্ধ।

যুক্তির [১] মূল্য শিক্ষিত সমাজের চক্ষে বড় অধিক ছিল না, এবং ঐরূপ ভিত্তির উপরে হিন্দুধর্মকে দাঁড় করাইতে গেলে যে উহার সনাতন মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ হইবে, ইহা বঙ্কিমবাবু ও অক্ষয়বাবু উভয়েই বেশ বুঝিয়াছিলেন। পূর্ণবাবু বলিয়াছেন যে, বঙ্কিম আলবার্ট হলে তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের এক বক্তৃতা শুনিয়া মনে মনে বিরক্তই হইয়াছিলেন। কিন্তু একথাও সত্য যে, তর্কচূড়ামণির বক্তৃতাসমূহ কলিকাতা ও মফঃস্বলে সাধারণ লোকের মধ্যে একটা বিরাট উৎসাহের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই উৎসাহের কারণ কি তাহা পূর্বেই নির্দেশ করিয়াছি। মানুষের স্বভাব এই যে, যেরূপ সিদ্ধান্ত তাহার অনুমত ও আকাঙ্ক্ষিত তাহার সংস্থাপক যুক্তিগুলিকে ভালরূপ বিচার করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তি তাহার কমই হয়। হিন্দুধর্ম জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠধর্ম এইরূপ সিদ্ধান্ত শিক্ষিত ও পণ্ডিত লোকের মুখে শুনিবার জন্য হিন্দুসমাজ তখন অত্যন্ত ব্যগ্র, তাই যে কেহ সুযুক্তি হউক কুযুক্তি হউক, হেতু হউক হেত্বাভাস হউক, যে কোনও উপায়ে ঐ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতেছিলেন, তাঁহার কথাই সূক্ষ্ম-বিচারালস লোকে আগ্রহের সহিত শুনিতেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই আগ্রহকে সমাজের উপচীয়মান স্বস্থতার চিহ্নরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং উহার সমুচিত খাদ্য জোগাইয়া সমাজদেহের বলবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন।

একদিক দিয়া দেখিতে গেলে বুঝা যাইবে তর্কচূড়ামণি মহাশয় যাহা করিতেছিলেন, বঙ্কিমও তাহাই করিতেছিলেন। একজন দাঁড়াইতে চাহিতেছিলেন য়ুরোপীয় বিজ্ঞানের উপরে; অপরে দাঁড়াইয়াছিলেন য়ুরোপীয় দর্শন ও চারিত্রনীতির উপরে। তর্কচূড়ামণির য়ুরোপীয় বিজ্ঞানে জ্ঞান অগাধ ছিল না, কাজেই সে পথে না গেলেই বোধ হয় ভাল হইত। তাঁহার মতগুলি শিক্ষিত যুবকেরা তেমন আদর করে নাই। বঙ্কিমের য়ুরোপীয় দর্শনে অধিকার গভীরতর ছিল, তাই তাঁহার মত তদানীন্তন শিক্ষিত সমাজ সাদরে বরণ করিয়াছিল। হিন্দুশাস্ত্রের মর্মগ্রহণে ও ব্যাখ্যায় তর্কচূড়ামণির পরিপক্কতা বঙ্কিম অপেক্ষা অধিক ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। শাস্ত্রকারগণ আপনাদের সংস্কারগুলি যে ভাবে লাভ করিয়াছিলেন তর্কচূড়ামণি মহাশয় তাহা বঙ্কিম অপেক্ষা ভাল বলিতে পারিতেন এবং তাহা বলিবার চেষ্টা করিলেই ভাল হইত; কিন্তু তিনি সমাজকে বোধ হয় তাহা শুনিতে তাদৃশ আগ্রহান্বিত দেখেন নাই। তিনি সমাজের অর্ধশিক্ষিতাংশের রুচিদ্বারা পরিচালিত হইয়াছিলেন। বঙ্কিম সেরূপ ভ্রমে পতিত হন নাই।

ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিম অনেক তত্ত্ব ও দেশীয়-য়ুরোপীয় অনেক মত আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে মিল, কোম্‌ত্‌, ফিক্‌টে, সীলী, হার্বার্ট স্পেন্সার, মেথিউ আর্ণল্‌ড্‌, বেদান্ত, গীতা, শাণ্ডিল্যসূত্র, পরকালতত্ত্ব, miracle সকলই আছে। বর্তমান গ্রন্থের স্বল্প পরিসরে উহার সম্যক্‌ আলোচনা সম্ভব নহে; তাহা করিতে

১। বর্তমান গ্রন্থের লেখক কৈশোরে ঢাকা নগরীতে এই সকল মত পণ্ডিতপ্রবর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের মুখেই শুনিয়াছিল।

হইলে স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিতে হয়। তাঁহার অনুশীলন তত্ত্বের যাহা আমি মূল বলিয়া মনে করি তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সংস্কারের সমন্বয়ে একটা তত্ত্ব দাঁড় করাইয়া মিল, কোমতে প্রভৃতির মত উল্লেখপূর্বক তাঁহার নিজ মত স্থাপন করিয়াছেন। মিল, কোমতে, স্পেন্সার সেকালের লোকের বড় প্রিয় ছিলেন। সীলীর দুইখানি বই এদেশে খুবই আলোচিত হইয়াছিল। কেশবচন্দ্রের খৃস্ট সম্বন্ধে ধারণা প্রধানতঃ সীলীর Ecce Homo গ্রন্থের শিক্ষা দ্বারাই গঠিত হইয়াছিল। বঙ্কিমও কতকটা ঐ গ্রন্থের আদর্শেই কৃষ্ণচরিত্র আলোচনা করেন। সীলীর অপর গ্রন্থ ধর্মতত্ত্বের কতক উপাদান জোগাইয়াছে।

ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিম হিন্দুধর্মের পরিণতির ইতিহাস এইরূপ দিয়াছেন—

> আমাদের সর্বাঙ্গসম্পন্ন হিন্দু ধর্মের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবে যে, ইহার যত পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা কেবল ইহাকে সর্বাঙ্গসম্পন্ন করিবার চেষ্টার ফল। ইহার প্রথমাবস্থা ঋগ্বেদসংহিতার ধর্ম আলোচনায় জানা যায়, যাহা শক্তিমান বা উপকারী বা সুন্দর তাহার উপাসনা, এই আদিম বৈদিক ধর্ম। তাহাতে আনন্দভাগ যথেষ্ট ছিল, কিন্তু সতের ও চিতের উপাসনার অর্থাৎ জ্ঞান ও ধ্যানের অভাব ছিল। এই জন্য কালে তাহা উপনিষদ সকলের দ্বারা সংশোধিত হইল। উপনিষদের ধর্ম চিন্ময় পরব্রহ্মের উপাসনা। তাহাতে জ্ঞানের ও ধ্যানের অভাব নাই, কিন্তু আনন্দাংশের অভাব আছে। ব্রহ্মানন্দপ্রাপ্তিই উপনিষদ্ সকলের উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু চিত্ত-রঞ্জিনী বৃত্তি সকলের অনুশীলন ও স্ফূর্তির পক্ষে সেই জ্ঞান ও ধ্যানময় ধর্মে কোনও ব্যবস্থা নাই। বৌদ্ধধর্মে উপাসনা নাই। বৌদ্ধেরা সৎ মানিতেন না, এবং তাঁহাদের ধর্মে আনন্দ ছিল না। এই তিন ধর্মের একটিও সচ্চিদানন্দ-প্রয়াসী হিন্দু জাতির মধ্যে অধিক দিন স্থায়ী হইল না। এই তিন ধর্মের সারভাগ গ্রহণ করিয়া পৌরাণিক হিন্দুধর্ম সংগঠিত হইল। তাহাতে সতের উপাসনা, চিতের উপাসনা, এবং আনন্দের উপাসনা প্রচুর পরিমাণে আছে। বিশেষ আনন্দভাগ বিশেষরূপে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাই জাতীয় ধর্ম হইবার উপযুক্ত এবং এই কারণেই সর্বাঙ্গসম্পন্ন হিন্দুধর্ম অন্য কোনও অসম্পূর্ণ বিজাতীয় ধর্মকর্তৃক বিজিত বা স্থানচ্যুত হইতে পারে নাই।

হেস্টির সহিত বিচারে বঙ্কিম হিন্দুধর্মের গঠনের যে ইতিহাস বা আনুমানিক বিবরণ দিয়াছিলেন, তাহাতে বেদের সহিত আধুনিক হিন্দুধর্মের ঐকান্তিক বিচ্ছেদের কথা বলিয়াছিলেন। সেখানে তিনি বেদকে হিন্দুর চক্ষে মৃত বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার মতে বৈদিক ধর্ম মৃত ধর্ম, আধুনিক হিন্দুধর্মের সহিত উহার কোন সম্বন্ধ নাই। ধর্মতত্ত্বে ততদূর যান নাই। বৈদিক ধর্মের মূল তত্ত্ব তিনি শক্তিমানের বা উপকারীর বা সুন্দরের উপাসনা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া আধুনিক হিন্দুধর্মে সেই তত্ত্ব পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বলিয়াছেন। তবে হেস্টির

সহিত বিচারে ধর্মের বাহ্যভাগ বা form লইয়া বিচার করিয়াছিলেন, এস্থলে তিনি উহার আন্তর ভাগ বা spirit লইয়া বিচার করিয়াছেন। সুতরাং দুই উক্তি নিতান্ত পরস্পরবিরোধী বলিয়া আশঙ্কা করিবার হেতু নাই। বস্তুতঃ কি বাহ্য ভাগে কি আন্তর ভাগে বৈদিকধর্ম প্রকৃত পক্ষে আর্যসমাজ হইতে কখনও লুপ্ত হয় নাই, কাজেই উহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলা যায় না। বৈদিক ধর্মের পরিণাম-ক্রমেই হিন্দুধর্মের বিকাশ হইয়াছে, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি।

সে যাহা হউক বঙ্কিমের উল্লিখিত সিদ্ধান্তগুলি অপ্রচুর যুক্তির সহিত প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই এবং ঐগুলি সূক্ষ্মবিচারসহ বলিয়াও হয়ত অনেকেরই মনে হইবে না। তথাপি একথা বলা যাইতে পারে যে, ঐ গুলিতে প্রচুর অন্তর্দৃষ্টি ও ভাবুকতার পরিচয় আছে এবং মোটের উপর ঐগুলি অযৌক্তিক নহে। এতৎ-প্রসঙ্গে বঙ্কিম ধর্মসংস্কারকগণকে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য সন্দেহ নাই। তিনি বলিতেছেন, "এক্ষণে যাঁহারা ধর্মসংস্কারে প্রবৃত্ত, তাঁহাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, ঈশ্বর যেমন চিৎস্বরূপ তেমন আনন্দস্বরূপ, অতএব চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি সকলের অনুশীলনের বিধি এবং উপায় না থাকিলে সংস্কৃত ধর্ম কখনও স্থায়ী হইবে না।" বঙ্কিমের ধর্ম ব্যাখ্যার বিশেষতঃ ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যায় ভক্তি যে কতকটা নীরস হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা পূর্বে বলিয়াছি। বঙ্কিম উহা না বুঝিয়াছিলেন তাহা নয়; কিন্তু য়ুরোপীয় চরিত্র-নীতিশাস্ত্রের Perfection theory-র সহিত ভক্তিতত্ত্বের সামঞ্জস্য বিধান করিতে গিয়া ঐ গোলে পড়িয়াছেন।

প্রতিমাপূজা সম্বন্ধে হেস্টির দূষণের প্রত্যুত্তরে বঙ্কিম যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমরা শুনিয়াছি। ধর্মতত্ত্বে তাঁহার সুবিবেচিত মত শুনা যাক্—

শিষ্য। প্রতিমাদির পূজা বিশুদ্ধ হিন্দুধর্মের নিষিদ্ধ না বিহিত?

গুরু। অধিকারভেদে নিষিদ্ধ এবং বিহিত। তদ্বিষয়ে ভাগবত পুরাণ হইতে কপিলোক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। ভাগবত পুরাণে কপিল ঈশ্বরের অবতার বলিয়া গণ্য। তিনি তাঁহার মাতা দেবহূতিকে নির্গুণ ভক্তিযোগের সাধন বলিতেছেন। এই সাধনের মধ্যে একদিকে সর্বভূতে ঈশ্বরচিন্তা, দয়া, মৈত্রী, যম নিয়মাদি ধরিয়াছেন, আর একদিকে প্রতিমাদর্শন পূজাদি ধরিয়াছেন; কিন্তু বিশেষ এই বলিতেছেন—"আমি সর্বভূতে ভূতাত্মারূপে অবস্থিত আছি। সেই আমাকে অবজ্ঞা করিয়া (অর্থাৎ সর্বভূতকে অবজ্ঞা করিয়া) মনুষ্য প্রতিমা পূজা বিড়ম্বনা করিয়া থাকে। সর্বভূতে আত্মস্বরূপ অনীশ্বর আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যে প্রতিমা ভজনা করে, সে ভস্মে ঘি ঢালে।" পুনশ্চ "যে ব্যক্তি স্বকর্মে রত, সে যত দিন না আপনার হৃদয়ে সর্বভূতে অবস্থিত ঈশ্বরকে জানিতে পারে, তাবৎ প্রতিমাপূজা করিবে।" বিধিও রহিল নিষেধও রহিল। যাহার সর্বজনে প্রীতি নাই, ঈশ্বর জ্ঞান নাই, তাহার প্রতিমাদির অর্চনা বিড়ম্বনা, আর যাহার সর্বজনে প্রীতি জন্মিয়াছে, ঈশ্বর জ্ঞান

জন্মিয়াছে, তাহারও প্রতিমাদি পূজা নিষ্প্রয়োজনীয় ; তবে যতদিন না সে জ্ঞান জন্মে, ততদিন বিষয়ী লোকের পক্ষে প্রতিমাদি পূজা অবিহিত নহে ; কেন না তদ্দ্বারা ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি জন্মিতে পারে। প্রতিমাপূজা গৌণ ভক্তির মধ্যে।

'নবজীবনের' একপক্ষ কাল পরেই 'প্রচার' প্রচারিত হয়।[১] বঙ্কিমের জ্যেষ্ঠ জামাতা ৺রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উহার সম্পাদক ছিলেন। বঙ্কিম বলিয়াছেন "প্রচার আমার সাহায্যে ও আমার উৎসাহে প্রকাশিত হয়। নবজীবনে আমি হিন্দুধর্ম—যে হিন্দুধর্ম আমি গ্রহণ করি—তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া নিয়মক্রমে লিখিতেছিলাম। প্রচারেও ঐ বিষয়ে নিয়মক্রমে লিখিতে লাগিলাম।"[২] প্রচার পত্রিকা প্রকাশিত হইবার পরই বঙ্কিমকে রবীন্দ্রনাথের সহিত অথবা আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত একটা ছোটখাটো সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ তখন আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হইলেও তরুণবয়স্ক, বয়স ১৮ বৎসর মাত্র। কিন্তু সেই বয়সেই তিনি কবি ও প্রবন্ধলেখক রূপে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। অল্প বয়সের লেখায় একটু চাপল্য স্বাভাবিক এবং উহা মার্জনীয়ও বটে। বঙ্কিমচন্দ্র যে রবীন্দ্রনাথের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহার কারণ তিনি রবীন্দ্রনাথের 'আক্রমণে'র পূর্বে আদিসমাজের আরও তিনজন সভ্য কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন ; ঐ সকল আক্রমণের তিনি তখন কোনও উত্তর দেন নাই। রবীন্দ্রবাবুর আক্রমণ ভারতীতে প্রকাশিত হইলে বঙ্কিম উহাকে বালচাপল্য মনে না করিয়া আদি ব্রাহ্মসমাজের একটা সম্মিলিত চেষ্টার নিদর্শন গণ্য করিয়া উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হন।

প্রচারের প্রথম সংখ্যায় বঙ্কিমের 'হিন্দুধর্ম'-শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রচারিত হইবার চারি মাস পরে রবীন্দ্রনাথ তৎসম্বন্ধে এক সভায় 'একটি পুরাতন কথা' শীর্ষক এক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন, এবং উহা ভারতী পত্রিকায়[৩] প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমচন্দ্র 'হিন্দুধর্ম' প্রবন্ধে দুইটি হিন্দুর তুলনা করেন, একজন আচারভ্রষ্ট কিন্তু যথার্থ ধর্ম বা সুনীতিপরায়ণ, আর একজন আচারশালী হইয়াও যথার্থ ধর্মভ্রষ্ট। প্রথমটির উদাহরণে বঙ্কিম লিখিলেন, ঐ ব্যক্তি কখনও মিথ্যা বলেন না, তবে যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা প্রয়োজনীয় অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয় সেইখানে কৃষ্ণোক্তি স্মরণপূর্বক মিথ্যা কহেন।[৪] রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের উক্তির অর্থ ভুল বুঝিয়া উক্ত প্রবন্ধে লিখিলেন—

---

১। প্রচার, আকারে বঙ্গদর্শনের অর্ধেক (তিন ফর্মা মাত্র) ছিল। উহার মূল্য ছিল দেড় টাকা। বঙ্গদর্শনের মূল্য তিন টাকা ছয় আনা ছিল।

২। প্রচার, প্রচারখণ্ড।

৩। ভারতী ১২৯১ অগ্রহায়ণ। প্রচার ও নবজীবন ঐ সনের শ্রাবণে প্রকাশিত হয়।

৪। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কর্ণ-বধের পূর্বে অর্জুন একবার যুধিষ্ঠিরমুখে গাণ্ডীবনিন্দা শ্রবণ করিয়া স্বীয় সত্য রক্ষার্থ তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন যে অর্জুনের যে সত্য তাহা রক্ষণীয় নহে, তাদৃশ সত্য লঙ্ঘন পাপ নহে বরং পুণ্য। এখানে

আমাদের দেশের প্রধান লেখক প্রকাশ্যভাবে, অসঙ্কোচে, নির্ভয়ে অসত্যকে সত্যের সহিত একাসনে বসাইয়াছেন, সত্যের পূর্ণ সত্যতা অস্বীকার করিয়াছেন, এবং দেশের সমস্ত পাঠক নীরবে নিস্তব্ধভাবে শ্রবণ করিয়া গিয়াছেন। সাকার-নিরাকার উপাসনা ভেদ লইয়াই সকলে কোলাহল করিতেছে, কিন্তু অলক্ষ্যে ধর্মের ভিত্তিমূলে যে আঘাত পড়িতেছে, সেই আঘাত হইতে ধর্মকে ও সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য কেহ দণ্ডায়মান হইতেছেন না। এ কথা কেহ ভাবিতেছেন না যে, যে সমাজে প্রকাশ্যভাবে কেহ ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করিতে সাহস করে, সেখানে ধর্মের মূল না জানি কতখানি শিথিল হইয়া গিয়াছে। আমাদের শিরার মধ্যে মিথ্যাচরণ ও কাপুরুষতা যদি রক্তের সহিত সঞ্চারিত না হইত, তাহা হইলে কি আমাদের দেশের মুখ্য লেখক পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া স্পর্ধাসহকারে সত্যের বিরুদ্ধে একটি কথা কহিতে সাহস করিতেন? অথচ কাহারও তাহা অদ্ভুত বলিয়াও বোধ হইল না। আমরা দুর্বল, ধর্মের যে অসীম আদর্শ চরাচরে বিরাজ করিতেছে, আমরা তাহার সম্পূর্ণ অনুসরণ করিতে পারি না, কিন্তু তাই বলিয়া আপনার কলঙ্ক লইয়া যদি সেই ধর্মের পাত্রে আরোপ করি, তাহা হইলে আমাদের দশা কি হইবে। যে সমাজের গণ্য ব্যক্তিরাও প্রকাশ্য রাজপথে ধর্মের সেই আদর্শপটে নিজ দেহের পঙ্ক মুছিয়া যায়,—সেখানে সেই আদর্শে না জানি কত কলঙ্কের চিহ্নই পড়িয়াছে, তাই তাহাদিগকে কেহ নিবারণও করে না। তা যদি হয়, তবে সে সমাজের পরিত্রাণ কোথায়? তাহাকে আশ্রয় দিবে কে, সে দাঁড়াইবে কিসের উপরে? সে পথ খুঁজিয়া পাইবে কেমন করিয়া? তাহার অক্ষয় বলের ভাণ্ডার কোথায়? সে কি কেবলই কুতর্ক করিয়া চলিতে থাকিবে, সংশয়ের মধ্যে গিয়া পড়িবে, আকাশের ধ্রুবতারার দিকে না চাহিয়া নিজের ঘূর্ণ্যমান মস্তিষ্ককেই আপনার দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্র বলিয়া স্থির করিয়া রাখিবে, এবং তাহারই ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়া লাটিমের মত ঘুরিতে ঘুরিতে পথপার্শ্বস্থ পয়ঃপ্রণালীর

মিথ্যাচরণই সত্য। বঙ্কিম ঐ উক্তি স্মরণ করিয়া উপরি উদ্ধৃত কথা লিখিয়াছিলেন। বঙ্কিম যদি তাঁহার কথা মূল উল্লেখপূর্বক স্পষ্ট করিয়া লিখিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় এত গোল হইত না। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি এইরূপ—

সত্যস্য বচনং সাধু ন সত্যাদ্বিদ্যতে পরম্।
তত্ত্বেনৈব সুদুর্জ্ঞেয়ং পশ্য সত্যমনুষ্ঠিতম্॥
ভবেৎ সত্যমবক্তব্যং বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ।
যত্রানৃতং ভবেৎ সত্যং সত্যঞ্চাপ্যনৃতং ভবেৎ॥
প্রাণাত্যয়ে বিবাহে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ।
সর্বস্বস্যাপহারে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ॥ ইত্যাদি

—মহাভারত, কর্ণ পর্ব, ৬৯ অধ্যায়।

মধ্যে গিয়া বিশ্রাম লাভ করিবে?......কোনখানেই মিথ্যা সত্য হয় না; শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু বলিলেও হয় না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও হয় না।......কঠোর সত্যাচরণ করিয়া আমাদের এই বঙ্গসমাজের কি এতই অহিত হইতেছে যে, অসাধারণ প্রতিভা আসিয়া বাঙ্গালীর হৃদয় হইতে সেই সত্যের মূল শিথিল করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছেন? কিন্তু হায়, অসাধারণ প্রতিভা ইচ্ছা করিলে স্বদেশের উন্নতির মূল শিথিল করিতে পারেন, কিন্তু সত্যের মূল শিথিল করিতে পারেন না।

ইহার উত্তরে বঙ্কিম লিখিলেন—

(রবীন্দ্রবাবুর) বক্তৃতাটি শুনি নাই, মুদ্রিত প্রবন্ধটি দেখিয়াছি। নিম্ন স্বাক্ষরকারী লেখক তাহার লক্ষ্য। ইহা আমার পক্ষে কিছুই নতন নহে। রবীন্দ্রবাবু যখন ক খ শেখেন নাই, তাহার পূর্ব হইতে এরূপ সুখ দুঃখ আমার কপালে অনেক ঘটিয়াছে। আমার বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা লিখিলে বা বক্তৃতায় বলিলে এ পর্যন্ত কোন উত্তর করি নাই। কখন উত্তর করিবার প্রয়োজন হয় নাই। এবার উত্তর করিবার একটু প্রয়োজন পড়িয়াছে......কিন্তু সে প্রয়োজনীয় উত্তর দুই ছত্রে দেওয়া যাইতে পারে। রবীন্দ্রবাবুর কথার উত্তরে ইহার বেশী প্রয়োজন নাই। রবীন্দ্রবাবু প্রতিভাশালী, সুশিক্ষিত, সুলেখক, মহৎস্বভাব, এবং বিশেষ প্রীতি, যত্ন, এবং প্রশংসার পাত্র। বিশেষতঃ তিনি তরুণবয়স্ক। যদি তিনি দুই একটি কথা বেশী বলিয়া থাকেন, তাহা নীরবে শুনাই আমার কর্তব্য তবে যে এ কয় পাতা লিখিলাম, তাহার কারণ রবির পিছনে একটা বড় ছায়া দেখিতেছি।

পাঠক বুঝিতেছেন 'ছায়া' অর্থে বঙ্কিম সমগ্র আদি ব্রাহ্মসমাজকে উদ্দিষ্ট করিতেছেন। তৎপরে তিনি বলেন—

প্রচার প্রকাশিত হইবার পর আমি আদি ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা চারিবার আক্রান্ত হইয়াছি। রবীন্দ্রবাবুর আক্রমণ চতুর্থ আক্রমণ। গড়পড়তায় মাসে একটি। এই সকল আক্রমণের তীব্রতা পরদায় পরদায় উঠিতেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম আক্রমণকারী বা সমালোচক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্বিতীয় সমালোচক স্বীয় নাম প্রকাশ করেন নাই। তৃতীয় আক্রমণকারী বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ। ইনি প্রচারে প্রকাশিত 'বাঙ্গালার কলঙ্ক'-শীর্ষক ঐতিহাসিক তথ্যমূলক প্রবন্ধের আলোচনা উপলক্ষে নব্যভারতে বঙ্কিমকে অনুচিত ও অনাবশ্যক গালাগালি করেন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বঙ্কিম বলেন যে রবীন্দ্রবাবু তাঁহার 'নায়েব' কৈলাসচন্দ্র সিংহের মত "মেছো হাটা হইতে গালি আমদানি করেন নাই; প্রার্থনামন্দির হইতে করিয়াছেন। .........রবীন্দ্রবাবু বলেন যে আমার এই মত যে, সত্য ত্যাগ করিয়া প্রয়োজনমতে মিথ্যা কথা বলিবে। বরং

আরও বেশী বলেন। ......সর্বনাশের কথা বটে, আদি ব্রাহ্মসমাজ না থাকিলে আমার হাত হইতে দেশ রক্ষা পাইত কি সন্দেহ!" তৎপরে আসল তর্কস্থলসম্বন্ধে বঙ্কিম বলিলেন—

রবীন্দ্রবাবু 'সত্য' এবং 'মিথ্যা' এই দুইটি শব্দ ইংরেজি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। সেই অর্থেই আমার ব্যবহৃত 'সত্য' 'মিথ্যা' বুঝিয়াছেন। তাঁহার কাছে সত্য Truth, মিথ্যা Falsehood. আমি 'সত্য' 'মিথ্যা' শব্দ ব্যবহারকালে ইংরেজির অনুবাদ করি নাই। এই অনুবাদপরায়ণতাই আমার বিবেচনায়, আমাদের মৌলিকতা, স্বাধীনচিন্তা ও উন্নতির এক বিঘ্ন হইয়া উঠিয়াছে। 'সত্য' 'মিথ্যা' প্রাচীন কাল হইতে যে অর্থে ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, আমি সেই অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। সে দেশী অর্থে, সত্য Truth, আর তাহা ছাড়া আরও কিছু। প্রতিজ্ঞারক্ষা, আপনার কথারক্ষা ইহাও সত্য। ......এ অর্থে 'সত্য' 'মিথ্যা' শব্দ ব্যবহার করা আমার উচিত হইয়াছে কি না ভরসা করি এ বিচার উঠিবে না। সংস্কৃত শব্দের চিরপ্রচলিত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া ইংরেজি কথার অর্থ তাহাতে লাগাইতে হইবে, ইহা আমি স্বীকার করি না। ......রবীন্দ্রবাবু 'সত্য' শব্দের ব্যাখ্যায় যেমন গোলযোগ করিয়াছেন, লোকহিত লইয়াও তেমনি—বরং আরও বেশী গোলযোগ করিয়াছেন।......এখন রবীন্দ্রবাবু বলিতে পারেন যে, "যদি বুঝিতে পারিতেছ যে, তোমার ব্যবহৃত শব্দের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া আমি ভ্রমে পতিত হইয়াছি, তবে আমার ভ্রমসংশোধন করিয়াই তোমার ক্ষান্ত হওয়া উচিত ছিল—আদি ব্রাহ্মসমাজকে জড়াইতেছ কেন?"... আমার সৌভাগ্য ক্রমে আমি রবীন্দ্রবাবুর নিকট বিলক্ষণ পরিচিত। শ্লাঘাস্বরূপ মনে করি,—এবং ভরসা করি, ভবিষ্যতেও করিতে পারিব যে, আমি তাঁহার সুহৃজ্জন মধ্যে গণ্য হই। চারিমাস হইল প্রচারের এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই চারিমাসমধ্যে রবীন্দ্রবাবু অনুগ্রহপূর্বক অনেকবার আমাকে দর্শন দিয়াছেন। সাহিত্যবিষয়ে অনেক আলাপ করিয়াছেন। এ প্রসঙ্গ কখনও উত্থাপিত করেন নাই। অথচ বোধ হয় যদি এ প্রবন্ধ পড়িয়া রবীন্দ্রবাবুর এমনই বিশ্বাস হইয়াছিল যে, দেশের অবনতি ও ধর্মের উচ্ছেদ এই দুইটি আমি জীবনের উদ্দেশ্য করিয়াছি, তবে যিনি ধর্মপ্রচারে নিযুক্ত আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, এবং স্বয়ং সত্যানুপ্রচারে যত্নশীল, তিনি এমন ঘোর পাপিষ্ঠের উদ্ধারের জন্য যে সে প্রসঙ্গ ঘুণাক্ষরেও উত্থাপিত করিবেন না, তারপর চারিমাস বাদে সহসা পরোক্ষে বক্তৃতার উৎস খুলিয়া দিবেন, ইহা আমার অসম্ভব বোধ হয়। তাই মনে করি এ উৎস তিনি নিজে খুলেন নাই, আর কেহ খুলিয়াছে।

উপসংহারে বঙ্কিম রবীন্দ্রবাবুকে সতর্ক করিয়া দিলেন—"সত্যের প্রতি কাহারও

অভক্তি নাই, সত্যের ভাণের উপর আমার বড় ঘৃণা আছে।[১]···এজিনিস এদেশে বড় ছিল না, এখন বিলাত হইতে ইংরেজির সঙ্গে বড় বেশী পরিমাণে আমদানী হইয়াছে। সামগ্রীটা বড় কদর্য। মৌখিক Lie direct সম্বন্ধে তাহাদের যত আপত্তি—কার্যতঃ সমুদ্রপ্রমাণ মহাপাপেও আপত্তি নাই। সেকালের হিন্দুর এই দোষ ছিল বটে, Lie direct সম্বন্ধে তত আপত্তি ছিল না; কিন্তু তত কপটতা ছিল না। দুইটিই মহাপাপ।······তাঁহার কাছে অনেক ভরসা করি এইজন্য বলিলাম।"

ইহার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ ভারতীতে সুদীর্ঘ 'কৈফিয়ৎ' দিলেন। তিনি বলিলেন, যে তিনি বঙ্কিমবাবুর কতকগুলি কথা ভুল বুঝিয়াছিলেন জানিয়া আনন্দিত হইলেন। রবীন্দ্রবাবু দেখাইতে চেষ্টা করিলেন যে, দোষ বঙ্কিমের লেখার যত, তাঁহার (রবীন্দ্রনাথের) তত নয়। এই প্রবন্ধে তিনি যথেষ্ট বিনয়-প্রকাশ করেন। তিনি বলেন "মেছুহাটাই বল, আর প্রার্থনা মন্দিরই বল, আমি কোথা হইতেও ফরমাস দিয়া কথা আমদানি করি নাই। হৃদয় হইতে উৎসারিত না হইলে সে কথা আমার মুখ দিয়া বাহির হইত না।······আমি বঙ্কিমবাবুর সহিত মুখামুখী উত্তর-প্রত্যুত্তর করিবার যোগ্য নহি, তিনিই আমার স্পর্ধা বাড়াইয়াছেন। তবে বঙ্কিমবাবুর হস্ত হইতে বজ্রাঘাত পাইবার সুখ ও গর্ব অনুভব করিবার জন্যই আমি লিখি নাই।"

এই ক্ষুদ্র সংগ্রামের এতখানি বিস্তৃত বিবরণ দিবার উদ্দেশ্য এই যে, প্রবীণের ও নবীনের এই সঙ্ঘর্ষ এককালে বেশ কৌতুক সৃষ্টি করিয়াছিল। দুইজনেই অতুল প্রতিভাশালী; একজন সাহিত্যক্ষেত্রে রাজরাজেশ্বররূপে সম্মানিত হইতে ছিলেন, আর একজন সেই অল্পবয়সেই অপরের অভাবে কালক্রমে তদীয় পদে অধিষ্ঠিত হইবার যোগ্যতা প্রদর্শন করিতেছিলেন। তাহা ছাড়া বঙ্কিমের মতাবলী যে হিন্দুসমাজে আন্দোলন না ঘটাইয়া ব্রাহ্মসমাজের একশাখায় এত পারাবতের পক্ষাস্ফালন কেন ঘটাইল তাহাও ভাবিবার যোগ্য। বিশেষতঃ হিন্দু সমাজের সহিত আদি ব্রাহ্মসমাজের অধিক সহানুভূতি ও ঘনিষ্ঠতা চিরদিনই ছিল। এই ব্যাপার হইতে অনেক সিদ্ধান্তই অনুমেয়।[২] কিন্তু এস্থলে এবিষয়ের অধিক আলোচনা বাঞ্ছনীয় নয়।

১। বঙ্কিম কোনও ক্ষেত্রেই humbug, sham ইত্যাদি সহ্য করিতে পারিতেন না, ইহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ১৫৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২। রবীন্দ্রনাথের সহিত বঙ্কিমের মসীসংগ্রাম শেষ হইলেও, আদিসমাজের প্রতিনিধিরূপে রবীন্দ্রনাথের সহিত (বঙ্কিমের মৃত্যুর পর) হিন্দুধর্মব্যাখ্যাতা চন্দ্রনাথ বসুর বহুদিন ধরিয়া বেশ তুমুল যুদ্ধ চলিয়াছিল। চন্দ্রনাথ ধীর ও গম্ভীরভাবে প্রায় পিতামহ ভীষ্মের মত ধর্ম সংগ্রাম করিয়াছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তখনও তারুণ্যসুলভ চপলতা পরিহার করেন নাই। অনেকেই মনে করেন তদীয় "হিং টিং ছট্" শীর্ষক ব্যঙ্গপূর্ণ কবিতায়—

সে যাহা হউক গুণানুরাগী বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথকে কদাপি স্নেহ করিতে বিরত হন নাই। রবীন্দ্রনাথও বঙ্কিমের প্রতি আর ঔদ্ধত্য বা অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন নাই। বঙ্কিমের মৃত্যুর পরে তিনি তৎসম্বন্ধে যে অতি মনোরম প্রবন্ধ লিখেন তাহাতে বলিয়াছিলেন, "একদিন আমার প্রথম বয়সে কোনও নিমন্ত্রণসভায় তিনি নিজ কণ্ঠ হইতে আমাকে পুষ্পমাল্য পরাইয়াছিলেন, সেই আমার জীবনের সাহিত্যচর্চায় প্রথম গৌরবের দিন। তাহার পরে সে দিন তিনি আমার প্রবন্ধ শ্রবণ করিয়া সমাদর সহকারে আমার বক্তৃতার স্থলে সভাপতি হইতে স্বীকার করিলেন; সে সৌভাগ্য অন্য লোকের পক্ষে এমন বিরল ছিল এবং সেই সমাদর বাক্য এমন অন্তরের সহিত উচ্চারিত হইয়াছিল যে, আজ তাহা লইয়া সর্বসমক্ষে গর্ব করিলে, ভরসা করি, সকলে আমাকে মার্জনা করিবেন।......সেই সকল উৎসাহ বাক্য সাহিত্য-পথযাত্রার মহামূল্য পাথেয়স্বরূপে আমার স্মৃতিভাণ্ডারে সাদরে রক্ষিত হইল; তদপেক্ষা উচ্চতর পুরস্কার আর এ জীবনে প্রত্যাশা করিতে পারিব না।"[১] সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে উক্ত বাদপ্রতিবাদ উল্লেখপূর্বক নিজের সেই বয়ঃসুলভ চাপল্যসম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"ভাবাবেশের কুহক কাটাইয়া তখন মল্লভূমিতে আসিয়া তাল ঠুকিতে আরম্ভ করিয়াছি। সেই লড়াইয়ের উত্তেজনার মধ্যে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গেও আমার একটা বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল।...এই বিরোধের অবসানে বঙ্কিমবাবু আমাকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হারাইয়া গিয়াছে—যদি থাকিত তবে পাঠকেরা দেখিতে পাইতেন বঙ্কিমবাবু কেমন সম্পূর্ণ ক্ষমার সহিত এই বিরোধের কাঁটাটুকু উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।" এই বিরোধের শেষ কণ্টকোদ্ধারে বঙ্কিমের বিপুল মহত্ত্ব ত আছেই, রবীন্দ্রনাথও উহা যে ভাবে স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারও মহত্ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ বিরোধের দুই বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ মাইকেলের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের এক তীব্র গর্হাপূর্ণ সমালোচনা করেন। 'জীবনস্মৃতি'তে তৎসম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "আমার বয়স তখন ঠিক ষোল। কিন্তু আমি ভারতীর সম্পাদকচক্রের বাহিরে ছিলাম না। ইতিপূর্বেই

> অতঃপর গৌর হতে এল হেন বেলা
> যবন পণ্ডিতদের গুরু-মারা চেলা।
> নগ্ন শির, সজ্জা নাই, লজ্জা নাই ধড়ে—
> কাছা কোঁচা শতবার খ'সে খ'সে পড়ে।
> অস্তিত্ব আছে না আছে, ক্ষীণ খর্ব দেহ,
> বাক্য যবে বাহিরায় না থাকে সন্দেহ।

ইত্যাদি বিবরণের লক্ষ্য চন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রবাবু প্রকাশ্যভাবে উহা অস্বীকার করিয়াছেন। সে যাহা হউক রবীন্দ্রনাথ ও চন্দ্রনাথবাবুর তুমুল সংগ্রাম এ গ্রন্থের নির্দিষ্ট সীমার বাহিরে। কৌতূহলী পাঠক সেকালের 'সাধনা' ও 'সাহিত্যে' উহার বিবরণ পাইবেন।

১। সাধনা, ১৩০১ বৈশাখ।

আমি অল্পবয়সের স্পর্ধার বেগে মেঘনাদবধের একটি তীব্র সমালোচনা লিখিয়াছিলাম। কাঁচা আমের রসটা অম্লরস,—কাঁচা সমালোচনাও গালিগালাজ। অন্য ক্ষমতা যখন কম থাকে, তখন খোঁচা দিবার ক্ষমতাটা খুব তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে। আমিও এই অমর কাব্যের উপর নখরাঘাত করিয়া নিজকে অমর করিয়া তুলিবার সর্বাপেক্ষা সহজ উপায় অন্বেষণ করিতেছিলাম। এই দাম্ভিক সমালোচনাটা দিয়া আমি ভারতীতে প্রথম লেখা আরম্ভ করিলাম।" এমন সরল দোষস্বীকারোক্তি যদি যথার্থ মহত্ত্বের পরিচায়ক না হয়, তবে মহত্ত্বের পরিচয় আর কিসে হয় জানি না।

'প্রচারে' বঙ্কিমচন্দ্রের যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাহার মধ্যে কয়েকটি 'বিবিধ প্রবন্ধ' দ্বিতীয় খণ্ডে এবং কয়েকটি 'লোকরহস্যে' পুনর্মুদ্রিত হয়। লোকরহস্যে মুদ্রিত প্রবন্ধগুলির আলোচনা পূর্বে প্রসঙ্গান্তরে করা হইয়াছে। বিবিধপ্রবন্ধে মুদ্রিত প্রবন্ধের মধ্যে একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহার নাম পূর্বে একবার উল্লিখিত হইয়াছে,—'গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি।' এই প্রবন্ধে বঙ্কিমের শাস্ত্রব্যাখ্যায় রূপকরীতি প্রয়োগের কতকগুলি উদাহরণ পাওয়া যায়। যথা,—কুণ্ঠাশূন্য নির্বিকার যে চিত্ত, হরি সেইখানে বাস করেন বলিয়া পুরাণে তাঁহাকে বৈকুণ্ঠবাসী বলে। বিষ্ণুর দুই পত্নী লক্ষ্মী সরস্বতী; ইহা অবশ্য সকলেই জানে যে, একজন ঐশ্বর্য সৌন্দর্যের প্রতিরূপ, অপরা জ্ঞানের প্রতিরূপ। কিন্তু বাবাজি আরও একটু অগ্রসর হইয়া রামবল্লভ বাবুকে বলিতেছেন "বিষ্ণু সৎ সরস্বতী চিৎ আর লক্ষ্মী আনন্দ। অতএব রে মূর্খ এই সচ্চিদানন্দ পরম ব্রহ্মকে প্রণাম কর।" বিষ্ণুর হৃদয়ের কৌস্তুভ সূর্য, বনমালা গ্রহ নক্ষত্রাদি। বিষ্ণু স্বয়ং অশরীরী, যিনি জগতে সবত্র প্রবিষ্ট তিনিই বিষ্ণু। শ্রীবিষ্ণুর পুরাণোক্ত ঐশ্বয ব্যাখ্যায় বাবাজি কেবল allegory এবং তাঁহার মূর্তিকল্পনায় symbolism লক্ষ্য করিয়াছেন। বিষ্ণুর হাতের পদ্ম সৃষ্টিক্রিয়ার প্রতিমা, গদা লয়ক্রিয়ার প্রতিমা, শঙ্খ ও চক্র স্থিতিক্রিয়ার প্রতিমা। জগতের স্থিতি স্থানে ও কালে। স্থান, আকাশ। আকাশ শব্দবহ, শব্দময়। তাই শব্দময় শঙ্খ আকাশের প্রতিমাস্বরূপ বিষ্ণুহস্তে স্থাপিত হইয়াছে। কল্পে কল্পে, যুগে যুগে, মন্বন্তরে মন্বন্তরে কাল বিবর্তনশীল, তাই কাল ঈশ্বরহস্তে চক্রাকারে আছে, ইত্যাদি।

গৌরদাস বাবাজি পরমপণ্ডিত, এবং পরমবৈষ্ণব। কিন্তু পাঁঠার মাংসটা বেশ চলে। খাদ্যাখাদ্যবিচারটা যে ধর্মের আবশ্যক অঙ্গ তাহা গৌরদাস স্বীকার করেন না। কিন্তু বঙ্কিম স্বয়ং একবার মৎস্যমাংস ছাড়িয়া হবিষ্যান্ন ধরিয়াছিলেন বলিয়া শচীশবাবু বলিয়াছেন। দ্বিতীয় ভাগ 'প্রদীপে' কালীনাথ দত্ত মহাশয়ও ঐ কথা বলিয়াছিলেন।[১] সাত্ত্বিক আহারের প্রকৃষ্টতা বঙ্কিম স্বয়ং অন্যত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, চিত্তশুদ্ধিই উহার প্রয়োজন। শাস্ত্রও ত তাহাই

১। প্রদীপ, ২য় ভাগ, ২৬২-২৬৩ পৃষ্ঠা।

বলেন, আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ। অবশ্য 'আহার' কথার অর্থ নিয়া সম্প্রদায়ভেদে মতভেদ আছে।

গৌরদাস বাবাজি কৃষ্ণলীলাও রূপকরীতি প্রয়োগে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে গমনার্থক ব্রজ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ব্রজ জগৎসংসার। বৃন্দাবন কোনও সহর-টহর নয়। বৃন্দা অর্থাৎ রাধা যেখানে থাকেন তাহাই বৃন্দাবন। রাধা কি? না ঈশ্বরের আরাধনাকারী ভক্ত। তিনি গোপী (গোপ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ), কেননা যাঁহারা ধর্মাত্মা তাঁহারাই পৃথিবীর রক্ষক। (গো = পৃথিবী) গোলোক ভূগোল একই। নন্দ ও আনন্দ এক কথা। কৃষ্ণ নন্দভবনে বাস করিতেন, ইহার অর্থ—পরমানন্দধামেই ঈশ্বরের বাস অথাৎ তিনি আনন্দেই বিদ্যমান। যশোদা যে কৃষ্ণকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন তাহার অর্থ এই যে, ঈশ্বরের যশ বা মহিমা কীর্তন দ্বারা তাঁহাকে হৃদয়ে পরিবর্ধিত করিতে হয়, ইত্যাদি।

কিন্তু গৌরদাস বাবাজি শ্রীকৃষ্ণকে রূপক বলেন না। "তিনি শরীরী, অন্যান্য মনুষ্যের সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে বিদ্যমান ছিলেন, এবং তিনি অশরীরী জগদীশ্বর।" তাঁহার মতে জগদীশ্বর সশরীরে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া জগতে ধর্ম স্থাপন করিয়াছিলেন. তিনি রূপক নহেন। পুরাণকার তাঁহাকে মাঝখানে স্থাপিত করিয়া এই ধর্মার্থক রূপকটি (ব্রজলীলা) গঠন করিয়াছেন।

বঙ্কিমের 'কৃষ্ণচরিত্র' বস্তুতঃ ঐ কথারই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। কৃষ্ণচরিত্রে বঙ্কিম মহাভারতের মূল ও প্রক্ষিপ্তাদি বিচার করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার যেরূপ পাণ্ডিত্য, সূক্ষ্মদর্শিতা ও পরিশ্রমশীলতা প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা নিতান্তই আশ্চর্যজনক। তিনি কৃষ্ণচরিত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া স্বাধীন চিন্তা দ্বারা শাস্ত্রের মর্ম ব্যাখ্যা করিয়া কর্তব্য শেষ করিতে পারেন নাই—উহা সম্ভবও ছিল না, তাঁহাকে স্বাধীন চিন্তাপদ্ধতি দ্বারা কোনটা আসল শাস্ত্র ও কোন্‌টা নকল শাস্ত্র—কোন্‌টা বিশ্বাস্য কোন্‌টা অবিশ্বাস্য তাহা পর্যন্ত ঠিক করিতে হইয়াছে। তাঁহার সিদ্ধান্ত যে সর্ববাদিসম্মত হইবে ইহা আশা করাই অন্যায়। হয়ও নাই। তাহা ছাড়া মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত অংশ বাদ দিলেই যে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যাহা পাওয়া যাইবে তাহার সকল অংশই ঐতিহাসিক, তাহা স্বীকার করিতেও অনেকেই কুণ্ঠিত হইবেন। আবার প্রক্ষিপ্ত অংশেও যে সত্যমূলক কতক জনশ্রুতি নাই তাহাই বা কে বলিতে পারে? সে যাহা হউক, কৃষ্ণসম্বন্ধে বঙ্কিমের বিশ্বাস কি তাহা আমরা জানি। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ভগবানের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন; কিন্তু কতকটা সীলী-প্রণীত Ecce Homo গ্রন্থের অনুকরণে তাঁহাকে মানুষরূপে—স্বপ্রচারিত অনুশীলনতত্ত্বের আদর্শরূপে—লোককে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। অনেকে বলেন বঙ্কিম ভগবানকে ভগবত্তা হইতে চ্যুত করিয়া মানুষত্বে টানিয়া নামাইয়াছেন। ইহা অতি অন্যায় সমালোচনা। শ্রীকৃষ্ণ যদি তত্ত্বমাত্র না হয়েন, তবে তিনি ভগবান হইয়াও মানুষরূপেই লীলা করিয়াছেন—

মানুষরূপে লীলা করিতে আসিয়া অমানুষ বা লোকাতীত কোনও ক্ষমতাপ্রদর্শন তাঁহার পক্ষে সমীচীন নহে; সুতরাং মানুষের কার্যরূপে তাঁহার কার্যপ্রণালীর আলোচনা অন্যায্য হইতে পারে না। বঙ্কিম স্বয়ং তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, সে বিশ্বাস কৃষ্ণচরিত্রে গোপন করেন নাই।

শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে আলোচনার বোধ হয় বঙ্কিমই একরূপ পথ-প্রদর্শক।[১] তৎপূর্বে ও পরেও অনেকে শ্রীকৃষ্ণকে একেবারে myth বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কেহ কেহ (যথা Barth[২]) শ্রীকৃষ্ণকে সূর্যের প্রতিরূপ দেবতা (solar deity) বলিয়া প্রতিপাদিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, কেহ কেহ বা (যথা Keith)[৩] Osiris, Adonis, Dionysos এর ন্যায় শস্যের দেবতা (Vegetation deity) বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সকল মতে কল্পনা-বৈচিত্র্য আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু কোনও মতই সূক্ষ্ম বিচারসহ নহে। তবে ইহা সম্ভব যে কালক্রমে মূল একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তির কীর্তিস্মৃতির সহিত নানাপ্রদেশের ধর্মসংস্কার ক্রমশঃ সমন্বিত হইয়া গিয়াছে। আধুনিক বৈষ্ণবধর্ম যে দাক্ষিণাত্যে তামিল জাতির মধ্যে অবয়বপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।[৪] শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে যাঁহারা বিশেষ আলোচনা করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা Indian Antiquiry পত্রিকায়[৫] সার্ আর্ জি ভাণ্ডারকার, বিউলার, গ্রীয়ার্সন্ প্রভৃতির প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।

কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম সংস্করণ ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে হয়। ছয় বৎসর পরে বঙ্কিম উহার অনেকাংশ সংশোধিত ও বর্ধিত করিয়া দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত করেন। বঙ্গদর্শনেও বঙ্কিম কৃষ্ণচরিত্র আলোচনা করিয়াছিলেন, তখন সকল বিষয় ভাবিবার ও বুঝিবার অবসর ও সুযোগ পান নাই। ঐ প্রবন্ধের ভ্রম বঙ্কিম শেষে স্বীকার করিয়াছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহের' সমালোচনা উপলক্ষেও (বঙ্গদর্শন ১২৮১, চৈত্র) বঙ্কিম শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলেন। শ্রীকৃষ্ণ ধীরে ধীরে তাঁহার হৃদয়ে স্বীয় লীলালোক বিস্তার করিয়াছিলেন। বঙ্কিম

---

১। বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্র আলোচনা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মনঃপূত হয় নাই। তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথকে ইহার প্রতিবাদ লিখিতে বলিয়াছিলেন। দ্র. দ্বিজেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা, পুরাতন প্রসঙ্গ, বিপিনবিহারী গুপ্ত।—স.

২। "Religions of India."

৩। Journal of the Royal Asiatic Society, 1915.

সুপ্রসিদ্ধ Golden Bough নামক নানা খণ্ডে বিভক্ত বৃহৎ গ্রন্থে এই সকল দেবতার বিশেষ বিবরণ আছে: solar myth, vegetation myth প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা কৌতুককর বিবরণ ও দৃষ্টান্তও ঐ গ্রন্থে পাওয়া যাইবে।

৪। মান্দ্রাজ হইতে Natesan-এর প্রকাশিত The Vaishnavite Reformers of India নামক ক্ষুদ্র পুস্তকখানি দ্রষ্টব্য।

৫। Indian Antiquiry 1889, 1894, 1908.

ভক্ত বৈষ্ণবের ভাব অঙ্গীকার করিতে পারেন নাই বলিয়া বৃন্দাবনলীলাকে তেমনভাবে বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার সেরূপ সুকৃতি থাকিলে এবং আর কয়েক বৎসর বাঁচিয়া গেলে (কে বলিতে পারে?) হয়ত সে লীলাও বুঝিতেন। লীলা লীলাই, তাহা রূপক নহে; কেননা তাহা ভক্তের প্রত্যক্ষগম্য। যাহা হউক শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তায় বঙ্কিমের বিশ্বাসের গভীরতা ছিল। আশা করা যাউক তিনি দেহান্তে শ্রীকৃষ্ণের চরণে আশ্রয় পাইয়াছিলেন। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"

১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে বঙ্কিম সমুদ্রযাত্রা হিন্দুর কর্তব্য কি না তৎসম্বন্ধে মত প্রকাশ করেন। তিনি ঐ প্রবন্ধে বলেন "সমুদ্রযাত্রা লোকহিতকর বলিয়া ধর্মানুমোদিত। সুতরাং ধর্মশাস্ত্রে যাহাই থাকুক, সমুদ্রযাত্রা হিন্দুধর্মানুমোদিত।" তাঁহার মতে প্রাচীন উদার হিন্দুধর্ম অপেক্ষাকৃত আধুনিক স্মার্তদিগের হাতে পড়িয়া সঙ্কীর্ণ হইয়াছে। যুক্তিবলে যদি কোনও আচার ধর্মানুমোদিত বোধ হয়, তবে স্মৃতির মত গ্রাহ্য করিবার প্রয়োজন নাই। বঙ্কিমের এই মত সম্বন্ধে তখন খুব আন্দোলন, আলোচনা হইয়াছিল। গোঁড়া হিন্দুর দল বঙ্কিমকে "সুরেন্দ্রবাবু, ডব্লিউ সি, ব্যানার্জি, রমেশ দত্ত" প্রভৃতির সহিত একদলভুক্ত "বাবু সাহেব" বলিয়া গালি দিয়াছিল।[১] এক্ষণে সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে মতভেদ প্রায় লুপ্ত হইয়া আসিয়াছে—সমাজের উপর পরিবর্তনশীল কালের প্রভাবে সমুদ্রযাত্রায় শাস্ত্রীয় বাধাসমূহ উপেক্ষিত হইতেছে। বঙ্কিমের শাস্ত্রমতব্যাখ্যায় নিরপেক্ষ যুক্তির প্রাধান্য আমরা বহুবার দেখিয়াছি—সুতরাং সে বিষয়ে অধিক আলোচনা অনাবশ্যক।

## ষোড়শ পরিচ্ছেদ

## দীপনির্বাণ

আমরা বঙ্কিমের প্রতিভা-কল্পলতায় তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল উভয়ই দেখিয়াছি এবং উভয়ই যথাসম্ভব সম্ভোগ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। ধর্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থগুলি রচনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাঙ্গালায় গীতার এক ভাষ্য রচনা করিতে আরম্ভ করেন। উহা সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারিলে বাঙ্গালীর সাহিত্য-রত্নভাণ্ডারে আরও একটি অমূল্য রত্ন রাখিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু তাহা হয় নাই। সরকারী কার্য হইতে অবসর গ্রহণের পরেই তাঁহার স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। এই ক্ষীণ স্বাস্থ্যের মধ্যে তিনি কৃষ্ণচরিত্র সংশোধন ও পরিবর্ধন জন্য বিপুল পরিশ্রম করিয়াছিলেন। গীতাব্যাখ্যাও এই সময়েই লিখিত হইতেছিল বলিয়া বোধ হয়। ইন্দিরা ও রাজসিংহ এই সময়ে পরিবর্ধিত হয়।

১। জন্মভূমি, ভাদ্র, ১২৯৯।

ইহা ছাড়া তিনি বৈদিক-সাহিত্য সম্বন্ধে এই সময়ে আলোচনা করিতেছিলেন, 'মৃত' বিদ্যাকে পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টায় ছিলেন। বেদ সম্বন্ধে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে একটি ইংরাজী প্রবন্ধও পাঠ করিয়াছিলেন। উহার মর্ম শচীশবাবুর বঙ্কিম জীবনীর পরিশিষ্টাংশে প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা অনাবশ্যক। এই সময়ে ৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে তিনি বলিয়াছিলেন, আর একখানি উপন্যাসে বৈদিক কালের একটি স্ত্রী চরিত্র অঙ্কিত করিবেন। খাতাও নাকি বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন।[১] নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবনে' দেখা যায়[২] তিনি ভারতবর্ষের একখানি 'প্রকৃত ইতিহাস' লিখিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন এবং কিয়দংশ লিখিয়াও ছিলেন। কিন্তু ভগবান তাঁহাকে ঐ সকল সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিবার অবসর দিলেন না। ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে তাঁহার পূর্বসঞ্জাত বহুমূত্র ব্যাধি অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল; ক্রমে তাহা ব্রণোৎপত্তি করিয়া সাংঘাতিক আকার ধারণ করিল। ইহার প্রায় দুই মাস পূর্বে এক সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাতের পর হইতে তিনি এবারের মতে পৃথিবী হইতে বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

বাঙ্গালী বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের সকল লীলার বর্ণনা করিয়াছেন—তাঁহার সন্ন্যাসের কথা আলোচনা করিতে যাইয়া কাঁদিয়া বক্ষ ভাসাইয়া দিয়াছেন—কিন্তু তাঁহার লীলাবসান প্রসঙ্গ কুত্রাপি আলোচনা করেন নাই। ইহার কারণ সহজেই অনুমেয়। আমরাও তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বঙ্কিমের জীবনের শেষ মুহূর্ত সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিব না। এই মাত্র বলিব—বাঙ্গালা ১৩০০ সনের (ইংরাজী ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দ) ২৬শে চৈত্র রবিবার বৈকালে বাঙ্গালার যে প্রত্যক্ষ খণ্ড জ্যোতি অপ্রত্যক্ষ মহাজ্যোতির সহিত একীভূত হইয়া যায়, তাহার অভাবে দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা আপনাদিগকে মহান্ধকারে নিমগ্ন বিবেচনা করিয়াছিলেন। আজ ছাব্বিশ বৎসর পরে সেই ঘটনা মনে করিয়া বর্তমান লেখকের চক্ষু যে জলভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছে তাহার কারণ ইহা নহে যে, অকালমৃত্যু বাঙ্গালা দেশে বড় বিরল, অথবা অকালে লীলা সংবরণ করিলেও বঙ্কিম স্বীয় প্রতিভার যোগ্য দান বঙ্গবাসীকে দিয়া যাইতে পারেন নাই, কিন্তু বঙ্কিম আপনাকে প্রত্যেক বাঙ্গালীর আপনার হইতে আপনার জন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার বিয়োগ নিতান্ত আপন জনের বিয়োগতুল্য। তাঁহার গ্রন্থাবলী পড়িতে পড়িতে তাঁহাকে আমাদের জীবিত ও মৃত অন্য প্রত্যেক সখা হইতে সমপ্রাণ, প্রত্যেক সুহৃৎ হইতে সদানুমত, এমন কি, প্রত্যেক গুরু হইতে বিশিষ্টতর হিতোপদেষ্টা বলিয়া মনে হয়। বঙ্গে আর কাহার কৃতি এমন "আবালবনিতাবৃদ্ধ-চিত্তপ্রসাদন"? কোন কবি বা ঔপন্যাসিক এমন ভাবে সকলের চিত্তে প্রবেশ করিবার মোহনমন্ত্র আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন? রুচির বিশিষ্টতা বা সহানুভূতির

১। প্রদীপ, ২য় ভাগ; ও মানসী, ৭ম বর্ষ।

২। আমার জীবন, ৪র্থ ভাগ।

সঙ্কীর্ণতা যে কারণেই হউক আধুনিক শ্রেষ্ঠ লেখকগণের প্রায় সকলেরই অনুরাগী পাঠকের সংখ্যা বাঙ্গালা সমাজের এক এক coterie বা ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে নিবদ্ধ; কিন্তু বঙ্কিম সমাজের সর্বশ্রেণীর লোকের সহিত সহানুভূতিবলে, এবং সর্বোপরি সত্যের সহিত আপনার কৃতিসমূহের মনোরম সামঞ্জস্যগুণে বাঙ্গালী-মাত্রকেই আপনার অনুরাগী ভক্তে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অমুক লেখককে প্রশংসা করা একটা ফ্যাসন, না করিলে সমাজে বর্বর প্রতিপন্ন হইতে হয়, সেইজন্য না বুঝিয়াও বা মনের যথার্থ প্রবোধব্যতিরেকেও কেহ কেহ কোনও কোনও লেখককে প্রশংসা না করেন তাহা নহে। মানব প্রকৃতিতে এ সঙ্কীর্ণতা সব দেশেই আছে। অনেক দেশেই অনেক লেখক ডাঃ জনসনের ভাষায় more admired than read। বঙ্কিম সম্বন্ধে কিন্তু তাহা বলা যায় না। বাঙ্গালীমাত্রেই তাঁহাকে 'স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে' আদর করিয়াছে, ভক্তি করিয়াছে, তাঁহার বইগুলি পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছে এখনও তাঁহার উপন্যাগুলি পুরানো হয় নাই। ইহা কি কম প্রশংসার কথা? কয়জন ঔপন্যাসিক সম্বন্ধে এমন কথা বলা যায়?

বঙ্কিমের কৃতিসমূহের এই সর্বজীনন ভাব হইতে ইহা মনে করা অন্যায় বা অযৌক্তিক নহে যে, যত দিন বাঙ্গালী জাতির জাতিগত বৈশিষ্ট্য নষ্ট না হইবে (কোন জাতিরই বা জাতীয় ধর্মের ঐকান্তিক বিপর্যয় সম্ভব?), তত দিন বঙ্কিমের গ্রন্থাবলীর আদর লুপ্ত হইবে না। তিনি বাঙ্গালা ভাষাকে যে রূপ দিয়া গিয়াছেন, তাহা হয়ত চিরদিন থাকিবে না। কেননা ভাষার একটা জীবনশক্তি আছে যাহার প্রভাবে তাহা জগতের অন্য সকল সজীব পদার্থের ন্যায় নিত্যই (যদিও খুব ধীরে ও প্রায় অলক্ষিত ভাবে) পরিবর্তন প্রাপ্ত হইতেছে। রামমোহনের ভাষা নাই, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের ভাষা নাই, বিদ্যাসাগর তারা-শঙ্করের আদর্শ নাই, বঙ্কিমেরই বা থাকিবে কিরূপে? তবে অন্য সকলের আদর্শ যত অল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল, বঙ্কিমের আদর্শ তত অল্পকাল স্থায়ী হইবে না। তবে সে আদর্শেরও যে ইতিমধ্যেই কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হইতেছে তাহাও লক্ষ্য করা যায়—যদিও সে পরিবর্তন নিতান্তই কিঞ্চিন্মাত্র। ভাষা সাহিত্যের দেহ মাত্র, দেহ ছাড়া সাহিত্যের প্রাণভূত আদর্শেও পরিবর্তন হয়, হইতেছেও। জীবনের ন্যায় সাহিত্যেও ফ্যাসানের পরিবর্তনে যুগে যুগে সাহিত্যকগণের আদরের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। এক পুরুষে বা এক যুগে যে কবিকে আদর করে, সে পুরুষ বা যুগ চলিয়া গেলে সে কবির আদর থাকে না। পরবর্তী পুরুষ বা যুগ তিনি কি করিয়াছিলেন তাহা দেখে না, তিনি কি করেন নাই তাহাই লক্ষ্য করে।[১] ইংরাজী সাহিত্যে এক কালে পোপের কত আদরই না ছিল। এখন বিদ্যালয়ের ছাত্রেরাও পোপকে কবিই বলিতে চায় না। টেনিসনের প্রশংসায় এককালে

১। এই কথাগুলি সার ওয়ালটার র‍্যালের সম্প্রাত প্রকাশিত একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থে সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে।

সমগ্র ইংলণ্ড মুখরিত হইত, এখন লোকে বলিতে আরম্ভ করিয়াছে তাঁহার চিন্তার গভীরতা ছিল না। "অন্য পরে কা কথা?" সেক্ষপীয়রের করুণরসাত্মক নাট্যরচনায় দক্ষতা ছিল না, এমনও নাকি একটা কথা উঠিয়াছে। রেনেসাঁসের অন্যতম প্রবর্তক দান্তেকে রেনেসাঁসের যুগের লোকেরা নিন্দা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু ফ্যাসানের এইরূপ পরিবর্তন সত্ত্বেও সেক্ষপীয়র, দান্তে, এমন কি, পোপ, টেনিসনও চিরকাল আদৃত থাকিবেন, কেননা তাঁহাদের সাহিত্যে সাময়িক রুচির একটা ছায়া ছাড়া আরও এমন অনেক গুণ ছিল—যাহা আমরা পূর্বে সৎ সাহিত্যের ধর্মরূপে নির্দেশ ও ব্যাখ্যা করিয়া আসিয়াছি। বঙ্কিমের সেই গুণগুলি বিশিষ্টরূপে ছিল বলিয়া, আশা করা যায়, তাঁহার নাম ও কীর্তি বাঙ্গালীর নিকট চিরকাল আদৃত ও সম্মানিত থাকিবে।

বঙ্কিমের প্রথম কোনও কোনও পুস্তকের ভাষার আলোচনা পূর্বে করিয়াছি। প্রথম তিনখানি উপন্যাসে তাঁহার ভাষা খুব খোলে নাই। বিষবৃক্ষ হইতে ঐ ভাষায় পরিবর্তনের সূচনা দেখা যায়। কমলাকান্তে বঙ্কিমের ভাষাপ্রবাহিণী ললিত তরঙ্গ নৃত্য করিতে আরম্ভ করে। পরিবর্ধিত ইন্দিরায় উহার পূর্ণপরিণতি। ৺জগদীশ নাথ রায়ের নিকট বঙ্কিম এক চিঠিতে লিখিয়াছিলেন[১] "ভাষার শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা; অনেক কষ্টে আমি সরলতাকে পাইয়াছি।" দেবীচৌধুরাণী ও সীতারাম সরল অথচ শিল্পকৌশল সমন্বিত রচনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বঙ্কিম ১২৯১ সনের মাঘের 'প্রচারে' বাঙ্গালা নব্য লেখকগণকে লক্ষ্য করিয়া যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন এবং যাহা শেষে তাঁহার দ্বিতীয় খণ্ড 'বিবিধ প্রবন্ধে' পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে, ঐ প্রবন্ধোক্ত অমূল্য উপদেশগুলি স্মরণ করিয়া আধুনিক লেখকগণ বাঙ্গালা গ্র রচনায় প্রবৃত্ত হইলে বঙ্গবাণীর মালঞ্চ এমন স্বচ্ছন্দজাত কণ্টকগুল্মে আকীর্ণ হইত না। পূর্বে আক্ষেপের বিষয় ছিল বাঙ্গালী বাঙ্গালা লিখিতে চায় না, ইংরাজী বুলির কসরত করিয়া ক্ষমতার অপচয় করে; এখন যেন মনে হয় বাঙ্গালী বড় বেশি বাঙ্গালা লিখিতেছে, হেলায় অশ্রদ্ধায় লিখিতেছে, তাড়াতাড়ি নাম বা পয়সা করিবার লোভে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া লিখিতেছে।

সে যাহা হউক, যাহা বলিতেছিলাম—বঙ্কিম সাহিত্যরচনায় সরলতাকে খুব শ্রেষ্ঠস্থান দিয়াছেন। সরলতা শ্রেষ্ঠগুণ বটে, এবং যদিও আধুনিক সাহিত্যে ঐ গুণটির এত আধিক্য হয় নাই যে উহার সম্বন্ধে অধিক বলা একেবারে নিষ্প্রয়োজন হইয়াছে, তথাপি সাহিত্যিকমাত্রকে মনে রাখিতে হইবে, সাহিত্যের ভাষায় সরলতা ছাড়াও আরও কয়েকটি অবশ্য অনুশীলনীয় গুণ আছে। শুদ্ধতা ও বৈচিত্র্য ঐরূপ দুইটি গুণ। ভাষার শুদ্ধতা অর্থে পরভাষা ও নিজ দেশের মৃত ভাষা উভয়েরই অনুচিত প্রভাববর্জন বুঝায়। মৃতভাষার প্রভাব হইতে ভাষাকে মুক্তি দান করিতে গিয়া কেহ কেহ আবার যেন প্রাদেশিকতার দিকে বড় বেশি

১। ভারতী, চৈত্র, ১৩১৮।

ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে গ্রাম্যতাদোষও অলক্ষিতে সাহিত্যে ঢুকিয়া পড়িতেছে তাহা সকলে লক্ষ্য করিতেছেন না। অনেকে আবার জিলা বিশেষের বা কোনও একটা অঞ্চলের প্রাদেশিকতাকে আদর্শরূপে স্থাপন করিতে প্রয়াসী; ইহার অন্ততঃ একটা দোষ এই যে, ইহাতে বহু লেখকের পক্ষে কৃত্রিমতা অবশ্যম্ভাবী, অথচ তদনুপাতে গুণ বিশেষ কিছুই দেখা যায় না। পরভাষার প্রভাব সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় যে, আমাদের বর্তমান শিক্ষানীতির দোষে উহা প্রায় অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। যদি এমন সুদিন হয় যে বাঙ্গালা ভাষা আমাদের শিক্ষার বাহন হইয়া উঠে, তবেই ইহার পরিবর্জন সম্ভব হইবে। এখনকার শিক্ষানীতির ফলে হয় আমরা মোটেই ভাবি না, না হয় যাহা ভাবি তাহাও ইংরাজী কায়দায় ভাবি বলিয়া ইংরাজী বাক্‌পদ্ধতি অনুকরণে সে ভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করি—খুব যে বিশুদ্ধভাবে করিতে পারি এমন কথা বলা যায় না। তাই যখন বাঙ্গালা লিখি তখন তাহা হয় বাঙ্গালা-ইংরাজীর খিচুড়ী, আর যখন ইংরাজী লিখি তখন তাহা হয় বাবু ইংলিশ।

ভাষার বৈচিত্র্য বা সৌন্দর্য গুণটি ব্যাখ্যা করা কঠিন। কালিদাসের ভাষা এক কালিদাসেরই। এডিসন্, টেনিসনের অনুকারী বহু আছে, কিন্তু এডিসন্‌ও একজন, টেনিসন্‌ও একজন। আধুনিক বাঙ্গালী লেখকগণও ভুলিয়া গিয়াছেন যে রবীন্দ্রনাথও একজনের অধিক জন্মে না। তাই তাঁহার রচনারীতির, বাক্‌-চাতুরীর ও ভাবমাধুরীর এমন অক্ষম অনুকরণ চলিতেছে। উত্তম লেখকের ভাষায় ব্যক্তিগত প্রতিভার এক একটা ছাপ থাকে, যাহা ব্যক্তিবিশেষে ভিন্নরূপ। বঙ্কিমের ভাষার সৌন্দর্যের মূলে তাহাতে ভাব ও ভাষার অপূর্ব পরিণয় লক্ষিত হয় যাহা তৎপূর্ববর্তী অন্য বাঙ্গালা লেখকের প্রায় ছিল না। আমি প্রবন্ধান্তরে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, বিদ্যাসাগরের রচনায় ভাষা নবকিশোরী সদৃশী, তাহাতে বড় সাজসজ্জার বাহার কিন্তু ভাবাবেশের ছায়া তাহার মুখে চোখে তখনও ফুটিয়া উঠে নাই, বঙ্কিমের রচনায় ভাষা মুগ্ধা যুবতীতুল্যা। বড় স্নিগ্ধা, বড় মনোহরা, অথচ যেন আপনার পূর্ণ লাবণ্য ব্যক্ত করিতে সঙ্কুচিতা। আর রবীন্দ্রনাথে সে প্রগল্‌ভা নায়িকা, সে ললিত স্বচ্ছন্দ গতিতে চলে, বড মধুর হাসি হাসে, অথচ মনে হয় যেন নিজ প্রগল্‌ভতায় ভাবকে কিয়ৎ পরিমাণে মুগ্ধ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। অবশ্য বঙ্কিমেরও স্থলে স্থলে ভাষার প্রগল্‌ভতা, রবীন্দ্রের ভাষায়ও মুগ্ধার ভাব আছে—কিন্তু তাহা সাধারণ রীতি নহে।

বঙ্কিম প্রতিভার বরপুত্র ছিলেন; তিনি একাধারে কবি, পণ্ডিত, নবসৃষ্টিকুশল শিল্পী, ভক্তিপ্রবণ দার্শনিক, দূরদৃষ্টিশালী স্বদেশপ্রেমিক, এবং ধীর ও শ্রদ্ধাশীল সমাজসংস্কারক। তাঁহার প্রতিভা সূর্যালোকের মত যেমন ব্যাপক তেমনই প্রখর, তাহাতে জ্যোতিঃ ও তাপ উভয়ই ছিল। তাই তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যমণ্ডলে একচ্ছত্র আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন। সে প্রতিভার আলোকচ্ছটায় যেমন

বাঙ্গালী পাঠক সম্প্রদায় মুগ্ধ হইয়াছিল, যেমন অনেক যথার্থ গুণবান্ সাহিত্যিকের উন্মেষোন্মুখ চিত্তসরোজ ফুটিয়া উঠিয়া বঙ্গসাহিত্যমালঞ্চের শোভা বর্ধন করিয়াছিল, তেমনই তাহার প্রবল দাহশক্তিতে অনেক অক্ষম লেখকের সাহিত্যসৃষ্টির দুরাশা দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। তিনি বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, পড়িতে পারিলেই যে লিখিতে হইবে বা লিখিবার সনন্দ পাইবে, সাহিত্যের রাজ্যে এমন নিয়ম নাই। সাহিত্যের রাজ্য জনতন্ত্রতার রাজ্য নহে, অন্ততঃ অবাধ স্বাধীনতার ক্ষেত্র নহে; যাঁহাদের শিল্পজ্ঞান আছে, সুরুচি আছে, বিচারক্ষমতা আছে, তাঁহারাই এ রাষ্ট্রের চালক, নিয়ামক ও অভিভাবক। অদ্যকার দিনে তদানীন্তন বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার অতুল প্রতাপ সম্বন্ধে সমুচিত ধারণা করাই কঠিন হইয়াছে, কেননা এখন আর বাঙ্গালায় তেমন একজন একচ্ছত্র সাহিত্যসম্রাট্ নাই। কিন্তু তাঁহার প্রভাব যে এই সাহিত্যের বিকাশের অবস্থায় অমূল্য উপকার সাধন করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি স্বয়ং বাঙ্গালীকে যে অপূর্ব সাহিত্য সম্পদ দিয়া গিয়াছেন, তাহার জন্য ত তাঁহার নিকট আমাদের অশোধনীয় কৃতজ্ঞতা ঋণ আছেই, তাহা ছাড়া তিনি বিভ্রমগ্রস্ত বাঙ্গালীকে সাহিত্যে, জীবনে ও সমাজে যাহা করিতে দেন নাই তাহার জন্যও তাঁহার নিকট আমাদের ঋণের পরিমাণ কম নহে। তাঁহার এই উভয়বিধ ঋণ স্মরণ করিয়া আসুন আমরা সকলে তাঁহার স্বর্গগত আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধানম্র হৃদয়ে উপচারাঞ্জলি অর্পণ করি—

ওঁ সর্বঃ সুগন্ধ এবায়ং শীতলঃ সুমনোহরঃ।<br>
ময়া নিবেদিতো ভক্ত্যা গন্ধোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥<br>
ওঁ শ্রিয়া দেব্যা সমাযুক্তং দেবৈশ্চ শিরসা ধৃতম্।<br>
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পুষ্পমেতং প্রগৃহ্যতাম্॥<br>
ওঁ বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ।<br>
আঘ্রেয়ঃ সর্বগন্ধানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥<br>
ওঁ সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্বতস্তিমিরাপহঃ।<br>
সবাহ্যাভ্যন্তরজ্যোতির্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥

ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্ন সন্ত্বোষধীঃ মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমানস্তু সূর্যো মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ। ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু।